মিসকুল খিতাম

প্রথম খণ্ড

উমদাতুল আহকামের ব্যাখ্যা

যায়েদ ইবনে হাসান ইবনে সালেহ আল-ওয়াসাবী
অনুবাদ: সাইদুর রহমান ও আব্দুল্লাহ আনসারী

مسك الختام

شرح عمدة الأحكام

মিসকুল খিতাম

শারহু উমদাতিল আহকাম

প্রথম খণ্ড

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

www.maktabatussunnah.org

email: maktabatussunnah19@gmail.com

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২৪ ঈসায়ী, রমযান ১৪৪৫হি

নির্ধারিত মূল্য: ৬৫০ (ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা

مسك الختام شرح عمدة الأحكام

মিসকুল খিতাম শারহু উমদাতিল আহকাম

প্রথম খণ্ড

লেখক- যায়েদ ইবনু হাসান ইবনু সালেহ আল-ওয়াসাবী

অনুবাদ: সাইদুর রহমান ও আব্দুল্লাহ আনসারী

সম্পাদক: আশরাফুল ইসলাম বিন রেজাউল হক

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

১. পবিত্রতা পর্ব

অধ্যায়: ১-পায়খানায় প্রবেশ করা এবং উত্তম রূপে পবিত্রতা হাসিল করা

অধ্যায়: ৬-তায়াম্মুম

২. সালাত পর্ব

অধ্যায়: ৮-সালাতের সময়সমূহ

অধ্যায়: ৯-জামাআতে সালাত আদায় করার ফযীলত ও তা ওয়াজিব হওয়ার বিবরণ

অধ্যায়: ১০-আযানের বর্ণনা

অধ্যায়: ১১-সালাতে কিবলাকে সামনে করা

অধ্যায়: ১২-সালাতের কাতারসমূহ

অধ্যায়: ১৫-রুকূ‘ও সিজদায় ধিরস্থিরতা অবলম্বন করা ফরয

অধ্যায়: ১৬-সালাতে কিরাআত পাঠ করা

অধ্যায়: ১৭-বিসমিল্লাহির রহমানির উচ্চস্বরে পাঠ না করা

অধ্যায়: ১৮-সাহু সিজদা

অধ্যায়: ১৯-মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা

অধ্যায়: ২০-বিবিধ বিষয়

অধ্যায়: ২১-তাশাহুদ

লেখকের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর জন্য, যিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের ইলাহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তার কোনো অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তার ওপর, তার পরিবার ও সকল সাহাবীদের ওপর দরুদ ও শান্তিরধারা বর্ষিত হোক।

অতঃপর, ইমাম আব্দুল গনী ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু সুরূর আল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ 'উমদাতুল আহকাম' কিতাবটি লেখেছেন। বিদ্বানরা ও ছাত্রসমাজ পঠনপাঠনের দিক দিয়ে তার কিতাবটাকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা মনে করি এর কারণ হচ্ছে তার স্বচ্ছ ও নির্মল ইখলাস এবং সত্যনিষ্ঠতা। বাকিটা তার ব্যাপারে আল্লাহ ভালো জানেন। আল্লাহ তাআলা তার ওপর রহম করুন।

বিদ্বানরা ব্যাখ্যা লেখার ব্যাপারেও তার কিতাবকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অনেক বিদ্বান বিস্তারিত ও সংক্ষেপে তার এই কিতাবের ব্যাখ্যা লেখেন, যা পাঠকমহলে সমাদৃত। আল্লাহর প্রশংসা তিনি এই কিতাবটা আমাকে দারুল হাদীসে পড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছেন। দারুল হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের শাইখ মুকবিল ইবনু হাদী আল ওয়াদায়ী রহিমাহুল্লাহকে আল্লাহ তাআলা তাঁর সুবিশাল জান্নাতে স্থান দান করুন এবং তার পরবর্তী খলীফা আমাদের শাইখ ইয়াহইয়া আল হাজুরী হাফিযাহুল্লাহকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

এই কিতাবটি পড়ানোর প্রারম্ভে আমার সাথে উপস্থিত কিছু ভাই বললেন, এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি কি ছাপানো হবে? আমি বললাম, না। তারা বললেন, যদি ছাপিয়ে প্রকাশ করা হতো তাহলে এখান থেকে অনেক মানুষ উপকৃত হতে পারতো। তারপর আমি এই উদ্যোগটা ভালো মনে করে বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতাম। তারপর আমি দৃঢ়প্রত্যয়ী হলাম এটা প্রকাশ করবো বলে। এই কিতাবটা প্রকাশ করার আগে আমি খানিকটা ভয় পেয়ে যাই। কারণ এই কিতাবে অনেক মাসআলা আছে যেগুলোতে আরো গভীর দৃষ্টি দিতে হবে এবং এই কিতাবের আরো অনেক ব্যাখ্যা আছে।

তারপর আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী হলাম যে এটা প্রকাশ করবো। তবে আনন্দের বিষয় হচ্ছে অল্প দিনের মধ্যেই কিছু প্রকাশক এই বইটি প্রকাশ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এতে আমি যারপরনাই অনুপ্রাণিত হই এবং পড়ানো চলমান রাখি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। মাসআলা শুরু থেকে পর্যায়ক্রমে একটার পর একটা করে লেখতে লেখতে এক বছর ও কয়েক মাসে আমি কিতাবটি পড়িয়ে শেষ করে ফেলি। পড়ানো শেষ

করার পর আমি কিতাবটি আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ করি। কোথাও সংযোজন করার প্রয়োজন অনুভব করলে সংযোজন করি, কোথাও বিয়োজন করার অনুভব করলে বিয়োজন করি। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করি। তথাপি আমি একজন মানুষ। আমার থেকে ভুল ও সঠিক দুটিরই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যা কিছু সঠিক তা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় হয়েছে আর যা কিছু ভুল তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। এই বইয়ের অলিগলিতে যদি বিজ্ঞ পাঠকদের কোনো ভুল বা অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় তাহলে সে জানিয়ে বাধিত করবেন। আমি জীবিত থাকলে সংশোধন করে নিবো। আর আমার যদি মৃত্যু হয় তাহলে পাঠক এই ভুল থেকে দূরে থাকবেন।

মামার ইবনু রাশেদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, একটা কিতাবকে যদি একশোবারও নিরীক্ষণ করা হয় তথাপি তাতে ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ এর ছাত্র ইমাম মুযানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ এর কিতাব 'আর রিসালা' আমি তার কাছে ৮০ বার পাঠ করি। প্রত্যেকবারই তিনি ভুলের কারণে কিছুক্ষণ থেমে বলেছেন, থামো, আল্লাহর কিতাব ব্যতীত কারো কিতাব বিশুদ্ধ নয়।

জনৈক কবি বলেন, অনেক কিতাব লেখে মনে করেছি বিশুদ্ধ লেখেছি। দ্বিতীয়বার যখন নিরীক্ষণ করি, তখন ভুল দেখতে পেয়ে ঠিক করে নিয়েছি। এই কবিতাটি ও এর পূর্বে ইমাম শাফেয়ী ও মামার রহিমাহুমার কথাগুলো আবুল আশবালের ‘জামেউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলি’ (১/৩৩৮) কিতাবে পাবেন।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুআ করি, তিনি যেন আমার এই চেষ্টাকে একমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন এবং মুসলিম জাতি যেন এই কিতাব দ্বারা উপকৃত হয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্ব জাহানের রব।

এই কিতাবকে আমি যেভাবে সাজিয়েছি

১. প্রত্যেক অধ্যায়, যেমন পবিত্রতা অধ্যায়, সালাত অধ্যায়, যাকাত অধ্যায় শেষ পর্যন্ত এই অধ্যায়গুলোর শুরুতে এগুলোর সংজ্ঞা ও এই অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসআলা উল্লেখ করেছি।

২. লেখক যে সকল অধ্যায়ের শুরুতে সংজ্ঞা দিয়েছেন ওই অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত কিছু মাসআলা আমি উল্লেখ করেছি।

৩. লেখক যে সকল হাদীস উল্লেখ করেছেন ওই সকল হাদীসের উৎস কোথায় তা বলে দিয়েছি। সাথে সাথে লেখকের কোনো সন্দেহ ও ভুল থাকলে সেটাও বলে দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ অচিরেই তুমি স্ব স্ব স্থানে তা দেখতে পাবে। এই ভুলগুলো হওয়ার কারণ হচ্ছে আল্লাহ ভালো জানেন তিনি কিছু হাদীস মুখস্ত থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪. প্রয়োজন অনুযায়ী হাদীসের অপরিচিত শব্দের ব্যাখ্যা করেছি।

৫. হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত মাসআলা আলোচনা করেছি।

৬. কোনো মাসআলায় ইজমা থাকলে তা উল্লেখ করেছি। আর যদি তাতে মতভেদ থাকে তা-ও উল্লেখ করেছি। তারপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন মাসআলাটা প্রাধান্যযোগ্য তা উল্লেখ করেছি অথবা বলেছি অমুক বিদ্বান এটা বলেছেন। যেমনঃ ইবনুল মুনযির, ইবনু কুদামা অথবা নববী বলেছেন।

৭. সাধ্যানুযায়ী মাসআলাগুলো সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করেছি। প্রথমে মত উল্লেখ করে একটি বা দুটি মাঝে মধ্যে একাধিক দলীল উল্লেখ করেছি। সংক্ষিপ্ত করার কারণ হচ্ছে যেন কিতাবের কলেবর বড় না হয়ে যায়। তারপর মাসআলার উৎস কোথায় বলে দিয়েছি, যাতে কেউ বিস্তারিত জানতে চাইলে সেখানে দেখতে পারে।

৮. অপ্রাসঙ্গিক কিছু মাসআলা উল্লেখ করেছি। এর কারণ হচ্ছে পড়ানোর সময় আমি কিছু মাসআলায় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। এগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত স্থানে উল্লেখ করেছি, যাতে পাঠক উপকৃত হতে পারেন।

লেখক

আবু আব্দিল্লাহ যায়েদ ইবনু হাসান ইবনু সালেহ আল ওয়াসাবী আল উমারী

এই ভূমিকাটা লেখা হয় কিতাব লেখা ও নিরীক্ষণের পর

শাবান ১৪৩২ হিঃ

হাফেয আব্দুল গনী আল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহর জীবনী

আব্দুল গনী আল মাকদেসী হলেন, হাফিয তাকিউদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল গনী ইবনু আব্দিল ওয়াহিদ ইবনু আলী ইবনু সুরূর ইবনু রফি' ইবনু হাসান ইবনু জা'ফর ইবনু ইবরাহিম আল মাকতুল ইবনু ইসমাঈল ইবনু আমীর জা'ফর আস সায়্যেদ আল আগার ইবনু ইবরাহিম আল আ'রাবী ইবনু আবু জা'ফর মুহাম্মাদ আর রঈস আল জাওয়াদ ইবনু আলী আল যীনবী ইবনু আব্দিল্লাহ বাহরুল জাওয়াদ ইবনু জা'ফর আত ত্বইয়ার ইবনু আবী ত্বলিব। আব্দুল গনী আল মাকদেসী আল জামা'ইলী হলেন উমদাতুল আহকামের লেখক। ৫৪১ হিজরি মোতাবেক ১১৪৬ খ্রিষ্টাব্দে রবিউস ছানী মাসে বায়তুল মাকদেস অর্থাৎ ফিলিস্তীনের নাবলুস শহরের জামা'ইলী নামক এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আর ইবনু কুদামাহ আল মাকদেসী শা'বান মাসে জন্মগ্রহন করেন। এই দিক থেকে আব্দুল গনী আল মাকদেসী ইবনু কুদামাহ আল মাকদেসীর চার মাসের বড়। জন্মের পরপরই তাদের পুরো পরিবার বায়তুল মাকদেস থেকে দামেস্কে চলে আসেন।

তার শিক্ষাজীবন: হাফিয আব্দুল গনী আল মাকদেসী খুব অল্প বয়সেই জ্ঞানার্জনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। শৈশবকালে তিনি শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু কুদামাহ আল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহর কাছে পড়াশোনা করেন। তারপর দামেস্কের শায়খ ও আলেমদের কাছে ফিকহসহ অন্যান্য বিষয় পড়াশোনা করেন। এই সকল শায়খদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবুল মাকারিম ইবনু হিলাল, সুলাইমান ইবনু আলী আর রহবী এবং আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু হামযাহ আল কুরাশী রহিমাহুল্লাহ।

তারপর ৫৬১ হিজরিতে তিনি বাগদাদে গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি শায়খ আব্দুল কাদির আল জাইলী রহিমাহুল্লাহ এর কাছে প্রায় চার বছরের মতো অবস্থান করেন। এসময় তিনি হাদীস ও ফিকহ নিয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকেন। তারপর ৫৬৫ হিজরিতে তিনি আবার দামেস্কে ফিরে আসেন। তারপর আবার তিনি মিশরের দিকে রওয়ানা দেন এবং ৫৬৬ হিজরিতে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করেন। সেখানে আবু তাহের আস সালাফী রহিমাহুল্লাহ এর কাছে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। আবু তাহের আস সালাফী রহিমাহুল্লাহ ৫৭৬ হিজরিতে মারা যান। তারপর তিনি ইসপাহানে সফর করেন এবং সেখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন।

তার সম্পর্কে আলেমদের প্রশংসার বর্ণনা: ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন, আব্দুল গনী আল মাকদেসী ছিলেন ইমাম, আলেম, হাফিয, সত্যবাদী হাদীসের অনুসারী। সাবত ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্দুল গনী আল মাকদেসী ছিলেন খুব ধার্মিক,

দুনিয়াত্যাগী, ইবাদতগুজার। তিনি রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন এবং বছরের অধিকাংশ সময় ছিয়াম পালন করতেন। তিনি ছিলেন খুব উদার এবং দানশীল। তিনি কোন সম্পদ জমা করে রাখতেন না। যেখানেই ইয়াতীম ও বিধবাকে পেতেন সেখানেই তাদেরকে দান করতেন। অধিক পড়াশোনা আর অধিক কান্নার কারনে তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। হাদীসের জ্ঞান ও মুখস্থের ক্ষেত্রে তার সময়ে তিনি ছিলেন সকলের উপরে। তিনি প্রচুর হাদীস চর্চা করেছেন এবং অনেক সুন্দর সুন্দর হাদীসের কিতাব রচনা করেছেন। তিনি প্রচুর হাদীস হিফয করেছিলেন। হাদীসের সবগুলো শাখায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। হাদীসের সূত্র, উসূল, সহীহ, যঈফ, নাসিখ, মানসুখ, হাদীসের রূপ, অর্থ ও ফিকহ, রাবীদের নাম ও তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই সবগুলো বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন অনেক ইবাদতগুজার, ধার্মিক এবং সালাফদের নিয়মে সুন্নাহকে মজবুতভাবে ধারণকারী। আব্দুল মালিক ইবনু আব্দিল আযীয আশ শায়বানী রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আত তাজ আল কুনদীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, দারাকুত্বনীর পরে হাফিয আব্দুল গনী আল মাকদেসীর মতো উত্তম আর কেউ নেই। আবু মূসা আল মাদিনী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের কাছে যারা এসেছেন তাদের খুব কম মানুষই এই বিষয়টি বুঝতে পারে। এই কম মানুষেরই একজন হলেন শায়খ ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল গনী আল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ। এই ধরণের ভুল-ভ্রান্তি বিশ্লেষণ করার তাওফীক তাকে দেওয়া হয়েছে। যদি এই এলাকাতে দারাকুত্বনী ও তার মতো মানুষ থাকতেন তাহলে তারাও তার কাজকে সঠিক বলতেন। তিনি যা বুঝতে পারেন খুব কম মানুষই সেগুলো বুঝতে পারেন। আল্লাহ যেন তার জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দেন। ইবনুল উম্মাদ আল হাম্বলী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসের হিফয তার কাছেই শেষ হয়েছে। সনদ ও মতনসহ সব শাখায় তিনি জ্ঞান রাখতেন। সাথে সাথে তিনি ছিলেন পরহেযগার, ইবাদতগুজার, সুন্নাতকে শক্তভাবে ধারণকারী এবং সৎ কাজের আদেশকারী আর অসৎ কাজ হতে নিষেধকারী। ইবনু কুদামাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাফিয আব্দুল গনী আল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে সেই অনুযায়ী আমলও করতেন। তিনি আমার ছোটকালের বন্ধু আর আমার জ্ঞানার্জনের সময়েরও বন্ধু। আমরা কোন ভালো বা কল্যাণকর কাজ করতে গেলে দেখতাম তিনি আমার আগেই সেই কাজ করেছেন। খুব কম সময়েই আমি তার আগে কোন ভালো কাজ করতে পেরেছি। বিদআতী ও শত্রুদের দেয়া কষ্ট দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদাকে পরিপূর্ণ করেছেন।

তার লিখিত কিতাবসমূহঃ হাফিয আব্দুল গনী আল মাকদেসী অনেক কিতাব রচনা করেন। তার রচনার মধ্যে সবচেয়ে বেশী তিনি হাদীসের কিতাব রচনা করেন। আব্দুল গনী আর মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ ৫৬টি কিতাব রচনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. উমদাতুল আহকাম (عمدة الأحكام)

২. আল কামালু ফি আসমায়ির রিজাল (الكمال في أسماء الرجال)

৩. আল মিসবাহ ফি উইয়ুনিল আহাদিসিস সিহাহ

৪. নিহায়াতুল মুরাদ মিন কালামি খইরির ইবাদ

৫. তুহফাতুত ত্বলিবীন ফিল জিহাদী ওয়াল মুজাহিদীন

৬. মিহনাতুল ইমাম আহমাদ (محنة الإمام أحمد)

৭. ই'তিকাদুল ইমাম শাফিয়ী (اعتقاد الإمام الشافعي)

৮. মানাকিবুস সাহাবাহ (مناقب الصحابة)

৯. আন নাসিহাতু ফিল আদইয়াতিস সহীহাহ

১০. আত তারগীব ফিদ দু'আ ওয়াল হাসি আলাইহি

১১. আস সানী মিন ফাযায়িলি উমার ইবনু খাত্তাব

১২. হাদীসুল ইফক (حديث الإفك)

১৩. মুখতাছারু সীরাতির রসূল ওয়া আছহাবিহিল 'আশারাহ

মৃত্যু: তার পুত্র আবু মূসা ইবনু আব্দুল গনী আল মাকদেসী বলেন, আমার পিতা ৬০০ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন যার ফলে কথাও বলতে পারছিলেন না এবং দাঁড়াতেও পারছিলেন না। ১৬ দিন ধরে এই কঠিন অবস্থায় থাকেন। তারপরে ৬০০ হিজরির ২৫ রবিউর আওয়াল মাস মোতাবেক ১/১২/১২০৩ সাল সোমবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তারপর মিশরে তাকে দাফন করা হয়।

الكتاب الأول : كتاب الطهاوة

প্রথম পর্ব: পবিত্রতা

معنى كتاب

কিতাব শব্দের অর্থ

কিতাব শব্দের আভিধানিক অর্থ: মিলানো ও একত্রিত করা। এই অর্থেই كتيبة الخيل – "ঘোড়াশাল বা আস্তাবল" শব্দটি আরবীতে ব্যবহার হয়। যেহেতু এখানে অধিক সংখ্যক অশ্ব একত্রিত ও সংযুক্ত হয়। সুতরাং কিতাবকে কিতাব বলা এই জন্য যে, এর অক্ষর ও মাসআলাগুলো একটি অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

পারিভাষিক অর্থ: কোনো একটি শাস্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামষ্টিক জ্ঞান, যা একাধিক পরিচ্ছেদ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাধিক অনুচ্ছেদ সম্বলিত হয়ে থাকে।

তাহারাত (পবিত্রতা) শব্দের অর্থ:

আভিধানিক অর্থ: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অর্থবহ ময়লা-আবর্জনা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা।

পারিভাষিক অর্থ: কোনো হাদাস (শারীরিক নাপাক বস্তু) অপসারণ অথবা কোনো নাজাস (শরীর বহির্ভূত নাপাক বস্তু) বিলুপ্ত করণ অথবা উভয়টির অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন কার্য প্রক্রিয়া। যেমন: তায়াম্মুম, সুন্নাহসম্মত গোসল প্রক্রিয়া ও ঢিলা পাথর ব্যবহার করা।

পবিত্রতা দুই প্রকার:

১ - মা'নাবী (তাৎপর্য বিশিষ্ট): যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ﴾

"তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করুন। এটা তাদেরকে পবিত্র করবে"। সূরা আত তাওবাহ ৯:১০৩। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿إِنَّهُمۡ أُنَاسٞ يَتَطَهَّرُونَ﴾

"নিশ্চয় তারা পবিত্র মানুষ"। সূরা আন নামল: ৫৬।

২ - ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য: এটা দুই প্রকারে বিভক্ত: হাদাস (শারীরিক নাপাক বস্তু) থেকে পবিত্রতা অর্জন এবং নাজাস (শরীর বহির্ভূত নাপাক বস্তু) থেকে পবিত্র অর্জন।

পেশ সহকারে তুহুর শব্দের অর্থ: পবিত্রতা অর্জন করা। আর যবর সহকারে শব্দটির অর্থ: ঐ পানি, যার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়। যেমন, অযূ (অযূ করা) ও উযূ (অযূর পানি) শব্দদ্বয়ের ক্ষেত্রে এবং সুহূর (সেহরি খাওয়া) ও সাহূর (সেহরির খাবার) শব্দদ্বয়ের ক্ষেত্রে।

লেখক পবিত্রতা অধ্যায় দিয়ে কিতাব সূচনা করেছেন; যেহেতু শাহাদাতাইন এর পরে দীনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রুকন হলো: সালাত। আর সালাত এর জন্য অবশ্যই পবিত্রতা জরুরী।

এই জন্যই পবিত্রতা অধ্যায় অগ্রে আনাকে পছন্দ করা হয়েছে। আর যেহেতু এটা সালাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সালাতের চাবি। কারণ, একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই শর্তটিই পালন করে।

١. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ – وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّةِ – وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".

১. উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "প্রত্যেক কাজ নিয়্যাত অনুযায়ী হয়ে থাকে"। অন্য বর্ণনায় নিয়্যাত শব্দটি একবচনে। আর মানুষ তার নিয়্যাত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তার রসূলের দিকে তার হিজরত আল্লাহ ও তার রসূলের দিকেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের কিংবা কোনো নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সেদিকেই গণ্য হবে"। [সহীহ বুখারী হা/১, ৬৬৮৯, সহীহ মুসলিম হা/১৯০৭।]

অনেক আলেম এই হাদীস দ্বারা তাদের গ্রন্থ সূচনা করাকে মুস্তাহাব মনে করেছেন

ইবনু মাহদী বলেছেন: যদি কেউ কোনো গ্রন্থ সংকলন করে, তাহলে সে যেন এই হাদীস দ্বারা সেই গ্রন্থের সূচনা করে। তিনি বলেছেন: যদি আমি কোনো গ্রন্থ লিখতাম, তাহলে সেই গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদ এই হাদীস দ্বারা শুরু করতাম।

খাত্তাবী ইমামগণ থেকে বর্ণনা করেছেন: যে ব্যক্তি কোনো গ্রন্থ লিখার ইচ্ছা পোষণ করে, তার জন্য উক্ত গ্রন্থটি এই হাদীস দ্বারা শুরু করা উচিত, যা ইলম অন্বেষীর হৃদয়ে নিয়্যাত সহীহ করার ব্যাপারে সতর্ক বার্তা পৌঁছে দিবে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন: এই হাদীসটি ইলমের এক তৃতীয়াংশ। যা ফিকহের সত্তরটি পরিচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত। ইবনু মুলাক্কিন বলেছেন, এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো: মৌলিক পরিচ্ছেদগুলো। যেমন: সকল প্রকার তাহারাত, সকল প্রকার সালাত, যাকাত ও সিয়াম।

ইমাম আহমাদ বলেছেন, ইসলামের মৌলিক নীতিমালা তিনটি হাদীসের উপরে প্রতিষ্ঠিত। উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“নিশ্চয় আমলসমূহের ভিত্তি নিয়্যাতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।” [সহীহ বুখারী হা/১]

আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের মাঝে শরীআত বহির্ভূত নতুন কোনো বিষয় সংযুক্ত করল, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য”। সহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।

নু’মান বিন বাশীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ

“হালাল সুস্পষ্ট এবং হারাম সুস্পষ্ট”। সহীহ বুখারী হা/২০৫১।

আবু উবাইদ বলেছেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র একটি বাক্যে আখেরাতের সকল বিষয় একত্রিত করেছেন: “যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের মাঝে শরীআত বহির্ভূত নতুন কোনো বিষয় সংযুক্ত করল, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য”। আর দীনের সকল বিষয়কে মাত্র একটি বাক্যে একত্রিত করেছেন: “নিশ্চয় আমলসমূহের ভিত্তি নিয়্যাতের উপরে প্রতিষ্ঠিত”। বাক্য দুইটি সকল পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ইবনু রজব উমারের হাদীসের আলোচনায় বলেছেন: এই হাদীসটি ঐ সকল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর উপরে দীনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

আমি বলব, ইমাম বুখারী তার “সহীহ” গ্রন্থটি এই হাদীস দ্বারা শুরু করেছেন এবং হাদীসটিকে তিনি ঈমান, দাস মুক্তি, হিজরত, নিকাহ, প্রতারণা বর্জন এবং শপথ ও মানতসমূহ অধ্যায়গুলোতে পুনরায় উল্লেখ করেছেন। একইভাবে ইমাম মাকদেসী তার এই গ্রন্থটিও সূচনা করেছেন এই হাদীস দ্বারা।

নিয়্যাতের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উত্তম কিছু বৈশিষ্ট্য

ইবনু মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ আল ইলাম গ্রন্থে (১/১৬০) বলেছেন, এমন কিছু আনুষঙ্গিক কর্মদায়িত্ব আছে, যেগুলো পালনের সময় স্মৃতিতে নিয়্যাতের কথা স্মরণ রাখা উচিত:

সাদাকা করা, মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা, অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, মৃত ব্যক্তির জানাযা ও দাফন করা, আগে সালাম দেওয়া এবং সালামের উত্তর দেওয়া, হাঁচি দাতার জন্য রহমতের দু‘আ করা এবং তার উত্তর দেওয়া, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা, দাওয়াত কবুল করা, ইলমের মাজলিসে উপস্থিত হওয়া, যিকির করা, নেককার ব্যক্তিগণের সাথে সাক্ষাৎ ও কবর যিয়ারত করা, মেহমান ও পরিবারবর্গকে খরচ প্রদান করা, প্রিয়, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও আত্মীয় স্বজনদিগকে সম্মান দেওয়া, ইলমও ইলম সংক্রান্ত

বিষয়ে সমালোচনা করা, বারংবার ইলমের দারস প্রদান, শিক্ষা প্রদান, ইলম গ্রহণ, অধ্যায়ন, লিপিবদ্ধ করণ ও সংকলন, ফতোয়া, ফায়সালা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে রাখা, নসীহত প্রদান, সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করা, আমানতসমূহ গ্রহণ করা এবং সেগুলো আদায় করা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে এবং এগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো যত বিষয় রয়েছে সেসকল ক্ষেত্রেও নিয্যাত করা উচিত।

এমনকি পানাহার ও ঘুমের সময়ও নিয়্যাতের কথা স্মরণ রাখা চাই। এই ক্ষেত্রে নিয়্যাতের মূল উদ্দেশ্য হলো আনুগত্য করার শক্তি লাভ করা এবং দৈহিক প্রশান্তি লাভ করা। যাতে করে দেহ উজ্জীবিত হয়।

নিয়্যাত ও যিকির এর মাঝে পার্থক্য

নিয়্যাতের স্থান হলো অন্তর। আর যিকিরের স্থান হলো জিহ্বা। এই জন্য কেউ যদি সালাতের যিকির জিহ্বা দ্বারা মুখে উচ্চারণ করে, কিন্তু সালাতের জন্য অন্তর দ্বারা নিয়্যাত না করে, তাহলে তার সালাত সহীহ হবে না। আবার কেউ যদি সূরা ফাতিহা জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ না করে অন্তর দ্বারা তিলাওয়াত করে তাহলেও তার সালাত সহীহ হবে না।

٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".

২. আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অপবিত্র অবস্থায় কারো সালাত কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে ওযূ করে (পবিত্র হয়)। [সহীহ বুখারী হা/৬৯৫৪, সহীহ মুসলিম হা/২২৫]

সালাত সহীহ হওয়ার শর্ত হচ্ছে ওযূ করা

এই দাবির দলীল হলোঃ আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, যা লেখক বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ মুসলিম উম্মাহ এই বিষয়ে ইজমা' কায়েম করেছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি ওযূ করতে সক্ষম হওয়ার পরেও নাপাক অবস্থায় সালাত আদায় করে, তাহলে তার সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। তার সালাত সর্বসম্মতিক্রমে পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। চাই সে ইচ্ছাকৃতভাবেই করুক অথবা ভুলে গিয়ে করুক অথবা না জেনে করুক। তিনি — রহিমাহুল্লাহ — আরো বলেছেনঃ এটা সালাত সহীহ হওয়ার শর্ত। এই বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত। কোনো সালাত পবিত্রতা ব্যতীত

সহীহ হয় না। চাই পবিত্রতা পানি দ্বারা অর্জন করা হোক অথবা তায়াম্মুম দ্বারা — শর্ত সাপেক্ষে — অর্জন করা হোক।

ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহ

১. উভয় রাস্তা থেকে নির্গত বস্তুঃ এটা দুই প্রকারে বিভক্তঃ

ক. স্বাভাবিক বস্তুঃ পেশাব, মল, বীর্য, মযী (শুক্রাণুর পূর্বে নির্গত তরল বস্তু), অদী (পেশাবের পরে নির্গত হালকা সাদা বস্তু) ও বায়ু। এই বস্তুগুলো সর্বসম্মতিক্রমে ওযূ নষ্ট করে। যা ইবনু মুনযির, ইবনু কুদামা ও ইমাম নববী উল্লেখ করেছেন।

খ. অস্বাভাবিক বস্তুঃ যা খুব বিরল। যেমনঃ রক্ত, গুটিপোকা, কঙ্কর, চুল ইত্যাদি। এমন বস্তু মতভেদপূর্ণ। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে, এমন বস্তু ওযূ নষ্ট করে। আর এই মতটিই সঠিক। ইবনু কুদামা বলেছেনঃ কারণ, এমন বস্তু তার উৎসের তারল্য থেকে মুক্ত হয় না। আর উক্ত তারল্যের কারণেই ওযূ নষ্ট হবে।

২. ইস্তেহাযাঃ অধিকাংশ আলেমের দৃষ্টিতে, এটা ওযূ ভঙ্গকারী। রবী'আহ এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ এটা ওযূ ভঙ্গকারী নয়। অধিকাংশ আলেমের দলীলঃ উম্মে হাবীবা বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার ঘটনায় বর্ণিত আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস। সেখানে বলা হয়েছেঃ "তুমি প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযূ করো"। হাদীসটি সমালোচিত হলেও এই মতের পক্ষে আরো অন্যান্য অনেক দলীল রয়েছে। এই বস্তুটি উভয় রাস্তা থেকে নির্গত নাপাকের অন্তর্ভুক্ত হলেও উক্ত বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে আমরা এটাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছি।

একইভাবে বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থাও একই। তার বিধান ইস্তেহাযাগ্রস্থ নারীর ন্যায়। সে প্রত্যেক সালাতের জন্যই ওযূ করবে। ইস্তেহাযাগ্রস্থ নারীর বিধান সম্পর্কে হায়েয অধ্যায়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে। ইন শা আল্লাহু তা'আলা।

৩. গভীর ঘুমঃ ওযূ ভঙ্গকারী ঘুমের ব্যাপারে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। এই বিষয়ে তারা একাধিক মত দিয়েছেন।

সহীহ মত হলোঃ যদি ঘুম এমন গভীর হয়, যার ফলে ব্যক্তির অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রীয় হয়ে যায়, যেই অবস্থায় সে নাপাক হলেও তা অনুধাবন করতে পারে না। তাহলে এমন ঘুম ওযূ নষ্ট করে দিবে।

দলীল হলোঃ সাফওয়ান বিন 'আসসাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেছেনঃ "যখন আমরা সফরে থাকতাম অথবা মুসাফির অবস্থায় আমাদেরকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তিনদিন ও তিনরাত পর্যন্ত একমাত্র ফরয ব্যতীত অন্যকোনো কারণে আমরা যেন আমাদের পায়ের মোজা না খুলি এই মর্মে আদেশ দিতেন। কিন্তু মলত্যাগ,

পেশাব ও ঘুমের বিষয়টি ব্যতিক্রম। এই ক্ষেত্রে মোজা খুলতে নিষেধ করতেন"। তিরমিযী (৩৫৩৫) ও অন্যান্যরা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সনদ হাসান পর্যায়ের। আর যদি ঘুম গভীর না হয়, বরং প্রাথমিক অবস্থার ঘুম হয় এবং আশে পাশের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্দ্রাজনিত কারণে আওয়াজ শনাক্ত করতে না পারে, তাহলে তার পবিত্রতা অবশিষ্ট থাকবে।

এই বিষয়ে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত সহীহ মুসলিমের (২৬৯) হাদীসটি দলীল। তিনি বলেন: "আমি এক রাত্রে আমার খালা মায়মুনা বিনতে হারিসের নিকট অবস্থান করলাম। তাকে আমি বললাম: যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হবেন, আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিবে। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে দাঁড়ালেন, আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমার হাত ধরে তাঁর বাম পাশে আমাকে দাঁড় করালেন। হঠাৎ আমি ঘুমাতে শুরু করলাম, তখন তিনি আমার কানের লতি ধরে টান দিলেন"।

বুখারীতে (৬৪২) এবং মুসলিমে (৩৭৬) বর্ণিত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেছেন: "একদা সালাতের ইকামত দেওয়া হলো, আর তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ব্যক্তির সঙ্গে নিম্নস্বরে আলাপ করছিলেন। তিনি উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতেই থাকলেন। এমনকি এক পর্যায়ে তার সাহাবীগণ ঘুমিয়ে গেলেন। এরপরে তিনি আসলেন এবং তাদেরকে সালাত পড়ালেন"। এটা মুসলিমের শব্দ। মুসলিমের আরেকটি বর্ণনা এরূপ: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ ঘুমাতেন, এরপরে তারা ওযূ না করেই সালাত আদায় করতেন"। আবূ দাউদ (২০০) হাদীসটি এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ তার যুগে শেষ ইশার সালাতের জন্য এতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন যে, তন্দ্রায় তাদের মাথা ঝিমিয়ে পড়ত। এরপরে তারা ওযূ ছাড়াই সালাত আদায় করতেন"। হাদিসটির সনদ সহীহ।

এর দ্বারাই দলীলসমূহ কেন্দ্রীভূত করা যেতে পারে; সাফওয়ান বিন আসসাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস ঘুম ওযূ ভঙ্গের কারণ এই দাবির পক্ষে দলীল। আর অন্যান্য হাদীসগুলো ঘুম ওযূ ভঙ্গের কারণ নয় এই মতের পক্ষে দলীল। বিধায় এমন হাদীসগুলোকে 'অনুভূতি নিষ্ক্রীয় হয় না' এমন ঘুমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। যেহেতু ঘুম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হাদাস (দেহ থেকে নির্গত নাপাক) নয়। বরং এটা নাপাক নির্গত হওয়ার একটি সম্ভাব্য সংঘটন স্থল। ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই বিষয়ে সহীহাইনে বর্ণিত এই হাদীসটি নির্দেশ করে: "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ দিয়ে (স্বজোরে) নিঃশ্বাস নেওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতেন। এরপরে তিনি উঠে ওযূ না করেই সালাত আদায় করতেন"। কারণ, তাঁর দুই চক্ষু নিদ্রা গেলেও তার অন্তর কখনো নিদ্রা যেত না। ফলে তিনি জাগ্রত থাকতেন। আর তাই যদি তাঁর দেহ থেকে কোনো বস্তু নির্গত হতো, তাহলে তিনি সেটা অনুভব করতে পারতেন। আর এটা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, ঘুম স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো নাপাক নয়। যেহেতু

ঘুম স্বয়ংসম্পূর্ণ নাপাক হলে তাতে নাবী — সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — ও অন্যের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকত না। যেমন পেশাব, মলত্যাগ ও অন্যান্য নাপাকগুলোর ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই।

এখানে যেই মতটি আমরা উল্লেখ করলাম, সেটা মালেকী মাযহাবের মত। তারা বলেন: ভারী (গভীর) ঘুম সর্বাবস্থায় ওযূ ভঙ্গকারী। চাই তা সংক্ষিপ্ত হোক অথবা দীর্ঘ হোক। আর হালকা ঘুম কোনো অবস্থায় ওযূ ভঙ্গকারী নয়। চাই তা সংক্ষিপ্ত হোক অথবা দীর্ঘ হোক। কিন্তু যদি এই ঘুম দীর্ঘ হয়, তাহলে ওযূ করা মুস্তাহাব।

আর ভারী ঘুমের মাপকাঠি হলো: যেই ঘুমে আচ্ছন্ন ব্যক্তি আওয়াজ অথবা কোনো বস্তু তার হাত থেকে পড়ে যাওয়া অথবা তার মুখের লালা নিঃসরিত হওয়া ইত্যাদি অনুভব করতে পারে না। যদি ঘুমন্ত ব্যক্তি এই বিষয়গুলো অনুভব করতে পারে, তাহলে তার ঘুম হালকা ঘুম বলে বিবেচিত হবে।

এই মতটিও আলবানী রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্যের বাহ্যিক মর্ম। যখন তিনি বলেছেন: খাত্তাবী গরীবুল হাদীস গ্রন্থে বলেছেন: প্রকৃত ঘুম হলো গভীর সংজ্ঞাহীন অবস্থা, যা অন্তরে আঘাত করে বাহ্যিক ঘটনাসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আর নু'আস (তন্দ্রা) হলো এমন ঘুম, যার পরক্ষণেই ভারী ঘুম অন্তরকে আচ্ছন্ন করে এবং অভ্যন্তরীণ ভাবনাসমূহ হতে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। (নাওম) ঘুম ও (নু'আস) তন্দ্রার মাঝে এই প্রকৃত ব্যবধান সম্পর্কে জানার দ্বারা অসংখ্য জটিলতার সমাধান হয়ে যায়। আর এই বিষয়টিও শক্তিশালী হয় যে, ঘুম সর্বাবস্থায় ওযূ ভঙ্গকারী।

৪. **বুদ্ধি শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া পাগলামি অথবা সংজ্ঞাহীনতা অথবা অসুস্থতা অথবা নেশার কারণে বা এই জাতীয় কোনো কারণে।** কারণ, এটা ঘুমের চাইতেও অধিক উপযোগী কারণ। এবং আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীসও দলীল: "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অচেতন হয়ে গেলেন। এরপরে আবার সচেতন হলেন। তারপরে গোসল করলেন" হাদীসটি সহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে।

নববী রহিমাহুল্লাহ আল মাজমূ' গ্রন্থে (২/২৫) বলেছেন: সমগ্র উম্মাহ এই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে: ওযূ পাগল হওয়া ও অচেতন হওয়ার দ্বারা ভেঙ্গে যাবে। এই বিষয়ে ইবনু মুনযির ও অন্যান্য আলেমগণ ইজমা' বর্ণনা করেছেন। এরপরে তিনি আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এরপরে তিনি বলেছেন: আমাদের মাযহাবের আলেমগণ এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন: পাগল হওয়া অথবা অচেতন হওয়া অথবা অসুস্থতা, অথবা মদ, নাবীয অথবা অন্যকোনো নেশা জাতীয় বস্তু পান করে অথবা প্রয়োজনীয় কোনো ওষুধ সেবন করে অথবা অন্যকিছুর দ্বারা মাতাল হওয়ার কারণে যার বুদ্ধি শক্তি বিলোপ হবে, তার ওযূ ভেঙ্গে যাবে। এই বিষয়ে একমাত্র খুরাসানী আলেমগণ ব্যতীত অন্য কেউ দ্বিমত করেননি। তারা বলেছেন: মাতাল ব্যক্তির ওযূ ভাঙবে না। যদি আমরা বলি কথা ও কাজের ক্ষেত্রে মাতাল ব্যক্তির বিধান সজাগ ব্যক্তির ন্যায় হবে।

৫. উটের গোশত খাওয়া: আলেমগণ উটের গোশত খাওয়ার দ্বারা ওযূ ভেঙ্গে যাবে এই বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। সহীহ মত হলো: ওযূ ভঙ্গ হবে। দলীল হলো: সহীহ মুসলিমে (৩৬০) জাবির বিন সামুরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস: "একদা এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করল: আমি কি ছাগলের গোশত খেয়ে ওযূ করব? তিনি বললেন: যদি চাও, তাহলে ওযূ করতে পার। আর যদি না চাও, তাহলে ওযূ করো না। তখন তিনি বললেন: আমি কি উটের গোশত খেয়ে ওযূ করব? তিনি বললেন: হ্যা, উটের গোশত খেয়ে ওযূ করো"। একইভাবে বারা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস। যা সহীহ মুসনাদে (১৪৬) বর্ণিত হয়েছে।

উটের গোশত ব্যতিরেকে কলিজা প্লীহা এই জাতীয় অন্যান্য অঙ্গসমূহ খাওয়ার দ্বারা ওযূ আবশ্যক হওয়ার বিধান

প্রথম মত: গোশত ব্যতীত উটের অন্যান্য যেই অঙ্গগুলো রয়েছে, যেমন: উটের কলিজা, প্লীহা, কুঁজ, চর্বি, ভুঁড়ি ও পেশীসমূহ ইত্যাদি খেলে ওযূ ভেঙ্গে যাবে। এটা হাম্বলী মাযহাবের একটি মত। যা ইবনু কুদামা ও ইবনু উসাইমীন গ্রহণ করেছেন। তাদের প্রমাণ হলো: এগুলো জবাইকৃত উটেরই অংশ। আর গোশত শব্দ প্রয়োগ করে পশুর ক্ষেত্রে সমগ্র পশুকেই বুঝানো হয়। কারণ, গোশতই পশুর দেহের অধিকাংশ অংশ জুড়ে বিদ্যমান। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা যখন শুকরকে হারাম ঘোষণা করলেন, তখন এটা সম্পূর্ণ শুকরকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। একই বিষয় এখানেও প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় মত: ওযূ ভাঙবে না। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: এই বস্তুগুলো গোশতের নামের অন্তর্ভুক্ত বস্তু নয়। এই দাবির পক্ষে যুক্তি হলো: তুমি যদি কাউকে তোমার জন্য গোশত ক্রয় করতে বল, আর সে যদি তোমার জন্য ভুঁড়ি ক্রয় করে; অবশ্যই তুমি তার কাজে নাখোশ হবে। সুতরাং ওযূ ভঙ্গের বিষয়টি গোশতের সঙ্গে নির্ধারিত।

তারা বলেছেন: আর যেহেতু বস্তুর মূল অবস্থা হলো পবিত্রতার উপরে স্থায়িত্ব, আর গোশত (হাড়বিহীন) ব্যতীত অন্যান্য অংশ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা একটি সম্ভাবনা মাত্র। আর সম্ভাবনা দ্বারা কখনো নিশ্চিত অবস্থা বিলুপ্ত হয় না। আর এখানে হিবর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন গোশত, যাতে কোনো হাড় থাকে না। প্রথমটিই প্রাধান্যযোগ্য মত।

উটের দুধ পান করার কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়া সম্পর্কিত বিধান

প্রথম মত: ওযূ ওয়াজিব হবে: এটা হাম্বলী মাযহাবের একটি মত। তাদের দলীল হলো: উসাইদ বিন হুদ্বাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: "তাঁকে উটের দুধের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন: উটের দুধ পান করার পরে ওযূ করো"। হাদীসটি আহমাদ (৪/৩৫২), ও ইবনু মাজাহ (৪৯৬) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ দুর্বল। যেহেতু হাদীসটি হাজ্জাজ বিন আরতাত এর সূত্রে বর্ণিত।

সঠিক হলো: হাদীসটি বারা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। যা তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উটের গোশত খাওয়ার কারণে ওযূ আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি ইবনু আবী হাতিম আল 'ইলাল গ্রন্থে (১/২৫) বর্ণনা করেছেন। একই অর্থে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেটার সনদ দুর্বল। সঠিক হলো: হাদীসটি মওকুফ।

দ্বিতীয় মত: এমন ক্ষেত্রে ওযূ করা মুস্তাহাব। এই মতটি ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু উসাইমীন গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল পূর্ববর্তী হাদীসটি।

তৃতীয় মত: এমন ক্ষেত্রে ওযূ করার বিধান নেই। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: যে ব্যক্তি ওযূ করেছে সে পবিত্র অবস্থায় থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত পবিত্রতা ভঙ্গ হওয়ার পক্ষে কোনো সহীহ দলীল পাওয়া না যাবে। আর উটের দুধ পান করার দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হওয়ার পক্ষে বর্ণিত কোনো হাদীস সহীহ নয়। এই মতটিই সঠিক।

উটের গোশতের ঝোল খাওয়ার কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়া সম্পর্কিত বিধান

প্রথম মত: ওযূ করা ওয়াজিব হবে না। যদিও উটের গোশতের স্বাদ ঝোলের মাঝে বিদ্যমান থাকে। এটা হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। তাদের দলীল হলো: 'উটের দুধ পান করলে ওযূ করা ওয়াজিব হবে না' মতের দাবিদারগণের দলীল। যা এই মাসআলার পূর্বের মাসআলায় অতিবাহিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: উটের গোশতের ঝোল খেলে ওযূ করা ওয়াজিব হবে। এটাও হাম্বলী মাযহাবের একটি মত। তাদের প্রমাণ হলো: যখন গোশতের স্বাদ ঝোলের মাঝে বিদ্যমান থাকবে, তখন উক্ত ঝোল খাওয়াটা গোশত খাওয়ার শামিল হবে। তারা এই মর্মে যুক্তি পেশ করেন: যদি আমরা শুকরের গোশত রান্না করি; তাহলে এর ঝোল খাওয়াও হারাম সাব্যস্ত হবে। একইভাবে এখানেও বিষয়টি একইভাবে সাব্যস্ত হবে।

অধিক সম্ভাব্য সঠিক মত: দ্বিতীয় মত; যেহেতু ঝোল গোশতের নির্যাস। আর তাছাড়াও: অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঝোলের মাঝে গোশতের টুকরা পাওয়া যায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

৬. (অযূ ভঙ্গের) ষষ্ঠ কারণ হলো কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই যৌনাঙ্গ স্পর্শ করা:

এই বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। সঠিক মত হলোঃ যে ব্যক্তি নিজের যৌনাঙ্গ স্পর্শ করল, তার ওযূ ভেঙ্গে গেল। দলীল হলোঃ বুসরা বিনতে সাফওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা 'এর হাদীসঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি নিজ যৌনাঙ্গ স্পর্শ করল, সে যেন ওযূ না করা পর্যন্ত সালাত আদায় না করে"। তিরমিযী (৮২) ও অন্যান্য গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির সনদ সহীহ। হাদীসটি আস সহীহ আল মুসনাদ গ্রন্থে (১৫৫৮) বর্ণিত হয়েছে। এবং একদল সাহাবা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম 'এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। যাদের বিবরণ তিরমিযী উল্লেখ করেছেন।

অন্যের যৌনাঙ্গ স্পর্শ করার দ্বারা কি ওযূ ভেঙ্গে যাবে? যেমন, কোনো মহিলা তার সন্তানকে গোসল দেওয়ার সময় তার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করে। অথবা কোনো চতুষ্পদ জন্তুর যৌনাঙ্গ স্পর্শ করার দ্বারা কি ওযূ ভেঙ্গে যাবে?

সহীহ মত হলোঃ ওযূ ভঙ্গ হবে না। কারণ, হাদীসে ذكره – শব্দটির মাঝে বিদ্যমান সর্বনামটি 'স্পর্শকারী ব্যক্তিকে' নির্দেশ করছে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

নিতম্ব স্পর্শ করার দ্বারা কি ওযূ ভঙ্গ হবে?

কোনো কোনো সনদে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করল"। আর فرج – শব্দটি সামনের ও পিছনের উভয় লজ্জাস্থানের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হয়। এই দৃষ্টিতেঃ যে ব্যক্তি তার নিতম্ব স্পর্শ করবে, তার ওযূ ভঙ্গ হবে। আর দুবুর হলোঃ ঐ ছিদ্রস্থান, যা মল নির্গমনের রাস্তা।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ আল মাজমূ' গ্রন্থে (২/৪৪) বলেছেনঃ আমাদের মাযহাবের আলেমগণের মত হলোঃ অণ্ডকোষ, নারী ও পুরুষের তলপেটের চুল, তলপেটের চুলের স্থান, সামনের ও পিছনের লজ্জাস্থানের মধ্যবর্তী স্থান, দুই নিতম্বের মধ্যবর্তী স্থান ইত্যাদি স্পর্শ করার দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হবে না। ওযূ ভঙ্গ হবে একমাত্র পুরুষাঙ্গ, পায়ুপথ ও নারীর লজ্জাস্থানের দুই পর্দার শেষ প্রান্ত স্পর্শ করার দ্বারা। যদি সে পর্দার বাহিরের কোনো অঙ্গ স্পর্শ করে, তাহলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। এতে কোনো দ্বিমত নেই। যা ইমামুল হারামাইন, বগবী ও অন্যান্য আলেমগণ স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেছেন।

আমি বলবঃ তালক বিন আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসঃ "এটা তোমারই দেহের একটি অঙ্গ মাত্র"। এই হাদীসটি তালক বিন আলীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যিনি একজন বিতর্কিত রাবী। বাহ্যিকভাবে মনে হয়, হাদীসটি দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর হাদীসটিকে হাসান মেনে নিলেও তার একাধিক সম্ভাবনা বিদ্যমান আছেঃ অন্যতম একটি সম্ভাবনাঃ হাদীসটি মানসুখ। আরেকটি সম্ভাবনাঃ হাদীসটি 'প্রতিবন্ধকতার ওপর দিয়ে স্পর্শ করা' 'এর প্রতি নির্দেশ করছে। আরেকটি সম্ভাবনাঃ বুসরার হাদীসকে অগ্রাধিকার দেওয়া

হবে হাদীসটির বর্ণনাকারীর সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে। আর যেহেতু হাদীসটিতে ইবাদতের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হাতের মুষ্ঠির পিঠ দ্বারা যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে কি ওযূ ভঙ্গ হবে?

প্রথম মতঃ হাতের মুষ্ঠির তালু আর পিঠের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়টিই ওযূ ভঙ্গ করবে। এটা 'আতা, আওযাঈ ও হাম্বলীদের মত। তাদের প্রমাণ হলোঃ আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু 'এর হাদীসঃ

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যদি তোমাদের কেউ স্বীয় হাত দ্বারা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়া তার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করে, তাহলে তার জন্য ওযূ করা ওয়াজিব"। হাদীসটি আহমাদ (২/৩৩৩), ইবনু হিব্বান (১১১৮), এবং তাবারানী আল আওসাতে (১৮৫০) বর্ণনা করেছেন। এটির সনদ হাসান।

আলেমগণ বলেছেনঃ হাত শব্দটির মাঝে হাতের মুষ্ঠির পিঠও শামিল হবে। আর إفضاء – শব্দের অর্থ হলোঃ কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়া সরাসরি স্পর্শ করা। আর যেহেতু হাতের পিঠ হাতেরই একটি অংশ, তাই সাধারণ হাতের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় বিধানসমূহ পিঠের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ফলে এটা হাতের তালুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হলো।

দ্বিতীয় মতঃ ওযূ ততক্ষণ পর্যন্ত ভঙ্গ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত হাতের তালু দ্বারা যৌনাঙ্গ স্পর্শ না করা হবে। এটা মালেক, শাফেয়ী, লাইস ও ইসহাকের মত।

তারা বলেছেনঃ যেহেতু হাতের পিঠ স্পর্শের জন্য নয়, তাই এর দ্বারা স্পর্শ করা আর রান দ্বারা স্পর্শ করা একই বিষয়।

অগ্রাধিকারযোগ্য মতঃ প্রথম মতটি অগ্রাধিকারযোগ্য। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

বাহু দ্বারা যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে কি ওযূ ভেঙ্গে যাবে?

প্রথম মতঃ ওযূ ভঙ্গ হবে না। এটা মালেক, লাইস বিন সা'আদ ও আহমাদের একটি মত।

দ্বিতীয় মতঃ ওযূ ভঙ্গ হবে। এটা আতা, আওযাঈ ও আহমাদের একটি মত। অগ্রাধিকারযোগ্য মতঃ প্রথম মতটি অগ্রাধিকারযোগ্য। যা ইবনু কুদামা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যেহেতু শরীআতে সাধারণভাবে হাত বলতে কবজি পর্যন্তই বুঝানো হয়। যা চোরের হাত কর্তন, রাতের ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে হাত ধৌত করণ এবং তায়াম্মুমের মাসাহ সংক্রান্ত দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়। আর ওযূতে কনুইসহ হাত ধৌত করা ওয়াজিব হয়েছে একমাত্র এই কারণে যে, কুরআনে হাতকে কনুই এর সঙ্গে স্পষ্টরূপে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

ইসলাম ত্যাগ করলে কি ওযূ ভঙ্গ হবে?

প্রথম মত: ইসলাম ত্যাগ করলে ওযূ ভঙ্গ হয়। এটা আওযাঈ, আহমাদ ও আবু ছাওর এর মত। দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

"যদি আপনি শিরক করেন, তাহলে আপনার আমল বাতিল হয়ে যাবে"। (আয যুমার: ৬৫), আর পবিত্রতা একটি আমল।

দ্বিতীয় মত: ইসলাম ত্যাগ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। এটা আবু হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী এর মত। এই মতের পক্ষে দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

"তোমাদের মধ্য যারা নিজেদের দীনকে পরিত্যাগ করবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাদের আমলসমূহ বাতিল হয়ে যাবে"। (আল বাকারাহ: ২১৭)।

এই আয়াতে আমল বাতিল হওয়ার বিষয়টিকে মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। আর যেহেতু আমলসমূহ পবিত্র বিষয়, তাই ইসলাম ত্যাগের দ্বারা বাতিল হবে না। উদাহরণস্বরূপ, জানাবাতের কারণে কৃত ফরয গোসল।

অগ্রাধিকারযোগ্য মত: দ্বিতীয় মতটি অগ্রাধিকারযোগ্য। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

বমি করলে কি ওযূ ভঙ্গ হবে?

এই বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। সঠিক মত হলো: ওযূ ভঙ্গ হবে না। যেহেতু এই বিষয়ে কোনো দলীল সাব্যস্ত হয়নি। আর মা'দান বিন আবি তালহার সূত্রে বর্ণিত বর্ণনাটি, যে আবুদ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বমি করলেন, এরপরে সিয়াম ভেঙ্গে ফেললেন। এরপরে সাওবান এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম: আবুদ দারদা আমাকে বর্ণনা করেছেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলেছেন? তিনি বললেন: তিনি সত্য বলেছেন। আর আমিই তার ওযূর পানি ঢেলে দিয়েছি"। হাদীসটি আবু দাউদ (২৩৮১) বর্ণনা করেছেন। সনদ সহীহ। হাদীসটি আমাদের শায়েখ (রহিমাহুল্লাহ) এর 'সহীহ মুসনাদ' গ্রন্থে (১০৩৯) বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসটিতে বমি ওযূ ভঙ্গকারী এমন কথা বলা হয়নি। এমনও হতে পারে যে, হয়ত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় ছিলেন, তাই ওযূ করেছেন।

নাকের রক্তক্ষরণ হলে কি ওযূ ভঙ্গ হবে?

আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তির মুখভর্তি বমি হবে অথবা নাকের রক্তক্ষরণ হবে, অথবা অল্প বমি হবে অথবা মযী নির্গত হবে। সে যেন সালাত থেকে উঠে আসে এবং ওযূ করে নেয়"। হাদীসটি ইবনু মাজাহ (১২২১) বর্ণনা করেছেন। তবে গ্রহণযোগ্য মতে হাদীসটি মুরসাল। যুহালী, আবু হাতিম ও দারাকুতনী হাদীসটি মুরসাল হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য: আত তালখীছ (১/২৭৫)।

এই জন্যই আলেমগণ এই মাসআলায় মতানৈক্য করেছেন। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো: নাকের রক্তক্ষরণ, শিরা কাটা, শিঙ্গা লাগানো ও মুখভর্তি বমির দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হবে না। যেহেতু এই বিষয়ে কোনো দলীল সাব্যস্ত হয়নি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৮৪), আল মাজমূ' (২/৬২), আল আওসাত (১/১৬৭) ।

٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ".

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল আস, আবূ হুরায়রা ও আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণিত, তারা সকলেই বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওযূর সময় যে সমস্ত লোকের পায়ের গোড়ালিতে পানি পৌঁছেনি সে সব লোকদের জন্য জাহান্নামে সর্বনাশ হবে। [সহীহ বুখারী হা/**১৬৩**, **১৬৫** সহীহ মুসলিম হা/**২৪১-২৪২**। আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসটি শুধুমাত্র সহীহ মুসলিমে (হা/২৪০) আছে।]

হাদীসটির প্রাসঙ্গিকতাসমূহ:

ইবনু মুলাক্কিন বলেছেন: পবিত্রকারী পানি ওযূর সকল অঙ্গে পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দিতে হবে। ওযূর অঙ্গগুলোর সামান্য অংশ যদি বাদ থাকে, তাহলেও ওযূ হবে না।

আমি বলব: এই হাদীসে ওযূতে উভয় পা ধৌত করা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে দলীল রয়েছে। এই মাসআলাটি সম্পর্কে অচিরেই আলোচনা করা হবে। ইন শা আল্লাহ।

দ্রষ্টব্য: শারহুস সুন্নাহ (১/৩১৩), আল মুফহিম (১/৪৯৫), শারহু মুসলিম (১২০) ।

٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ:"فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ". وَفِي لَفْظٍ:" مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ".

৪. আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ওযূ করবে, তখন সে যেন তার নাকে পানি দেয় অতঃপর সে যেন তার নাক ঝেড়ে ফেলে। আর যে ব্যক্তি ঢিলা ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। আর যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তখন সে তার হাত পাত্রে ঢুকানোর পূর্বে যেন তিনবার ধুয়ে নেয়। কারণ সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় কোথায় ছিল। আর সহীহ মুসলিমের অন্য শব্দে রয়েছে, সে যেন নাকের ছিদ্রের মাঝে পানি ভালোভাবে পৌঁছিয়ে দেয়। অন্য শব্দে রয়েছে, যে ব্যক্তি ওযূ করবে, সে তার নাকে পানি পৌঁছিয়ে দেয়। [সহীহ বুখারী হা/১৬১-১৬২, সহীহ মুসলিম হা/২৩৭, ২৭৮]

মল পরিষ্কারের ক্ষেত্রে তিনটির কম ঢিলা ব্যবহার কি যথেষ্ট হবে?

প্রথম মত: ভালোভাবে পরিষ্কার করা ওয়াজিব। কিন্তু এই পরিষ্কার পূর্ণাঙ্গ হবে তিনটি ঢিলা দ্বারা। সুতরাং যদি তিনটির কম ঢিলা দ্বারা পরিষ্কার হয়েও যায়, তথাপি তা যথেষ্ট নয়। এটা শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক ও আবু সাওর এর মত। তাদের দলীল: সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেছেন:

“আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকি পরিষ্কারের ক্ষেত্রে ডান হাত দ্বারা ঢিলা ব্যবহার অথবা তিনটির কম ঢিলা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন”। হাদীসটি মুসলিম (২৬২) বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের বর্ণিত শব্দে আরো বলা হয়েছে: “তোমাদের কেউ যেন তিনটির কম ঢিলা ব্যবহার না করে”।

মুসনাদ আহমাদে (৬/১৩৩), আবু দাউদে (৪০) ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যায়, সে যেন নিজের সঙ্গে তিনটি ঢিলা নিয়ে যায়। যেগুলো দ্বারা সে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করবে। কারণ, সেগুলো তার জন্য যথেষ্ট হবে”। হাদীসটিকে শায়েখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ ‘আল ইরওয়া’ গ্রন্থে (৪৪) হাদীসটির সমার্থক হাদীসগুলো উল্লেখ করে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তাদের এই মতের পক্ষে আরো অনেকগুলো দলীল রয়েছে।

দ্বিতীয় মত: মূল ওয়াজিব হলো পরিচ্ছন্নতা। যদি সেটা একটি মাত্র ঢিলা দ্বারা অর্জিত হয়, তাহলে তাই যথেষ্ট হবে। এটা আবু হানীফা, মালেক, দাউদ যাহেরী এর মত। শাফেয়ী মাযহাবের একটি মত। এটা ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাদের দলীল হলো: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "যে ব্যক্তি ঢিলা ব্যবহার করে মল পরিষ্কার করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে"। তারা বলেছেন: সর্বনিম্ন বেজোড় সংখ্যা হলো: এক।

এই যুক্তির উত্তর হলো: এই শব্দটি মুজমাল। যার ব্যাখ্যা প্রথম মতের সাথে বর্ণিত সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ববর্তী হাদীসে করা হয়েছে। তারা আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত এই মারফূ' হাদীসটি দ্বারা দলীল পেশ করেছে:

"যে ব্যক্তি মল পরিষ্কারের ক্ষেত্রে ঢিলা ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এমনটি করল, সে খুব ভালো করল। আর যদি এমনটি কেউ না করে, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই"। হাদীসটি আবু দাউদ (৩৫) ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। এর সনদ দুর্বল। যেহেতু এই সনদে হুসাইন আল হিবরানী আবু সাঈদ আল হিবরানী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তারা উভয়েই মাজহুল রাবী।

অগ্রাধিকারযোগ্য মত হলো: প্রথমটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৫২), আল মাজমূ' (২/১২০), আল ফাতহ (১/২৫৭), আদাবুল খলা (১৯, ৩১১)।

তিনটির অধিক বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহারের বিধান

প্রথম মত: তিনটির অধিক ঢিলা ব্যবহার করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। যেমন: তিনটি ঢিলা ব্যবহারের ফলে পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হলে এর বেশি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যদি তিনটি যথেষ্ট না হয়, তাহলে চতুর্থটি ব্যবহার করা ওয়াজিব। এরপরে যদি পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়, তাহলে অতিরিক্ত আরেকটি ব্যবহার করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু বেজোড় সংখ্যার উপরে আমল করার স্বার্থে পঞ্চমটি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। একই বিধান পরবর্তীগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

তাদের দলীল হলো: আবু দাউদে বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র হাদীস। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি মল পরিষ্কারের ক্ষেত্রে ঢিলা ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। যে এটা করল, সে উত্তম কাজ করল। আর এমনটা না করলেও কোনো সমস্যা নেই"। পূর্বে এই হাদীসটির মান উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাদীসটি দুর্বল। এর সনদে দুইজন মাজহুল রাবী রয়েছেন।

দ্বিতীয় মত: ঢিলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেজোড় সংখ্যা অবলম্বন করা শর্তহীন ওয়াজিব। এটা ইবনু হাযমের মত। তার দলীল হলো: সহীহাইনে বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে মল পরিষ্কারের ক্ষেত্রে ঢিলা ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে"। একইভাবে হাদীসটি আরো বর্ণিত হয়েছে: জাবির ও আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে। উভয়টিই মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী আদেশ, আর আদেশ ওয়াজিব হওয়ার দাবি রাখে যদি কোনো ভিন্ন মর্ম নির্দেশিকা না পাওয়া যায়। তবে আবু হুরায়রার হাদীসটিতে সেই মর্ম বিদ্যমান ছিল। যা প্রথম মতের সাথে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হাদীসটি সাব্যস্ত নয়। কিন্তু এই আদেশটিকে মুসলিমে বর্ণিত সালমান ফার্সীর হাদীসের ভিত্তিতে ঢিলা দ্বারা তিনবার পরিষ্কার করার পক্ষে প্রয়োগ করা হবে। যেখানে তিনি বলেছেন: "আমাদেরকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকি পরিষ্কারের ক্ষেত্রে তিনটির কম ঢিলা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন"। সুতরাং এই কথার মর্ম হলো তিনটি ঢিলা ব্যবহারই যথেষ্ট। এর অধিক ব্যবহার করলে সেটা মুস্তাহাব।

তবে এই মতটি সমালোচনার দাবি রাখে। কারণ, জমহুর আলেমগণ আমার দেখা মতে নাপাকি দূর না হলে তিনটির অধিক ঢিলা ব্যবহার করাকেও ওয়াজিব বলেছেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (১/১০৮), আল মুগনী (১/১৫২), আল মাজমূ' (২/১২২), আদাবুল খলা (৩০৩) ।

যদি কোনো ব্যক্তি তিনবার ঢিলা ব্যবহার করার পরে পুনরায় পেশাবের ফোঁটা নির্গত হয় তাহলে কি সে পুনরায় নতুন করে তিনবার ঢিলা ব্যবহার করবে?

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) আল মাজমূ' গ্রন্থে (২/১২২) বলেছেন: আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেছেন: যদি কোনো ব্যক্তি তার পুরুষাঙ্গ দুই বা তিনবার ঢিলা দ্বারা পরিষ্কার করার পরে পুনরায় এক ফোঁটা পেশাব নির্গত হয়, তাহলে তার জন্য পুনরায় তিনবার ঢিলা ব্যবহার করা ওয়াজিব।

পাথরের ঢিলা দ্বারা নাপাকি পরিষ্কার করার পদ্ধতি

প্রথম মত: পরিষ্কার করার অর্থ হলো: নাপাকির মূল অংশ ও এর আর্দ্রতা বিলুপ্ত করা। যাতে করে সর্বশেষ ঢিলাটি ব্যবহারের পরেও সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন থাকে এবং এর উপরে নাপাকির সামান্য চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই না থাকে। এটা হাম্বলী মাযহাবের একটি মত। যা ইবনু তাইমিয়্যাহ গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় মত: পরিষ্কার করার অর্থ হলো: মূল নাপাকিকে এমনভাবে পরিষ্কার করা, যাতে করে পানি ব্যতীত দূরীভূত করা সম্ভব নয় এমন পিচ্ছিল ছাপ ব্যতীত আর কোনো কিছু অবশিষ্ট না থাকে। এটা শাফেয়ীর মত এবং হাম্বলী মাযহাবের একটি মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি প্রাধান্যযোগ্য। যেহেতু দ্বিতীয়টি পালনের ক্ষেত্রে অনেক কষ্ট ও সমস্যা হবে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৫২), আল মাজমূ' (২/১১৯), আদাবুল খলা (২৮৭) ।

পাথরের বিকল্প অন্য কোনো ঢিলা ব্যবহার করলে কি তা নাপাকি দূরীভূত করণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে?

প্রথম মত: পাথরের বিকল্প অন্য বস্তুকেও ঢিলা হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয আছে। যা পাথরের বিকল্প হওয়ার উপযুক্ত। যেমন: কাষ্ঠখণ্ড, কাপড়ের টুকরা, মাটির ঢিলা, ইটের ঢিলা, গামছা বা তোয়ালে ও এই জাতীয় বস্তু। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

তাদের দলীল হলো: সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেছেন: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকি পরিষ্কারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে তিনটির কম ঢিলা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন"। হাদীসটি সহীহ মুসলিমে (২৬২) বর্ণিত হয়েছে এবং আবু হুরায়রার হাদীসটিও তাদের দলীল: তিনি বলেছেন: আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর পিছনে চলতে লাগলাম। যখন তিনি প্রয়োজন পূরণের স্বার্থে বের হয়েছিলেন। তিনি ডানে বামে তাকাতেন না। আমি তাঁর নিকটে গেলে তিনি বললেন: "আমাকে পাথর বা এই জাতীয় কিছু ঢিলা এনে দাও, যাতে সেগুলো দ্বারা আমি নাপাকি পরিষ্কার করতে পারি। আমাকে কোনো হাড় অথবা পশুমল এনে দিও না"। সহীহ বুখারী (১৫৫) ।

উল্লিখিত হাদীসটি থেকে সাব্যস্ত প্রমাণ: পশুর বিষ্ঠা ও হাড় দ্বারা নাপাকি পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিষেধাজ্ঞা এই বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, অন্যান্য বস্তু পাথরের ঢিলার বিকল্প হতে পারে। অন্যথায় পশুর বিষ্ঠা ও হাড়কে বিশেষভাবে নিষেধ করার কোনো অর্থ হয় না। তাদের মতের পক্ষে আরো অনেকগুলো দলীল আছে।

দ্বিতীয় মত: একমাত্র পাথরের ঢিলা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু দ্বারা নাপাকি পরিষ্কার করা জায়েয নেই। এটা যাহেরী মাযহাবের মত। আহমাদ এর থেকে বর্ণিত একটি মত। যা তার অনুসারীদের কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল হলো: পাথরের ঢিলা ব্যবহার সংক্রান্ত হাদীসসমূহ। এই মতের উত্তর হলো: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্টভাবে পাথরের কথা উল্লেখ করেছেন; কারণ, খোলা প্রান্তরে একজন পবিত্রতা

অর্জনকারী ব্যক্তির নিকট অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাথরের ঢিলাই বিদ্যমান থাকে। তা ছাড়া এটা ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই এবং এটা অর্জনে বেগ পেতে হয় না।

অগ্রাধিকারযোগ্য মত: প্রথম মতটিই অগ্রাধিকারযোগ্য। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (১/১০৮), আল মুগনী (১/১৬৫), আল মাজমূ' (২/১৩০), আল ফাতহ (১/২৫৬)।

ঢিলা ব্যবহারে যেই বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকা শর্ত

প্রথম শর্ত: ঢিলাটি পবিত্র হতে হবে। ঢিলাটি নাপাক বস্তু বা নাপাকযুক্ত হতে পারবে না। নাজাস হলো: কোনো বস্তু সত্তাগতভাবে নাপাক হওয়া। আর মুতানাজ্জিস হলো: কোনো (পবিত্র) বস্তু নাপাকযুক্ত হওয়া।

দ্বিতীয় শর্ত: ঢিলাটির মাঝে পরিচ্ছন্ন করার গুণ বিদ্যমান থাকা। সুতরাং কাঁচ ব্যবহার করা যাবে না। যেহেতু এটা মসৃণ। এর দ্বারা পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হবে না।

তৃতীয় শর্ত: হাড় বা পশুর মল হতে পারবে না। এই বিষয়ের দলীল হলো: মুসলিমে বর্ণিত (৪৫০) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমার নিকট জিন জাতির একজন দূত এসেছিলেন। আমি তার সঙ্গে তাদের ঠিকানায় গিয়েছিলাম। এবং তাদের সামনে কুরআন পাঠ করেছি”। রাবী (ইবনু মাসউদ) বললেন: এরপরে তিনি আমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন এবং তাদের বিভিন্ন কীর্তি ও তাদের আগুনের চিহ্ন দেখালেন। তারা তাঁর নিকট খাবারের জন্য প্রার্থনা করল। এরপরে তিনি বললেন: “তোমাদের জন্য খাদ্য (বিবেচিত) হবে এমন প্রতিটি পশুর হাড়, যা জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। তোমাদের হাতের স্পর্শে হাড় সম্পূর্ণ গোশতে পরিণত হবে এবং প্রতিটি চতুষ্পদ জন্তু ও গৃহপালিত পশুর মল তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হবে”। এরপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “সুতরাং তোমরা এই বস্তুগুলো ঢিলা হিসেবে ব্যবহার করো না। কারণ, এগুলো তোমাদের ভাইদের খাদ্য”।

চতুর্থ শর্ত: ঢিলাটি কোনো খাদ্য হতে পারবে না। অর্থাৎ আদম সন্তানদের কোনো খাদ্য হতে পারবে না এবং তাদের চতুষ্পদ জন্তুর কোনো খাদ্য হতে পারবে না। দলীল হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মল-মূত্র পরিষ্কারের ক্ষেত্রে হাড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কারণ; এটা জিনদের খাদ্য এবং গোবর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। যেহেতু এটা তাদের পশুদের খাদ্য। আর মানুষ তো আরো শ্রেষ্ঠ প্রাণী। সুতরাং মল-মূত্র পরিষ্কারের ক্ষেত্রে তাদের খাদ্য এবং তাদের চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার আরো অধিক দাবিদার।

পঞ্চম শর্ত: ঢিলাটি সম্মানিত কোনো বস্তু হতে পারবে না। মুহতারাম হলো: এমন বস্তু, যার সম্মান আছে। অর্থাৎ: শরীআতের দৃষ্টিতে যার মহত্ত্ব সাব্যস্ত। যেমন: শারঈ জ্ঞানের গ্রন্থসমূহ। দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী: "এটাই (পূর্বে বর্ণিত কার্যসমূহ) হজ্জ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সম্মানিত বস্তুগুলোকে শ্রদ্ধা করবে, সেটা তার রবের নিকট তার জন্য উত্তম প্রতিদান হিসেবে বিদ্যমান থাকবে" । আল হাজ্জ (৩০) ।

ষষ্ঠ শর্ত: ঢিলাটি কোনো পশুর দেহের অংশ হতে পারবে না। যেমন: কোনো গাভীর লেজ দ্বারা মল-মূত্র পরিষ্কার করা অথবা মেষশাবকের কান দ্বারা করা পরিষ্কার করা। কারণ; গাভীর খাদ্য দ্বারা ইস্তিনজা করতে যেখানে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে ব্যক্তি গাভীর কোনো অঙ্গ দ্বারা ইস্তিনজা করাটা নিষিদ্ধ হওয়ার অধিক উপযুক্ত। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

উপর্যুক্ত মাসআলাগুলো ব্যতীত হাদীসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো অনেকগুলো মাসআলা এখনো অবশিষ্ট রয়েছে, যেগুলো হাদীসের সাথে সংযুক্ত। যেসকল মাসআলার আলোচনা অচিরেই উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত (৮) হাদীসের অধীনে উল্লেখ করা হবে। আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত (১৬) হাদীসের অধীনে 'পায়খানায় প্রবেশ ও উত্তমরূপে নাপাকি থেকে পরিষ্কার হওয়ার নিয়ম' সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হবে। ইনশা আল্লাহ।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৫৭), আল মাজমূ' (২/১৩২), আশ শারহুল মুমতি' (১/১৩২), আদাবুল খলা (৩৬৭) ।

الأحكام المتعلقة باستعمال الماء الدائم

আবদ্ধ পানি ব্যবহার সম্পর্কিত বিধানসমূহ

৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِى، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ". وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ".

৫. আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে পানি চলাচল করে না এমন পানিতে, তোমাদের কেউ যেন পেশাব না করে। অতঃপর সেই পানিতেই গোসল করে। সহীহ মুসলিমে রয়েছে, তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে অপবিত্রতার গোসল না করে। [সহীহ বুখারী হা/২৩৯, সহীহ মুসলিম হা/২৮২-২৮৩।]

স্থির পানিতে পেশাব করার বিধান

প্রথম মত: স্থির পানিতে পেশাব করা হারাম। এটা হাম্বলী ও যাহেরীদের মত। কুরতুবী এই মতকে গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল হলো: লেখক কর্তৃক বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি।

দ্বিতীয় মত: স্থির পানিতে পেশাব করা মাকরূহ। এটা মালেকী ও শাফেয়ীদের মত। এই দলীলের ভিত্তি হলো: পানি তার আসল অবস্থা তথা পবিত্রতার উপরে বহাল আছে।

তৃতীয় মত: যদি স্থির পানি পরিমাণে অনেক বেশি হয়, তাহলে তাতে পেশাব করা মাকরূহ হবে। হারাম হবে না।

অগ্রাধিকারযোগ্য মত: প্রথমটিই অগ্রাধিকারযোগ্য মত। অর্থাৎ স্থির পানিতে পেশাব করা হারাম। এই কারণে নয় যে, এর দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যাবে। বরং এমন কাজ করার পথ বন্ধ করে দেওয়ার স্বার্থে।

ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমহুল্লাহ বলেছেন: স্থির পানিতে পেশাবের ব্যাপারে তাঁর নিষেধাজ্ঞা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে না যে, শুধুমাত্র পেশাবের দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যাবে। কারণ, হাদীসের বাক্যে এমন কোনো শব্দ নেই, যা এই মর্মের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। বরং কখনো কখনো তাঁর নিষেধাজ্ঞা সংশ্লিষ্ট কাজের পথ বন্ধ করে দেওয়ার স্বার্থেও হয়ে থাকে। যেহেতু পেশাব পানি নাপাক হওয়ার রাস্তা তৈরি করে দেয়। সুতরাং যখন এক ব্যক্তি পেশাব করে, এরপরে আরেক ব্যক্তি পেশাব করে, তখন পানিটি পেশাবের দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাই পেশাবের নিষেধাজ্ঞাটি সেই পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে। অথবা বলা হবে: এটা শুধুমাত্র স্বভাবজাত দৃষ্টিতেই অপছন্দনীয়। পানিকে নাপাক করে এই জন্য নয়। এবং 'স্থির পানিতে' পেশাবের ব্যাপারে তাঁর নিষেধাজ্ঞাটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, এই নিষেধাজ্ঞা অল্প ও বেশি উভয় পরিমাণের পানিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (১৫০), আল মাজমূ' (২/১০৮), মাজমূ' ফাতাওয়া (২১/৩৪), আল ফাতহ (১/৩৪৮), আত তাওযীহ (১/১২৯), এবং আহকামুল গুসল (৩৭৭) ।

স্থির পানিতে জুনুবী ব্যক্তির গোসল করার বিধান

প্রথম মত: স্থির পানিতে জুনুবী ব্যক্তির জন্য গোসল করা হারাম। এটা আবু হানীফার মত। ইবনু হাযম এই মতটিকে গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল হলো: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় মত: মাকরূহ। এটা মালেকী ও শাফেয়ীদের মত। তাদের দলীল হলো: জুনুবী ব্যক্তির দেহ পবিত্র। আর পবিত্র দেহ পবিত্র পানির সংস্পর্শে আসার দ্বারা নাপাক হতে পারে না।

অগ্রাধিকারযোগ্য মত: প্রথম মতটিই অগ্রাধিকারযোগ্য। যেহেতু এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান। যেমনটি আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো: হারাম ঘোষণা করা। তবে ভিন্ন অর্থবোধক কোনো নির্দেশিকা বিদ্যমান থাকলে ভিন্ন অর্থ সাব্যস্ত হবে। আমার জানামতে এখানে কোনো ভিন্ন অর্থবোধক নির্দেশিকা নেই। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (১৫০), শারহু মুসলিম (২৮৩), তাওযীহ (১/১২৯), আহকামুল গুসল (৩৭৭)।

জুনুবী ব্যক্তি স্থির পানিতে গোসল করলে তার নাপাকি দূর হবে?

ইবনু হাযমের মতে, জুনুবী ব্যক্তি স্থির পানিতে গোসল করলে সেই গোসল তার পবিত্রতার জন্য যথেষ্ট হবে না। যদি গোসলকারী জুনুবী না হয়, তাহলে তার গোসল যথেষ্ট হবে। তার দলীল হলো: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। যেহেতু নিষেধাজ্ঞা সংশ্লিষ্ট বস্তুর ব্যর্থতা বা কার্যহীনতার দাবি রাখে।

ইবনু কুদামা বলেছেন: যখন জুনুবী বা মুহদিস ব্যক্তি দুই কুল্লার কম পরিমাণ পানিতে নাপাকি দূর করার উদ্দেশ্যে ডুব দিবে, তখন উক্ত পানি ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হবে। কিন্তু তার নাপাকি দূর হবে না। তিনি আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। এরপরে তিনি বলেছেন: আর নিষেধাজ্ঞা নিষিদ্ধ বস্তুর কার্যহীনতার দাবি রাখে। আর যেহেতু পানির প্রথম অংশ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দ্বারাই পানি ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হয়। যার ফলে সমস্ত শরীর থেকে নাপাকি দূর হয় না। আর যদি পানির পরিমাণ দুই কুল্লার সমপরিমাণ বা তার চাইতে বেশি হয়, তাহলে গোসলকারীর নাপাকি দূর হয়ে যাবে এবং এর দ্বারা পানি প্রভাবিত হবে না। যেহেতু এই পরিমাণ পানি নাপাকি গ্রহণ করে না।

শাফেয়ী বলেছেন: এই পরিমাণ পানিও ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হবে। যেহেতু পানি একমাত্র ব্যবহৃত তখনই হয়, যখন এর দ্বারা নাপাকি দূর হয়।

গ্রহণযোগ্য মত: স্থির পানিতে জুনুবী ব্যক্তির জন্য গোসল করা হারাম। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজকে নিষেধ করেছেন। আর তার নাপাকি দূর হয়ে যাবে। আর পানি ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষেত্রে, সঠিক মত হলো: ব্যবহৃত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা সম্পূর্ণরূপে জায়েয। মাকরূহ হবে না। এটা আহমাদ এর একটি বর্ণনা। যা ইবনু হাযম, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু আব্দিল হাদী, শাওকানী গ্রহণ করেছেন।

ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: স্থির পানিতে গোসল করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বর্ণনাটি যদি সহীহ হয়, যা ব্যবহৃত পানির মাসআলার সাথে সম্পর্কিত। তবুও সেটা ‘ব্যবহৃত পানি অন্যকে নোংরা করে দিতে পারে’ এই জন্য এসেছে। পানিটি নাপাক

হয়েছে এই জন্য নয়। এবং পানিটি ব্যবহৃত হয়েছে এই জন্যও নয়। কারণ, সহীহ বর্ণনায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে: "জুনুবী ব্যক্তির ব্যবহারের কারণে পানি নাপাক হয় না" ।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (১৫০), আল মুগনী (১/২২), মাজমূ' ফাতাওয়া (২১/৪৬), আহকামুল গুসল (৩৮৩) ।

স্থির পানিতে মলত্যাগ করার বিধান কী?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, আমাদের মাযহাবের আলেমগণ ও অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন, পানিতে মলত্যাগ করা, পানিতে পেশাব করার ন্যায় বা তার চাইতে নিকৃষ্ট কর্ম। একই বিধান যখন কোনো ব্যক্তি কোনো পাত্রে পেশাব করে, এরপরে সেই পেশাব সে কোনো পানিতে ঢেলে দেয়। একই বিধান যখন কোনো ব্যক্তি নদীর নিকটে এমন স্থানে দাঁড়িয়ে পেশাব করে, যেখান থেকে পানি নদীতে প্রবাহিত হয়। এমন সকল প্রকার পেশাব উল্লিখিত বিবরণ অনুসারে নিন্দিত, নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে কোনো আলেম দ্বিমত পোষণ করেননি। তবে দাউদ বিন আলি যাহেরী থেকে বর্ণিত হয়েছে: নিষেধাজ্ঞাটি মানুষের নিজের পেশাবের সাথে নির্দিষ্ট। আর মল পেশাবের ন্যায় হতে পারে না। একই বিধান যখন কোনো ব্যক্তি পাত্রের মধ্যে পেশাব করে, এরপরে সেই পেশাব পানিতে ঢেলে দেয় অথবা পানির নিকটে পেশাব করে। তার এই মতটি আলেমগণের মতের বিপরীত। এই মতটি তার থেকে বর্ণিত হাদীসের যাহেরী অর্থের উপরে অবিচল থাকা মতগুলোর মাঝে সবচেয়ে জঘণ্য। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

আমি বলব: দাউদ এই মাসআলায় যেই মত দিয়েছেন, ইবনু হাযমের মতও সেটিই।

দ্রষ্টব্য: আল মুফহিম (১/৫৪৬), শারহু মুসলিম (২৮১) ।

পেশাব বা মলত্যাগের পরে স্থির পানিতে নেমে পবিত্রতা অর্জনের বিধান

নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আর যে ব্যক্তি পানিতে পেশাব বা মলত্যাগ করেনি এমন ব্যক্তির জন্য নাপাকি পরিষ্কারের উদ্দেশ্যে পানিতে ডুব দেওয়ার মাসআলা হলো, যদি পানি পরিমাণে এত অল্প হয়, যে তাতে নাপাকি পতিত হলে তা নাপাক হয়ে যায়, তাহলে এমন পানিতে নামা হারাম। যেহেতু এর ফলে পানি নাপাকির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তা নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি পানির পরিমাণ এত বেশি হয়, যেখানে নাপাকি পতিত হওয়ার ফলে তা নাপাক হবে না, তাহলে এমন পানি প্রবাহমান হলে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি তা স্থির পানি হয়, তথাপি এমন পানিতে নামা হারাম হবে না। এমনকি এটা মাকরূহও হবে না। যেহেতু

এটা পেশাবের সমমানের নয় এবং পেশাবের নিকটবর্তীও নয়। যদি মানুষ এমন কাজ থেকে বিরত থাকে, তাহলে সেটাই অধিক উত্তম হবে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

বেশি পানিতে নাপাকি পতিত হওয়ার পর যদি পানি পরিবর্তিত না হয়, তাহলে সেটা পবিত্র বলেই বিবেচিত হবে

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ আলেমগণ এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, নীল নদের পানি, সাগরের পানি ও এই জাতীয় পানির মাঝে যখন নাপাকি পতিত হয়, কিন্তু এর ফলে উক্ত পানির রঙ, স্বাদ ও গন্ধের মাঝে পরিবর্তন না হয়, বরং সেটা আপন অবস্থায় বহাল থাকে, তাহলে এমন পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে।

ইবনু দাকিকিল ঈদ রহিমাহুল্লাহ লেখকের উদ্ধৃত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ জেনে রাখো, এই হাদীসটিকে অবশ্যই নির্দিষ্ট মর্মের দ্বারা অথবা শর্তযুক্ত করার দ্বারা তার বাহ্যিক মর্ম থেকে মুক্ত করা জরুরী। যেহেতু এই বিষয়ে ইজমা' সাব্যস্ত হয়েছে যে, সাগরের ন্যায় বিরাট পানির স্তূপে নাপাকি কোনো পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে না।

ইবনু নুজাইম রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ যেহেতু আমাদের ইজমা' সাব্যস্ত হয়েছে যে, প্রচুর পরিমাণ পানিতে গোসল করা হারাম নয়। আলেমগণ এই বিষয়ের উপরে ইজমা' বর্ণনা করেছেন।

দ্রষ্টব্যঃ আল ইজমা' (৩৩), আল ইহকাম (১/২২), ইজমা'আতু ইবনি আব্দিল বার (১/১১৬)।

যখন পানিতে নাপাকি পতিত হওয়ার দ্বারা পরিবর্তন হয় তখন তা নাপাক হয়ে যায়

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ তারা এই বিষয়ে ইজমা' পোষণ করেছেন যে, অল্প বা বেশি পানিতে যদি নাপাকি পতিত হয়, এরপরে তা উক্ত পানির স্বাদ, বা গন্ধ, বা রঙ পরিবর্তন করে দেয়, তাহলে উক্ত পানি নাপাক বিবেচিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত পানি এই অবস্থায় বহাল থাকবে। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ ইবনু মুনযিরের এই ইজমা' বর্ণনা করার পরে বলেছেনঃ একইভাবে এই বিষয়ে আমাদের মাযহাবের আলেমগণ ও অন্যান্য অনেক আলেম ইজমা' বর্ণনা করেছেন। আর পানি চাই প্রবাহমান হোক অথবা স্থির, কম হোক বা বেশি, পানির স্বাদ বা রঙ বা গন্ধ বেশি পরিবর্তন হোক কিংবা কম সর্বাবস্থায় তা ইজমা' অনুসারে নাপাক বলেই বিবেচিত হবে। এই বিষয়ের উপরে একইভাবে একাধিক আলেম ইজমা' বর্ণনা করেছেন।

দ্রষ্টব্যঃ আল ইজমা' (৩৩), আল আওসাত (১/২৬৮), আত তামহীদ (১৮/২৩৫), আল ইসতিযকার (১/২১১), আল মাজমূ' (১/১৬০), মাজমূ' ফাতাওয়া (২১/৩০) ।

যখন স্থির পানিতে মিশ্রিত নাপাকির ফলে পানিতে পরিবর্তন হয় না

প্রথম মত: যদি পানি দুই কুল্লার সমান বা তার চাইতে বেশি হয়, তাহলে তা নাপাক হবে না। আর যদি পানির পরিমাণ দুই কুল্লার চাইতে কম হয়, তাহলে তাতে পরিবর্তন না হলেও তা নাপাক বলে বিবেচিত হবে। এটা ইবনু উমার, সাঈদ বিন জুবাইর, মুজাহিদ, শাফেয়ী, আহমাদ, আবু উবাইদ ও ইসহাকের মত। তাদের দলীল হলো: লেখকের উদ্ধৃত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি। একইভাবে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসটি: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম বলেছেন:

"যখন পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হয়, তখন তা নাপাকি গ্রহণ করে না"। আবু দাউদ (৬৩), তিরমিযি (৬৭) ও অন্যান্যরা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শায়েখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ আল ইরওয়া গ্রন্থে (১/৬০) গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং নাবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম এর বাণী: "যখন পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হয়, তখন তা নাপাকি গ্রহণ করে না"। এই বক্তব্যের তাৎপর্য হলো: যদি পানি দুই কুল্লার কম হয়, তাহলে সেটা নাপাকিকে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ নাপাক হয়ে যাবে। তাদের মতের পক্ষে আরো অনেক দলীল রয়েছে। দুই কুল্লার পরিমাণ নির্ধারণে তারা মতানৈক্য করেছেন। কেউ কেউ অধিক পরিমাণ পানিকে দুই কুল্লা ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা পরিমাপ করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা এবং মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির থেকে বর্ণিত হয়েছে: "যদি পানি চল্লিশ কুল্লার সমপরিমাণ হয়, তাহলে সেই পানিকে কোনো বস্তু নাপাক করতে পারবে না"। ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত: "যদি পানি বড় দুই বালতি পরিমাণ হয়, তাহলে সেটা নাপাক গ্রহণ করে না"। ইকরিমাহ বলেছেন: "যদি একটি বড় বালতি বা দুইটি বড় বালতি পরিমাণ হয়"।

আর আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: "যদি পানি চল্লিশ বালতি সমপরিমাণ হয়"। আবু হানীফার মাযহাব হলো: যদি পানির পরিমাণ এমন হয়, যে এক পাশ থেকে নাড়া দিলে অপর পাশের পানি নড়ে উঠে, তাহলে তা নাপাক হয়ে যাবে। অন্যথায় নাপাক হবে না।

দ্বিতীয় মত: যদি নাপাকি কোনো মানুষের পেশাব হয় অথবা পাতলা মল হয়, তাহলে তা নাপাক হয়ে যাবে যদিও পানির পরিমাণ বেশি হয়। তবে সম্পূর্ণ পানি উঠানো যদি কঠিন সমস্যা হয়, তাহলে (পানির রঙ, গন্ধ, স্বাদ পরিবর্তিত না হলে) পানি পবিত্র বিবেচিত হবে। আর যদি নাপাকি অন্য কোনো বস্তু হয়, তাহলে উক্ত পানি নাপাক হয়ে যাবে যদি তা দুই কুল্লার কম হয়। আর যদি পানি দুই কুল্লার সমান বা তার চাইতে বেশি হয়, তাহলে পানির বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তা নাপাক হবে না। এটা হাম্বলী মাযহাবের একটি মত।

তৃতীয় মত: অল্প পানি এবং বেশি পানি কোনোটাই নাপাক হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পানির রঙ অথবা স্বাদ অথবা গন্ধ নাপাকির কারণে পরিবর্তন না হবে। এই মতটি ইবনু আব্বাস ও

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটা সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব, হাসান বাসরী, ইকরিমাহ, সাঈদ বিন জুবাইর, আতা, আব্দুর রাহমান বিন আবি লায়লা, জাবির বিন যায়েদ, মালিক, আওযায়ি, ছাওরী, ইয়াহয়া আল কাত্তান, আব্দুর রাহমান বিন মাহদী এর মত। শাফেয়ীর একটি মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। যা ইবনু মুনযির, ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু উসাইমীন গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল হলো:

আল্লাহ তা'আলার বাণী: "আমরা আসমান থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করেছি" (আল ফুরকান: ৪৮)। এখানে আল্লাহ তা'আলা পানিকে পবিত্র বলেছেন। সুতরাং পবিত্রতার বৈশিষ্ট্য ততক্ষণ পর্যন্ত পানি থেকে বিলুপ্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পানিতে পরিবর্তনের ফলে এই বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত না হবে। তারা আরো দলীল পেশ করেন: আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারা, যা তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন:

"নিশ্চয় পানিকে কোনো বস্তু নাপাক করতে পারে না"। আবু দাউদ (৬৭), তিরমিযি (৬৬) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে শায়েখ আলবানী অন্যান্য শাহেদ ও একাধিক সনদ দ্বারা সহীহু সুনানি আবি দাউদ গ্রন্থে (৫৯) সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। তাদের আরো অনেক দলীল রয়েছে।

প্রথম মতে উদ্ধৃত দুই কুল্লা সম্পর্কিত ইবনু উমারের হাদীসের ক্ষেত্রে তারা দুইটি উত্তর দিয়েছেন:

প্রথম উত্তর: তারা বলেছেন: আমাদের নিকট নস (কুরআন হাদীসের দলীল) মানতুক ও মাফহুম; দুই প্রকার। আর মানতুক মাফহুমের উপরে অগ্রাধিকারযোগ্য। সুতরাং "পানি পবিত্র, কোনো বস্তু পানিকে নাপাক করতে পারে না" এই হাদীসটির স্পষ্ট বক্তব্য অল্প ও বেশি উভয় প্রকারের পানিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর "যখন পানি দুই কুল্লার সমপরিমাণ হবে, কোনো নাপাকি গ্রহণ করবে না" এই হাদীসটির স্পষ্ট বক্তব্য "পানি পবিত্র, কোনো বস্তু পানিকে নাপাক করতে পারে না" এই হাদীসটির বক্তব্যের সমার্থক। কারণ, এই হাদীসের বক্তব্য হলো: যদি পানি দুই কুল্লার সমপরিমাণ হয়, তাহলে সেটাকে কোনো বস্তু নাপাক করতে পারে না। আর হাদীসটির অব্যক্ত মর্ম হলো: যদি পানি দুই কুল্লার চাইতে কম পরিমাণ হয়, তাহলে তা নাপাক হয়ে যাবে। এই অব্যক্ত মর্মটি আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের স্পষ্টভাবে ব্যক্ত মর্মের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই ব্যক্ত মর্মকে অব্যক্ত মর্মের উপরে প্রাধান্য দেওয়া হবে। তাই আমরা দুই কুল্লার হাদীস থেকে শুধু ব্যক্ত মর্মটিই গ্রহণ করব। এর অব্যক্ত মর্মটি গ্রহণ করব না। কারণ, এটা আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয় উত্তর: এই উত্তরে বলা হবে: নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে কোনো সাধারণ বিধান দিতে চাননি। বরং একটি বহুল প্রচলিত বিধান দিতে চেয়েছেন। কারণ, পানি যখন দুই কুল্লা সমপরিমাণ হয় এবং নাপাকির কারণে তা পরিবর্তিত হয়, তখন সেটা ইজমা'র ভিত্তিতে নাপাক বলে ধর্তব্য হবে। একইভাবে হাদীসটির অব্যক্ত

মর্ম হলো: যখন পানি দুই কুল্লার কম হবে, অধিকাংশক্ষেত্রে পানি নাপাকিকে গ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

একইভাবে তারা আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসটিরও উত্তর দিয়েছেন। একইভাবে প্রথম মতের অনুসারীদের দলীলে উপস্থাপিত সকল দলীলেরই তারা উত্তর দিয়েছেন, যেগুলো আমরা উল্লেখ এখনো উল্লেখ করিনি। আলেমগণ এই মাসআলার আলোচনায় অনেক দীর্ঘ বিশ্লেষণ করেছেন। এমনকি ইবনু কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ এই মাসআলা সম্পর্কে বলেছেন: এটাই দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ঢেউয়ের উর্মিমালার একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থল। আর সেটা পানি ও তরল বস্তুর মাসআলা; যখন সেটাতে নাপাকি মিশ্রিত হয়, এরপরে তা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং পানিতে নাপাকির কোনো প্রকার চিহ্ন দেখা না যায়।

ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই স্থানটি ঐ সকল সঙ্কীর্ণতম স্থানের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে অল্পকিছু ব্যক্তি ব্যতীত কেউ সঠিক দিশা পায় না।

গ্রহণযোগ্য মত হলো: তৃতীয় মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/২৬১), আল মুগনী (১/২৩), আল মাজমূ' (১/১৬২), মাজমূ' ফাতাওয়া (২১/৩০), আন নাইল (১/১৬০), আশ শারহুল মুমতি' (১/৩৮), আহকামুল মিয়াহ (৩৩৯)।

حكم الإناء الذي شرب منه الكلب وولغ فيه

যে পাত্রে কুকুর পান করে ও লেহন করে তার বিধান

٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا" وَلِمُسْلِمٍ " أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ".

وَلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ.

৬. আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর পান করে তখন সে যেন উক্ত পাত্রকে সাতবার ধৌত করে। আর মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, প্রথমবার যেন মাটি দ্বারা ঘষে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে রয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো পাত্রে কুকুর চেটে খাবে তখন সে পাত্রটিকে সাতবার ধৌত করবে। আর অষ্টম বারে মাটি দ্বারা ঘষবে। [সহীহ বুখারী হা/১৭২, সহীহ মুসলিম হা/২৭৯।]

কুকুরের লালা কি নাপাক?

প্রথম মত: কুকুরের লালা নাপাক। এটা জমহুর তথা হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী ও অন্যান্য মাযহাবের মত। তাদের দলীল হলো: লেখক কর্তৃক বর্ণিত আবু হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসটি। যেহেতু উভয় হাদীসেই সাতবার পাত্র ধোয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এটা এই বিষয়েরও দলীল যে, এটা কঠোর নাপাকি। একইভাবে মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় শব্দটি এভাবে এসেছে: "তোমাদের কারোর পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা পবিত্র করার পদ্ধতি হলো"। তারা বলেছেন: যেহেতু তাহারাত হয়ত অদৃশ্য নাপাকি অথবা দৃশ্যমান নাপাকি দূর করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর পাত্রের উপরে কোনো হাদাস থাকে না। যার ফলে পাত্রে বিদ্যমান নাপাকি দৃশ্যমান নাপাকি এটা নিশ্চিত হলো।

দ্বিতীয় মত: কুকুরের ঝুটা পবিত্র। এটা মালেকী মাযহাব, যুহরী, আওযাঈ ও দাউদের মত। কারণ, তাদের মতে, এখানে ধৌত করার আদেশটি মূলত ইবাদত সংক্রান্ত। নাপাকি পরিষ্কারের জন্য নয়। আর ইবাদত সংক্রান্ত বিষয় দলীলের প্রয়োগস্থলেই সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে সেটা দলীলের ক্ষেত্রকে অতিক্রম করতে পারে না। যেহেতু এখানে 'ইল্লাত সম্পর্কে জানা নেই। তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "সুতরাং তারা তোমাদের জন্য যে শিকার ধরে আনে, তা হতে তোমরা আহার কর" (আল মায়িদাহ: ৪) ।

তারা বলেছেন: নিঃসন্দেহে শিকার কুকুরের লালার মিশ্রণ থেকে মুক্ত হয় না। আর আমরা ধৌত করার ব্যাপারে আদিষ্ট নই। এই বিষয়ের উত্তর হলো: তাদের মাধ্যমে শিকারকৃত প্রাণী আহার করা বৈধ হওয়ার দ্বারা শিকারের নাপাক অঙ্গটি পবিত্র করা ওয়াজিব হওয়ার বিধানটির সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। আর আদেশটিকে যথেষ্ট মনে না করার কারণ নাপাক বস্তু পবিত্র করার দলীলসমূহের মাঝে বিদ্যমান 'আম নস। তারা বুখারীতে (১৭৪) বর্ণিত ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদিস দ্বারাও দলীল পেশ করে: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে মাসজিদে নববীতে কুকুর আসা-যাওয়া ও পেশাব করত। কিন্তু তারা সেখানে কোনো কিছুই ছিটিয়ে দিতেন না।

এই হাদীসটির কয়েকটি উত্তর আছে, যেগুলো হাফেয উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাওকানী বলেছেন: হাফেয বলেন: এই কথাটা সর্বাধিক সহজ: এটা ছিল প্রাথমিক অবস্থায় বৈধতার মৌলিক নীতি অনুসারে। পরবর্তীতে মাসজিদসমূহের সম্মান এবং সেগুলোকে পবিত্রকরণের আদেশ এসেছে এবং মাসজিদগুলোর দরজা স্থাপন করা হয়েছে।

অগ্রাধিকারযোগ্য মত: প্রথম মতটি অগ্রাধিকারযোগ্য। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৩০৬), আল মাজমূ' (২/৫৯৮), আল ফাতহ (১/২৭৬-২৭৯) । আন নাইল (১/১৭২), আত তাওযীহ (১/১৩৭), আহকামুন নাজাসাহ লিদ দিবয়ান (৩২৩)।

কুকুর ও এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কি নাপাক?

প্রথম মত: পবিত্র। এটা আবু হানীফা, মালেক, যুহরী, দাউদ যাহেরী ও আহমাদের একটি বর্ণনা। তাদের দলীল হলো: এই আয়াতটি এবং ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, যা ইতোপূর্বের মাসআলাটিতে বর্ণিত হয়েছে। উভয়টি সম্পর্কে আলোচনাও অতিবাহিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: কুকুর সত্তাগত নাপাক। প্রশিক্ষিত হোক বা অপ্রশিক্ষিত। ছোট হোক বা বড়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: আবু হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন: যেহেতু কুকুরের লালা নাপাক, যা তার মুখের ঘাম। বিধায় এর মুখও নাপাক। যা তার গোটা দেহ নাপাক হওয়াকে নিশ্চিত করে। যেহেতু তার ঘাম তার মুখেরও একটি অংশ। আর তার মুখ তার অঙ্গগুলোর মাঝে সর্বাধিক সম্মানিত। সুতরাং তার গোটা দেহটা নাপাক হওয়ার অধিক উপযুক্ত।

অগ্রাধিকারযোগ্য মত: প্রথম মতটি, যা ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ এর নিকট গ্রহণযোগ্য। এই বিষয়ে তার অত্যন্ত চমৎকার বক্তব্য রয়েছে। যদি চাও তাহলে সেটা অধ্যায়ন করতে পার। পেশাবের মাসআলাটি ভিন্ন। কারণ, তিনি বলেছেন: যদি বলা হয়: পেশাব থুথুর চাইতে অধিক সম্মানিত, তাহলে এটা ভুল বিশ্লেষণ হবে। আর থুথুর সঙ্গে পশমকে সংযুক্ত করা সম্ভব নয়; কারণ, থুথু কুকুরের পেট হতে নির্গত হয়। পক্ষান্তরে চুল তার পিঠেই উৎপন্ন হয়।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (২/৫৮৫), আন নাইল (১/১৭২), আত তাওযীহ (১/১৩৭), আহকামুন নাজাসাত (১/১০৩) ।

সাতবার ধৌতকরণ এবং পানি ও মাটি ব্যবহারের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে কুকুরের অন্যান্য অঙ্গগুলোও কি তার লালার সাথে সম্পৃক্ত হবে?

প্রথম মত: যখন কুকুরের পেশাব বা মল বা ঘাম বা থুথু বা রক্ত বা চুল অথবা অন্যকোনো অঙ্গ কোনো পবিত্র বস্তুকে স্পর্শ করবে, এমন অবস্থায় যে উভয়টির কোনো একটি আর্দ্র থাকবে, তখন উক্ত বস্তুটিকে সাতবার ধৌত করা ওয়াজিব। যেখানে একবার ধৌত করতে হবে মাটি দ্বারা। শাফেয়ী মাযহাবের দুইটি মতের মাঝে সর্বাধিক সহীহ মত, হাম্বলী

মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত, শায়েখ ইবনু উসাইমীন ও বাসসাম এর নিকট গ্রহণযোগ্য মত। তাদের দলীল হলো: যখন কুকুরের লালা নাপাক এবং এর কারণে পাত্রকে সাতবার ধৌত করতে হয়, তাহলে তার পেশাব নাপাক হওয়ার অধিক উপযুক্ত। যেহেতু সেটা অধিক নাপাকি এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

দ্বিতীয় মত: সাতবার ধৌতকরণটি শুধুমাত্র জ্বিহবা লাগানোর সাথেই নির্দিষ্ট। আর অন্যান্য সকল অঙ্গগুলোর সাথে স্পর্শ হলে অন্যান্য নাপাকি ধৌত করার ন্যায় ধৌত করতে হবে। এটা শাফেয়ী মাযহাবের একটি মত। আর হানাফী ও মালেকী মাযহাবের মত হলো: তাদের মতে ধারাবাহিকতা মৌলিকভাবেই ধর্তব্য নয়। জ্বিহবা লাগানোর ক্ষেত্রেও নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও নয়। আর যারা সাতবার ধৌতকরণকে জ্বিহবা লাগানোর সাথে নির্দিষ্ট করেন তাদের দলীল হলো: হাদীসের যাহেরী অর্থ। আর জ্বিহবা ব্যতীত অন্যকোনো অঙ্গ লাগার ক্ষেত্রে সেটা অন্যান্য সাধারণ নাপাকির মতই বিবেচিত হবে।

ইমাম নববী বলেছেন: এই বিশ্লেষণটি দলীলের দৃষ্টিতে যথাযথ ও শক্তিশালী। যেহেতু সাতবার ধৌতকরণ সম্পর্কে আদেশটি তাদেরকে কুকুরের সাথে আহার করার ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি করবে। যা অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

অধিক সম্ভাব্য সঠিক মত: দ্বিতীয় মতটি। তবে এই মতটা অধিক সঠিক, তবে অবশ্যই পূর্বে বর্ণিত অঙ্গগুলোকে নাপাক বিবেচনা করার ভিত্তিতে। অন্যথায় এই মতটি অধিক সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থেকে অনেক দূরে।

আর কুকুরের পেশাব: ইবনু মুনাইয়ির, এরপরে শাওকানী কুকুরের পেশাব নাপাক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাফেয এই বিষয়ের মতানৈক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর ইবনু তাইমিয়্যার মতটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন: যদি বলা হয়: পেশাব থুথু হতে অধিক পবিত্র, তাহলে এটা ভুল বিশ্লেষণ হবে। আমি বলব: এই কথা কুকুরের মলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

আর কুকুরের পশম: এটা পবিত্র। এই মতটিকে ইবনু তাইমিয়্যাহ অধিকাংশ আলেমের প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন এবং তিনি নিজে মতটিকে গ্রহণ করেছেন। যেই বিষয়ে তিনি বলেছেন: এই নীতির ভিত্তিতে: যদি কুকুরের পশম ভেজা থাকে এবং মানুষের কাপড়কে স্পর্শ করে, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। যেমনটি জমহুর ফকীহগণের মত। যেমন: আবু হানীফা, মালেক এবং একটি বর্ণনানুসারে আহমাদ। কারণ, শারীরিক বস্তুর ক্ষেত্রে মৌলিক অবস্থা হলো পবিত্র থাকা, ফলে কোনো বস্তুকে দলীল বিহীন নাপাক বলা জায়েয নেই।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/৫৭), আল মাজমূ' (২/৬০৪), আল ফাতহ (১/২৭৮), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (২১/৬১৬), আন নাইল (১/১৭৩), আশ শারহুল মুমতি' (১/৪১৬), আত তাওযীহ (১/১৩৭), আহকামুন নাজাসাহ (৬৭১) ।

যখন এক বা একাধিক কুকুর পাত্রে একাধিকবার মুখ দিবে তখন সমাধান কী?

ইমাম নববী শাফেয়ী আলেমগণের তিনটি মত উল্লেখ করেছেন:

প্রথম: এই মতটি তাদের নিকট সহীহ: সকল কুকুরের জন্যই সাতবার ধৌতকরণ যথেষ্ট। যেহেতু কোনো নাপাকির উপরে সমজাতীয় নাপাকি পতিত হওয়ার দ্বারা তাতে কোনো পরিবর্তন আসে না।

দ্বিতীয়: প্রত্যেক বার মুখ দেওয়ার বিপরীতে সাতবার করে ধৌত করতে হবে, যেকোনো একবার মাটি দ্বারা। যেহেতু উক্ত পাত্রের ক্ষেত্রে এই দাবি প্রয়োগ করা যায় যে, তাতে কুকুর মুখ দিয়েছে। সুতরাং এটা ঠিক ঐ পাত্রের মতই হলো, যেটাকে ধৌত করার পরে পুনরায় তাতে কুকুর মুখ দিয়েছে।

তৃতীয়: যখন একটি কুকুর একাধিকবার মুখ দিবে, তখন তার একাধিকবার মুখ দেওয়ার বিপরীতে মাত্র সাতবার ধৌতকরণই যথেষ্ট হবে। আর যদি কুকুরের সংখ্যা একাধিক হয়, তাহলে প্রত্যেকটি কুকুরের বিপরীতে সাতবার ধৌর করা ওয়াজিব হবে।

সঠিক মত: প্রথম মতটিই সঠিক। এটা মালেকী মাযহাবেরও একটি মত।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (২/৬০২), আল মাওসূআতুল ফিকহীয়্যাহ (৩৫/১৩০) ।

পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সেই পাত্রকে কতবার ধৌত করতে হবে?

প্রথম মত: পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সাতবার ধৌত করতে হবে, তার মধ্যে একবার মাটি দ্বারা ধৌত করতে হবে। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় মত: উক্ত পাত্র আটবার ধৌত করতে হবে। যার মধ্যে একবার মাটি দ্বারা ধৌত করতে হবে। এটা আহমাদের একটি বর্ণনা এবং দাউদের একটি বর্ণনা। যা হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাদের দলীল হলো: আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বর্ণিত হয়েছে: "সেটাকে (পাত্র) সাতবার ধৌত করো, আর অষ্টমবার সেটাকে মাটি দ্বারা পরিষ্কার করো"।

তৃতীয় মত: যুহরী বলেছেন: উক্ত পাত্রটি তিনবার ধৌত করাই যথেষ্ট হবে। আবু হানীফা বলেছেন: এমনভাবে ধৌত করতে হবে যে, পাত্রটি পবিত্র হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। যদি সেটা একবারে হয়, তাহলে তাই যথেষ্ট। একইভাবে আবু হানীফার নিকট অন্যান্য শারীরিক নাপাকিগুলোর অবস্থাও একই। তিনি বলেছেন: হুকমী নাপাকি তিনবার ধৌত করা ওয়াজিব। আবু হানীফার দলীল হলো: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: কুকুর মুখ দিয়েছে এমন পাত্রের ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সেটাকে

যেনো তিনবার ধৌত করা হয় অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার” এবং অন্যান্য সকল নাপাকির উপরে কিয়াসের ভিত্তিতে।

এই মতের উত্তর হলো: হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। যেহেতু এটা আব্দুল ওয়াহহাব বিন যাহহাক এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যা পরিত্যক্ত। আর কিয়াসটি দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক একটি কিয়াস। ফলে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যাবে না।

অগ্রাধিকারযোগ্য মত হলো: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৩০৫), আল মুগনী (১/৫২), আল মাজমূ’ (২/৫৯৭) ।

কোনো পাত্রকে কুকুরের মুখের ঝুটা থেকে মাটি দ্বারা পবিত্র করার পদ্ধতি কী?

প্রথম মত: শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট স্থানে মাটি নিক্ষেপ করাই যথেষ্ট নয়। বরং মাটিকে তরলের সাথে এমনভাবে মিশ্রিত করতে হবে, যাতে করে তরলটি মাটিকে পাত্রের সকল স্থানে পৌঁছে দেয়। এটাই শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অধিক সহীহ মত। তাদের দলীল হলো: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: “সাতবারের প্রথমবার মাটি দ্বারা”।

এখানে باء – অক্ষরটি সংযুক্তকরণ অথবা সহাবস্থানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমবার মাটির সাথে যুক্ত করে। সুতরাং ধৌতকরণের সমূহ উপাদানের মাঝে মাটিকে অন্তর্ভুক্ত করার দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, এই ক্ষেত্রে শুধু মাটি পাত্রে ছিটিয়ে দেওয়াকে ধৌতকরণ বলা যাবে না।

দ্বিতীয় মত: শুধুমাত্র মাটি ছিটিয়ে দেওয়াটাই যথেষ্ট হবে। এটা শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের দ্বিতীয় মত। তাদের দলীল হলো: আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বর্ণিত হয়েছে: “অষ্টমবার পাত্রটিকে মাটি দ্বারা পরিষ্কার করো”। তারা বলেছেন: এই বর্ণনাটি এই বিষয়ের দলীল যে, মাটিকে পানির সাথে মিশ্রিত না করেই শুধু মাটি দ্বারাই পাত্রকে পরিষ্কার করা যথেষ্ট হবে। যেখানে মাটিকে পানি থেকে পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি উপাদান বিবেচনা করা হয়েছে।

অগ্রাধিকারযোগ্য মত: প্রথম মতটি অগ্রাধিকারযোগ্য। যেহেতু হাদীসটি ঐ সকল শব্দে বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো হাদীসটির শব্দগুলোর মাঝে পূর্বে বিবৃত হয়েছে এবং হাফেযের বক্তব্যও অতিবাহিত হয়েছে। যেখানে তিনি বলেছেন: “আর সাতবারের প্রথমবার” এই বর্ণনাটি সংখ্যাধিক্য ও অধিক সংরক্ষিত হওয়ার ভিত্তিতে প্রাধান্য পাবে এবং অর্থের দিক থেকেও, যেহেতু শেষের ক্রম পরিষ্কারের জন্য আবারও ধৌত করার প্রয়োজনীয়তার দাবি রাখে।

দ্রষ্টব্য: আল ইহকাম (১/২৯), আল ইনছাফ (১/২২৫), আহকামুন নাজসাহ (৬৭৭) ।

যেই পানিতে কুকুর মুখ দিয়েছে সেটা দ্বারা পাত্র ধৌত করা কি জায়েয?

ইবনু মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ আল ইলাম গ্রন্থে (১/৩০৫) বলেছেন: যেই পানিতে কুকুর মুখ দিয়েছে সেটা দ্বারা কি পাত্র ধৌত করা যায়? এই বিষয়ে মালেকী মাযহাবে দুইটি মত রয়েছে। ইবনু বাশীর উভয় মত বর্ণনা করেছেন। মত দুইটির উৎস হলো ধৌত করার কারণের উপরে নির্ভরশীল। যদি কারণ নাপাকি হয়, তাহলে উক্ত পানি দ্বারা ধৌত করা যাবে না। আর যদি কারণ শুধুমাত্র ইবাদত হয়, তাহলে উক্ত পানি দ্বারা পাত্র ধৌত করা যাবে।

আমি বলব: সঠিক মত হলো: উক্ত পানি দ্বারা পাত্র ধৌত করা যাবে না।

উশনান গাছ বা সাবান কি মাটির বিকল্প হতে পারে?

প্রথমত উশনান (ক্ষার) হলো: অত্যন্ত চিকন ডাল বিশিষ্ট গাছ, যার ফলের দানাগুলো চিনির দানার ন্যায় ছোট হয় বা তার চাইতেও অধিক ছোট হয়। পূর্বের যুগে এর দ্বারা কাপড় ধৌত করা হতো। এটা মাটির মতই কঠিন শক্ত। পরিচ্ছন্নকারী ও ময়লা দূরকারী।

মাসআলার বিধান:

প্রথম মত: ক্ষার এবং সাবান এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং এগুলো ব্যতীত অন্যান্য পরিচ্ছন্নকারী পদার্থও এর স্থলাভিষিক্ত হবে। এটা হাম্বলী মাযহাব এবং শাফেয়ী মাযহাবের একটি মত। তাদের দলীল হলো: ক্ষার ও সাবান এবং এই জাতীয় বস্তু নাপাকি দূর করণের ক্ষেত্রে মাটি থেকেও অধিক কার্যকরী। তারা বলেছেন: যেহেতু সর্বপ্রকার (নাপাকি) বিলোপকারী জড় পদার্থের দ্বারা ইস্তিনজা করা জায়েয আছে অথচ নস (কুরআন হাদীসের দলীল) তো শুধুমাত্র পাথরের ব্যাপারে এসেছে। সুতরাং এখানেও একই দাবি প্রযোজ্য হবে।

দ্বিতীয় মত: মাটি (পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে) অত্যাবশ্যক। অন্যকোনো বস্তু মাটির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। এটা শাফেয়ীদের দ্বিতীয় মত। হাম্বলী মাযহাবের একটি মত। তারা এই বিষয়ে কয়েকটি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন:

১ – নস (কুরআন হাদীসের দলীল) যেহেতু মাটির ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাই সেটার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা ওয়াজিব।

২ – বড়ই পাতা ও ক্ষারের গাছ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি সেইদিকে ইশারা করেননি।

৩ – হয়তবা মাটিতে এমন কোনো পদার্থ আছে, যা কুকুরের লালা থেকে নির্গত জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম।

৪ – মাটি পবিত্রকারী দুইটি বস্তুর একটি। কারণ, পানির অনুপস্থিতিতে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে সেটা পানির স্থলাভিষিক্ত হয়।

তৃতীয় মত: মাটি না থাকা অবস্থায় জায়েয আছে অথবা মাটি নাপাক মিশ্রিত স্থানটিকে নোংরা করে ফেলবে এই আশঙ্কা থাকলে। যেমনঃ কুকুরের নাপাকি যদি কাপড় বা এই জাতীয় বস্তুতে লেগে যায়। এটা শাফেয়ী মাযহাবের তৃতীয় মত। এই মতটিই মূলত সঠিকতার সবচেয়ে নিকতবর্তী। এটা দ্বিতীয় মতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, যদি মাটি নেই বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে অন্যান্য পরিচ্ছন্নকারী বস্তুসমূহ ব্যবহার করা ব্যবহার না করার চাইতে অধিক উত্তম। অথবা যদি মাটি ব্যবহারের ফলে কোনো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন, পাত্র ব্যতীত কাপড় বা অন্যান্য বস্তু। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিজের ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এবং অন্যেরও ক্ষতি সাধন করা যাবে না" । আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/৫৩), আল মাজমূ' (২/৬০১), আল ইনছাফ (১/২২৫), আশ শারহুল মুমতি' (১/৪১৮), আহকামুন নাজাসাহ (৬৬৩) ।

যদি কুকুর পাত্রের পানি ব্যতীত অন্যকোনো পানিতে মুখ দেয় তাহলে এর বিধান কী?

নববী বলেছেন: যদি কুকুর অধিক পরিমাণ পানিতে মুখ দেয়, যেখানে কুকুরের মুখ দেওয়ার পরেও পানিতে দুই কুল্লার পরিমাণ হ্রাস হয়নি, তাহলে এর ফলে উক্ত পানি নাপাক হবে না। হাফেয বলেছেন: তাঁর বক্তব্য: "তোমাদের কারোর পাত্রে" এই কথার বাহ্যিক মর্ম থেকে বুঝা যায় যে, সকল পাত্রই এখানে উদ্দেশ্য। আবার এর তাৎপর্য উদাহরণস্বরূপ আবদ্ধ পানিকে বের করে দেয়। আওযাঈ সরাসরি এই মতটি পোষণ করেছেন। কিন্তু যখন আমরা বলব যে, ধৌতকরণ নাপাকি দূর করার জন্য, তখন বিধানটি অল্প পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, বেশি পানিতে নয়। আমি বলব: সারকথা হলো: পানি অল্প হোক বা বেশি হোক, যদি নাপাকির কারণে এর তিনটি বৈশিষ্ট্যের কোনো একটি পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে সেটা নাপাক হয়ে যাবে। অন্যথায় নাপাক হবে না। পূর্বে বর্ণিত ৫ নং হাদীসের অধীন মাসআলাসমূহ দ্রষ্টব্য।

দ্রষ্টব্য: আল বায়ান: (১/৪৩২), শারহু মুসলিম (২৭৯), আল মাজমূ' (২/৬০৫), আল ফাতহ (১/২৭৫) ।

যদি কুকুর শুকনা খাবারে মুখ দেয় তাহলে বিধান কী?

নববী বলেছেন: যদি কুকুর এমন পাত্রে মুখ দেয়, যেখানে শুকনা খাবার রয়েছে, তাহলে খাবারের যেই স্থানে তার মুখ লেগেছে, সেই স্থান এবং এর পাশের খাবারটুকু ফেলে দিবে। আর অবশিষ্ট খাবারকে পূর্ববর্তী পবিত্রতার উপরে বহাল আছে এটা মেনে নিয়ে ভোগ করবে। ঠিক যেমন জমাটবদ্ধ ঘির মাঝে ইঁদুর মারা গেলে করণীয়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। আমি বলব: ইমাম বুখারী যেই হাদীসটি (৫৫৪০) মায়মুনা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি

বলেছেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘির মাঝে পতিত ইঁদুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: "পতনের স্থান এবং এর পার্শ্ববর্তী স্থানের ঘি ফেলে দাও। আর অবশিষ্ট ঘি খাও"। হাদীসটি আহমাদ (৬/৩৩০) বর্ণনা করেছেন, নাসায়ী (৪২৫৯) বর্ণনা করেছেন। এবং তারা উভয়েই "জমাটবদ্ধ ঘি" এই কথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির (আহমাদ ও নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত) সনদ সহীহ।

দ্রষ্টব্য: আল বায়ান (১/৪৩৬), শারহু মুসলিম (২৭৯), আল মাজমূ' (২/৬০৫) ।

পাত্রে বিদ্যমান পানি ফেলে দেওয়ার বিধান

ইবনু মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যদি তিনি পাত্র ব্যবহারের ইরাদা না করতেন, তাহলে শাফেয়ীদের সঠিক মতানুসারে পাত্রের পানি ফেলে দেওয়া সুন্নাহ হতো। কেউ কেউ বলেছেন: পানি ফেলে দেওয়া ওয়াজিব; পূর্বের বর্ণনার বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে। কারণ, শর্তহীন আদেশ ব্যক্তিগত মতানুসারে ওয়াজিব হওয়ার দাবি রাখে। এটা অধিকাংশ ফকীহগণের মত।

আর প্রথম মতে, এটাতে সকল প্রকার নাপাকির সঙ্গে কিয়াস করা হয়েছে। কারণ, নাপাকিসমূহ ফেলে দেওয়া ওয়াজিব নয় এই বিষয়ে কারোর দ্বিমত নেই। আমি বলব: আবূ হুরায়রার হাদীস, যা লেখক বর্ণনা করেছেন, মুসলিমের কোনো কোনো বর্ণনায় এই বাক্যটি সংযোজিত হয়েছে: "সে যেনো উক্ত পানি ফেলে দেয়" যে অংশটি শায বলে বিবেচিত। যা আলী বিন মুসহির এককভাবে বর্ণনা করেছেন এবং একদল রাবীর বিরোধিতা করেছেন। যা হাদীসের শব্দের আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে।

দ্রষ্টব্য: আল ইলাম (১/৩০৮), শারহু মুসলিম (২৭৯), আল ফাতহ (১/২৭৫) ।

শুকরের দেহ (সত্তাগতভাবে) নাপাক নাকি পবিত্র?

প্রথম মত: পবিত্র। এটা মালেকের মাযহাব। আবু হানীফার একটি মত। এটাকে শাওকানী পছন্দ করেছেন। তাদের দলীল হলো: বস্তুর মূল অবস্থা হলো পবিত্রতা। বিধায় আমরা নাপাকির দাবি রাখে এমন স্পষ্ট সহীহ দলীল ব্যতীত কোনো বস্তু সত্তাগত নাপাক হওয়ার সিদ্ধান্ত দিতে পারি না। আর এখানে এমন কোনো দলীল নেই। আর শুকরের দেহের গোশত আহার করা হারাম হওয়ার বিষয়টি তার জীবদ্দশায় তার সত্তা নাপাক হওয়ার দাবি রাখে না। কারণ, গাধা, খচ্ছর ও বিড়াল আহার করা হারাম হওয়া সত্ত্বেও সহীহ মতানুসারে এগুলো সত্তাগতভাবে পবিত্র।

দ্বিতীয় মত: নাপাক। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। বরং শুকরের দেহ নাপাক হওয়ার ব্যাপারে ইবনু মুনযির আলেমগণের ইজমা' বর্ণনা করেছেন। যা নববী তার থেকে বর্ণনা

করেছেন। এই মতের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "অথবা শুকরের গোশত, কারণ, এটা নাপাক বস্তু" (আল আন'আম: ১৪৫)। একইভাবে আবু ছা'লাবা আল খুশানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস, তিনি বলেছেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আহলে কিতাবদের অঞ্চলে বসবাস করি। আমরা কি তাদের পাত্রে আহার করতে পারি? তিনি বললেন: "অন্য কোনো পাত্র না পেলে তাদের পাত্রে আহার করতে পারবে। তবে সেগুলো ধুয়ে নিবে। তারপরে আহার করবে"। হাদীসটি বুখারী (৫৪৭৮) ও মুসলিম (১৯৩০) বর্ণনা করেছেন। আর সহীহাইনের বাহিরে অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে: "আমরা আহলে কিতাবদের অঞ্চলে বসবাস করি, যারা শুকরের গোশত খায় এবং মদ পান করে"। কিন্তু শায়খাইনের এই অতিরিক্ত বাক্যটি বর্ণনা না করার কারণে এটি সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে মনে একটি শঙ্কা থেকে যায়। তারা আরো দলীল দিয়েছেন: বুরাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি পাশাখেলায় লিপ্ত হয়, সে যেনো তার হাতকে শুকরের গোশত ও রক্তের মধ্যে নিজের হাত রঞ্জিত করল"। হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন (২২৬০)।

প্রাধান্যযোগ্য মত হলো: এটা পবিত্র, প্রথম মতটি। আর দ্বিতীয় মতের পক্ষে আয়াত দ্বারা যে দলীল পেশ করা হয়েছে, তার সমাধান হলো: আয়াতটিকে হারাম সাব্যস্ত করণের প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। আর আয়াতটিতে বিদ্যমান সর্বনামটি কি পূর্বে বর্ণিত সকল বস্তুর দিকে ফিরবে নাকি শুধু শুকরের দিকে? এতদসত্ত্বেও

رجس – শব্দটি অনেকগুলো অর্থে ব্যবহার হয়। অন্যতম কয়েকটি অর্থ হলো: নোংরা, নিষিদ্ধ বস্তু, নিকৃষ্ট কাজ, শাস্তি, লা'নত, কুফর, শিরক, গুনাহ ও নাপাক।

আবু ছা'লাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "সেগুলোকে ধুয়ে নাও, এরপরে তাতে আহার করো"। হতে পারে ধৌতকরণের কারণ এই যে, কাফেররা মদ ও শুকরের গোশত জাতীয় অন্যান্য নিষিদ্ধ নাপাক বস্তু থেকে বেঁচে থাকত না। এই জন্যই সেগুলো ধৌতকরণের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর বুরাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটিতে বলা হয়েছে: সে যেনো নিজের হাতকে শুকরের গোশত ও রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করল। আর এই কথাটি শুকরের মৃত্যুর পরেই সাব্যস্ত হতে পারে। আর মৃত প্রাণী নাপাক নিঃসন্দেহে। নববী বলেছেন: শুকর তার জীবদ্দশায় সত্তাগতভাবে নাপাক এই বিষয়ে আমাদের নিকট কোনো স্পষ্ট দলীল নেই।

দ্রষ্টব্য: আত তামহীদ (১/৩২০), আল মাজমূ' (২/৫৮৬), লিসানুল আরাব, আন নিহায়াহ লি ইবনু আছীর (رجس – শব্দের আলোচনা), আস সায়লুল জাররার (১/১৪৩), আহকামুন নাজাসাহ (১১৫), সহীহু ফিকহিস সুন্নাহ (১/৮৬) ।

শুকরের ঝুটা কি নাপাক?

প্রথম মত: নাপাক। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। এই মতানুযায়ী শুকরের ঝুটা পাত্রে পতিত হলে সেটা কি কুকুরের ন্যায় সাতবার ধৌত করতে হবে, নাকি এর বিধান অন্যান্য নাপাকসমূহের ন্যায়। ইমাম নববী বলেছেন: আর শুকরের গোশত, এই সকল ক্ষেত্রে এর বিধান হলো কুকুরের ন্যায়। এটাই আমাদের মাযহাব। অধিকাংশ আলেমগণ এই বিষয়ে মত দিয়েছেন যে, শুকরের ঝুটার ক্ষেত্রে সাতবার ধৌত করার প্রয়োজন নেই। এটা শাফেয়ীর মত। আর এটা দলীলের ক্ষেত্রে শক্তিশালী।

দ্বিতীয় মত: পবিত্র। এটা মালেকী মাযহাবের মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মত। এই মতানৈক্যটি হুবহু শুকরের সত্তা নাপাক হওয়ার মতানৈক্যের মতোই: শুকর কি সত্তাগতভাবে পাক নাকি নাপাক?

সহীহ মত হলো: এটা পবিত্র। পূর্বে এই মাসআলাটি আলোচনা হয়েছে। দলীলসমূহের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (২৭৯), আহকামুন নাজাসাহ (৩২১) ।

গোশত খাওয়া বৈধ এমন প্রাণিসমূহের ঝুটা পবিত্র।

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যতজন আলেম থেকে আমরা ইলম সংগ্রহ করেছি, তাদের সকলের মতেই গোশত খাওয়া বৈধ এমন প্রাণিসমূহের ঝুটা পবিত্র। যাদের থেকে আমরা এই মতটি সংগ্রহ করেছি: ছাওরী, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক। এটা মদীনাবাসী, আহলুর রায় ও কূফাবাসীর মত।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৩১৩), আল মুগনী (১/৫০)।

কুকুর ও শুকর ব্যতীত সকল হিংস্র জন্তু ও সকল পশুর ঝুটার বিধান

প্রথম মত: পবিত্র। এটা রবিআহ, ইয়াহয়া বিন সাঈদ, আবুয যিনাদ, মালেকী ও শাফেয়ীদের মত। এটা উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "আপনি বলুন, আমার নিকট প্রেরিত অহীতে একজন আহারকারীর ক্ষেত্রে তার আহার্য বস্তুর মাঝে একমাত্র মৃত পশু বা প্রবাহিত রক্ত বা শুকরের গোশত ছাড়া — যেহেতু এটা অপবিত্র — আর কোনো বস্তুকে নিষিদ্ধ বলে পাই না। আল আন'আম: (১৪৫)।

আবু কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়ালের ক্ষেত্রে বলেছেন: "নিশ্চয় বিড়াল নাপাক। এটা তো তোমাদের ঘরে বিচরণকারী প্রানীসমূহের

একটি”। হাদীসটি আবু দাউদ (৭৫) এবং তিরমিযী (৯২) এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে শায়েখ আলবানী আল ইরওয়া গ্রন্থে (১/১৯১) বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় মত: নাপাক। এটা হাম্বলীদের মত। যারা গাধা ও খচ্চরের ঝুটা দ্বারা ওযূ করাকে মাকরূহ বলেছেন: ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, নাখঈ, শা'বী, হাসান, ইবনু সিরীন, আওযাঈ, ছাওরী ও আহলুর রায়। তাদের দলীল হলো:

ইবনু উমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো নির্জন মরুভূমিতে এবং পালাক্রমে হিংস্র ও গৃহপালিত পশুর যাতায়াত হয় এমন স্থানে বিদ্যমান পানি সম্পর্কে? তিনি বললেন: যদি পানি দুই কুল্লার সমপরিমাণ হয়, তাহলে সেটা নাপাক ধারণ করে না। অপর বর্ণনানুসারে: সেই পানিকে কোনো বস্তু নাপাক করতে পারে না। হাদীসটি সুনানের সংকলকগণ বর্ণনা করেছেন। শায়েখ আলবানী আল ইরওয়া গ্রন্থে (১/৬০) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। শাওকানী এই হাদীসটির উত্তর দিয়েছেন: হাদীসটিকে এই মর্মেই প্রয়োগ করা হবে। কারণ, এই জাতীয় পশুগুলোর পানির ঘাটে নিয়মিত আসা যাওয়া এই সম্ভাবনা তৈরি করে যে, হয়ত তারা সেখানে পেশাব ও মলত্যাগ করত। সুতরাং এই হাদীসে উক্ত পশুগুলোর ঝুটা নাপাক হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই।

গ্রহণযোগ্য মত: প্রথমটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৩০৮), ইখতিলাফুল উলামা লিল মারওয়াযী (২৬), আত তুহুর লি আবী উবাইদ (২৮৩), আল মাজমূ' (১/২২৩), আল ইনছাফ (১/২৪৫), আন নাইল (১/১৭৬), আহকামুন নাজাসাহ (৩০৯)।

كيفية الوضوء وفضيلته كما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه

উযূ করার পদ্ধতি ও এর ফযীলত: যেমন উসমান ইবনে আফ্ফান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন

৭. عَن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: "مَن تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".

৭. উসমান ইবনে আফফানের মুক্তদাস হুমরান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, তিনি একবার দেখলেন উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ওযূর পানি নিয়ে ডাকলেন। অতঃপর সেই পানি দিয়ে তিনি প্রথমে তিনবার দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে পাত্র থেকে পানি নিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন, তারপর তিনবার তার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। অতঃপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। তারপর (একবার) মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর তিনবার দুই পা টাখনুসহ ধৌত করলেন। তারপর বললেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এ ওযূর মতই ওযূ করতে দেখেছি। এরপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার এ ওযূর মত ওযূ করবে অতঃপর দু'রাকআত সালাত আদায় করবে, যে দু'রাকআতে সে অন্য কিছু চিন্তা করবে না মহান আল্লাহ তার পূর্বেকৃত সকল (ছোট) পাপ ক্ষমা করবেন। [সহীহ বুখারী হা/১৬৪, সহীহ মুসলিম হা/**২২৬, ১৯৩৪**।]

كيفية أخرى للوضوء مروي عن عمر بن يحي المازني

উযূর অন্যান্য পদ্ধতি যা উমার ইবনে ইয়াহইয়া আল মাযিনী রহি. হতে বর্ণিত

٨. عَن عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي الحَسَنِ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَن وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ التَوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّورِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا بِثَلاثِ غرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ، فَمَسَحَ بِهِمَا رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ–مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ " بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ". وَفِي رِوَايَةٍ "أَتَانَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَورٍ مِن صُفْرٍ ".

৮. আমর ইবনে ইয়াহইয়া আল মাযিনী রহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আমর ইবনে আবিল হাসান এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি পানি ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে আসতে বললেন। এরপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর ন্যায় ওযূ করে দেখালেন। তিনি পাত্র হতে উভয় হাতের ওপর পানি ঢাললেন, অতঃপর উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) তিনবার ধৌত করলেন। তারপর তিনি তার হাত পাত্রের মধ্যে দিলেন। অতঃপর তিনি তিন কোষ পানি দ্বারা তিনবার করে কুলি

করলেন, নাকে পানি দিলেন ও নাক ঝেড়ে ফেললেন। তারপর আবার তিনি তার হাতকে পাত্রের মধ্যে দিলেন। এরপর পানি নিয়ে তিনি তিনবার তার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তারপর তিনি তার হাত আবার পাত্রের মধ্যে দিয়ে পানি নিয়ে উভয় হাতের কনুইসহ দু'বার ধৌত করলেন। এরপর তার উভয় হাত পাত্রে দিয়ে হাত ভিজিয়ে তার মাথা এভাবে একবার মাসাহ করেন যে, উভয় হাতকে মাথার সম্মুখ ভাগ হতে পিছনে এবং পিছন দিক হতে সম্মুখে আনেন। তারপর তিনি তার দুই পা ধৌত করেন।

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি মাথার অগ্রভাগ হতে শুরু করে মাথার পিছনে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যান এরপর তিনি ফিরিয়ে যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে এনে ছেড়ে দেন। অন্য বর্ণনায় আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলে আমরা পিতল নির্মিত এক পাত্র পানি বের করে দিলাম। [সহীহ বুখারী হা/১৮৫, ১৮৬, ১৯২, ১৯৭ সহীহ মুসলিম হা/২১১, ২৩৫।]

ওযূর সময় বিসমিল্লাহ বলার বিধান

বিসমিল্লাহ'র কথা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। এরপরের হাদীসটিতেও উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর বিবরণ সম্বলিত সহীহ হাদীসগুলোতেও বর্ণিত হয়নি। অথচ দশের অধিক সংখ্যক সাহাবী থেকে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে ওযূতে বিসমিল্লাহ'র কথা বলা হয়েছে। সেই সকল হাদীসে আমরা দৃষ্টিপাত করে দেখেছি সেগুলো অত্যন্ত দুর্বল পর্যায়ের। যেগুলো সামষ্টিকরূপেও দুর্বল পর্যায় থেকে উন্নীত হতে পারেনি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

এই বিষয়ে আলেমগণের মতসমূহ:

প্রথম মত: বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। ওয়াজিব নয়। সুতরাং কেউ যদি স্বেচ্ছায় এটা পরিত্যাগ করে, তবুও তার ওযূ সহীহ হবে। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

দ্বিতীয় মত: বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। এটা ইসহাকের মত। ইমাম আহমাদের একটি বর্ণনা এবং যাহেরীদের মত।

তৃতীয় মত: এটা মুস্তাহাব নয়। এটা আবু হানীফা থেকে বর্ণিত একটি মত। এক বর্ণনায় ইমাম মালেক বলেছেন: এটা বিদআত। অপর বর্ণনায় তিনি বলেছেন: এটা মুবাহ। এটা পালন করা ও পরিত্যাগ করাতে কোনো ফযীলত নেই।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মত অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। ইমাম বুখারী এই মর্মে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন: "পরিচ্ছেদ: সর্বক্ষেত্রে এবং সহবাসের সময় বিসমিল্লাহ বলা সম্পর্কে"। এরপরে তিনি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস উল্লেখ করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি তাদের কেউ স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস

করার ইচ্ছা করে, তাহলে সে বলবে: বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শায়তানা”। হাদীসটি সামনে বর্ণিত হবে। লেখক হাদীসটি ৩১২ নম্বরে উল্লেখ করেছেন।

বিসমিল্লাহ'র শাব্দিক রূপ কী? এবং এটা কখন বলতে হয়?

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যখন এটা সাব্যস্ত হলো, তাহলে তাসমিয়াহ তথা বিসমিল্লাহ এর স্থানে অন্যকোনো বাক্য স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না। যেমন: জবাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত পশু জবাই করার ক্ষেত্রে, পানাহারের ক্ষেত্রে। বিসমিল্লাহ এর স্থান হলো নিয়্যাতের পরে তাহারাত এর সকল কাজের আগে। কারণ, বিসমিল্লাহ বলা তাহারাত এর ক্ষেত্রে ওয়াজিব; যাতে করে বিসমিল্লাহ সকল কাজের উপরেই প্রয়োগ হয়। যেমন জবাইয়ের পশুকে জবাই করারা সময় বিসমিল্লাহ বলতে হয়।

আমি বলব: এই মতটি প্রযোজ্য হবে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব সাব্যস্ত হলে। অন্যথায় যদি কেউ শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তথাপি কোনো সমস্যা নেই, কাজের মাঝখানে বলে নিলেই হবে।

আবুল ফারাজ বলেছেন: যদি ওযূর মাঝখানে কেউ বিসমিল্লাহ বলে, তাহলে সেটা যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায়, কারণ, সে ওযূর ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেছে বলে ধর্তব্য হবে। দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৩৬৭), আল মুগনী (১/১০৪), আল মাজমূ' (১/৩৮৫), আস সাইল (১/২১১)।

ঘুম থেকে উঠার সময় ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ওযূর শুরুতে দুই হাতের কবজি ধৌত করা মুস্তাহাব

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যতজন আলেম থেকে আমরা ইলম সংগ্রহ করেছি তারা সকলেই এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, ওযূর শুরুতে দুই হাত ধৌত করা সুন্নাহ। যা পালন করা মুস্তাহাব। এই বিষয়ে ওযূকারী স্বাধীন। চাইলে সে একবার ধৌত করবে। আবার চাইলে দুইবার ধৌত করবে। আর চাইলে তিনবারও ধৌত করতে পারবে। তবে আমার মতে তিনবার ধৌত করাটাই অধিক পছন্দনীয়।

আর যদি সে এটা না করে তার উভয় হাত ধৌত করার পূর্বেই সরাসরি তার হাত পাত্রে রাখে, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। চাই সে এটা ভুলবশত করুক অথবা ইচ্ছাকৃত করুক। যদি উভয় হাত পরিষ্কার থাকে।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ঘুম থেকে উঠার সময় ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা ওয়াজিব নয়। আমাদের জানামতে এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৩৭৫), আল মুগনী (১/৯৮)।

ঘুম থেকে উঠার পরে দুই হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করার বিধান কী?

প্রথম মত: যখন কোনো ব্যক্তি রাতের ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, তখন তার উভয় হাতের কবজিদ্বয় পাত্রে রাখার পূর্বেই ধৌত করা ওয়াজিব। এটা ইবনু উমার ও আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। এটা হাসান বাসরী, ইসহাক ও যাহেরীদের মত এবং আহমাদের একটি বর্ণনা। এই বিষয়ের দলীল পূর্বে বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু কর্তৃক বর্ণিত (৪ নং) হাদীসটি। সেখানে বলা হয়েছে: "যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, সে যেনো তার দুই হাত পাত্রে প্রবেশ করানোর পূর্বে তিনবার ধৌত করে নেয়। কারণ, তোমাদের মধ্যে কেউ এটা জানে না যে, তার হাত রাত্রে কোথায় স্পর্শ করেছে" ।

দ্বিতীয় মত: ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরে দুই কবজি পর্যন্ত ধোয়া মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। অর্থাৎ: হানাফী, শাফেয়ী, মালেকীদের মত ও আহমাদের একটি বর্ণনা। এই মতের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন তোমাদের চেহারা ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত করো। আর তোমাদের মাথা মাসাহ করো, এবং তোমাদের পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করো" (আল মায়িদাহ: ৬) ।

দলীল বিশ্লেষণ: আল্লাহ তা'আলা দুই হাতের কবজি পর্যন্ত ধৌত করার কথা উল্লেখ করেননি। যদি এটা ওয়াজিব হতো, তাহলে তিনি অবশ্যই উল্লেখ করতেন। এছাড়াও তারা বলেছেন: শারীরিক নাপাকির ক্ষেত্রে সংখ্যার শর্ত দেওয়াটা মুস্তাহাব হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মত। বাহ্যিক হাদীসের ভিত্তিতে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৩৭২), আল মুগনী (১/৯৮৯), আল মাজমূ' (১/৩৯০), আল ইলাম (১/২৪৯), আল ফাতহ (১/২৬৪), আশ শারহুল মুমতি' (১/১৭১) ।

এই বিধানটি দিবসের ঘুমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে?

প্রথম মত: এই মতটি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ রাতের ও দিবসের ঘুমের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তবে অধিকাংশ আলেমের মত এই বিধানের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। তাদের দলীল হলো: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণীর ব্যাপক মর্ম: "যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে (জাগ্রত হয়)" ।

দ্বিতীয় মত: নিষেধাজ্ঞা শুধু রাতের ঘুমের সঙ্গে নির্দিষ্ট। দিবসের ঘুমের সঙ্গে নয়। এটা আহমাদ ও দাউদের মত। তাদের দলীল হলো: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত

হাদীসের শেষে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য: “কারণ, সে জানে না, তার হাত কোথায় স্পর্শ করেছে”। আর প্রকৃত রাত্রিযাপন একমাত্র রাতেই হয়ে থাকে। হাফেয বলেছেন: আবু দাউদের একটি বর্ণনা অনুসারে – যেই সনদে মুসলিম হাদীস উল্লেখ করেছেন: “যখন তোমাদের কেউ রাতের ঘুম থেকে জেগে উঠে”। একইভাবে তিরমিযীও ভিন্ন আরেকটি সহীহ সনদে এটা উল্লেখ করেছেন। আবু আওয়ানাহ এর একটী বর্ণনা অনুসারে – যেই সনদে মুসলিম হাদীস উল্লেখ করেছেন: “যখন তোমাদের কেউ সকালে (ঘুম থেকে) উঠে ওযূর প্রস্তুতি গ্রহণ করে”।

সঠিকতার নিকটতম মত হলো: প্রথম মতটি। কারণ, হাদীসে বর্ণিত কারণ, আর তা হলো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী: “সে জানে না, তার হাত রাত্রে কোথায় স্পর্শ করেছে”। আর রাতের ঘুমকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঘটনার আধিক্যের কারণে। এমন মতই হাফেয উল্লেখ করেছেন। আর নববী সেটা গ্রহণ করেছেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৩৭২), আল মুগনী (১/৯৮), আল মাজমূ' (১/৩৯০), আল ফাতহ (১/২৬৩) ।

কোনো পানিতে হাত প্রবেশ করানো হলে সেই পানির বিধান কী?

ইমাম নববী বলেছেন: কোনো ব্যক্তি যদি নিজের হাত নাপাক কি না এই বিষয়ে সন্দেহ নিয়ে তা ধৌত করার পূর্বেই পানিতে প্রবেশ করায়, তাহলে সে মাকরুহে তানযীহ সংঘটিত করল। এর ফলে পানি নাপাক হবে না। বরং সেটা পবিত্র অবস্থায় থাকবে। সেটা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাও জায়েয আছে। এটা আমাদের মাযহাব এবং সকল আলেমগণের মাযহাব। তবে আমাদের মাযহাবের আলেমগণ হাসান বাসরী রহিমাহুল্লাহ থেকে একটি ভিন্ন মত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: এমন পরিস্থিতিতে পানি নাপাক হয়ে যাবে। যদি সেটা রাতের ঘুমের পরে হয়। এই মতটি ইসহাক বিন রাহওয়াইহ, মুহাম্মাদ বিন জারীর ও দাউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটা নিতান্তই দুর্বল মত। কারণ, পানি ও হাতের পবিত্রাবস্থাটাই আসল। ফলে সংশয়ের ভিত্তিতে সেটা নাপাক হতে পারে না। আর শরীআতের নীতিমালাও এই বিষয়ে একটি অপরটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে এমন কথা বলারও অবকাশ নেই যে, যাহেরী অবস্থার বিচারে হাত নাপাক বলে বিবেচিত হবে।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (১/৩৯০), আল ফাতহ (১/২৬৩) ।

দুই হাত ও দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার বিধান

লেখক কর্তৃত বর্ণিত উসমান ও আব্দুল্লাহ বিন যায়েদের হাদীসে আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার কথা নেই। এটা লাকীত বিন ছাবিরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"পূর্ণরূপে ওযূ করো। আঙ্গুলসমূহের মাঝে খিলাল করো। সিয়ামরত না হলে গড়গড়া করে কুলি করো"। আবু দাউদ (১৪২), তিরমিযী (৭৮৮), এছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থসমূহ। হাদীসটির সনদ সহীহ। আমাদের শায়েখ মুকবিল আল ওয়াদেঈ রহিমাহুল্লাহ রচিত 'সহীহুল মুসনাদ' গ্রন্থেও বিদ্যমান। تَخْلِيل – শব্দটি মূলত দুইটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান ফাঁকা জায়গাকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো: আঙ্গুলসমূহের মাঝে ফাঁকা রাখা এবং সেগুলোর মাঝে পানি পৌঁছে দেওয়া। তবে মাসআলার বিধানে কয়েকটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: ওযূতে হাত ও পাদ্বয়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা মুস্তাহাব। এটা হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মাযহাব।

দ্বিতীয় মত: দুই হাতের আঙ্গুলের মাঝে খিলাল করা ওয়াজিব। কিন্তু দুই পায়ের মাঝে সুন্নাহ। এটা মালেকী মাযহাবের মত।

তৃতীয় মত: দুই হাত ও দুই পায়ের ক্ষেত্রে ওয়াজিব। এটা মালেকী মাযহাবের একটি মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মত। এই প্রসঙ্গটি অবশিষ্ট থেকে যায় যে, হাদীসে আমর এর অর্থ পরিবর্তনকারী সূক্ষ্ম আর্দ্রতা, যা আঙ্গুলগুলোর মাঝে খিলাল ব্যতীতই পৌঁছে যায়। এর দ্বারাই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। ফলে সাবধানতার দাবি অনুযায়ী এটা মুস্তাহাব থেকে যায়। দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১০৮), আল মাজমূ' (১/৪৫৪), আত তাওযীহ (১/২১৮), আহকামুল ওযূ (১/২৭৫)।

আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার পদ্ধতি

মুস্তাওরিদ বিন শাদ্দাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওযূ করতে দেখেছি; তিনি ওযূ করার সময় দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা খিলাল করেছেন। আহমাদ (৪/২২৯), আবু দাউদ (১৪৮) আরো অন্যান্য লেখকগণ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সনদ দুর্বল। কারণ, এটা ইবনু লাহীআহ এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ওযূকারীর জন্য কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। চাইলে সে ডান হাত অথবা বাম হাতের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা খিলাল করতে পারে। যেহেতু এই দলীলটি সাব্যস্ত হয়নি। আর হাতের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করার নিয়ম হলো, একটিকে অপরটির মাঝে প্রবেশ করিয়ে তা খিলাল করবে। এই জন্য নয় যে, এই বিষয়ে কোনো দলীল আছে। কিন্তু এটা সহজ পদ্ধতি এই জন্য। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ’ (১/৪৫৫), আয যাদ (১৯৮), আশ শারহুল মুমতি’ (১/১৭৫), আহকামুল ওযূ (১/২৭৯) ।

কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার বিধান কী?

প্রথম মত: ওযূতে এবং ফরয গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব। এটা ইবনু মুবারাক, ইবনু আবী লায়লা, হাম্মাদ, ইসহাক এর মত। আহমাদ এর প্রসিদ্ধ মত। এবং আতা এর একটি বর্ণনা।

দ্বিতীয় মত: ওযূ ও গোসলে নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব। কুলি করা নয়।

তৃতীয় মত: কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া ওযূ ও গোসলে সুন্নাহ।

চতুর্থ মত: উভয়টি গোসলের ক্ষেত্রে ওয়াজিব, ওযূর ক্ষেত্রে নয়। এই মতগুলো সবই আলেমগণের একেকটি দলের মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মত; উভয়টিই উভয় ক্ষেত্রে ওয়াজিব।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যেহেতু পূর্ণাঙ্গরূপে যারাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর বর্ণনা দিয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কুলি করেছেন এবং নাকে পানি দিয়েছেন। আর উভয়টির উপরে তাঁর স্থায়ী আমল উভয়টি ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে দলীল। যেহেতু তাঁর কর্ম আল্লাহর কিতাবে আদিষ্ট ওযূর বিশদ ব্যাখ্যা হওয়ার উপযুক্ত।

আমি বলব: তিনি এখানে আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীকে উদ্দেশ্য করেছেন: “হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে” (আল মায়িদাহ: ৬)। আর আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীকেও: “তোমাদের চেহারাসমূহ (ধৌত করো)” (আল মায়িদাহ: ৬)। এই শব্দে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আরবদের মতে, চেহারা হলো এমন বস্তুর নাম, যা দ্বারা সরাসরি সাক্ষাৎ পরিচয় সংঘটিত হয়। তা ছাড়া দ্বিতীয় মতটিও শক্তিশালী। আর তা হলো শুধু নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব, কুলি করা নয়। যেহেতু এমন কিছু দলীল আছে, যেখানে নাকে পানি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন: “সে যেনো নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে নেয়”। পক্ষান্তরে কুলির আদেশ সংক্রান্ত হাদীসসমূহের সঠিকতার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৩৭৭), আবু উবাইদ রচিত আত তাহুর (৩৩৭), আল মুগনী (১/১১৮), আল মাজমূ’ (১/৪০০), তামবিহুল আফহাম (১/৩৬) ।

কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে পানি শেষ সীমায় পৌঁছানোর বিধান

লাকিত বিন ছাবিরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নাকে পানি দেওয়ার সময় পানি শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দাও। তবে তুমি সিয়ামরত হলে এটা করবে না"। হাদীসটির সনদ সহীহ। এর তাখরীজ দুইটি মাসআলার পূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে। আর মুবালাগাহ এর অর্থ হলো: কুলির ক্ষেত্রে: কণ্ঠনালীর শেষ সীমায় পানি পৌঁছে দেওয়া। আর নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে: পানি কণ্ঠনালীর শেষ সীমায় টেনে নেওয়া।

মসআলার বিধান: ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে পানি শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছানো সুন্নাহ, এতে কোনো দ্বিমত নেই। ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: মুখের সকল অংশে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয় এবং নাকের ভেতরের সকল অংশে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়। বরং এটা সিয়ামরত ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব মাত্র। আমরা এটাকে পবিত্রতা সংক্রান্ত সুন্নাহের তালিকায় উল্লেখ করেছি। আর যখন সে নিজ মুখে পানি পৌঁছে দিবে, তখন সে ঐ পানিটুকু গিলে নিতে পারবে। অথবা বাহিরে ফেলেও দিতে পারবে। কারণ, এর দ্বারা মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেছে।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (১/৩৯৬), আল মুগনী (১/২০), আহকামুল ওযূ (১/১৯৯) ।

নাকে পানি দেওয়ার পূর্বে কুলি করার বিধান

প্রথম মত: নাকে পানি দেওয়ার পূর্বে কুলি করা মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। কেউ কেউ এই বিষয়ে ইজমা' বর্ণনা করেছেন। ওযূর মাঝে ডান হাতকে বাম হাতের উপরে অগ্রগামী করার বিধানের ভিত্তিতে কিয়াসই তাদের দলীল। সুতরাং যেভাবে ডান হাতকে অগ্রগামী করা সুন্নাহ, একইভাবে এখানেও তাই হবে।

দ্বিতীয় মত: কুলিকে নাকে পানি দেওয়ার উপরে অগ্রগামী করা শর্ত। এটা শাফেয়ী মাযহাবের দুইটি মতের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ মত। নববী এই বিষয়ক মত দুইটি উল্লেখ করার পরে বলেছেন: উভয়টির মাঝে সবচেয়ে সহীহ মত হলো এটা শর্ত। বিধায় নাকে পানি দেওয়াকে কুলির পরেই হিসাবে রাখা হবে। আগে নয়। কারণ, উভয়টি ভিন্ন অঙ্গ। বিধায় উভয়টির মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা শর্ত। যেমন: মুখ ও হাতের মাঝে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। কারণ, মুখ ও নাক উভয়টিই চেহারার অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং উভয়টিই একই অঙ্গের অন্তর্ভূক্ত। আর উভয়টির মাঝে তারতীবের বিষয়টিকে শর্ত সাব্যস্ত করার জন্য দলীলের প্রয়োজন। অথচ এই প্রসঙ্গে এমন কোনো দলীল নেই।

আর "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকে পানি দেওয়ার উপরে কুলিকে অগ্রগামী করেছেন" মর্মে যেই বর্ণনা এসেছে, সেটা একটি কর্মপদ্ধতি মাত্র, যা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে

দলীল নয়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (১/৪০০), আহকামুল ওযূ (১/১৯৭) ।

কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার মাঝে কি বিরতি দেওয়া যাবে?

প্রথম মত: কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার মাঝে বিরতি দেওয়া মুস্তাহাব। এটা হানাফীদের মাযহাব, মালেকী মাযহাবের একটি মত, অধিকাংশ শাফেয়ীগণ এই মতকেই মান্য করেন। তারা এমন কিছু হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন, যেগুলোতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার মাঝে বিরতি দেওয়ার বর্ণনা রয়েছে। তবে উক্ত হাদীসসমূহ সাব্যস্ত হয়নি।

দ্বিতীয় মত: এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার কার্যকে একত্রে পালন করা মুস্তাহাব। এটা শাফেয়ী থেকে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত, হাম্বলীদের প্রসিদ্ধ মত। নববী ও ইরাকী এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই মতের দলীল হলো: লেখক কর্তৃক বর্ণিত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। সেখানে বলা হয়েছে: "এরপরে তিনি তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন এবং নাক ঝাড়লেন তিন অঞ্জলি পানি দ্বারা" এবং ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস। সেখানে বলা হয়েছে: "তিনি এক অঞ্জলি পরিমাণ পানি নিলেন, এরপরে তা দ্বারা কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন"। সহীহ বুখারী (১৪০) ।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১২০), আল মাজমূ' (১/৩৯৮), আহকামুল ওযূ (১/২২৩) ।

নাকে পানি দেওয়ার পরে নাক ঝাড়ার বিধান

প্রথমত إستنثار – শব্দটি মূলত نثر – থেকে নির্গত। অর্থ: ওযূকারী ব্যক্তি নাকে পানি নেওয়ার পরে উক্ত পানি ঝেড়ে ফেলে দেওয়া। অর্থাৎ নাকের বাতাস দ্বারা উক্ত পানি টেনে বের করে নিবে। ভেতরের ময়লা পরিষ্কার করার জন্য। এর ফলে নাকের বাতাস বের হয়ে আসবে। চাই হাতের সাহায্যে করা হোক বা হাতের সাহায্য ব্যতীত। ইমাম মালেকের থেকে উক্ত কর্মটি হাত ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু দ্বারা করা মাকরূহ। কারণ, এটা চতুষ্পদ জন্তুর কর্মের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তবে প্রসিদ্ধ মত হলো এটা মাকরূহ নয়।

মাসআলার বিধান:

প্রথম মত: এটা মুস্তাহাব, যা অধিকাংশ আলেমের বক্তব্য। বরং ইবনু মুলাক্কিন এটা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মতির কথা বর্ণনা করেছেন। জমহুর আলেমগণ এই বিষয়ক আদেশ

মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে দলীলের দিয়েছেন (আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণত) রিফাআহ বিন রাফে' রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা এর হাদীস (৮৫৮) দ্বারা।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কারোর সালাত পূর্ণাঙ্গ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে পরিপূর্ণভাবে ঐভাবে ওযূ না করে, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন"। হাদীসটির সনদ সহীহ। এখানে তিনি ওযূর পদ্ধতিকে ওযূর আয়াতের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে নাকে পানি দেওয়ার কথা উল্লেখ নেই। এই কথার উত্তর হলো: হতে পারে যে, আদেশ দ্বারা ওযূর আয়াতের চাইতেও বিস্তারিত কোনো আদেশের কথা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুকরণের আদেশ দিয়েছে, আর তিনিই হলেন আল্লাহর আদেশের ব্যাখ্যাকারী। আর পূর্ণাঙ্গভাবে নাবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এর ওযূকে বর্ণনাকারী কোনো রাবী নাকে পানি দেওয়ার কথা পরিত্যাগ করেননি। বরং কুলি করার কথাও কেউ বাদ দেননি।

দ্বিতীয় মত: ওয়াজিব। এটা ইবনু হাযমের মত। হাফেয বলেছেন: বাহ্যিক আদেশ থেকে মনে হয় এটা ওয়াজিব। সেই ভিত্তিতে নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে আদেশ আসার কারণে আহমাদ, ইসহাক, আবু উবাইদ, আবু ছাওর, ইবনু মুনযিরসহ যারা এটাকে ওয়াজিব হওয়ার দাবি করেছেন, তাদের বক্তব্য অনুসারে নাক ঝাড়াকেও ওয়াজিব বলতে হবে। যেহেতু এই ক্ষেত্রেও আদেশ বর্ণিত হয়েছে। আর মুগনীর লেখকের বক্তব্যের বাহ্যিক মর্ম অনুসারে তারা এটাকে ওয়াজিবই বলেছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মতটি। দলীল হলো: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত পূর্ববর্তী (৪) হাদীসটি। সেখানে বলা হয়েছে: "এরপরে যেন সে নাক ঝেড়ে নেয়"। শায়েখ ইয়াহয়া হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন: নাকে পানি দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো নাকের ভেতরের ময়লা ভিজানো এবং সেটাকে নরম করা। আর ময়লা বের করার উদ্দেশ্যে নাক ঝাড়াটা নাকে পানি দেওয়ার একটি ফলাফল মাত্র। সুতরাং কেউ যদি ময়লা দূর না করে শুধুমাত্র সেটা ভিজিয়ে রাখে, তাহলে এর দ্বারা উদ্দিষ্ট পরিচ্ছন্নতা অর্জন হবে না।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (১৯৮), আল ফাতহ (১/২৬২), আল ইলাম (১/২৬২) ।

কুলি করা নাকে পানি দেওয়া এবং চেহারা ধৌত করার মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষার বিধান

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ আল মুগনী গ্রন্থে (১/১২১) বলেছেন: উভয়টির মাঝে এবং চেহারার অন্যান্য অংশ ধৌত করার মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়। কারণ, উভয়টিই চেহারার অংশ। কিন্তু মুস্তাহাব হলো: চেহারা ধৌত করার পূর্বে উভয়টি দ্বারা শুরু করবে। কারণ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর বর্ণনা যারাই করেছেন,

সকলে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার মাধ্যমেই শুরু করেছেন। তবে সামান্য কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়েছে।

চেহারা ধৌত করা ওযূর একটি রুকন

এই বিষয়ের দলীল হলো: কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা'। কিতাবের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন তোমাদের চেহারা ধৌত করো" (আল মায়িদাহ: ৬)।

আর সুন্নার দলীল হলো: লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত উসমান ও আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এবং অন্যানুদের থেকে বর্ণিত হাদীস।

আর ইজমা' বর্ণনা করেছেন তহাবী, মাওয়ারদী, ইবনু রাশিদ, ইবনু কুদামা ও নববী।

দ্রষ্টব্য: শারহুল মাআ'নী (১/৩৩), আল হাবী (১/১০৭), আল বিদায়াহ (১/৩৯), আল মুগনী (১/১১৪), আল মাজমূ' (১/৪০৫) ।

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে চেহারার সীমা

খিরাকী রহিমাহুল্লাহ তার মুখতাছার ফিল ফিকহ গ্রন্থে বলেছেন: মাসআলা: চেহারা ধৌত করা। চেহারা হলো: যা মাথার চুলের উৎস থেকে শুরু হয়ে চোয়ালের দুই পাশের হাড় হয়ে নিচের দিকে থুতনি পর্যন্ত এবং দুই পাশে কানের লতি পর্যন্ত বিস্তৃত। কান এবং চোয়ালের মধ্যবর্তী গ্রন্থিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: চেহারা হলো: দৈর্ঘ্যে মাথার চুলের উৎস থেকে থুতনি পর্যন্ত এবং দুই চোয়ালের হাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। আর প্রস্থে এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত বিস্তৃত। স্বাভাবিক ব্যক্তিদের মাথার চুলের উৎসই এই ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে। যার ললাটে চুল উৎপন্ন হয়নি এবং যার চুল কপাল থেকে নিচে নেমে এসেছে তার চুল ধর্তব্য নয়। দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১১৪), আল মাজমূ' (১/৪০৫) ।

সম্পূর্ণ চেহারা ধৌত করা ওযূকারীর উপরে ওয়াজিব

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ আল মাজমূ' গ্রন্থে (১/৪১৬) বলেছেন: তাতিম্মাহ গ্রন্থের লেখক ও অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন: ওযূকারীর জন্য তার মাথা, ঘাড়ের একটি অংশ এবং থুতনির নিচের অংশ চেহারাসহ ধৌত করা ওয়াজিব। কারণ, এটা ব্যতীত সম্পূর্ণ চেহারা ধৌত করা সম্ভব নয়। যেমন সিয়ামের ক্ষেত্রে রাতের একাংশ পর্যন্ত অনাহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। যাতে করে সম্পূর্ণ দিবস সিয়ামের অন্তর্ভুক্ত হয়।

চুলের কলি ও কানের মধ্যবর্তী স্থানে বিদ্যমান শুভ্র খালি জায়গার বিধান

প্রথমত: জুলফির সংজ্ঞা: ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: 'ইযার (চুলের কলি) হলো: ঐ চুল, যা (ভ্রূর নিচে অবস্থিত) স্ফীত হাড়ের উপরে উৎপন্ন হয়, যেই হাড়টি কানের ছিদ্রের সাথে সংযুক্ত এবং ছিদ্রের পাশ দিয়ে কানের লতি পর্যন্ত নেমে যাওয়া অংশটি। আবু উমার দিবয়ান — আল্লাহ তা'আলা তাকে ছাওয়াব দান করুন — ভাষাবিদদের বক্তব্য উল্লেখ করার পরে বলেছেন: এর ফলে স্পষ্ট হলো যে, ভাষাবিদ ও ফকীহদের মতে 'আযার (জুলফি) হলো: ঐ চুল, যা দুই কানের পাশ দিয়ে ললাটের নিম্ন প্রান্ত থেকে (দুই চোখের বাহিরের কিনারা) চুলের কলির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। যা সাধারণত দাড়িবিহীন পুরুষের চেহারায় উৎপন্ন সর্বপ্রথম চুল হয়ে থাকে।

মাসআলার বিধান:

প্রথম মত: শুভ্র (কানের ছিদ্রপথ ও চুলের কলির মধ্যবর্তী) অংশটি চেহারার অন্তর্ভুক্ত। এই মতানুসারে উক্ত অংশটি ধৌত করা ওয়াজিব। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

দ্বিতীয় মত: চেহারার সীমা এক কলি থেকে অন্য কলি পর্যন্ত। এই মতানুসারে: কান ও কলির মধ্যবর্তী শুভ্র অংশটি ধৌত করা ওয়াজিব নয়।

তৃতীয় মত: দাড়িবিহীন ও দাড়িযুক্ত পুরুষের মাঝে পার্থক্য: দাড়িবিহীন ব্যক্তির জন্য চেহারার উভয় অংশই (কলি ও শুভ্র অংশ) ধৌত করতে হবে। কিন্তু দাড়িযুক্ত ব্যক্তির জন্য উভয়টি ধৌত করা ওয়াজিব নয়। এটি হানাফীদের মাঝে আবু ইউসুফের বক্তব্য। এই মতটি মালেক থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

অগ্রাধিকারযোগ্য মত: প্রথম মত, শুভ্র অংশটি চেহারার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, গালের ন্যায় এর দ্বারাও ব্যক্তির সাক্ষাৎ পরিচয় অর্জন হয়। আর যেহেতু এটা দাড়িবিহীন পুরুষ ও মহিলার ক্ষেত্রে চেহারার অন্তর্ভুক্ত, বিধায় দাড়িযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১১৫), আল মাজমূ' (১/৪০৭), আহকামুল ওযূ (১/৪৬১) ।

জুলফি কি মাথার অংশ নাকি চেহারার অংশ?

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আর জুলফি হলো: ঐ চুল, যা চুলের কলির উপরের অংশে বিদ্যমান। যা কানের শীর্ষপ্রান্তের সাথে সংযুক্ত। কানের শীর্ষদেশ থেকে সামান্য নিচে অবস্থিত। আর নাযাআহ হলো: মাথার দুই পাশে (কপালের প্রান্তে) অবস্থিত চুলমুক্ত স্থান, যেখানে এসে চুলের পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। উভয়টিই মাথার অংশ। আমাদের মাযহাবের আনেক আলেম জুলফির ক্ষেত্রে আরেকটি মত পোষণ করেছেন: এটা চেহারার অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু সেটা চুলের কলির সাথে সংযুক্ত। গালের প্রান্তসীমার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে এটা সহীহ নয়। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ শাফেয়ী পন্থি আলেমগণ থেকে

এই বিষয়ে তিনটি বিশ্লেষণ বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১১৫), আল মাজমূ' (১/৪১৭) ।

ছোট পবিত্রতার ক্ষেত্রে দাড়ি খিলাল করা এবং ত্বকের গোড়ায় পানি পৌঁছানো

প্রথমত: ঘন দাড়ির বাহ্যিক অংশ খিলাল করা ওয়াজিব এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। প্রশ্ন হলো: দাড়ির ভেতরের অংশ ধৌত করাও কি ওয়াজিব?

প্রথম মত: দাড়ির ভেতরের অংশ এবং এর নিচের ত্বক ধৌত করা ওয়াজিব নয়। এটা সাহাবা, তাবেঈন ও অন্যান্য অধিকাংশ আলেমের মত। এই মতের দলীল হলো: ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস সহীহ বুখারীতে (১৫৭) বর্ণিত হয়েছে: "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একবার করে ওযূ করলেন"। আর এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘন দাড়িবিশিষ্ট ছিলেন। আর মাত্র এক অঞ্জলি দ্বারা পানি কখনো ত্বক পর্যন্ত পৌঁছায় না।

দ্বিতীয় মত: ত্বক ধৌত করা ওয়াজিব। এটা মুযানী ও আবু ছাওর এর মত। এই মতের দলীল হলো: আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস: তিনি বলেছেন: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয গোসল করতেন, তখন দুই হাত ধৌত করতেন এবং সালাতের ন্যায় ওযূ করতেন। এরপরে গোসল করতেন। এরপরে নিজ হাত দ্বারা তাঁর চুল খিলাল করতেন। যখন তিনি নিশ্চিত হতেন যে, পানি তাঁর ত্বককে সিক্ত করেছে, তখন তিনবার মাথায় পানি ঢালতেন। এরপরে সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করতেন"। সহীহ বুখারী (২৭২), সহীহ মুসলিম (৩১৬) ।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দাড়ি খিলাল করার মর্মে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সামষ্টিকরূপে হাদীসগুলো হাসানের পর্যায়ে উন্নীত হয়। তবে দাড়ি ঘন হলে পানি ত্বক পর্যন্ত পৌঁছানো ওয়াজিব নয়।

আর দ্বিতীয় মতের বিশ্লেষণ হলো: আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস দ্বারা তাদের দলীল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এটা বলা যায় যে, এটা বড় পবিত্রতার ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর আমাদের আলোচ্য বিষয় ছোট পবিত্রতা। এখানে একটি আরেকটি থেকে ভিন্ন। কারণ, এটা সুবিধা ও শিথীলতার উপরে ভিত্তিশীল। তাই এখানে মাথায় মাসাহ করা, দুই মোজার উপরে মাসাহ করা এবং একবার একবার করে ওযূ করার ন্যায় সহজ বিধান রয়েছে।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৩৮২), আল মাজমূ' (১/৪০৮), আল মুগনী (১/১১৭), আশ শারহুল মুমতি' (১/১৭৩) ।

ঘন দাড়ি ও পাতলা দাড়ি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিয়ম

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ ঘন দাড়ি ও পাতলা দাড়ি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কয়েকটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন: প্রথম: মানুষ যেই দাড়িকে পাতলা বলে, সেটাই পাতলা। আর যেটাকে তারা ঘন বলবে, সেটা ঘন। দ্বিতীয়: যদি দাড়ির ত্বকের নিচে কোনো কসরত ছাড়াই পানি পৌঁছে যায়, তাহলে সেটা পাতলা দাড়ি। আর যেই দাড়ির ত্বকের নিচে কসরত ব্যতীত পানি পৌঁছায় না, সেটা ঘন। তৃতীয়: এই মতটি সহীহ। এই মতটিকে অকাট্যরূপে সঠিক বলেছেন ইরাকি আলেমগণ, বগবী ও অন্যান্য আলেমগণ। আর অন্যান্য আলেমগণ এটাকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

এটা শাফেয়ীর বক্তব্যের বাহ্যিক মর্ম: যেই দাড়ি পারস্পরিক আলোচনার মাজলিসে দর্শকের দৃষ্টি থেকে ত্বককে ঢেকে রাখে, সেটা ঘন। আর যেটা ত্বককে ঢেকে রাখতে পারে না, সেটা পাতলা দাড়ি। শেষ (সামান্য পরিবর্তনসহ) ।

শায়েখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: দাড়ি: হয়ত পাতলা হবে অথবা ঘন হবে। পাতলা দাড়ি হলো: যা ত্বককে ঢেকে রাখতে পারে না। এমন দাড়ি ধৌত করা এবং এর নিচের ত্বক ধৌত করা ওয়াজিব। কারণ, এই দাড়ির নিচের ত্বক যখন প্রকাশিত হয়ে গেল, তখন এটা চেহারার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। যা দ্বারা ব্যক্তির সাক্ষাৎ পরিচয় অর্জন হয়। আর ঘন দাড়ি হলো: যা ত্বককে ঢেকে রাখে। এমন দাড়ির শুধুমাত্র বাহ্যিক অংশটুকু ধৌত করা ওয়াজিব।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (১/৪০৯), আশ শারহুল মুমতি' (১/১৭২) ।

চেহারায় উৎপন্ন দাড়ি ব্যতীত অন্য চুল

প্রথম মত: চেহারায় উৎপন্ন দাড়ি এবং অন্য চুলের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন: মোচ, নিমদাড়ি, ভ্রূ ও এই জাতীয় চুল। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

দ্বিতীয় মত: শাফেয়ী ও কিছু হাম্বলী আলেমগণ এর মতে: দাড়ি ও অন্য চুলের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তারা দাড়ির ক্ষেত্রে ঘন দাড়ি ও পাতলা দাড়ির পার্থক্য বজায় রেখে অধিকাংশ আলেমের ন্যায় মত দিয়েছেন। আর দাড়ি ব্যতীত অন্য চুলের ক্ষেত্রে তারা সংশ্লিষ্ট চুলের ত্বক পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে পানি পৌঁছানোকে ওয়াজিব বলেছেন। চাই তা ঘন হোক বা পাতলা। ইমাম নববী বলেছেন: আমাদের মাযহাবের আলেমগণের মতে: চেহারায় এমন আট প্রকার চুলে রয়েছে, যেগুলো নিম্নবর্তী ত্বকসহ ধৌত করা ওয়াজিব। চাই তা ঘন হোক অথবা পাতলা হোক।

সেগুলো হলো: দুইদিকের ভ্রূ, মোচ, নিমদাড়ি, চুলের কলি, মহিলার দাড়ি, হিজড়ার দাড়ি, দুই চোখের লোম এবং চোয়ালের চুল। আমি বলব: তাদের দলীল হলো: এই চুলগুলো

সাধারণত নিম্নবর্তী ত্বককে ঢাকতে পারে না। আর যদি এমন চুলের ক্ষেত্রে নিম্নবর্তী ত্বক ঢাকার বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তাহলে সেটা অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হবে। যার সঙ্গে বিধানের কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। এটা ইবনু কুদামার পছন্দনীয় মত। এই বিষয়ে তিনি বলেছেন: আমাদের দলীল হলো: এটা এমন চুল, যা নিম্নবর্তী ত্বককে ঢেকে রাখে। যা পুরুষের দাড়ির সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। আর দু ভ্রূ, মোচ ও নিমদাড়ির ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতার দাবিটি গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এটাই স্বাভাবিক।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১১৬), আল মাজমূ' (১/৪১১), আহকামুল ওযূ (১/৪৭১) ।

দুই চোখের ভেতরের অংশ ধৌত করার বিধান

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: সর্বসম্মতিক্রমে দুই চোখের ভেতরের অংশ ধৌত করা ওয়াজিব নয়। তবে এটা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে দুইটি মত রয়েছে, উভয়টিই লেখক অর্থাৎ আল মুহাযযাব গ্রন্থের প্রণেতা আবু ইসহাক শিরাযী বর্ণনা করেছেন। উভয়টির মাঝে অধিকাংশ আলেমের নিকট সর্বাধিক সহীহ মত হলো: এটা মুস্তাহাব নয়।

আমি বলব: সহীহ মত হলো: মুস্তাহাব নয়। বরং এটা মাকরূহ। কারণ, এতে চোখের ক্ষতি রয়েছে। এটা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো করেননি। ওযূতেও না, ফরয গোসলেও না। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। শিরাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আমরা এখানে যেই আলোচনা উল্লেখ করলাম, সেটা চোখের ভেতরের অংশ ধৌত করার ব্যাপারে। তবে দুই চোখের কোণসমূহ ধৌত করা যায় এতে কোনো দ্বিমত নেই।

আমি বলব: مأق العينين – অর্থ হলো: চক্ষুদ্বয়ের ঐ কোণ, যা নাকের দিকে নেমে গেছে। যেখান থেকে অশ্রু ঝরে। অথবা চোখের অগ্রভাগ, বা শেষভাগ।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১১৯), আল মাজমূ' (১/৪০৪) ।

কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করা ওযূর একটি রুকন

এই বিষয়ের দলীল হলো: কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা'। কিতাবের দলীল: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন তোমাদের চেহারা ধৌত করো" (আল মায়িদাহ: ৬)।

সুন্নার দলীল: উসমান ও আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস, যা লেখক বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও অন্যান্যদের থেকেও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর বিবরণ সম্বলিত অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইজমা'র দলীল: ওযূতে দুই হাত ধৌত করার ব্যাপারে অনেক আলেমগণই ইজমা' বর্ণনা করেছেন। তাদের মাঝে অন্যতম হলেন: তাহাবী, ইবনু আব্দিল বার, ইবনু হাযম, ইবনু রুশদ, ইবনু কুদামা ও নববী এই বিষয়ে ইজমা' বর্ণনা করেছেন।

দ্রষ্টব্য: শারহুল মা'আনী (১/৩৩), আত তামহীদ (৪/৩১), আল ইসতিযকার (১/১৬৫), আল মারাতিব (১৮), আল বিদায়াহ (১/৪১), আল মুগনী (১/১২২), আল মাজমূ' (১/৪১৭) ।

ওযূর সময় দুই হাত কনুইসহ ধৌত করার বিধান

প্রথম মত: ওযূতে দুই হাত কনুইসহ ধৌত করা ওয়াজিব। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

দ্বিতীয় মত: হাতের কনুই ও পায়ের দুই গ্রন্থি ধৌত করা ওয়াজিব নয়। এটা আবু বকর বিন দাউদ, যুফার ও মালেকের মত। এখানে বর্ণিত মতানৈক্যটি মূলত আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর সাথে সম্পর্কিত: "কনুই পর্যন্ত" (আল মায়িদাহ:৬)। একইভাবে লেখক কর্তৃক বর্ণিত উসমান ও আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস। সেখানে বলা হয়েছে: "এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত"। প্রথম মতের প্রবক্তাগণ বলেন: বর্ণিত إلى – শব্দটি আসলে مع – অর্থাৎ সহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং দুই হাতের কনুই ধৌত করা ওয়াজিব। আর দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাগণ বলেন: বর্ণিত إلى – শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে শেষ সীমা বুঝানোর জন্য। সুতরাং দুই হাতের কনুই ধৌত করা ওয়াজিব নয়।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি, দুই হাতের কনুই ধৌত করা ওয়াজিব।

ইমাম কুরতুবী তার তাফসির গ্রন্থে (৬/৭৭) বলেছেন: আলেমগণ দুই হাতের কনুই হাত ধৌত করার সীমার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হবে কি না এই বিষয়ে মতানৈক্য করেছে। একদল বলেছেন: হ্যাঁ, অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, إلى – শব্দের পরবর্তী অংশ পূর্বের অংশের শ্রেণিভুক্ত। এটা সিবওয়াইহ ও অন্যান্যদের মত।

তিনি আরো বলেছেন (২/২৯৪): إلى – শব্দটি শেষ সীমা বুঝানোর জন্য। যখন এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের শ্রেণিভুক্ত হয়, তখন সেটা একই বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন তুমি বললে: اشتريت الفدان إلى حاشيته আমি ক্ষেতটি কিনেছি কিনারাসহ। অথবা: اشتريت منك هذه الشجرة إلى هذه الشجرة – আমি তোমার নিকট থেকে এই গাছটি এই গাছসহ কিনলাম। যেখানে পণ্য হলো গাছ। তাহলে পরের গাছটি পণ্যের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে। শেষ। এছাড়াও, সহীহ মুসলিমে (২৪৬) আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "এরপরে তিনি ডান হাত ধৌত করলেন। এমনকি বাহু পর্যন্ত পানি পৌঁছে দিলেন। এরপরে তিনি বাম হাত ধৌত করলেন। এমনকি বাহু পর্যন্ত পানি পৌঁছে দিলেন। এরপরে

মাথা মাসাহ করলেন। এরপরে ডান পা ধৌত করলেন। এমনকি পায়ের নলা পর্যন্ত পানি পৌঁছে দিলেন। এরপরে বাম পা ধৌত করলেন। এমনকি পায়ের নলা পর্যন্ত পানি পৌঁছে দিলেন। এরপরে বললেন: এভাবেই আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি ওযূ করতে"।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১২২), আল মাজমূ' (১/৪১৯), আল ফাতহ (১/২৯২) ।

যদি সম্পূর্ণ হাত বা হাতের কিছু অংশ কাটা থাকে

যদি কনুইয়ের উপরের দিকে কাটা থাকে, তাহলে এই ক্ষেত্রে ইবনু কুদামা বলেছেন: ধৌত করার বিধান অকার্যকর হয়ে যাবে; যেহেতু বিধান প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্র নেই। শিরাযী বলেছেন: যদি হাত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় এবং ফরয প্রযোজ্য হওয়ার ন্যায় কোনো ক্ষেত্র না থাকে, তাহলে তার ওপর কোনো ফরয প্রযোজ্য হবে না। নববী বলেছেন: এটা সর্বজন স্বীকৃত মত।

শিরাযী বলেছেন: মুস্তাহাব হলো: হাতের অবশিষ্ট অংশে পানি দ্বারা স্পর্শ করা। যাতে করে অঙ্গটি পবিত্রতা থেকে খালি না হয়।

আমি বলব: সঠিক মত হলো: এটা মুস্তাহাব নয়। যেহেতু এই বিষয়ে কোনো দলীল নেই। আর যদি হাতের আংশিক কাটা থাকে, তাহলে এই ক্ষেত্রে ইবনু কুদামা বলেছেন: যদি কনুইয়ের নীচ থেকে হাত কাটা থাকে, তাহলে অবশিষ্ট ফরয স্থানটুকু ধৌত করতে হবে। নববী বলেছেন: যদি ফরযের ক্ষেত্র সামান্য অবশিষ্ট থাকে, তাহলে সেই অংশটুকু ধৌত করা ওয়াজিব এতে কোনো দ্বিমত নেই।

আমি বলব: এর দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার এই বাণী: "তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো" (আত তাগাবুন: ৬)। আর আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন আমি তোমাদেরকে কোনো বিষয়ে আদেশ দিই, তখন সেটা সাধ্যানুযায়ী তোমরা পালনের চেষ্টা করো"। সহীহ বুখারী (৭২৮৮), সহীহ মুসলিম (১৩৩৭) ।

আর যদি হাত কনুইয়ের স্থান থেকে কাটা থাকে, তাহলে প্রথম মত হলো: যদি হাত গ্রন্থিজোড়া থেকে কাটা থাকে, তাহলে তার জন্য বাহুর মাথা ধৌত করা ওয়াজিব। এটা শাফেয়ী মাযহাবের একটি মত, হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত।

দ্বিতীয় মত: বাহুর মাথা ধৌত করা ওয়াজিব নয়। এটা শাফেয়ীদের দ্বিতীয় মত। মূলত উভয় মতের মতানৈক্য হলো কনুইয়ের ক্ষেত্রে। কেউ বলেছেন: কনুই হলো: দুইটি হাড়ের সন্ধিস্থল; হাতের বাহুর হাড় ও হাতের নলার হাড়। এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে বাহুর হাড় ধৌত

করা ওয়াজিব। কেউ কেউ বলেছেন: কনুই নলার হাড়। এই সংজ্ঞা অনুসারে বাহুর হাড় ধৌত করা ওয়াজিব নয়।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল বায়ান: (১/১২২), আল মুগনী (১/১২৩), আল মাজমূ' (১/৪২৩), আহকামুল ওযূ (২/৫০১) ।

কর্তিত দুই হাত বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি তাকে ওযূ করিয়ে দেওয়ার মত কাউকে না পায়

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যদি কোনো ব্যক্তির দুই হাত কর্তিত থাকে, আর সে এমন কাউকে পায়, যে তাকে স্বেচ্ছায় ওযূ করিয়ে দিবে, তাহলে তার জন্য ওযূ করিয়ে নেওয়া আবশ্যক। কারণ, সে সামর্থ্যবান। আর যদি পারিশ্রমিক ব্যতীত তাকে ওযূ করিয়ে দেওয়ার মত কাউকে না পায়, তাহলেও তার জন্য ওযূ করিয়ে নেওয়া আবশ্যক, ঠিক যেমন তার জন্য পানি ক্রয় করা আবশ্যক। ইবনু আকিল বলেছেন: তবে তার জন্য এটা আবশ্যক না হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন: কোনো ব্যক্তি সালাতে কিয়াম করতে অপারগ হয়ে গেল, তাহলে এমন অবস্থায় তাকে সালাতে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য কাউকে ভাড়া করাটা জরুরী নয়।

আমি বলব: সঠিক মত হলো: তার জন্য ওযূ করিয়ে নেওয়া আবশ্যক। তিনি (ইবনু কুদামা) রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আর যদি সে পারিশ্রমিক প্রদানে সক্ষম না হয় অথবা কাউক ভাড়া না পাওয়া যায়, তাহলে সে তার পরিস্থিতি অনুসারেই সালাত আদায় করবে। যেমন: পানি ও মাটি খুঁজে না পাওয়া ব্যক্তি। আর যদি সে ওযূ করিয়ে দেওয়ার মত কাউকে না পায়, কিন্তু তায়াম্মুম করিয়ে দেওয়ার লোক পায়, তাহলে তার জন্য তায়াম্মুম করিয়ে নেওয়া আবশ্যক। যেমন: পানি খুঁজে না পাওয়া ব্যক্তি যদি মাটি খুঁজে পায়। এটা শাফেয়ী মাযহাব। এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই।

দ্রষ্টব্য: আল বায়ান (১/১২৩), আল মুগনী (১/১২৩), আল মাজমূ' (১/৪২৫) ।

যদি নখের নিচে এমন ময়লা থাকে যা নখের গোড়ায় পানি পৌঁছাতে বাধা দেয়

প্রথম মত: এমন ময়লা সর্বক্ষেত্রে দূর করা ওয়াজিব। এমন ময়লা থাকা অবস্থায় ওযূ সহীহ হবে না। শাফেয়ীদের মধ্যে মুতাওয়াল্লী, হাম্বলীদের মধ্যে ইবনু আকিল এই মত পোষণ করেছেন। তাদের দলীল হলো: হাতের একটি অংশ মূল হাতের অংশ নয় এমন বস্তু দ্বারা এমনভাবে ঢেকে গেছে যে, সেখানে পানি পৌঁছানো সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও পানি পৌঁছানোর পথে বাঁধা দিচ্ছে। ফলে এর উপরে মোম বা এই জাতীয় অন্য কোনো বস্তু থাকলে যেমন

হতো, ঠিক তেমনি হয়েছে। কারণ, এই ময়লা যদি দেহের অন্য কোনো স্থানে থাকত, তাহলে পবিত্রতা অর্জিত হতো না।

দ্বিতীয় মত: এমন ময়লা দূর করা কোনো ক্ষেত্রেই ওয়াজিব নয়। এই মতটা মার্জনার যোগ্য। এটা শাফেয়ীদের মধ্যে গাযালী গ্রহণ করেছেন। ইবনু কুদামা এই মতের দিকে ঝুঁকেছেন। তাদের দলীল হলো: অহির যুগে অধিকাংশ বেদুঈনরা এটাকে গুরুত্ব দিত না। এরপরেও কোনো হাদীসে সালাত পুনরাবৃত্তির আদেশ সম্পর্কিত কোনো বিধান বর্ণিত হয়নি। যদি এটা ওয়াজিব হতো, তাহলে অবশ্যই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়টি বর্ণনা করতেন। যেহেতু কোনো সমস্যার বিধান বর্ণনা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনের সময় থেকে দেরিতে করা জায়েয নেই। তারা আরো বলেছেন: যেহেতু এমন ময়লা থেকে বেঁচে থাকাও কষ্টকর।

তৃতীয় মত: যদি নখের নিচের ময়লা সামান্য হয়, তাহলে সেটা ক্ষমার যোগ্য। আর যদি অধিক পরিমাণ হয়, তাহলে সেটা দূর করা ওয়াজিব। এটা মালেকী মাযহাব। হাম্বলী মাযহাবের একটি মত। ইবনু দাকিকিল ঈদ এই মতটির প্রতি ধাবিত হয়েছেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন: যদি নখের সামান্য ময়লা বা এই জাতীয় বস্তু পানি পৌঁছতে বাঁধা দেয়, তাহলে পবিত্রতা সহীহ হবে। এটা আমাদের মাযহাবের আলেমগণের একটি মত। একইভাবে সর্বপ্রকার সামান্য বস্তু যদি পানি পৌঁছাতে বাঁধা দেয় যেমন, রক্ত ও আটার খামীর ইত্যাদি, তাহলেও পবিত্রতা সহীহ হবে।

সঠিক মত: তৃতীয় মত। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৩৪), আল মাজমূ' (১/৩৪০), আল ইহকাম (১/৮৫), সুনানুল ফিতরাহ (২৫৯)।

মাথা মাসাহ করা ওযূর একটি রুকন

এই বিষয়ের দলীল হলো: কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা'।

কিতাবে দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করো" (আল মায়িদাহ: ৬)।

আর সুন্নার দলীল হলো: লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত উসমান ও আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস। অন্যান্যদের থেকেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

ইজমা'র দলীল হলো: মাওয়ারদী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: মাথা মাসাহ করা কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা' এর দ্বারা সাব্যস্ত ওয়াজিব। একইভাবে এই ইজমা' তহাবী, ইবনু আব্দিল বার, ইবনু রুশদ, ইবনু কুদামা, নববী ও অন্যান্য আলেমগণ বর্ণনা করেছেন।

মাথার যতটুকু অংশ মাসাহ করা ওয়াজিব

প্রথম মত: প্রত্যেকের জন্যই সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ওয়াজিব। ইমাম মালেক, ইবনু উলাইয়াহ, আহমাদ, মুযানী এই মত পোষণ করেছেন। এই মতের দলীল হলো: পূর্বোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করো" (আল মায়িদাহ: ৬)। এখানে برءوسكم – শব্দে বিদ্যমান باء – অক্ষরটি সংযুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আংশিক পরিমাণ অর্থে নয়। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তারা যেনো প্রাচীন এই ঘরের তাওয়াফ করে" (আল হাজ্জ: ২৯)। এটা জানা কথা যে, তাওয়াফ কখনো বায়তুল্লাহর আংশিক স্থান জুড়ে করলে তা জায়েয হবে না। একইভাবে তারা আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করেছেন, যা লেখক উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "এরপরে তিনি নিজের দুই হাত প্রবেশ করালেন, আর উভয়টি দ্বারা নিজের মাথা মাসাহ করলেন। একবার মাথার সামনে থেকে পেছন পর্যন্ত আরেকবার পেছন থেকে সামনে পর্যন্ত উভয় হাত দ্বারা মাথা মাসাহ করলেন। অপর বর্ণনায়: তিনি মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে ঘাড়ের পেছন পর্যন্ত দুই হাত টেনে আনলেন। এরপরে আবার উভয় হাত তিনি আগের স্থান পর্যন্ত টেনে আনলেন, যেখান থেকে মাসাহ শুরু করেছিলেন। এই হাদীসটি: উক্ত আয়াতে বিদ্যমান মুজমালের ব্যাখ্যা। আয়াতটি হলো: "তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করো" (আল মায়িদাহ: ৬)।

দ্বিতীয় মত: মাথার আংশিক অংশ মাসাহ করার দ্বারা মাসাহ যথেষ্ট হবে। এটা ইবনু উমার থেকে বর্ণিত। হাসান আল-বাসরী, ছাওরী, দাউদ, আবু হানীফার মত। এটা শাফেয়ীদের মাযহাব। শাফেয়ীগণ আংশিকের ব্যাখ্যায় বলেছেন: আংশিকের ব্যাখ্যা হলো, এতটুকু অংশ, যা মাসাহ করলে মাসাহ বলা যায়। যদিও সেটা পরিমাণে সামান্য হোক। আবু হানীফা বলেছেন: মাথার এক চতুর্থাংশ। অপর বর্ণনায়: তিন আঙ্গুল দ্বারা তিন আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা মাসাহ করবে। তার থেকে আরেকটি বর্ণনা র য়েছে: কপালের সমপরিমাণ জায়গা মাসাহ করবে। এই মতের দলীল হলো: মুগিরাহ বিন শু'বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে: সেখানে বলা হয়েছে: "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করছিলেন, তখন তিনি মাথার অগ্রভাগের চুলের উপরে মাসাহ করলেন এবং পাগড়ির উপরে এবং দুই মোজার উপরে মাসাহ করলেন"। সহীহ মুসলিম (২৭৪) ।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি, আর সেটা হলো তাদের পেশকৃত দলীলটি 'আম সাব্যস্ত করা। আর দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাদের দলীলের দাবির উত্তর হলো: তিনি শুধুমাত্র মাথার অগ্রভাগের চুলের উপরেই মাসাহ সীমাবদ্ধ করেননি। বরং এর সাথে তিনি পাগড়ির উপরেও মাসাহ করেছেন।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (১/৪৩১), তাফসীরুল কুরতুবী (৬/৮৭), আল ইসতিযকার (১/১৬৬), (২/৩০০), আল আওসাত (১/৩৯৩), আল ফাতাওয়া (২১/১২২) ।

মাথা কি একাধিকবার মাসাহ করা যায়?

প্রথম মত: একাধিকবার মাথা মাসাহ করা যাবে না। বরং একবারই মাত্র মাসাহ করা যায়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো:

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত অনেকগুলো হাদীস এবং বুখারীর বাহিরে অন্যান্য গ্রন্থের হাদীসসমূহ, যেগুলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর বিবরণ সম্বলিত। সেখানে মাসাহ করার ক্ষেত্রে একাধিকবারের কথা নেই। সেগুলোর মাঝে অন্যতম কিছু হাদীস হলো: যা লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ উসমান, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। আবু দাউদ (১১১)। যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর বিবরণ সম্বলিত।

সেখানে বলা হয়েছে: "এরপরে তিনি একবার মাথা মাসাহ করলেন"। হাদীসটির সনদ সহীহ। এটা আমাদের শায়েখ রচিত সহীহ মুসনাদে (৯৬৯) বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: তিনবার মাসাহ করা মুস্তাহাব। এটা শাফেয়ীদের মাযহাব, আহমাদের একটি বর্ণনা। তাদের দলীল হলো: যেই হাদীসগুলোতে একাধিকবার মাসাহ করার বিবরণ এসেছে। তবে সেগুলো দুর্বল। অথবা গায়রে মাহফুয হাদীস। এমন হাদীস, যা তুলনামূলক নিম্নস্তরের সিকাহ রাবী তার চাইতে অধিক সিকাহ রাবীর বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা করেছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি, যা ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু কাইয়িম ও শাওকানী পছন্দ করেছেন।

ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এটা মাসাহ, আর মাসাহের মাঝে তাকরার তথা একাধিক্যতা সুন্নাহ নয়। যেমন: মোজার উপরে মাসাহ করা, তায়াম্মুমে মাসাহ করা, যখমের পট্টির উপরে মাসাহ করা। আর মাসাহের পরে পুনরায় মাসাহ করার চাইতে মাসাহ করার পরে পুনরায় ধৌত করাটাই অধিক উত্তম। কারণ, মাসাহ যখন একাধিকবার করা হয়, তখন সেটা ধৌত করার পর্যায়ে চলে যায়।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১২৭), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (২১/১২৬), আয যাদ (১/১৯৩), আন নাইল (১/৪৫৯) ।

মাথার উপরে মাসাহ করার পদ্ধতি

শিরাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: মুস্তাহাব হলো: সম্পূর্ণ মাথা এই পদ্ধতিতে মাসাহ করা: দুই হাতের অঞ্জলিতে পানি নিবে। এরপরে সেটাকে ফেলে দিবে। তারপরে একটি তর্জনী আঙ্গুলকে অপর তর্জনী আঙ্গুলের সাথে মিলিয়া ধরবে। এরপরে উভয়টিকে মাথার অগ্রভাগের উপরে রাখবে। আর একই সময়ে উভয় বৃদ্ধাঙ্গুল মাথার দুই পাশের জুলফির হাড়ের উপরে রাখবে। এরপরে উভয় আঙ্গুল টেনে ঘাড়ের পিছন পর্যন্ত। এরপরে উভয় আঙ্গুল টেনে আবার আগের স্থান পর্যন্ত নিয়ে আসবে, যেখান থেকে মাসাহ শুরু করেছিল।

এরপরে তিনি আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যা লেখক উদ্ধৃত করেছেন। এরপরে তিনি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যেহেতু মাথার চুলের উৎপন্নস্থল ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং আঙ্গুল টানার সময় ঐ অংশের চুল সামনে রাখবে, যা মাথার অগ্রভাগে অবস্থিত। ফলে মাসাহ এর প্রয়োগ চুলের অভ্যন্তরে হবে। উপরে নয়। মাথার পিছনের ভাগ থেকে মাসাহ শুরু করবে না, তাহলে মাসাহ শুধু চুলের উপরেই হবে। যখন তার দুই হাত ফিরিয়ে আনবে, তখন যাওয়ার পথে চুলের যেই অংশে মাসাহ হয়নি, সেই অংশেও মাসাহ হয়ে যাবে।

নববী বলেছেন: লেখক এখানে যেই পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন, তা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে সকলেই একমত। এটার ভিত্তি হলো উক্ত হাদীসটি এবং ঐ অর্থ যা তিনি উল্লেখ করেছেন। আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেছেন: মাথার অগ্রভাগ থেকে পিছন ভাগ পর্যন্ত যাওয়া এবং পুনরায় সামনের দিকে ফিরে আসা উভয়টিকে 'একবার মাসাহ' গণনা করা হবে।

দ্রষ্টব্য: আল বায়ান (১/১২৫), (আল মাজমূ' (১/৪৩৩) ।

যদি সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা উদ্দেশ্য হয় কিন্তু সামান্য অংশ বাদ পড়ে যায় তাহলে কোনো সমস্যা নেই

ইবনু আব্দিল বার আল ইসতিযকারে (২/২৬) বলেছেন: তা ছাড়া তারা এই বিষয়ে ইজমা' করেছেন যে, সামান্য অংশ যদি উদ্দেশ্যহীনভাবে বাদ পড়ে যায়, তাহলে সেটা ক্ষমার যোগ্য, এতে ওযূকারীর ওযূর কোনো ক্ষতি হবে না।

পাগড়ির উপরে মাসাহ করার বিধান

প্রথম মত: পাগড়ির উপরে মাসাহ করা এবং এর উপরেই মাসাহ সীমাবদ্ধ করা জায়েয। এটা উমার বিন আব্দুল আযীয, হাসান, কাতাদাহ, মাকহুল থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটা ছাওরী ও আওযাঈর মত। হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। এটা যাহেরীদের মাযহাব।

ইবনু মুনযির বলেছেন: যারা এই এভাবে মাসাহ করেছেন তাদের মাঝে অন্যতম হলেন: আবু বকর ছিদ্দীক, উমার বিন আল-খাত্তাব, আনাস বিল মালেক, আবু উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। এটা সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাছ ও আবুদ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে।

এই মতের দলীল হলো: মুসলিমে বর্ণিত মুগিরার হাদীস, যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে এবং 'আমর বিন উমাইয়াহ আদ্ব দ্বামরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। যা বুখারীতে (২০৪) বর্ণিত হয়েছে: "আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তাঁর পাগড়ি ও দুই মোজার উপরে মাসাহ করতে"। আর বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে মুসলিমে (২৭৫) বর্ণিত হয়েছে: তিনি বলেছেন: "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় মোজা এবং খিমারের উপরে মাসাহ করেছেন"। এখানে خمار – শব্দটি দ্বারা আসলে পাগড়িকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, একজন ব্যক্তি তার পাগড়ি দ্বারা মাথা ঢাকে। আবু দাউদে (১৪৬) ছাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, যা সহীহ। হাদীসটি আমাদের শায়েখ রহিমাহুল্লাহ এর সহীহ মুসনাদে (১৯৪) বর্ণিত হয়েছে এবং সালমান এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটা দুর্বল। আর আবু তালহার হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে: "দুই মোজা এবং পাগড়ির উপরে মাসাহ করা"। এই বিষয়ে আবু বকর, উমার, আনাস, ও আবু উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে আসার বর্ণিত হয়েছে। যেগুলোর কিছু সনদ সহীহ।

দ্বিতীয় মত: পাগড়ির উপরে মাসাহ করা জায়েয নেই। এটা নাখঈ, শা'বী, কাসিম, হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও অন্যান্যদের মত। তাদের দলীল হলো এই আয়াতটি: "তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করো" (আল মায়িদাহ: ৬)। প্রকৃত মাসাহ পানি দ্বারা সংশ্লিষ্ট বস্তুকে স্পর্শ করানোর দ্বারা সংঘটিত হয়। ইবনু আবি শায়বাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে (১/২৯) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন: "তিনি পাগড়ির উপরে মাসাহ করতেন না"। একইভাবে উক্ত গ্রন্থে জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে: তিনি মাথাকে পানি দ্বারা স্পর্শ করানোর আদেশ দিয়েছেন। বর্ণনাটির সনদ সহীহ। আয়াতটির উত্তরে বলা যায়: আয়াতটি জায়েয হওয়ার মতকে নাকচ করে না। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার কালামের ব্যাখ্যাকারী, তাফসীরকারী।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটিই প্রাধান্যযোগ্য পূর্ববর্তী দলীলগুলোর কারণে। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৪৬৬), আল মুগনী (১/৩০০), আল ফাতহ (১/৩০৯), আন নিহায়াহ লি ইবনিল আছীর (২৮৫), আহকামুল মাসাহ আলাল হায়িল (৪৯৯) ।

পাগড়ির উপরে মাসাহ করার জন্য কি পাগড়ি নির্দিষ্ট কোনো গঠনের উপরে থাকা শর্ত?

প্রথম মত: পাগড়ির উপরে মাসাহ করা জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হলো: থুতনির নিচের তালুসহ সমগ্র মাথাকে বেষ্টনকারী ও আচ্ছাদনকারী হতে হবে। তবে স্বাভাবিকরূপে কিছু অংশ খোলা রাখা যেতে পারে। এটা হাম্বলীদের মাযহাব। তাদের দলীল হলো: ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য, যেখানে তিনি বলেছেন: পাগড়ির উপরে মাসাহ করা জায়েয হওয়ার অন্যতম একটি শর্ত হলো: পাগড়িটা সাধারণ মুসলিমদের পাগড়ির আদলে হতে হবে। অর্থাৎ থুতনির নিচে অন্য কোনো বস্তু থাকতে হবে। কারণ, এটা আরবদের পাগড়ি। এমন পাগড়িগুলো অন্যান্য পাগড়ির চাইতে অধিক আবরণ বিশিষ্ট। এমন পাগড়িগুলো খোলা কঠিন।

আর যদি পাগড়িটা একটি শামলা (ঝুলন্ত প্রান্ত) বিশিষ্ট হয়, কিন্তু থুতনির নিচের তালুসহ সমগ্র মাথাকে বেষ্টনকারী না হয়, তাহলে এমন পাগড়ির উপরে মাসাহ করার ক্ষেত্রে হাম্বলীদের দুইটি মত রয়েছে: এক: জায়েয। যেহেতু এই পাগড়িটা যিম্মিদের পাগড়ির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। কারণ, তাদের রীতিতে শামলার প্রচলন নেই। দুই: জায়েয নেই। কারণ, এটা ‘আম নাহির অন্তর্ভুক্ত। এমন পাগড়ি খোলা কঠিন নয়।

দ্বিতীয় মত: এটা শর্ত নয়। এটা ইবনু তাইমিয়্যার মত। যা ইবনু উসাইমীন গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল হলো: পাগড়ি থুতনিসহ গোটা মাথাকে বেষ্টনকারী হওয়া অথবা একটি শামলা বিশিষ্ট হওয়া শর্ত নয়। বরং নস (কুরআন হাদীসের দলীল) শুধুমাত্র পাগড়ির ক্ষেত্রেই এসেছে। দলীলে অন্য কোনো শর্তের কথা বলা হয়নি। যখনই পাগড়ি হওয়া সাব্যস্ত হবে, সেটার উপরে মাসাহ করা জায়েয হবে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মত: এটা শর্ত নয়।

মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ইবনু কুদামা যেই শর্তগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো কোনো সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে বলে আমি দেখিনি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/৩০১), মাজমূ‘উল ফাতাওয়া (২১/১৮৬), আল ইখতিয়ারাত (১৪), আল ইনছাফ (১/১৩৯), তুহফাতুল আহওয়াযি (১/৩৪৮), শারহুল বুলুগ লি-ইবনি উসাইমীন (১/৩১৮)।

সম্পূর্ণ পাগড়ির উপরে মাসাহ করা কি ওয়াজিব?

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: সম্পূর্ণ পাগড়ির উপরে মাসাহ করা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। আহমাদ থেকে বর্ণিত হয়েছে: পাগড়ির উপরে সেভাবেই মাসাহ করা হবে যেভাবে মাথার উপরে মাসাহ করতে হয়। এই বাক্যটির অর্থ মাসাহ করার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত সাদৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে এমন সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। এমন অর্থেরও সম্ভাবনাও রয়েছে যে, পাগড়ির আংশিক মাসাহ করা জায়েয। কারণ, এটা মাসাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে। ফলে মোজার ন্যায় এর আংশিক মাসাহ করার বৈধতা দেওয়া হয়েছে। কাযী বলেছেন: পাগড়ির আংশিক মাসাহ করা জায়েয। যেমন, মোজার ক্ষেত্রে আংশিক মাসাহ করা জায়েয। এই আংশিক মাসাহ পাগড়ির পেঁচের সাথে নির্দিষ্ট। পাগড়ির পেঁচ হলো এর চতুর্দিকের গোলাকার ভাঁজসমূহ, পাগড়ির কেন্দ্রের পৃষ্টতল নয়।

মুরদাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তার বক্তব্য: পাগড়ির অধিকাংশ অংশে মাসাহ করলে তা যথেষ্ট হবে। এটাই মাযহাবের আসল মত। জমহুর আলেমগণ এই মতকেই গ্রহণ করেছেন। তাদের মাঝে অনেকেই এই মতকে চূড়ান্ত বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন: পাগড়ির সকল অংশে মাসাহ না করলে মাসাহ জায়েয হবে না। এটা একটি বর্ণনা। দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/৩০৩), আল ইনছাফ (১/১৪০) ।

চুলের অগ্রভাগ ও পাগড়ির উপরে মাসাহ করা

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: সম্পূর্ণ পাগড়ির উপরে মাসাহ করাটা শাফেয়ী ও একদল আলেমদের মতে মুস্তাহাব। যাতে পবিত্রতার বিধানটি সম্পূর্ণ মাথার ক্ষেত্রেই সাব্যস্ত হয়। পাগড়ি পবিত্র অথবা অপবিত্র যেই অবস্থায়ই পরিধান করা হোক না কেনো, তাতে কোনো পার্থক্য নেই।

কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আবু হানীফা ও আমাদের মাযহাবের আলেমগণের মাঝে আশহাব এই হাদীস দ্বারা শুধুমাত্র মাথার অগ্রভাগের উপরে মাসাহ করলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু এই হাদীসে তাদের পক্ষে কোনো দলীল নেই। কারণ, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র মাথার অগ্রভাগের উপরে মাসাহ করেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি মাথার অগ্রভাগের পাশাপাশি সম্পূর্ণ পাগড়ির উপরে মাসাহ করেছেন।

আমি বলব: এই মাসাআলায় মুসলিমে মুগিরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস বিদ্যমান। যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মাথার অগ্রভাগের উপরে, পাগড়ির উপরে এবং দুই মোজার উপরে মাসাহ করেছেন। সুতরাং পূর্বে বর্ণিত হাদীসটি থেকে প্রাধান্যযোগ্য মত সাব্যস্ত হলো: শুধু মাথার উপরে মাসাহকে সীমাবদ্ধ

করা, শুধু পাগড়ির উপরে সীমাবদ্ধ করা এবং পাগড়ির পাশাপাশি মাথার অগ্রভাগের উপরে মাসাহ করা সবগুলোই জায়েয আছে।

শাওকানী বলেছেন: মোট কথা: শুধু মাথার উপরে মাসাহ করা সাব্যস্ত হয়েছে। শুধু পাগড়ির উপরে মাসাহ করা সাব্যস্ত হয়েছে এবং মাথার সাথে পাগড়ির উপরে মাসাহ করা সাব্যস্ত হয়েছে। সবগুলোই সহীহ। বিধায় অত্যাবশ্যকীয় কারণ ব্যতীত মাসাহ যথেষ্ট হওয়ার বিষয়টিকে হাদীসে বর্ণিত পন্থাগুলোর মাঝে মাত্র কয়েকটির সাথে নির্দিষ্ট করা লেখকদের আচরণ হতে পারে না।

দ্রষ্টব্য: আল মুফহিম (১/৫৩২), শারহু মুসলিম (২৭৪), আন নাইল (১/৪৭৮) ।

যদি পাগড়ির উপরে মাসাহ করার পরে তা খুলে ফেলা হয় তাহলে কি ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে?

ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: একইভাবে যদি পাগড়ির উপরে বা খিমারের উপরে মাসাহ করার পরে সেটাকে খুলে ফেলা হয়, তাহলে তার জন্য পুনরায় ওযূ করা বা মাথা মাসাহ করা কোনোটাই জরুরী নয়। বরং সে পূর্বেই মতই পবিত্র। সে এভাবেই সালাত আদায় করবে। এই মতটিকে ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ ও একইভাবে কুরতুবী প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ এই মতের বিরোধিতা করেছেন। যেমনটি তার পুত্র আব্দুল্লাহ রচিত 'মাসায়িল' গ্রন্থে রয়েছে। তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম: পাগড়ির উপরে মাসাহ করার পরে পাগড়ি খুলে ফেলেছে এমন ব্যক্তির বিধান কী? তিনি বললেন: সে ওযূ পুনরায় করবে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: ইবনু হাযম ও তার সঙ্গে সহমত পোষণকারীদের মতটিই প্রাধান্যযোগ্য। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (১/৩৩৭), আল ফাতাওয়া আল কুবরা (৫/৩০৫), তাফসিরুল কুরতুবী (৬/৯০), আহকামুল মাসাহ আলাল হায়িল (৪৭১) ।

পাগড়ির ওপর মাসাহ করার ক্ষেত্রে কি সেটা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা শর্ত?

প্রথম মত: পাগড়ি বা খিমারের উপরে কেবল তখনি মাসাহ করা বৈধ হবে যখন সেটাকে পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা হবে। এটা আবু ছাওর এর মত। হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। তাদের দলীল হলো: দুই মোজার উপরে মাসাহ করার বিধানের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত কিয়াস। এই দলীলের উত্তর হলো: পায়ের পবিত্রতা হলো ধৌত করার মাঝে। আর মাথার পবিত্রতা মাসাহ করার মাঝে। সুতরাং উভয়টি পবিত্রতার দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন।

দ্বিতীয় মত: পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা শর্ত নয়। এটা যাহেরীদের মত। আহমাদ এর একটি বর্ণনা। ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু উসাইমীন এই মতকে গ্রহণ করেছেন। তাদের

দলীল হলো: পাগড়ির উপরে মাসাহ করার ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসসমূহে পবিত্রতার কোনো শর্ত নেই। পক্ষান্তরে মোজার বিষয়টি ভিন্ন, তাতে এই শর্তের কথা বলা আছে। বিধায় আমরা দলীলের উপরেই অটল থাকব।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মতটি প্রাধান্যযোগ্য। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (১/৩০৯), আল ইনছাফ (১/১৩০), আন নাইল (১/৪৭৭), শারহুল বুলুগ (১/৩১৯), আহকামুল মাসাহ আলাল হায়িল (৫৫৭) ।

পাগড়ির উপরে মাসাহ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে?

প্রথম মত: পাগড়ির উপরে মাসাহ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। যেমন: দুই মোজার উপরে মাসাহ করার নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। এটা আবু ছাওরের মত। হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। এটা উমার ইবনু খাত্ত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। ইবনু হাযম বলেছেন: এই মতটি তার থেকে সাব্যস্ত হয়েছে।

তাদের দলীল হলো: আবু উমামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই মোজা ও পাগড়ির উপরে সফরে তিনদিন, আর লোকালয়ে একদিন একরাত পর্যন্ত মাসাহ করতেন"। হাদীসটি ইমাম তাবারানী "আল কাবীর" এ (৮/১২২) বর্ণনা করেছেন। যা অত্যন্ত দুর্বল। এতে দুইটি 'ইল্লাত রয়েছে। প্রথমটি: মারওয়ান আবু সালামাহ। বুখারী তার ব্যাপারে বলেছেন: এই ব্যক্তি মুনকারুল হাদীস। দ্বিতীয়টি: শাহার বিন হাওশাব। সেও একজন দুর্বল রাবী।

দ্বিতীয় মত: পাগড়ির উপরে মাসাহ করার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। এটা যাহেরীদের মত। যা ইবনু উসাইমীন গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল হলো: পাগড়ির উপরে মাসাহ করার ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেকগুলো হাদীস বিদ্যমান। যেগুলোতে নির্দিষ্ট সময়সীমার উল্লেখ নেই। আর এই বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তা সাব্যস্ত হয়নি।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (১.৩০৯), আল মুগনী (১/৩০৪), আন নাইল (১/৪৭৭), শারহুল বুলুগ (১/৩২০), আহকামুল মাসাহ আলাল হায়িল (৫৬৩) ।

পুরুষের জন্য কি খিমারের (মাথায় পরিহিত সাধারণ কোনো আবরণ) উপরে মাসাহ করা জায়েয?

প্রথম মত: খিমারের (পাগড়ি ব্যতীত অন্যকোনো আবরণ) উপরে মাসাহ করা জায়েয। এটা ইবনু হাযমের মত। তার দলীল হলো: মুসলিমে বর্ণিত (২৭৫) বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই মোজা ও খিমারের উপরে মাসাহ করেছেন"। এই দাবির উত্তরে বলা হবে: এখানে আসলে খিমার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: পাগড়ি। খিমারকে এই জন্যই খিমার বলা হয় যে, এটা মাথাকে ঢেকে রাখে। এটা কুরতুবী ও নববীর বক্তব্য। একইভাবে শাওকানী নববীর এই বক্তব্য উদ্ধৃত করে সেটাকে গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় মত: খিমারের উপরে মাসাহ করা যাবে না। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: পাগড়ির উপরে মাসাহ করার দলীলসমূহ এবং খিমার শব্দবিশিষ্ট বর্ণনাসমূহ। যেমন বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। যেখানে খিমার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পাগড়ি। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। একইভাবে ভাষাবিদগণ বলেছেন: খিমার দ্বারা পাগড়িই উদ্দেশ্য।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মতটি। কিন্তু যারা হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে প্রথম মতটি "খিমারের উপরে মাসাহ করা জায়েয" পোষণ করেছেন, তাদের মতকেও নাকচ করা যাবে না। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (১/৩০৩), আল মুফহিম (১/৫৩৪), শারহু মুসলিম (২৭৫), আন নিহায়াহ (২৮৫), আন নাইল (১/৪৭৮), আশ শারহুল মুমতি' (১/২৩৬) ।

নারীর জন্য কি তার খিমারের উপরে মাসাহ করা জায়েয?

প্রথম মত: নারীর জন্য তার খিমারের উপরে মাসাহ করা জায়েয নেই। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করো" (আল মায়িদাহ: ৬)। তারা বলেছেন: যদি নারী তার খিমারের উপরে মাসাহ করে, তাহলে সে মাথার উপরে মাসাহ করেনি। বরং সে একটি বিচ্ছিন্ন বস্তুর উপরে মাসাহ করেছে। আর সেটা হলো খিমার। বিধায় এই মাসাহ জায়েয হবে না।

তারা বলেছেন: যেহেতু এটা মাথা ঢাকার জন্য পরিধান করা হয়, তাই এটা প্রতিরক্ষা পোশাকের ন্যায়। বিধায় এর উপরে মাসাহ করা জায়েয নেই। আর "প্রতিরক্ষা পোশাকের উপরে মাসাহ করা জায়েয নেই" এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কারণ, এমন পোশাক খোলা কঠিন নয়। সুতরাং এটা যেনো পুরুষের মাথার তকিয়া টুপির ন্যায়।

দ্বিতীয় মত: নারীর জন্য মাসাহ করা জায়েয আছে। এটা ইবনু হাযমের মত, আহমাদের একটি বর্ণনা। তাদের দলীল হলো: পুরুষের জন্য পাগড়ির উপরে মাসাহ করা সংক্রান্ত

দলীলসমূহ। তারা বলেছেন: এটাকে পাগড়ির উপরে মাসাহ করার উপরে কিয়াস করা হবে। যেহেতু এটা মাথার প্রচলিত পোশাক। যা খোলা কঠিন। ফলে এটা পাগড়ির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এছাড়াও: উম্মে সালামাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে: তিনি খিমারের উপরে মাসাহ করতেন। বর্ণনাটির সনদ হাসান পর্যায়ের।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। যা ইবনু তাইমিয়্যাহ গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি নারীর জন্য মাসাহ এর অনুমতি দিয়েছেন ঠান্ডার লাগার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকার শর্তে। ইবনু উসাইমীন একই মত পোষণ করেছেন।

ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যেই অবস্থায়ই হোক না কেনো, যদি আবহাওয়া শীতল থাকার কারণে অথবা বারংবার খিমার খোলা আর লাগানোর সমস্যার কারণে কষ্ট হয়, তাহলে এমন ক্ষেত্রে মাসাহ করাতে কোনো সমস্যা নেই। অন্যথায় উত্তম হলো: সে মাসাহ করবে না। এই বিষয়ে কোনো স্পষ্ট সহীহ নস (কুরআন হাদীসের দলীল) আসেনি।

দ্রষ্টব্য: আল ইসতিযকার (২/৩১৯), আল মুহাল্লা (১/৩০৩), আল মুগনী (১/৩০৫), মাজমূ‘উল ফাতাওয়া (২১/২১৮), আশ শারহুল মুমতি’ (১/২৩৮), আহকামুল মাসাহ আলাল হায়িল (৫৩৫) ।

যদি মাথার চুল মেহেদী বা আঠা জাতীয় বস্তু অথবা মধু দ্বারা জড়ানো থাকে

শায়েখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ আশ শারহুল মুমতি’ গ্রন্থে (১/২৩৯) বলেছেন: যদি মাথার চুল মেহেদী, আঠা জাতীয় বস্তু অথবা মধু বা এই জাতীয় বস্তু দ্বারা জড়ানো থাকে, তাহলে এর উপরে মাসাহ করা জায়েয আছে। কারণ, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম পরিহিত অবস্থায় তাঁর মাথা মেহেদীযুক্ত ছিল। চুলের উপরে যেই বস্তু যুক্ত থাকে, সেটাকে মাথার চুলের অনুগামী ধরা হবে। এখান থেকে বুঝা যায় যে, মাথার পবিত্রতার ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। এই নীতি অনুসারে: যদি কোনো মহিলা মেহেদী তার মাথার চুলে লাগায়, তাহলে তার জন্য মাথার চুলে মাসাহ করা জায়েয আছে। তার মাথার চুল বেছে বেছে মেহেদী উঠানোর কোনো প্রয়োজন নেই। একইভাবে যদি সে তার মাথার চূড়ায় কোনো ঝুঁটি বাঁধে, তাহলে এমন ক্ষেত্রেও তার জন্য মাথায় মাসাহ করা জায়েয আছে। কারণ, আমরা যখন খিমারের উপরে মাসাহ করাকে জায়েয সাব্যস্ত করেছি, তখন এটা আরো অধিক উত্তমরূপে জায়েয হবে।

টুপির উপরে মাসাহ করার বিধান কী?

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আমরা আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে আমাদের পর্যন্ত এই মর্মে বর্ণনা এসেছে যে, "তিনি টুপির উপরে মাসাহ করতেন"। আমরা এমন কাউকে জানি না, যে এই মত পোষণ করেন। আওযাঈ, সাঈদ বিন আব্দুল আযিয, মালেক, শাফেয়ী, নু'মান, ইসহাক এবং আমরা ইলম সংরক্ষণ করেছি যাদের সূত্রে এমন কেউ এই মত পোষণ করেন না।

আমি বলব: তিনি আনাস এর সূত্রে "তিনি টুপির উপরে মাসাহ করতেন" মর্মে যেই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, সেটাও ইবনু হাযমের মত এবং আহমাদের একটি বর্ণনা। বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, তিনি টুপির উপরে মাসাহ করতেন না। বরং আমরা বর্ণিত দলীলসমূহের উপরেই অটল থাকব। দলীলের সীমা অতিক্রম করবো না। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। কালানসুওয়াহ হলো: এমন পোশাক, যেটা মাথার উপরে পরিধান করা হয়। যার উপরে পাগড়ি বাঁধা হয়।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৪৭২), আল মুগনী (১/৩০৪), আল ইনছাফ (১/১২৯), আহকামুল মাসাহ আলাল হায়িল (৫৪৩)।

দুই কান মাসাহ করার বিধান কী?

প্রথম মত: দুই কানের উপরে মাসাহ করা মুসতাহাব, ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। বরং তাদের কেউ কেউ এই বিষয়ে ইজমা'ও বর্ণনা করেছেন। নববী বলেছেন: আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন জারির তাবারী তার গ্রন্থ 'ইখতিলাফুল ফুকাহা' তে উল্লেখ করেছেন: তারা এই বিষয়ে ইজমা' পোষণ করেছেন: "যে ব্যক্তি উভয় কান মাসাহ করল না, তার পবিত্রতা সহীহ হবে" ।

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "দুই কান সামনের দিক থেকে মাসাহ করা সুন্নাত। উভয়টিই মাথা বা চেহারার অংশ নয়" এই বক্তব্যে শাফেয়ীর দলীল হলো: যারা সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ওয়াজিব হওয়ার দাবি করেন, তাদের ঐক্যমতে যদি কোনো ব্যক্তি দুই কান মাসাহ না করে এবং এই অবস্থায় সালাত আদায় করে, তাহলে তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।

ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: দুই কান মাসাহ করা ফরয নয় এবং উভয়টি মাথার অন্তর্ভুক্তও নয়। কারণ, এই সকল ক্ষেত্রে বর্ণিত আসারসমূহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, দুই কান মাসাহ করা ওয়াজিব নয়। কারণ, এমনটি বর্ণিত হয়নি। আর উভয়টি মাথার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে অনুগামী হিসেবে হতে পারে।

দ্বিতীয় মত: দুই কান মাসাহ করা ওয়াজিব। এটা ইসহাক ও কিছু মালেকী মাযহাবের আলেমদের মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। আলবানী আস সহীহা গ্রন্থে (৩৬) এই মতকেই গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়ে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এই মতের দলীল হলো: "দুই কান মাথার অংশ" এই হাদীসটি। এই বর্ণনাটি সাহাবীদের — রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম — একটি বড় দল থেকে বর্ণিত হয়েছে।

মোট কথা: এই মাসআলাটির ভিত্তি হলো: হাদীসটি সহীহ হওয়ার উপরে নির্ভরশীল। যারা এটাকে সহীহ বলে দাবি করেছেন, তাদের জন্য কান মাসাহকে ওয়াজিব বলার সুযোগ আছে। তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাদীসটিকে সহীহ মনে হয় না। এই ভিত্তির আলোকে: গ্রহণযোগ্য মত হলো: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৪০৫), আত তামহিদ (৪/৪১), আল মুহাল্লা (১/৩০০), আল মুগনী (১/৩০২), আল মাজমূ' (১/৪৪৬), তাফসিরুল কুরতুবী (৬/৯০), আহকামুল ওযূ (২/৫২৭)।

দুই কান মাসাহ করা পদ্ধতি

আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস, সেখানে বলা হয়েছে: "এরপরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মাথা মাসাহ করলেন। আর দুই হাতের শাহাদাত আঙ্গুল উভয় কানের ভেতরে প্রবেশ করালেন। দুই বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা কানের বাহ্যিক অংশে মাসাহ করলেন। আর দুই শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভেতরে মাসাহ করলেন। এরপরে দুই পা তিনবার ধৌত করলেন"। আবু দাউদ (১৩৫)। হাদীসের সনদ হাসান পর্যায়ের।

নববী রহিমাহুল্লাহ আল মাজমূ' গ্রন্থে (১/৪৪২) বলেছেন: আর মাসআলার বিধান হলো: দুই কান মাসাহ করা সুন্নাহ। পূর্ববর্তী হাদীসগুলো ভিত্তিতে। আর সুন্নাহ হলো কানের ভেতরে ও বাহিরে উভয় স্থানেই মাসাহ করা। বাহিরের অংশ হলো: মাথার সঙ্গে যুক্ত অংশ। আর ভেতরের অংশ হলো: চেহারার সাথে যুক্ত অংশ।

দুই কান কি মাথার সঙ্গে মাসাহ করা যাবে?

প্রথম মত: মাথার পানি দ্বারা কান মাসাহ করা মুস্তাহাব। এটা ছাওরী ও হানাফীদের মাযহাব।

ইবনু আব্দিল বার বলেছেন: এটা সাহাবীদের এবং তাবেঈনের একটি বড় দল থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাদের দলীল হলো: "দুই কান মাথার অংশ" মর্মে বর্ণিত হাদীসসমূহ।

কেউ কেউ মনে করেন যে, উক্ত হাদীসগুলো সামগ্রিকরূপে হাসানের পর্যায়ে উন্নীত হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন হয় না। একইভাবে আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস: "একজন ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল: হে

আল্লাহর রাসূল, পবিত্রতা কীভাবে অর্জন করতে হয়? তখন তিনি একটি পাত্রে পানি আনার আদেশ দিলেন। এরপরে উক্ত পানি দ্বারা দুই হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। এরপরে তিনবার চেহারা ধৌত করলেন। এরপরে তিনবার দুই হাতের বাহু (কনুই পর্যন্ত) ধৌত করলেন। এরপরে তাঁর মাথা মাসাহ করলেন। তখন তাঁর দুই হাতের শাহাদাত আঙ্গুল তাঁর কানের ভেতরে প্রবেশ করালেন। এরপরে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা কানের বাহিরের অংশ মাসাহ করলেন। আর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভেতরে মাসাহ করলেন। এরপরে দুই পা ধৌত করলেন"। হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সনদটি হাসান। বাহ্যিক হাদীস অনুসারেঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার সাথে দুই কান মাসাহ করেছেন।

দ্বিতীয় মতঃ উভয়টির জন্যই নতুন করে পানি নেওয়া মুস্তাহাব। যদি কেউ এই নিয়ম ভঙ্গ করে মাথার সাথে কান মাসাহ করে, তাহলেও সেটা জায়েয হবে। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলোঃ আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসঃ "তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথা মাসাহ করার পানি বাদ দিয়ে অন্য পানি নিয়ে কান মাসাহ করেছেন"। বায়হাকী (১/৬৫)। হাদীসটি এই শব্দে সংরক্ষিত নয়। বরং সংরক্ষিত হাদীসটি একই সূত্রে মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে এই শব্দেঃ "তিনি মাথা মসাহ করলেন দুই হাতে অবশিষ্ট থাকা অতিরিক্ত পানি ছাড়া অন্য পানি দিয়ে। এই বিষয়ে আয যঈফাহ গ্রন্থে (৯৯৫) ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ এর গবেষণা দ্রষ্টব্য। তারা এই মর্মেও দলীল দিয়েছেন যে, এই মর্মে ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, উভয় কানের মাসাহ মাথা মাসাহ এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। এটাই দলীল যে, উভয়টি মাথার অংশ নয়।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রথম মতটি। ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর বিবরণ সম্বলিত হাদীসগুলোতে তিনি দুই কানের জন্য পৃথক পানি গ্রহণ করেছেন এমন তথ্য অনুপস্থিত।

ইবনু কাইয়িম বলেছেনঃ তাঁর থেকে এটা সাব্যস্ত হয়নি যে, তিনি উভয় কান মাসাহ করার জন্য নতুন করে পানি নিয়েছেন। বরং এটা ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে।

দ্রষ্টব্যঃ আল আওসাত (১/৪০৪), আল মুগনী (১/১০৬), আল মাজমূ' (১/৪৪৪), আয যাদ (১/১৯৫), আন নাইল (১/৪৬৭), আহকামুল ওযূ (১/২৯৫) ।

দুই কান মাসাহ করা কি মাথা মাসাহ করার জন্য যথেষ্ট হবে?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ আল মাজমূ' গ্রন্থে (১/৪৪৫) বর্ণনা করেছেন: এই বিষয়ে ইজমা' প্রতিষ্ঠিত যে, উভয় কান মাসাহ করা মাথা মাসাহ এর জন্য যথেষ্ট নয়।

দুই কান কি পাগড়ির সাথে মাসাহ করা যাবে?

মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ আশ শারহুল কাবির গ্রন্থে (১/১৬৭) বলেছেন: পাগড়ির সাথে দুই কান মাসাহ করা ওয়াজিব নয়। এই বিষয়ে আমরা কোনো দ্বিমত পাইনি। কারণ, এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত বর্ণিত হয়নি। উভয়টিই মাথার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে অনুগামী হিসেবে হতে পারে।

আমি বলব: তার বক্তব্য: "ওয়াজিব নয়" এটা মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টিকে নাকচ করে না।

দুই পা ধৌত করার বিধান

প্রথম মত: দুই পা ধৌত করা ওয়াজিব। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। ইবনু মুনযির বলেছেন: সাধারণ আলেমগণ এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, যার পায়ে মোজা নেই, তার জন্য উভয় পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করা ওয়াজিব।

মাওয়ারদী বলেছেন: সকল ফকীহদের মতে দুই পায়ের ক্ষেত্রে ফরয হলো ধৌত করা। মাসাহ করা নয়।

এই মতের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন তোমরা তোমাদের চেহারাসমূহ, কনুই পর্যন্ত হাতসমূহ ধৌত করো এবং মাথাসমূহ মাসাহ করো এবং গোড়ালি পর্যন্ত পাসমূহ ধৌত করো" (আল মায়িদাহ: ৬)।

প্রসিদ্ধ কিরাত অনুসারে: أرجلكم – শব্দটি যবর সহকারে উচ্চারিত হবে। শব্দটি পূর্ববর্তী শব্দ أيديكم – এর সাথে 'আতফ হয়েছে। একইভাবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসগুলোও দলীল। যার মাঝে অন্যতম হলো: পূর্বে অতিবাহিত উসমান ও আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসটি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাসাহের ব্যাপারে একটি হাদীসও বর্ণিত হয়নি। একইভাবে পূর্বে বর্ণিত আব্দুল্লাহ বিন আমর, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা এবং আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর হাদীস: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জাহান্নামের

আগুনের শাস্তি অবধারিত গোড়ালিসমূহের জন্য"। তারা أرجلكم – শব্দে যের সহকারে বর্ণিত কেরাতের কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন:

প্রথম: উক্ত শব্দে যের দেওয়া হয়েছে প্রতিবেশিত্বের কারণে। কিন্তু উদ্দেশ্য ধৌত করাই হবে।

দ্বিতীয়: এখানে মাসাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ধৌত করা। তবে মাসাহ শব্দ দ্বারা ধৌত করাকে ব্যক্ত করা হয়েছে এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, ওযূকারীর জন্য উভয় ক্ষেত্রেই পানি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শিথিলতা অবলম্বন করা উচিত। যেহেতু উভয় ক্ষেত্রেই অপচয়ের আশঙ্কা রয়েছে।

তৃতীয়: এখানে উদ্দেশ্য হলো: দুই মোজার উপরে মাসাহ করা। যেমনটি সুন্নাহের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়।

দ্বিতীয় মত:দুই পায়ের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো: মাসাহ করা। যা ইবনু আব্বাস, আলী ও আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু হাজার বলেছেন: তাদের থেকে উক্ত মত থেকে প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা সাব্যস্ত হয়েছে। এবং এটা ইকরিমা, হাসান, শা'বীর মত। এটা শীয়াদের মাযহাব। তারা মূলত আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর বাহ্যিক মর্ম দ্বারা দলীল পেশ করেন: "তোমরা তোমাদের মাথাসমূহ মাসাহ করো এবং পাসমূহ গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করো" (আল মায়িদাহ: ৬)। এটা أرجلكم – শব্দে যের সহকারে পাঠ করেন এমন আলেমদের মতানুসারে। তারা বলেছেন: الرجل – 'পা' শব্দটি 'আতফ হয়েছে الرأس – 'মাথা' শব্দের উপরে। আর মাথা যেহেতু মাসাহ করতে হয়, তাই পায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য হবে।

তৃতীয় মত: তার জন্য ধৌত করা ও মাসাহ করা উভয়টির সুযোগ রয়েছে। এই মতকে ইবনু জারীর, আওযাঈ, আহমাদ ও আবু আলী আল জুব্বায়ী এদের প্রতি সম্বন্ধিত করা হয়েছে। যা হাসান ও ছাওরীর মত।

চতুর্থ মত: ধৌত করা ও মাসাহ করা উভয়টিই করতে হবে। এই মতটি হাসান আল বাসরীর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে। যা দাউদ যাহেরীর মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথমটি। মোজা পরিহিত না থাকা অবস্থায় উভয় পা ধৌত করতে হবে। সুতরাং তার মোজা থাকলে তার জন্য মাসাহ করার অনুমতি রয়েছে। দুই পায়ের মোজার ব্যাপারে আলোচনা অচিরেই আসবে। ইনশাআল্লাহ।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৪১০), শারহুস সুন্নাহ (১/৩১৩), আল হাবী (১/১২৩), আল মুহাল্লা (১/৩০১), মিনহাজুস সুন্নাহ (৪/১৭০, ১৭৯), আল মুফহিম (১/৪৯৬), আল মাজমূ' (১/৪৪৭), তাফসিরুল কুরতুবী (৬/৮২), আল ইলাম (১/২৩৭), আল ফাতহ (১/২৬৬) ।

ওযূর সময় পা ধৌত করার ক্ষেত্রে গোড়ালির উভয় গ্রন্থিকে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান

নববী রহিমাহুল্লাহ আল মাজমূ' গ্রন্থে (১/৪৫১) বলেছেন: গোড়ালির উভয় গ্রন্থিকে পা ধৌত করার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী: "এবং তোমাদের পাসমূহ গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করবে" (আল মায়িদাহ: ৬)। তাফসীরবিদগণের মতে: এর অর্থ হলো: গোড়ালির উভয় গ্রন্থিসহ ধৌত করবে। আর كعبان – শব্দের উদ্দেশ্য হলো: ঐ দুইটি স্ফীত হাড়, যা পায়ের নলা ও পায়ের পাতার জোড়াস্থলে অবস্থিত। এই বিষয়ের দলীল হলো: নু'মান বিন বাশির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস: "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং বললেন: তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করো। আমি দেখেছি, আমাদের একজন ব্যক্তি তার পায়ের গোড়ালি অপরের পায়ের গোড়ালির সঙ্গে এবং তার কাঁধ অপরের কাঁধের সঙ্গে যুক্ত করে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং এটা এই দিকে ইঙ্গিত করছে যে, كعب – শব্দটি এখানে ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, যা আমরা বললাম। এরপরে তিনি বলেছেন: এটা আমাদের মাযহাব। এই মত পোষণ করেছেন মুফাসসিরগণ, আহলুল হাদীস আলেমগণ, ভাষাবিদগণ ও ফকীহগণ। শিয়ারা বলেছে: কা'ব হলো: পায়ের পাতার উপরে বিদ্যমান দুইটি স্ফীত হাড়। সুতরাং তাদের মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির পায়ে একটি করে কা'ব বা গোড়ালি গ্রন্থি রয়েছে।

আমি বলব: নু'মান এর হাদীসটি আবু দাউদ (৬৬২) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ সহীহ।

ওযূর পদ্ধতিসমূহ

প্রথম পদ্ধতি: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার তিনবার করে ওযূ করেছেন। যার দলীল হলো উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি অন্যান্যদের থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইবার দুইবার করে ওযূ করেছেন। দলীল হলো: বুখারীতে (১৫৮) বর্ণিত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। এবং আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। যা আবু দাউদ (১৩৬) বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় পদ্ধতি: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করেছেন একবার একবার করে। দলীল হলো: ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস। যা বুখারীতে (১৫৭) বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ পদ্ধতি: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করেছেন। তিনবার করে মুখ ধৌত করেছেন। এরপরে উভয় হাত পাত্রে ঢুকিয়ে কনুইসহ ধৌত করলেন। দলীল হলো: আব্দুল্লাহ বনিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাত হাদীস, যা লেখক বর্ণনা করেছেন।

ওযূতে কতবার ধৌত করা মুস্তাহাব আর কতবার ধৌত করা ওয়াজিব

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তার বক্তব্য: "এরপরে তিনি কুলি করলেন এবং নাক পরিষ্কার করলেন"। এখানে তিনবারের সংখ্যাটা সকল অঙ্গের ক্ষেত্রে ওযূর সর্বোচ্চ পূর্ণতা বলে বিবেচিত হবে। এর থেকে বেশি হলে সেটা সীমালঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে। যদি অতিরিক্তটা কোনো অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করার জন্য হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। ইবনু রুশদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আলেমগণ এই বিষয়ে ইজমা' করেছেন: ধোয়ার উপযুক্ত অঙ্গসমূহের পবিত্রতার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো একবার করে ধৌত করা, যদি সংশ্লিষ্ট অঙ্গ পূর্ণরূপে ধৌত করা হয়। আর দুই ও তিন সংখ্যা মানদুব তথা মুস্তাহাব।

নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আর মাসআলার বিধান হলো: আলেমগণের ইজমা'র ভিত্তিতে একমাত্র মাথা ব্যতীত অন্যান্য সকল অঙ্গের ক্ষেত্রে তিনবার করে ধৌত করা মুস্তাহাব। কারণ, মাথার ক্ষেত্রে সালাফদের মতানৈক্য রয়েছে।

আমি বলব: সহীহ মত হলো: মাসাহ একাধিকবার করা সুন্নাহ নয়। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

একইভাবে আমরা এখানে যাদের কথা উল্লেখ করলাম তারা ব্যতীত অন্যরা ইজমা' বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাফেয মতানৈক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন: অদ্ভুত বিষয় হলো: আবু হামিদ আল ইসফিরায়িনী কোনো এক আলেমের সূত্রে এই মত বর্ণনা করেছেন: তিনবারের কম সংখ্যা ওযূর অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে জায়েয নেই। যেনো তিনি বর্ণিত হাদীসটির বাহ্যিক অর্থকে গ্রহণ করেছেন। এটা ইজমা' দ্বারা খণ্ডিত।

আমি বলব: অন্যান্য দলীলসমূহের ভিত্তিতেও এই মতটি তিনি গ্রহণ করেছেন। যেগুলো এই মাসআলার পূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে।

আর তার বক্তব্য: বর্ণিত হাদীসটির বাহ্যিক অর্থকে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ: এই হাদীসটির ভিত্তিতে: আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার মারফূ' হাদীস দ্বারা: "যে ব্যক্তি এর চাইতে কম বা বেশি করল, সে গুনাহ করল এবং সীমালঙ্ঘন করল"। أَونقص – শব্দটির সংযোজনটিকে মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ অস্বীকার করেছেন। এরপরের মাসআলাতেই উক্ত সংযোজনের ব্যাপারে আলোচনা হবে।

দ্রষ্টব্য: আল ইসতিযকার (২/১০), আল বিদায়াহ (১/৪৪), আল মাজমূ' (১/৪৬১), আল ফাতহ (১/২৩৩)।

একটি অঙ্গকে তিনবারের বেশি ধৌত করার বিধান

হাফেয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আহমাদ, ইসহাক ও অন্যান্যরা বলেছেন: তিনবারের বেশি কোনো অঙ্গ ধৌত করা জায়েয নেই। ইবনু মুবারাক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এমন ব্যক্তি গুনাহ থেকে রক্ষা পাবে বলে আমি মনে করি না। শাফেয়ী বলেছেন: ওযূকারী ব্যক্তি তিনবারের বেশি কোনো অঙ্গ ধৌত করুক এটা আমি পছন্দ করি না। যদি এর চাইতে বেশি সে ধৌত করে, তাহলে আমি সেটাকে মাকরূহ মনে করব না। অর্থাৎ: আমি সেটাকে হারাম বলব না। যেহেতু "আমি পছন্দ করি না" এটা মাকরূহ হওয়ার দাবি রাখে। আর এটাই শাফেয়ীদের মতে সর্বাধিক সহীহ মত: মাকরুহে তানযিহী হবে। দারিমী আলেমগণের সূত্রে কোনো এক সম্প্রদায়ের ব্যাপারে এই মত বর্ণনা করেছেন: তিনবারের অধিক ধৌত করা ওযূকে বাতিল করে দেয়। যেমন সালাতে কোনো কর্মকে সংযোজন করা। এটা ফাসেদ কিয়াস।

আমি বলব: সঠিক মত হলো: যা আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন: তিনবারের অধিক জায়েয নেই। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর বিবরণ সম্বলিত হাদীস। যা আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে: "তিনি তিনবার তিনবার করে ধৌত করলেন। এরপরে বললেন: ওযূ এমনি। সুতরাং যে এর চাইতে বেশি অথবা কম করল, সে গুনাহ করল এবং সীমালঙ্ঘন করল"। আবু দাউদ (১৩৫)। এর সনদ হাসান। তবে এই শব্দটি ব্যতীত: أونقص – অথবা যে এর চাইতে কম করল। এটা কিছু রাবীর ভ্রম মাত্র। এই আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: আল ফাতহ ও আহকামুল মাসাহ গ্রন্থদ্বয়।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৪০), আল মাজমূ' (১/৪৬৮), আল ফাতহ (১/২৩৪), আহকামুল মাসাহ আলাল হায়িল (২৭৪)।

যদি ওযূর অঙ্গগুলোকে কম বেশি করে ধৌত করে

শিরাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যদি ওযূকারী অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে কম বেশি করে, অর্থাৎ একটি অঙ্গকে একবার, আরেকটিকে দুইবার, আরেকটিকে তিনবার ধৌত করে, তাহলে সেটা জায়েয আছে।

ইবনু কুদামা বলেছেন: যদি সে কোনো অঙ্গকে একবার আর অপর অঙ্গকে একাধিকবার ধৌত করে, তাহলে সেটা জায়েয আছে। কারণ, এটা যদি সকল অঙ্গের ক্ষেত্রে জায়েয হয়, তাহলে সেটা কিছু সংখ্যক অঙ্গের ক্ষেত্রেও জায়েয হবে। এরপরে তিনি আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস উল্লেখ করেছেন, যা লেখক বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "এরপরে তিনি স্বীয় মুখ তিনবার ধৌত করলেন। এরপরে তাঁর হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করালেন। এরপরে উভয় হাত দুইবার করে ধৌত করলেন"। দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৪০), আল মাজমূ' (১/৪৬৬)।

যদি ধৌত করার সংখ্যার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয়

নববী রহিমাহুল্লাহ আল মাজমূ’ গ্রন্থে (১/৪৬৮) বলেছেন: যদি ওযূকারী এই সংশয়ে পতিত হয় যে, সে কি দুইবার ধৌত করেছে, নাকি তিনবার ধৌত করেছে, সেটা তার স্মরণে নেই, তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে: সে নিশ্চিত সাব্যস্ত বিষয়টির বিধানের উপরেই ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিবে। আর সেটা হলো এই ক্ষেত্রে দুইবার। বিধায় সে তৃতীয়বার ধৌত করবে। এরপরে তিনি রহিমাহুল্লাহ ইমামুল হারামাইন এর সূত্রে আরো দুইটি সমাধান উল্লেখ করেছেন: এক: সে আরেকবার ধৌত করবে না। কারণ, এমন ক্ষেত্রে সে চারবার ধৌত করার আশঙ্কায় থাকবে। যা বিদআত এবং তিনবার ধৌত করার আশঙ্কায় থাকবে, যা সুন্নাহ। আর বিদআতে লিপ্ত হওয়ার চাইতে সুন্নাহ পরিত্যাগ করা অধিক উত্তম। দুই: সালাতের ন্যায় আরেকবার ধৌত করবে। আর বিদআত তখনি হবে, যখন সে ইচ্ছাকৃতভাবে চতুর্থবার কারণ ব্যতীতই ধৌত করবে।

নববী বলেছেন: সহীহ মত হলো: সে আরেকবার ধৌত করবে। আমি বলব: এটাই সঠিক মত। ইন শা আল্লাহ, আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ওযূর অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করার বিধান

প্রথমত তারতীবের অর্থ: কোনো অঙ্গকে পূর্ববর্তী অঙ্গের পূর্বে ধৌত করা যাবে না। যেভাবে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে কয়েকটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: ওযূর অঙ্গসমূহের মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। এটা উসমান, ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত। এবং আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকেও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এটা অধিকাংশ আলেমদের মত। এই মতের দলীল হলো: উক্ত আয়াতটি। আয়াতে বিদ্যমান প্রমাণটি হলো:

আল্লাহ তা‘আলা দুইটি ধৌত করতে হয় এমন অঙ্গের মাঝে একটি মাসাহযোগ্য অঙ্গ প্রবেশ করিয়েছেন, আর তা মাথা। আর আরবরা কখনো কোনো সমকক্ষ বস্তুকে অনুরূপ বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে না। যদি সেখানে কোনো উদ্দেশ্য না থাকে। এখানে সেই উদ্দেশ্যটি হলো: ধারাবাহিকতা ।

তারা আরো দলীল দিয়েছেন: মুসলিমে (৮৩২) বর্ণিত আমর বিন আবাসাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারা। যা একটি দীর্ঘ হাদীস। সেখানে বলা হয়েছে: আমি বললাম: হে আল্লাহর নাবী, আমাকে ওযূ সম্বন্ধে বিবরণ দিন। তখন তিনি বললেন: “তোমাদের মধ্যে যে কেউ যখন ওযূর প্রস্তুতি নেয়, তখন সে কুলি করবে, নাকে পানি নিবে। এরপরে নাক পরিষ্কার করবে ... এরপরে যখন মুখ ধৌত করবে ... এরপরে তার দুই হাত কনুইসহ ধৌত করবে ... এরপরে মাসাহ করবে ... এরপরে গোড়ালিসহ দুই পা ধৌত করবে” ।

হাদীসের মাঝে বিদ্যমান প্রমাণ হলো: হাদীসে প্রতিটা অঙ্গকে ধারাবাহিকভাবে ثُمَّ – শব্দ দ্বারা একটিকে পরেরটির সাথে যুক্ত করা হয়েছে। যেই শব্দটি তারতীবের দাবি রাখে। এটা তা'লিমের ক্ষেত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য। তাদের পক্ষে আরো অনেকগুলো দলীল রয়েছে।

দ্বিতীয় মত: ধারাবাহিকতা ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ আলেমগণের মত। যা আলী ও ইবনু মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তারা দলীলটি পেশ করেছেন এইভাবে যে, আয়াতে বিদ্যমান অঙ্গগুলোর মাঝে واو – দ্বারা 'আতফ করা হয়েছে। যা তারতীবের দাবি রাখে না। আর মুসনাদে আহমাদে (৪/১৩২) বর্ণিত মিকদাম বিন মা'দী কারিব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাত কনুইসহ ধৌত করেছেন। এরপরে কুলি করলেন এবং নাকে পানি নিলেন" । হাদীসটির সনদে আব্দুর রহমান বিন মায়সারাহ আবু সালামাহ আল হিমছী নামক রাবী রয়েছে। তাকরীব গ্রন্থে বলা হয়েছে: সে মাকবুল পর্যায়ের রাবী।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। **আর তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব।** পূর্ববর্তী দলীলসমূহের ভিত্তিতে। এছাড়াও: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর বিবরণ সম্বলিত হাদীসগুলোতে তারতীবের বর্ণনা বিদ্যমান। আমার জানামতে, এমন কোনো সহীহ হাদীস নেই, যেখানে তারতীবের কথা বলা হয়নি। আর আলী ও ইবনু মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়। যেমনটি দিবয়ান রচিত 'আহকামুল ওযূ' গ্রন্থে বিদ্যমান। এছাড়াও: ইমাম আহমাদ তাদের উভয়ের বক্তব্যের একটি অর্থ নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেছেন: তারা উভয়েই উক্ত বক্তব্যে ডান অঙ্গের পূর্বে বাম অঙ্গকে উদ্দেশ্য করেছেন। কারণ, কিতাবের দৃষ্টিতে উভয়টিরই বাচনভঙ্গি অভিন্ন। দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৪২২), আল মুহাল্লা (১/৩১০), আল মুগনী (১/১৩৬), আল মাজমূ' (১/৪৭১) ।

ওযূর অঙ্গগুলো ধৌত করার সময় বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি ধৌত করা

মুওয়ালাত হলো কোনো সময়ক্ষেপণ না করেই অর্থাৎ বিরতিহীনভাবে একটি অঙ্গের পরে অন্যটি ধৌত করা। ইমাম নববীসহ অন্যান্যরা এই বিষয়ে ইজমা' বর্ণনা করেছেন যে, সামান্য বিরতি কোনো ক্ষতি করে না। তবে তারা অধিক বিরতির ক্ষেত্রে তিনটি মত পোষণ করেছেন:

প্রথম মত: বিরতিহীন ধারাবাহিকতা সর্বক্ষেত্রে ওয়াজিব। এটা কাতাদাহ, রবি'আহ, আওযাঈ, লাইছ ও শাফেয়ীর পুরতান মত এবং আহমাদের মাযহাবের বাহ্যিক মত।

দ্বিতীয় মত: কোনো ক্ষেত্রেই ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

তৃতীয় মত: একমাত্র জরুরী অজুহাত ব্যতীত সকল ক্ষেত্রেই এটা ওয়াজিব। যেমন: সম্পূর্ণ পানি না থাকা। এটা মালেকের মাযহাব। যা লাইছ থেকে বর্ণিত। তারা মুওয়ালাতের (বিরতিহীনতা) পক্ষে আয়াতটি দ্বারা দলীল পেশ করেছে। দলীলের তাৎপর্য হলো: শর্তের

জওয়াব বিরতিহীন হয়, উভয়টির মাঝে কোনো বিলম্ব থাকে না। জওয়াব তার শর্তের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে যুক্ত হওয়ার আবশ্যিকতার ভিত্তিতে। এখানে অন্যতম একটি যৌক্তিক বিশ্লেষণ আছে: সম্পূর্ণ ওযূ হলো একটি ইবাদত। বিধায় যখন তার অঙ্গগুলোর মাঝে বিরতি দেওয়া হবে, তখন সম্পূর্ণ ওযূ একটি ইবাদত বলে বিবেচিত হবে না।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: এই তৃতীয় মতটি শরীআতের উসূলের সাথে, আহমাদের মাযহাবের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ, ওয়াজিব হওয়ার দলীলসমূহ একমাত্র সীমালঙ্ঘনকারীকেই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে। বিরতিহীনভাবে ধৌত করতে অক্ষম এমন ব্যক্তিকে বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে না।

ইবনু উসাইমীন বলেছেন: পবিত্রতার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কারণে যদি বিরতিহীনতা রক্ষা না হয়, তাহলে সেটা এই বিধান বহির্ভূত। যেমন: ওযূকারীর কোনো অঙ্গে এমন অন্তরায় আছে, যা পানি নির্দিষ্ট স্থানে পানি পৌঁছাতে বাঁধা দেয়। যেমন: জুতার পালিশ। যা দূর করার কাজে সে ব্যস্ত থাকার ফলে বিরতিহীনতা ভঙ্গ হয়। এমন ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। একইভাবে যদি পানি শুকিয়ে যায় এবং সেটা কূপ থেকে উত্তোলন করার কাজে সে ব্যস্ত থাকে। অথবা যদি পানি এক এক ট্যাপ থেকে অন্য ট্যাপে স্থানান্তরিত হয়, আর এই অবস্থায় যদি অঙ্গসমূহ শুকিয়ে যায়, তাহলে সেটা কোনো ক্ষতি করবে না।

আমি বলব: ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুমাল্লাহ যেই মতটি দিয়েছেন, তা সহীহ। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৩৮), আল মাজমূ' (১/৪৮১), আল ফাতাওয়া (২১/১৩৫), আশ শারহুল মুমতি' (১/১৯১)।

যদি ত্বকের গোড়ায় পানি পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক বস্তু পাওয়া যায়

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ আল মাজমূ' গ্রন্থে (১/৪৫৬) বলেছেন: আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেছেন: যদি কোনো ব্যক্তি পায়ের ফাটা অংশে চর্বি অথবা মোম অথবা আঠা গলিয়ে লেপন করে অথবা উভয় পায়ে মেহেদী লেপন করে এবং এগুলোর কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে উক্ত বস্তুটিকে পরিষ্কার করা আবশ্যক। কারণ, এটা ত্বক পর্যন্ত পানি পৌঁছানোর পথে বাঁধা প্রদান করে। যদি মেহেদীর রংটুকু শুধু অবশিষ্ট থাকে, কোনো শারীরিক অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে এটা ওযূর কোনো ক্ষতি করবে না। ওযূ সহীহ হবে। যদি তার অঙ্গসমূহের উপরে তরল তেলের ছাপ থাকে, এই অবস্থায় সে যদি ওযূ করে এবং ত্বকে পানি পৌঁছে দেয় এবং ত্বকের উপরে পানি প্রবাহিত করে, আর পানি সেখানে স্থির না থাকে, তাহলে তার ওযূ সহীহ হবে। কারণ, পানি স্থির থাকা শর্ত নয়। যা মুতাওয়াল্লী, উদ্দাহ ও আল বাহর গ্রন্থকার এবং অন্যান্য ফকীহগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন।

সকল প্রকার নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্যই কি নিয়্যাত করা শর্ত?

প্রথম মত: নিয়্যাত ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুম সহীহ হওয়ার শর্ত। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ববর্তী হাদীস: "আমলসমূহ একমাত্র নিয়্যাতের উপরে ভিত্তিশীল"।

দ্বিতীয় মত: ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুম নিয়্যাত ব্যতীত সহীহ হবে। এটা আওযাঈ ও হাসান বিন সালিহ এর মত। এই মতের পক্ষে ওযূর বিবরণ সম্বলিত আয়াতটি দ্বারা এইভাবে দলীল পেশ করা হয় যে, সেখানে নিয়্যাতের কথা উল্লেখ নেই। একইভাবে ওযূর বিবরণ সম্বলিত হাদীসগুলোতেও নিয়্যাতের কথা নেই।

তৃতীয় মত: ওযূ ও গোসল নিয়্যাত ব্যতীতই সহীহ হবে। কিন্তু তায়াম্মুম নিয়্যাত ব্যতীত সহীহ হবে না। এটা ছাওরী ও আবু হানীফার মত। আওযাঈ থেকেও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। দলীল হলো: উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: "আমলসমূহ একমাত্র নিয়্যাতের উপরে ভিত্তিশীল"।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৩৬৮), আল মাজমূ' (১/৩৫২), আল মুগনী (১/১১০) ।

যে ব্যক্তি কোনো নফল সালাত অথবা কুরআন পাঠ করার জন্য ওযূ করেছে তার জন্য কি উক্ত ওযূ দ্বারা অন্যান্য সালাত আদায় করা জায়েয হবে?

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মাসআলা: যখন কোনো ব্যক্তি নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যাতে অথবা ফরয বা নফল সালাতের উদ্দেশ্যে অথবা কুরআন পাঠ করার উদ্দেশ্যে অথবা জানাযার সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে ওযূ করে, তখন উক্ত ওযূ দ্বারা ফরয সালাত আদায় করা তার জন্য জায়েয আছে। ইমাম শাফেয়ী, আবু উবাইদ, ইসহাক, আবু ছাওর ও আমাদের মাযহাবের অন্যান্য আলেমগণের মতানুসারে। আমরা একই মত পোষণ করি।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৩৭১), আল মাজমূ' (১/৩৬৫), আল মুগনী (১/১১১) ।

استحباب التيمن في الأمور الشريفة المستطابة

পবিত্র কাজকর্ম করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব

৭. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

৯. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জুতা পরিধান করা, মাথার চুল আঁচড়ানো, পবিত্রতা অর্জনসহ যাবতীয় কাজ ডান দিক হতে করাকে পছন্দ করতেন। [সহীহ বুখারী হা/১৬৮, সহীহ মুসলিম হা/২৬৮।]

যেই বিষয়সমূহে ডান দিককে প্রাধান্য দেওয়া মুস্তাহাব

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আমাদের মাযহাবের এবং অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন: সম্মানযুক্ত সকল কর্মে ডান দিককে অগ্রাধিকার দেওয়া মুস্তাহাব। যেমন: ওযূ, গোসল, পোশাক, জুতা, মোজা ও পায়জামা পরিধান করা, মাসজিদে প্রবেশ করা, মিসওয়াক করা, সুরমা লাগানো, নখ কাটা, মোচ ছাঁটা, বগলের পশম উপড়ানো, মাথা মুণ্ডন করা, সালাতের শেষে সালাম ফিরানো, পায়খানা থেকে বের হওয়া, পানাহার, মুসাফা, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা, কোনো বস্তু গ্রহণ করা, দেওয়া ইত্যাদিসহ যেগুলো এই জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ।

আর এগুলোর বিপরীত ক্ষেত্রে বাম দিককে প্রাধান্য দেওয়া মুস্তাহাব। যেমন: নাক পরিষ্কার করা, ইস্তিনজা করা, পায়খানায় প্রবেশ করা, মাসজিদ থেকে বের হওয়া, মোজা, পায়জামা, পোশাক ও জুতা খুলে ফেলা এবং নোংরা-ময়লা বস্তু স্পর্শ করতে হয় এমন কাজ করা। এরপরে তিনি রহিমাহুল্লাহ এই বিষয়ে বর্ণিত দলীলসমূহ উল্লেখ করেছেন।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (১/৪১৮), শারহু মুসলিম (২৬৮), আল মুফহিম (১/৫১১), আল ফাতহ (১/২৬৯, ২৯০) ।

ওযূর ক্ষেত্রে দুই হাত ও দুই পায়ের ক্ষেত্রে ডান দিককে প্রাধান্য দেওয়া ওয়াজিব নয়

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তারা এই বিষয়ে ইজমা' পোষণ করেছেন: যে ব্যক্তি ডান দিকের পরিবর্তে বাম দিক থেকে ওযূ শুরু করল, তার জন্য পুনরায় ওযূ করার প্রয়োজন নেই। নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আলেমগণ এই বিষয়ে ইজমা' পোষণ করেছেন: ওযূর ক্ষেত্রে ডান দিককে বাম দিকের উপরে প্রাধান্য দেওয়া সুন্নাহ। যদি কেউ এর বিপরীত করে,

তাহলে সে অতিরিক্ত ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। তার ওযূ সহীহ হবে। শিয়ারা বলেছে: এটা ওয়াজিব। তবে শিয়াদের মতানৈক্য ধর্তব্য নয়।

তিনি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: বাম দিককে প্রাধান্য দিলে যদিও ওযূ জায়েয হবে, তথাপি সেটা মাকরূহ তানযিহী হবে। এই বিষয় ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ 'আল উম্ম' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ডান ও বাম দিকের মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়। আমরা এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত আছে বলে জানি না। কারণ, আল্লাহর কিতাবে উভয়টির তাৎপর্য একই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "এবং তোমাদের হাতসমূহ", "এবং তোমাদের পাসমূহ" (আল মায়িদাহ: ৬)। আর ফকীহগণ দুই হাতকে একটি অঙ্গ ও দুই পাকে একটি অঙ্গ হিসেবেই বিবেচনা করেন। আর একই অঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব হয় না।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৩৮৭), আল মুগনী (১/১৩৭), শারহু মুসলিম (২৬৮) ।

فضل إسباغ الوضوء وما يترتب على ذلك من امتياز هذه الأمة يوم القيامة على سائر الأمم

পূর্ণাঙ্গ রূপে উযূ করার শ্রেষ্ঠত্ব ও এ জন্য কিয়ামতের দিন সকল উম্মতের উপর এ উম্মতে মুহাম্মাদীর আলাদা শ্রেষ্ঠত্ব হবে।

١٠. عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: "إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ".

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: "إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ".

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: سَمِعْتُ خَلِيلِي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: "تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ" .

১০. নুআ'ইম আল মুজমীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে ওযূর চিহ্নের কারণে উজ্জ্বল অবস্থায় আহ্বান করা হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তার ঔজ্জ্বল্য ও শুভ্রতাকে বৃদ্ধি করতে চায় সে যেন তা করে। [সহীহ বুখারী হা/১৩৬, সহীহ মুসলিম হা/২৪৬]

অন্য একটি শব্দে বর্ণিত হয়েছে তিনি বললেন, আমি আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে ওযূ করতে দেখেছি, তিনি তার মুখমণ্ডল ও দুই হাত ধৌত করলেন। এমনকি তাঁর এই ধৌতকরণ দুই কাধ পর্যন্ত পৌছার উপক্রম হলো। এরপর তার দুই পা পায়ের নলার ওপর পর্যন্ত ধৌত করলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, ওযূর প্রভাবে তাদের হাত পা এবং মুখমণ্ডল থাকবে উজ্জ্বল। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতাকে বৃদ্ধি করতে চায় সে যেন তা করে। [সহীহ মুসলিম হা/২৪৬।]

মুসলিম এর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে: আমি (আবু হুরায়রা) আমার বন্ধুকে (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন: মুমিন ব্যক্তির অলঙ্কার ততদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে যে পর্যন্ত ওযূর পানি পৌঁছাবে। [সহীহ মুসলিম হা/২৫০।]

ওযূর মধ্যে হাতের দুই বাহু এবং পায়ের দুই নলার আংশিক অংশ ধৌত করার বিধান

প্রথম মত: ফরয সীমা অতিক্রম করা মুস্তাহাব নয়। সীমা দুইটি হলো: দুই হাতের কনুই এবং দুই পায়ের গোড়ালি। এটা মালেক ও মালেকের একদল অনুসারীর মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু কাইয়িম, সা'দী ও বাসসাম এর অভিমত। তাদের দলীলসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১ – আল্লাহ তা'আলার বাণী: "হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন তোমাদের চেহারা ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত করো এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করো, এবং তোমাদের পাসমূহ গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করো" (আল মায়িদাহ: ৬)। আয়াতে বিদ্যমান প্রমাণ: আয়াতটি দুই কনুই ও দুই গোড়ালি দ্বারা ফরযের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

২ – বুখারীতে (১৫৯) এবং মুসলিমে (২২৬) বর্ণিত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওযূর বিবরণ সম্বলিত। সেখানে বলা হয়েছে: "দুই কনুইসহ দুই হাত ও গোড়ালি পর্যন্ত দুই পা ধৌত করতে হয়"।

৩ – ইবাদত মনে করে ফরযের সীমালঙ্ঘন করাটা বিদআত। যা সাব্যস্ত করার জন্য দলীলের প্রয়োজন। আর আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এই হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে: "আমার

উম্মতকে কিয়ামতের দিবসে এমন অবস্থায় আহবান করা হবে, যখন তাদের ওযূর অঙ্গসমূহ ওযূর প্রভাবে সুদর্শন উজ্জ্বলতায় দিপ্তিমান থাকবে"। এই হাদীসটি ওযূর অঙ্গসমূহের উজ্জ্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

৪ – কোনো সাহাবী থেকে এটা বর্ণিত হয়নি: তারা এমন অর্থ কোনো নস (কুরআন হাদীসের দলীল) থেকে বুঝেছেন এবং ওযূর ক্ষেত্রে তারা ফরযের সীমালঙ্ঘন করেছেন। তবে আবু হুরায়রা ব্যতীত। তার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে: তিনি এই কাজ লুকিয়ে করতেন এই ভয়ে যে, মানুষ তাকে দেখলে বিষয়টিকে অদ্ভুত মনে করবে। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি গরমকালে যখন ওযূ করতেন, কখনো কখনো পানি তার বগল পর্যন্ত পৌঁছে যেত। আবু উবাইদ 'আত তাহুর' গ্রন্থে (১১৬) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন লাইছের লেখক আব্দুল্লাহ বিন সালিহ থেকে। সে দুর্বল রাবী। এটা ইবনু আবি শায়বাহ (১/৫৭) উমারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন: আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন হাফছ আল উমারী। তিনি দুর্বল রাবী। আলবানী রহিমাহুল্লাহ উভয় সূত্রই আয যঈফাহ গ্রন্থে (১০৩০) উল্লেখ করেছেন।

৫ – ওযূর বিষয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "যে ব্যক্তি এর চাইতে অতিরিক্ত করল, সে গুনাহ করল এবং সীমালঙ্ঘন করলে"। ইমাম নববী এই প্রমাণটিকে খণ্ডন করেছেন। এরপরে তিনি বলেছেন: যেহেতু এখানে উদ্দেশ্য হলো: ধৌত করার সংখ্যা বৃদ্ধি করা। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্বিতীয়ত মত: ওযূর সময় দুই হাতের কনুই ও দুই পায়ের গোড়ালির সীমার পরের অংশ ধৌত করা মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তারা মুস্তাহাব সীমার দৈর্ঘ্য নির্ধারণ নিয়ে মতানৈক্য করেছেন। কেউ বলেছেন: দৈর্ঘ্যের সীমা হলো: কাঁধ এবং হাঁটু পর্যন্ত। কেউ বলেছেন: বাহু এবং পায়ের নলার অর্ধসীমা পর্যন্ত। কেউ বলেছেন: কোনো সীমা নির্ধারণ ছাড়াই সাধারণরূপে অতিরিক্ত অংশ ধৌত করা মুস্তাহাব। এই মতগুলো সবই শাফেয়ীদের মত।

এই মতের প্রমাণ হলো: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে: আমি আমার খলীল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "মুমিনের অলংকার সে পর্যন্ত পৌঁছাবে, যতদূর পর্যন্ত তার ওযূর পানি পৌঁছাবে"। আর তার বক্তব্য: "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বীয় উজ্জ্বলতা ও শুভ্রতাকে আরো দীর্ঘ করতে পারে, সে যেনো তা করে"। হাদীসে বিদ্যমান এই অংশটি আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিজের পক্ষ থেকে সংযুক্ত, যা ইবনু তাইমিয়্যাহ ও অন্যান্যরা বলেছেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এই হাদীসটি উল্লেখ করার পরে বলেছেন: কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, বাহু ধৌত করা উজ্জ্বলতার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করার মাধ্যম। কিন্তু এই ধারণার কোনো তাৎপর্য নেই। কারণ, উজ্জ্বলতা থাকবে চেহারায়, হাতে বা পায়ে নয়। আর হাতের ও পায়ের উজ্জ্বলতা ও শুভ্রতা দীর্ঘ করা সম্ভব নয়। কারণ, সম্পূর্ণ চেহারা ধৌত করা যায়। কিন্তু মাথা ধৌত করা যায় না।

আর মাথায় কোনো শুভ্রতা নেই। আর উজ্জ্বলতা দীর্ঘ করা মুস্তাহাব নয়। বরং এটা দীর্ঘ করা অঙ্গ বিকৃতির শামিল।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল ফাতাওয়া (১/২৭৯), আল মাজমূ' (১/৪৫৮), শারহু মুসলিম (২৪৬), আল ফাতহ (১/২৩৬), আত তায়সির (১/২৩) ।

কিয়ামতের দিবসে যে ওযূ করেনি এবং সালাত আদায় করেনি একইভাবে শিশুদেরকে কীভাবে চিহ্নিত করা হবে?

শায়খুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মাজমূ'উল ফাতাওয়া গ্রন্থে (২১/১৭১) বর্ণিত হয়েছে: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী সম্পর্কে: "নিশ্চয় তোমরা কিয়ামতের দিন ওযূর প্রভাবে উজ্জ্বল শুভ্র অবস্থায় আগমন করবে"। এটা মুসল্লীদের বৈশিষ্ট্য। তাহলে সালাত পরিত্যাগকারী অন্যান্য মুকাল্লাফ ব্যক্তিদেরকে এবং শিশুদেরকে কীসের দ্বারা চেনা যাবে?

তিনি উত্তর দিলেন: আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন। এই হাদীসটি এই বিষয়ের দলীল যে, একমাত্র ঐ ব্যক্তিকেই চেনা যাবে, যে শুভ্র-উজ্জ্বল থাকবে। তারা হলো ঐ সকল ব্যক্তি, যারা সালাতের জন্য ওযূ করে। আর শিশুরা বয়স্ক পুরুষদের অনুগত। আর যারা কখনোই ওযূ করেনি এবং সালাত আদায় করেনি, হাদীসের তাৎপর্য অনুসারে তাদেরকে কিয়ামত দিবসে চেনা যাবে না।

١. بَابُ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَالِاسْتِطَابَةِ

অধ্যায়-১: পায়খানায় প্রবেশ করা এবং উত্তম রূপে পবিত্রতা অর্জন করা

তার বক্তব্য: بابِ — শব্দের অর্থ হলো: কোনো বস্তুর নিকটে পৌঁছানোর রাস্তা। পরিবাহী। মাসজিদ ও বাড়ীর দরজা হলো: যেই স্থান দিয়ে সেখানে প্রবেশ করা হয়।

তার বক্তব্য: خلاء — শব্দটি দীর্ঘ টান দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। প্রকৃত অর্থ: শূণ্যস্থান। মাজাযী অর্থে শব্দটা প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্ধারিত স্থানকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। খলা (নির্জন স্থান), কানিফ (মল-বর্জ্য রাখার স্থান) ও মিরহাদ (পায়খানা) সবগুলোই প্রয়োজন পূরণের স্থান।

তার বক্তব্য: إستطابة – (ইস্তিতাবাহ), إستنجاء (ইস্তিনজা) ও إستجمار (ইস্তিজমার) শব্দগুলো 'উভয় দিকের রাস্তা থেকে নির্গত নাপাককে নির্গমনস্থল থেকে পরিষ্কার করাকে বুঝায়। সুতরাং ইস্তিতাবাহ ও ইস্তিনজা উভয়টি কখনো পানি ও পাথরের ঢিলা দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। তবে ইস্তিজমার শব্দটি পাথরের ঢিলা ব্যবহারের সঙ্গে নির্দিষ্ট। শব্দটি حجار – থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো: ছোট ছোট নুড়ি পাথর। আর ইস্তিতাবাহ শব্দটির অর্থ শান্তি কামনা করা। ইস্তিনজার প্রক্রিয়াকে এই শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। কারণ, নাপাকি পরিত্যাগ করার ফলে ব্যক্তির মন প্রশান্তি লাভ করে। আর ইস্তিনজার ব্যাপারে আযহারী বলেছেন: শামির বলেছেন: শব্দটি আরবী বাগধারা نجوت الشجرة وأنجيتها – বাক্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। বাক্যটি গাছ কাটার সময় ব্যবহার করা হয়। যেনো গাছকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়া হলো। দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৪৯), আল মাজমূ' (২/৮৬), শারহু মুসলিম (৩৭৫), আল ফাতহ (১/২৪৪) ।

١١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –: أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" .

১১. আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট দুষ্ট পুরুষ জিন ও দুষ্ট মেয়ে জিন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। [সহীহ বুখারী হা/১৪২, সহীহ মুসলিম হা/৩৭৫ ।]

পায়খানায় প্রবেশের সময় নাপাকি ও নাপাক সত্তাসমূহ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা মুস্তাহাব

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ইমাম আহমাদ বলেছেন: যখন কোন ব্যক্তি পায়খানায় প্রবেশ করবে, তখন বলবে: أعوذ بالله من الخبث والخبائث – "আমি আল্লাহর নিকট সমূহ নাপাকি থেকে এবং নাপাক জিনদের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। আমি যতবার ওযূর স্থানে প্রবেশ করা কালে এটা বলিনি, ততবারই আমার সঙ্গে স্বভাব বিরুদ্ধ ঘটনা ঘটেছে।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই দুআটি পাঠ করা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চাই স্থানটি লোকালয়ে হোক অথবা মরুদ্যানে হোক।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৬৭), আল মাজমূ' (২/৮৯), শারহু মুসলিম (৩৭৫) ।

পায়খানায় প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করার বিধান

লেখক কর্তৃক বর্ণিত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে সহীহাইনের বর্ণনার বাহিরে অতিরিক্ত একটি শব্দ সংযুক্ত হয়েছে, আর তা হলো: বিসমিল্লাহ। শায়েখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এটা আমার নিকট শায শব্দ। কারণ, এটা সহীহাইনে বর্ণিত আনাসের সূত্রে বর্ণিত আব্দুল আযিয বিন সুহাইবের হাদীস ও অন্যান্য রাবীদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। যেদিকে পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এরপরে তিনি রহিমাহুল্লাহ আরেকটি সূত্র উল্লেখ করেছেন। এরপরে বলেছেন, মোটকথা এই হাদীসে বর্ণিত বিসমিল্লাহ শব্দটি আনাস থেকে দুইটি সূত্রে বর্ণিত, একটি শায, অপরটি মুনকার। কিন্তু তিনি রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন: পায়খানায় প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ শরীআতসম্মত হওয়ার দলীল পাওয়া যায় আলী, আনাস, আবু সাঈদ, ইবনু মাসউদ ও মুয়াবিয়া বিন হিদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর হাদীস থেকে।

হাদীসটি হলো: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "পায়খানায় প্রবেশকালে আদম সন্তানদের সতর ও জিনদের চোখের মাঝে অন্তরায় হলো এই শব্দটি পাঠ করা: বিসমিল্লাহ। তিনি মনে করেন যে, হাদীসগুলো সামষ্টিকরূপে সহীহ এর স্তর পর্যন্ত উন্নীত হয়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

আলেমগণের মত হলো:

প্রথম মত: পায়খানায় প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করা মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: পূর্ববর্তী হাদীসসমূহ।

দ্বিতীয় মত: বিসমিল্লাহ বলা শরীআতসম্মত নয়। এটা মালেকী মাযহাবের একটি মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত হলো: প্রথম মতটি। যদি উক্ত বিষয়ে দলীল সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দলীলগুলো যঈফ। দেখুন আল জামিউল কামিল ২/১৩১, তাসহীলুল ফিকহ ১/১৬৪, ১/১৩৯।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৬৭), আল মাজমূ' (২/৮৯), আল ইরওয়া (৫০), তামামুল মিন্নাহ (৫৮), আদাবুল খলা (৩৭) ।

কোন স্থানের সঙ্গে এই দুআটি নির্দিষ্ট? আর কখন তা পাঠ করতে হয়?

হাফেয রহিমাহুল্লাহ আল ফাতহ গ্রন্থে (১/২৪৪) বলেছেন: এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু দুইটি:

এক: এই দুআটি কি মলত্যাগের জন্য নির্ধারিত স্থানগুলোর সঙ্গে নির্দিষ্ট; যেহেতু সেখানে শয়তানরা উপস্থিত থাকে। যেমনটি যায়েদ বিন আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে সুনানের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। নাকি এটা ঐ অবস্থাকেও অন্তর্ভুক্ত করবে যখন ব্যক্তি

ঘরে থেকে কোনো পাত্রে পেশাব করে? সবচেয়ে সহীহ মত হলো: দ্বিতীয়টি যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রয়োজন পূর্ণ করা শুরু না করবে।

দুই: এই দুআটি কখন পাঠ করবে?

যারা ঐ অবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করাকে মাকরূহ বলেছেন, তারা ব্যাখ্যা করেন: ইস্তিনজার জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রবেশের পূর্বেই দুআটি পাঠ করবে। আর অন্যান্য স্থানে কাজটা শুরু করার পূর্বে পাঠ করবে। যেমন: উদাহরণ স্বরূপ কাপড় গুটানো। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তারা ভুলে যাওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে তারা বলেছেন: এমন ব্যক্তি অন্তর থেকে আউযুবিল্লাহ পাঠ করবে, মুখ নয়। আর যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণকে বৈধ বলেছেন, তাদের মতে কোনো ব্যাখ্যায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

আমি বলব: অধিকাংশ আলেমের মতই সঠিক। তবে এই কথাটুকু সঠিক নয়: অন্তর থেকে আউযুবিল্লাহ পাঠ করবে, মুখে নয়। পূর্বেই উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস অতিবাহিত হয়েছে — যা এই গ্রন্থের প্রথম হাদীস — যিকিরের স্থান হলো মুখ। আর ইস্তিআযাহ একটি যিকির, বিধায় তা অন্তর দ্বারা যথেষ্ট হয় না। এই নীতির ভিত্তিতে: ইস্তিনজা চলাকালে ইস্তিআযা পাঠ করা হবে না। আল্লাহই ভালো জানেন।

পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময়ের যিকির

এই বিষয়ে আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার একটি হাদীস রয়েছে: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা থেকে বের হতেন, তিনি বলতেন: "গুফরানাকা" অর্থাৎ: আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যা আবু দাউদ (৩০), তিরমিযী (৭) ইউসুফ বিন আবি বুরদাহ এর সূত্রে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমাকে আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন। এরপরে তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইউসুফ বিন আবি বুরদাহ এর ব্যাপারে ইমাম ইজলী বলেছেন: তিনি কুফী সিকাহ রাবী। হাকিম বলেছেন: তিনি আবু মুসার পরিবারভুক্ত সিকাহ রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। আমি কাউকে তার সমালোচনা করেছে বলে জানি না। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহদের মাঝে উল্লেখ করেছেন। যাহাবী আল কাশিফ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: তিনি সিকাহ রাবী। তাকরীব গ্রন্থকার বলেছেন: মাকবুল রাবী। আলবানী ইরওয়া গ্রন্থে (১/৯১) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিনি বলেছেন: হাদীসটিকে হাকিম সহীহ বলেছেন। একইভাবে আবু হাতিম রাযী, ইবনু খুযায়মাহ, ইবনু হিব্বান, ইবনু জারুদ, নববী ও যাহাবী সহীহ বলেছেন।

মোট কথা: হাদীসটি হাসান। সেই ভিত্তিতে: পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় এই দুআটি পাঠ করা মুস্তাহাব।

পায়খানায় প্রবেশের সময় বাম পা আগে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। আর বের হওয়ার সময় ডান পা আগে বের করা মুস্তাহাব

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই আদবটি মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে সকলে একমত। এটা একটি পরিচিত মূলিনীতি। আর তা হলো: যেই কাজটির সাথে সম্মান-মর্যাদা সংযুক্ত, সেটা ডান দিক থেকে শুরু করতে হয়। আর বিপরীত কাজটি বাম দিক থেকে শুরু করতে হয়। আমি বলব: একইভাবে এই ঐকমত্য ইবনু কাসিম তার টীকায় বর্ণনা করেছেন। আর (১০) নং হাদীসের আলোচনায় ডান দিককে প্রাধান্য দেওয়া মুস্তাহাব এমন ক্ষেত্র এবং বাম দিককে প্রাধান্য দেওয়া মুস্তাহাব এমন ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৬৭), আল মাজমূ' (২/৯১), হাশিয়াতুর রওদ (১/১২২) ।

١٢. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ الْغَائِطَ وَلَا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا". قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ , فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

১২. আবূ আইয়ূব আল আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যখন তোমরা পায়খানায় যাবে তখন কিবলাকে সম্মুখে কিংবা পিছনে রাখবে না। বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে'। আবূ আইয়ূব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা যখন শামদেশে আসলাম, তখন আমরা কতিপয় পায়খানাকে কা'বার দিকে করে তৈরী করা দেখতে পেলাম। সেজন্য আমরা সেই দিক থেকে কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। [সহীহ বুখারী হা/৩৯৪, সহীহ মুসলিম হা/২৬৪]

١٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ، مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ.

১৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার এক প্রয়োজনে (আমার বোন উম্মুল মুমিনীন) হাফছার ঘরের ছাদে উঠলাম, তখন দেখলাম, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিচে এক ঘেরা জায়গায়) কিবলাকে পিছনে রেখে সিরিয়ার দিকে মুখ করে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করছেন। অপর বর্ণনায়, বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে স্বীয় প্রয়োজনে বসেছেন। [সহীহ বুখারী হা/১৪৮, ১৪৫, সহীহ মুসলিম হা/২৬৬]

ইস্তিনজা করার সময় কিবলামুখী হয়ে বসা বা কিবলার দিকে পিঠ করে বসার বিধান

এই মাআলায় আলেমগণ আটটি মত দিয়েছে: এগুলোর মাঝে অধিকতর সম্ভাব্য সঠিক মত হলো তিনটি:

প্রথম: নিষেধাজ্ঞাটি লোকালয়ে এবং নির্জন স্থানের ক্ষেত্রে মাকরূহ তানযিহী স্বরূপ। এটা নাখঈ, আবু হানীফা, আহমাদ, আবু ছাওর ও আবু আইয়ুব আল-আনসারী থেকে বর্ণিত একটি মত। তারা ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসকে আবু আইয়ুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের নিষেধাজ্ঞাকে শিথিলকারী সাব্যস্ত করেছেন। উভয় হাদীসই লেখক উল্লেখ করেছেন দলীলসমূহের মাঝে সমন্বয়ের স্বার্থে। নিষেধাজ্ঞাকে মাকরুহে পরিবর্তনকারী দলীলগুলোর মাঝে অন্যতম হলো: জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস। তিনি বলেছেন: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কিবলার বিপরীতমুখী হতে বা কিবলামুখী হতে নিষেধ করেছেন যখন আমরা পানি প্রবাহিত করি। তিনি বলেন: এরপরে আমরা তাঁর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তাঁকে কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে দেখলাম"। আহমাদ (৩/৩৬০), হাদীসটির সনদ হাসান। আমাদের শায়েখ রহিমাহুল্লাহ রচিত সহীহ আল মুসনাদ গ্রন্থে (১/১৯৩) বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: নির্জন স্থানে ও লোকালয়ের ক্ষেত্রে হারাম। এটা আবু আইয়ুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, মুজাহিদ, ইবরাহিম, সুফয়ান ছাওরী ও আবু ছাওর এর মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। তারা আবু আইয়ুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের সাধারণ মর্ম দ্বারা দলীল পেশ করেন। যা লেখক উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় মত: নির্জন স্থানের ক্ষেত্রে হারাম। কিন্তু লোকালয়ের ক্ষেত্রে জায়েয। এটা আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন উমার, শা'বী, মালেক, শাফেয়ী ও ইসহাকের মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। তারা লোকালয়ে এটা জায়েয হওয়ার পক্ষে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি দ্বারা দলীল পেশ করেন। যা লেখক উল্লেখ করেছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটিই প্রাধান্যযোগ্য পূর্ববর্তী দলীলসমূহের মাঝে সমন্বয় করার স্বার্থে। তৃতীয় মতটিও তুলনামূলক অধিকতর সঠিক। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৩২৪), আত তামহিদ (১/৩১০), আল মুহাল্লা (১৪৬), আল মাজমূ' (২/৯৪), আল ফাতহ (১/২৪৬), আন নাইল (১/২৭৩), আস সাইল (১/১৯৫)।

ইস্তিনজা করার সময় বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখী হয়ে বসার বিধান

প্রথম মত: ইস্তিনজা করার সময় বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখী হওয়া হারাম। যা ইবরাহিম নাখঈ, ইবনু সিরিন ও কিছু শাফেয়ী আলেমদের মত। তাদের দলীল হলো: "মা'কিল আল আসাদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম পেশাব করা অথবা মলত্যাগের সময় উভয় কিবলার অভিমুখী হতে নিষেধ করেছেন"। ইবনু আবি শায়বাহ (১/১৩৯) বর্ণনা করেছেন বনু ছালাবার আযাদকৃত দাস এর সূত্রে। যে অজ্ঞাত রাবী। ।

দ্বিতীয় মত: মাকরূহ হবে। হারাম হবে না। খাত্তাবী কা'বাকে পিছনের দিকে না রেখে বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখী হলে ইস্তিনজা করা হারাম হবে না মর্মে ইজমা' সাব্যস্ত হওয়ার দাবি করেছেন। এমনটি নববীও দাবি করেছেন এবং এটা মাকরূহ হবে, হারাম হবে না। তবে এই দাবির ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। কারণ, এই মতের বিরোধিতাকারীও আছে। তাদের আলোচনা প্রথম মতে উল্লেখ করা আছে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়: এটা হারাম হবে না, মাকরূহ হবে। যেহেতু হারাম হওয়ার বা মাকরূহ হওয়ার পক্ষে কোনো দলীল নেই। এটা শাওকানী রহিমাহুল্লাহ এর বিশ্লেষণের বাহ্যিক মর্ম। বরং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখী হয়ে ইস্তিনজা করেছেন এটা সাব্যস্ত হয়েছে। যেমনটি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে বিদ্যমান, যা লেখক একটি বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (২/৯৪), আল ফাতহ (১/২৪৬), আস সাইল (১/১৯৭)।

সূর্য ও চন্দ্র অভিমুখী হয়ে ইস্তিনজা করার বিধান

প্রথম মত: লজ্জাস্থানকে সূর্য ও চন্দ্র মুখী করা মাকরূহ। যা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: উব্বাদ বিন কাছির থেকে, তিনি উসমান আল আ'রাজ থেকে, তিনি হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের সাতটি দল এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপরে তিনি তাদের তালিকা উল্লেখ করেছেন এবং দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। সেখানে বলা হয়েছে: তিনি পুরুষকে সূর্য ও চন্দ্রমুখী হয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। উব্বাদ বিন কাছিরের ব্যাপারে আত তাকরীব গ্রন্থে বলা হয়েছে: তিনি মাতরূক রাবী। নববী বলেছেন: হাদীসটি বাতিল। হাফেয বলেছেন: হাদীসটি বাতিল। এর কোনো ভিত্তি নেই।

দ্বিতীয় মত: উভয়টির দিকে মুখোমুখী হয়ে বা পিছন দিকে রেখে ইস্তেঞ্জা করা মাকরূহ। এই মতটি কিছু হানাফী এবং কিছু শাফেয়ী আলেম গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় মত: কোনো অবস্থাতেই সূর্য ও চন্দ্রের মুখোমুখী হয়ে বা পিছনদিকে রেখে ইস্তিনজা করা মাকরূহ নয়। এটা কিছু মালেকী, কিছু শাফেয়ী ও কিছু হাম্বলী আলেমগণের মত। যা ইমাম নববী, শাওকানী, ইবনু উসাইমীন গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল হলো: মাকরূহ হওয়ার পক্ষে কোনো সহীহ দলীল নেই। একইভাবে আবু আইয়ুব এর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "কিন্তু পূর্ব অথবা পশ্চিমমুখী হয়ে ইস্তিনজা করো"। এখানে পুর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ করে বা পিঠ দিয়ে বসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই

নিয়মের ভিত্তিতে: সর্বাবস্থায় উভয়টি পূর্ব ও পশ্চিমে বা কোনো একটি অবশ্যই পশ্চিমে বা পূর্বে থাকবেই।

প্রাধান্যযোগ্য মত: তৃতীয় মতটি। শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আর সূর্য ও চন্দ্রের দিকে মুখ করে ইস্তিনজা করার এই মাসআলাটি আলেমগণের একটি বিরল শাখাগত মাসআলার গবেষণা। কারণ, এই বিষয়ে কোনো সহীহ, হাসান ও দুর্বল দলীলও নেই। যা বর্ণিত হয়েছে, তা একমাত্র আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরে মিথ্যারোপ মাত্র। যা মিথ্যাবাদীদের বর্ণনা। আর যদি কিবলার প্রতি কিয়াস করে এই মত দেওয়া হয়, তাহলে সেলাইকারীর জন্য কাপড়ের ছেঁড়া-ফাটা আরো বৃদ্ধি পাবে। আর এমন কিয়াসকারীকে বলা হবে: "হে সাদ, উটকে এভাবে ঘাটে আনতে হয় না"। এর চাইতেও আশ্চর্যের বিষয় হলো, সূর্য চন্দ্রের সঙ্গে উজ্জ্বল নক্ষত্রমালাকে জুড়ে দেওয়া। যেখানে মূল বস্তুটির মাসআলাই বাতিল, সেখানে শাখাগত মাসআলার অবস্থা কী হতে পারে। এমন কিয়াসকারীর উচিত আসমানকেও সংযুক্ত করে দেওয়া। কারণ, আসমানেরও মহা সম্মান রয়েছে। কারণ, সেটা ফেরেশতাগণের অবস্থানস্থল।

এরপরে জমিনকেও সংযুক্ত করা উচিত। কারণ, জমিন ইবাদতের ও আনুগত্যের স্থান। আল্লাহর নেককার বান্দাদের ঠিকানা। আর তখন প্রয়োজন পূরণকারীর জন্য প্রশস্ত জমিন সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়বে এবং ইস্তিনজা করার সময় তাকে এই জগৎ থেকে বের হয়ে যেতে হবে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে কী আভিনব শিথিলতা, যা দেখে কখনো হাসতে হয়, আবার কখনো কাঁদতে হয়।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৬৩), আল মাজমূ' (২/১১০), আত তালখীছ (১/১০৩), আস সাইল (১/১৯৭), আশ শারহুল মুমতি' (১/১২৩), আদাবুল খালা (২১৯)।

١٤. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ".

১৪. আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যেতেন আমি ও আমার ন্যায় একটি ছেলে চামড়ার তৈরী থলেতে করে পানি ও বর্শা নিয়ে যেতাম। তিনি উক্ত পানি দ্বারা ইস্তিনজা তথা সৌচকার্য করতেন। [সহীহ বুখারী হা/১৫০, মুসলিম হা/২৭১]

ইস্তিনজা করার বিধান

প্রথম মত: পেশাব ও মল হতে ইস্তিনজা করা ওয়াজিব। সামনের বা পেছনের কোনো একটি রাস্তা দিয়ে নির্গত নোংরা নাপাকি থেকে মুক্ত হওয়াকে ইস্তিনজা বলা হয়। এটা সালাত সহীহ হওয়ার শর্ত। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো:

আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। একইভাবে সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেছেন; "আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি পাথর খণ্ডের কম পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন"। সহীহ মুসলিম (২৬২)।

দ্বিতীয় মত: এটা সুন্নাহ। এটা আবু হানীফা, মুযানীর মত। মালেকের একটি বর্ণনা। তাদের দলীল হলো: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: "যে ঢিলা দ্বারা ইস্তিনজা করবে, সে যেনো বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এই নিয়ম পালন করল, সে উত্তম কাজ করল। আর যদি কেউ না করে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। এর সনদ দুর্বল। সনদে দুইজন মাজহুল ব্যক্তি রয়েছে। এর আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। তারা বলেছেন: যেহেতু এটা এমন নাপাকি, যার ছাপ দূর করা ওয়াজিব নয়, বিধায় এর মূল অস্তিত্বও দূর করা ওয়াজিব নয়। যেমন: চিংড়ির রক্ত।

এই যুক্তির উত্তর হলো: চিংড়ির রক্ত দূর করা অতিবড় কষ্টসাধ্য বিষয়। পক্ষান্তরে ইস্তিনজার বিষয়টি তার বিপরীত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৫০), আল মাজমূ' (২/১১১) ।

পানি দ্বারা পরিষ্কার করার পদ্ধতি

প্রথম মত: পানি দ্বারা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা ধর্তব্য নয়। বরং এই ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হলো নাপাকযুক্ত স্থানটি পূর্বের ন্যায় পরিচ্ছন্ন হওয়া। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস: তিনি বলেছেন: ফাতিমা বিনতু আবি হুবাইশ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলেন। এরপরে তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমি ইস্তেহাযাগ্রস্থ একজন নারী। আমি পবিত্র হতে পারি না। সেখানে বলা হয়েছে: "যখন তোমার হায়েয আসবে, তখন সালাত পরিত্যাগ করবে। আর যখন তা চলে যাবে, তখন তুমি রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করবে। এরপরে সালাত আদায় করবে"। সহীহ বুখারী (২২৮), সহীহ মুসলিম (২২২) ।

হাদীসটি থেকে দলীল উপস্থাপন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রক্ত ধুয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাকে তিনি কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করে দেননি। একইভাবে এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ, যেগুলোতে সংখ্যার কথা উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় মত: নাপাকযুক্ত স্থানটি সাতবার ধৌত করতে হবে। এটা হাম্বলী মাযহাবের একটি মত। তাদের দলীল হলো: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের বর্ণনা: "তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সেটাকে সাতবার ধৌত করার আদেশ দিয়েছেন"। হাদীসটির আলোচনা ৭ নং হাদীসের অধীনে অতিবাহিত হয়েছে। এই মতের উত্তর হলো: এটা মুগাল্লাযা নাপাক।

তৃতীয় মত: নাপাকযুক্ত স্থানটি তিনবার ধৌত করতে হবে। এটা হাম্বলী মাযহাবের তৃতীয় মত। তাদের দলীল হলো: এই মাসআলার পূর্বের মাসআলায় বর্ণিত সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি। সেখানে বলা হয়েছে: "অথবা তিনটির কম ঢিলা দ্বারা ইস্তিনজা করতে তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন"। আর আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি সহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে: "যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তখন সে যেনো তার হাত তিনবার ধৌত করা পর্যন্ত পাত্রে না রাখে"। হাদীসটি ৪ নং হাদীসের অধীনে বর্ণিত হয়েছে।

এই দলীলের উত্তর হলো: পানি আর পাথরের ঢিলার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। পাথরের ঢিলা পূর্ণরূপে নাপাকি দূর করতে পারে না। এই জন্যই এখানে সংখ্যাকে শর্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পানি ভিন্ন। কারণ, এটা পূর্ণরূপে মূল নাপাকি দূর করতে পারে। এমনকি নাপাকির কোনো চিহ্ন পর্যন্তও বাকি থাকে না।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা এবং কোনো আদেশ সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৬১), আদাবুল খলা (২৮৯) ।

পানি থাকা সত্ত্বেও যদি শুধু পাথরের ঢিলা ব্যবহার করা হয়

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যদি শুধুমাত্র পাথরের ঢিলা ব্যবহার করা হয়, তবুও সেটা যথেষ্ট হবে। এই বিষয়ে আলেমগণের মাঝে কোনো মতানৈক্য নেই। এই বিষয়ে আমাদের বর্ণিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে। আর যেহেতু এই বিষয়ে সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর ইজমা' সাব্যস্ত হয়েছে।

কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আমাদের মাযহাবের আলেমগণের মাঝে ইবনু হাবীব বিরল মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন: পানি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পাথরের ঢিলা ব্যবহার জায়েয নেই।

এটার পক্ষে কোনো দলীল নেই। যেহেতু সহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে সাব্যস্ত হয়েছে: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোটায় পানি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পাথরের ঢিলা ব্যবহার করেছেন। যেই লোটা নিয়ে আবু হুরায়রা তাঁর পেছনে পেছনে হাটছিলেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৫১), আল মুফহিম (১/৫২০), আল মাজমূ' (২/১১৭) ।

ইস্তিনজায় কোনটি অধিক উত্তম পানি ব্যবহার করা নাকি ঢিলা ব্যবহার করা?

প্রথম মত: পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা অধিক উত্তম। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: আনাস বিন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন: যেহেতু এটা নাপাকযুক্ত স্থানটিকে পবিত্র করে। মূল নাপাকি এবং নাপাকির চিহ্ন দূর করে। আর এটা পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রেও অধিক কার্যকর।

দ্বিতীয় মত: পাথরের ঢিলা ব্যবহার অধিক উত্তম। এটা আহমাদ এর একটি বর্ণনা। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ, ইবনু যুবাইর, এবং হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত: তারা পানি দ্বারা ইস্তিনজা করার বিরোধিতা করেছেন। একইভাবে সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব, আতা, হাসান থেকে মতটি বর্ণিত হয়েছে। এই মতের দলীল হলো: পাথরের ঢিলার ব্যবহার অধিকাংশ সাহাবীদের নিকট পরিচিত আমল ছিল। তারা বলেন: যেহেতু পানি আহারযোগ্য। তাই (যথাসাধ্য) এর সম্মান করা ওয়াজিব। আর এর দ্বারা ইস্তিনজা করা এর জন্য অপমানকর। আর যেহেতু এর দ্বারা ইস্তিনজা করা এটা কে নষ্ট করার শামিল।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি।

দ্রষ্টব্য: আল মুফহিম (১/৫২০), আল মুগনী (১/১৫১), আল মাজমূ' (২/১১৭), আদাবুল খলা (৫৬৪) ।

পাথরের ঢিলা ও পানি উভয়টিকে একত্রে ব্যবহার করা যায়?

অধিকাংশ আলেমের মতে, উভয়টিকে একত্রে ব্যবহার করা মুস্তাহাব। আর পাথরের ঢিলা পূর্বে ব্যবহার করতে হবে নাপাকির পরিমাণ হ্রাস করার লক্ষ্যে। এরপরে পানি ব্যবহার করতে হবে। তাদের দলীল হলো: ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস: তিনি বলেছেন: "যখন কুবার অধিবাসীদের শানে এই আয়াত নাযিল হলো: "এখানে এমন ব্যক্তিগণ অবস্থান করেন, যারা পবিত্র থাকতে পছন্দ করেন। আর আল্লাহ তা'আলা পবিত্র থাকা ব্যক্তিদেরকে পছন্দ করেন" (আত তাওবাহ: ১০৮), তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাদের পবিত্রতার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন: আমরা পাথরের ঢিলার পরে পানি ব্যবহার করি"। বাযযার কাশফুল আসতার গ্রন্থে

(২৪৭) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ দুর্বল। কারণ, এটা আব্দুল্লাহ বিন শাবীব ও মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয বিন উমার এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তারা উভয়েই মাতরুক রাবী।

শায়েখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: পানি ও পাথরের ঢিলা একত্রে ব্যবহার করার বিষয়টি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সনদে সাব্যস্ত হয়নি। ফলে উভয়টিকে একত্রে ব্যবহার করার মতটিতে দীনের মাঝে বাড়াবাড়ির শামিল হতে পারে বলে ভয় করছি। কারণ, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ ছিল যেকোনো একটির উপরে ক্ষান্ত করা। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শই সর্বোত্তম আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট আদর্শ হলো দীন বহির্ভূত নতুন বিদআত পালন করা।

আর কুবাবাসীদের পানি ও পাথরের ঢিলা একত্রে ব্যবহার ও তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী: "এখানে এমন ব্যক্তিগণ অবস্থান করেন, যারা পবিত্র থাকতে পছন্দ করেন। আর আল্লাহ তা'আলা পবিত্র থাকা ব্যক্তিদেরকে পছন্দ করেন" (আত তাওবাহ: ১০৮) অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনাটির সনদ দুর্বল। যা দ্বারা দলীল পেশ করা যায় না। যেটাকে ইমাম নববী, হাফেয ও অন্যান্য মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন। মূল হাদীসটি আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে ঢিলা ব্যবহারের উল্লেখ নেই। এই জন্যই আবু দাউদ হাদীসটিকে "পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ" এ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির অনেকগুলো শাহেদ বিদ্যমান, যেগুলোতে কোথাও পাথরের ঢিলার বিবরণ নেই।

আমি বলব: পাথরের ঢিলা আর পানি উভয়টির একত্রিত ব্যবহার দীনের মাঝে বাড়াবাড়ির শামিল, এই কথাটি সমালোচনার যোগ্য। যেহেতু এটার জায়েয হওয়াটা সুস্পষ্ট। কারণ, এটা নোংরা পরিষ্কারের শামিল। আর এই পদ্ধতিতে পরিষ্কার করাটা পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

শায়েখ আল উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তৃতীয় বিষয় হলো: পাথরের ঢিলা দ্বারা ইস্তিনজা করা এরপরে পানি ব্যবহার করা। এটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু পবিত্রতার মৌলিক উদ্দেশ্য সাধনে এটা অধিক কার্যকরী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৫২), আল মাজমূ' (২/১১৭), তামামুল মিন্নাহ (৬৫), আশ শারহুল মুমতি' (১/১৩১), আদাবুল খলা (৫৬৭) ।

ঘুমিয়েছে অথবা বায়ু নির্গত হয়েছে এমন ব্যক্তির জন্য ইস্তিনজা জরুরী নয়

খিরাকী বলেছেন: যে ব্যক্তি ঘুমিয়েছে অথবা যার বায়ু নির্গত হয়েছে এমন ব্যক্তির জন্য ইস্তিনজা করা জরুরী নয়।

ইবনু কুদামা বলেছেন: এই বিষয়ে আমরা কোনো মতানৈক্য আছে বলে জানি না। আবু আব্দিল্লাহ – অর্থাৎ আহমাদ বিন হাম্বাল – বলেছেন: বায়ু নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাবে এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নায় ইস্তিনজার কোনো বিধান নেই। বরং তার উপরে ওযূ করা জরুরী।

ইমাম নববী বলেছেন: আলেমগণ এই বিষয়ে ইজমা' করেছেন: বায়ু নির্গত হওয়া, ঘুমানো, মহিলাদেরকে স্পর্শ করা এবং পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করাতে ইস্তিনজা ওয়াজিব হয় না। শীআদের একটি সম্প্রদায় থেকে বর্ণিত হয়েছে: এটা ওয়াজিব। আর শীআদের মতানৈক্য গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৪৯), আল মাজমূ' (২/১১৩) ।

ইস্তিনজার জন্য নিয়্যাতের বিধান কী?

প্রথম মত: শারীরিক নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য নিয়্যাতের শর্ত নেই। এমন একটি বিষয় হলো ইস্তিনজা। বিধায় এই ক্ষেত্রেও নিয়্যাতের প্রয়োজন নেই। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। বরং আলেমগণ এই বিষয়ে ইজমা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম নববী বলেছেন: যেই বিধানটি তিনি উল্লেখ করেছেন, আর তা হলো নাপাকি দূর করার জন্য নিয়্যাতের প্রয়োজন নেই। এটা আমাদের মাযহাবের প্রসিদ্ধ সহীহ মত, যা জমহুর আলেমগণ অকাট্য অভিমত। যেই বিষয়ে আল-হাবীর লেখক, এবং বগবী শারহুস সুন্নাহ এর মাঝে মুসলিমদের ইজমা' এর কথা বর্ণনা করেছেন।

আমি বলব: তাদের দলীল হলো: শারীরিক নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন একটি পরিত্যাজ্যমূলক বিষয়। যার জন্য নিয়্যাতের প্রয়োজন নেই। যেমন, যিনা ও মদ পান পরিত্যাগ করা। সুতরাং বৃষ্টির পানি যদি নাপাক কাপড়ের উপরে পতিত হয়, আর এর ফলে উক্ত নাপাকি দূর হয়ে যায়, তাহলে কাপড়টি পবিত্র হয়ে যাবে। যদিও সে নিয়্যাত না করে। যেহেতু নাপাকিটি একটি শারীরিক নোংরা বস্তু, ফলে যখন বস্তুটি দূরীভুত হবে, তখন তার বিধানও দূরীভুত হবে।

দ্বিতীয় মত: নির্দিষ্টভাবে মযী নির্গত হওয়ার ফলে ইস্তিনজা করার সময় নিয়্যাত করা শর্ত। এটা মালেকী মাযহাবের মত। তাদের দলীল হলো: 'আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: তিনি বলেন: আমার দেহ থেকে অধিক মযী নির্গত হতো। যেই কারণে এই বিষয়ে আমি একজন লোককে আদেশ করলাম নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করার জন্য, যেহেতু

তাঁর কন্য আমার স্ত্রী ছিল। উক্ত ব্যক্তি প্রশ্ন করলে তিনি বললেন: “তুমি তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে এবং ওযূ করবে”। সহীহ বুখারী (২৬৯), সহীহ মুসলিম (৩০৩) ।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (১/৩৫৪), আদাবুল খলা (২৭৩) ।

ইস্তিনজাকারীর জন্য মুস্তাহাব হলো জমিনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত নিজের কাপড় না উঠানো

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: মুস্তাহাব হলো ইস্তিনজাকারী তার কাপড় জমিনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত উঠাবে না।

নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই আদাবটি সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব। কিন্তু ওয়াজিব নয়। যেমনটি শায়েখ আবু হামিদ বিন আছ ছাব্বাগ, মুতাওয়াল্লী ও অন্যান্যরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

আমি বলব: এই মতের দলীল হলো: ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস: তিনি বলেছেন: “যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিনজা করার ইরাদা করতেন, নিম্নাঞ্চলে গমন করতেন এবং নির্ধারিত স্থানে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না”। এটা সিলসিলা আস সহীহাতে (১০৭১) বর্ণিত হয়েছে।

মু'আবীয়া বিন হায়দাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি বললাম: “আমাদের সতরের কতটুকু অংশ খোলা রাখতে পারব আর কতটুকু অংশ ঢেকে রাখব? তিনি বললেন: তোমার নিজের সতরকে স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্যদের থেকে ঢেকে রাখো। তিনি বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, যদি মানুষের ভিড়ে অবস্থান করতে হয়, তখন কী করব? তিনি বললেন: যদি সকলের দৃষ্টি থেকে ঢেকে রাখতে পার, তাহলে ঢেকে রাখো, যেনো কেউ না দেখতে পায়। আমি বললাম: যদি কেউ নির্জন স্থানে অবস্থান করে, তখন করণীয় কী? তিনি বললেন: তাহলে আল্লাহ তা'আলার প্রতি লজ্জাশীল হওয়া অধিক জরুরী”। আহমাদ (৩/৫), আবু দাউদ (৪০১৭) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাসান।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৬৪), আল মাজমূ' (২/৯৮) ।

ইস্তিনজা করার সময় দূরে যাওয়া এবং নিজেকে ঢেকে রাখা

মুগিরাহ বিন শু'বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মলত্যাগের উদ্দেশ্যে কোথাও যেতেন, দূরে যেতেন"। তিরমিযী (২০), আবু দাউদ (১), এটা হাসান হাদীস। এটা সিলসিলা সহীহাতে (১১৫৯) বর্ণিত হয়েছে।

আব্দুর রহমান বিন কুরাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে নির্জন প্রান্তরের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আর যখনি তিনি ইস্তিনজা করার ইচ্ছা করতেন, দূরবর্তী স্থানে গমন করতেন"। নাসায়ী (১৬), আহমাদ (৩/৪৪৩)। হাদীসটির সনদ হাসান। সিলসিলা সহীহার মাঝে এটা (১১৫৯) বর্ণিত হয়েছে।

নববী রহিমাহুল্লহ আল মাজমূ' গ্রন্থে (৩/১৭১) বলেছেন: আর মাসআলার বিধান হলো: মানুষের চোখ থেকে সতর ঢেকে রাখা ইজমা'র ভিত্তিতে সাব্যস্ত ওয়াজিব।

ইস্তিনজা করার সময় কথা বলার বিধান

নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ইস্তিনজা করার সময় কথা বলা সম্পর্কিত যেই বিধানটি মুছান্নিফ রহিমাহুল্লা অর্থাৎ - আল মুহাযযাব গ্রন্থের রচয়িতা শীরাযী - উল্লেখ করেছেন, তা সর্বসম্মত মত। আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেছেন: মাকরূহ হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার কথার বিধান একই।

ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: মোটকথা: ইস্তিনজা করার সময় একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কোনো কথা না বলা উচিত। যেমনটি ফকীহগণ রহিমাহুমুল্লাহ বলেছেন। যেমন: কাউকে পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে কথা বলা অথবা কারোর এমন জরুরী কথা, যেই কথার উত্তর দেওয়া ছাড়া কোনো ভিন্ন উপায় নেই। অথবা কোনো ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন আছে, যার সঙ্গে এখনি কথা না বললে তার চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অথবা পবিত্র হওয়ার জন্য পানি চাওয়ার প্রয়োজন হলে। এমন ক্ষেত্রে কথা বলাতে কোনো সমস্যা নেই।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৬৬), আল মাজমূ' (২/১০৩), আস সাইল (১/১৯৩), আশ শারহুল মুমতি' (১/১১৯) ।

ইস্তিনজা ও এই জাতীয় কাজের সময় আল্লাহর যিকির করার বিধান

প্রথম মত: ইস্তিনজা করার সময় আল্লাহর যিকির করা মাকরূহ। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। এই মতের দলীল হলো: ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস: "একজন ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁকে সালাম দিল, যখন তিনি পেশাব করছিলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তির সালামের উত্তর দেননি"। মুসলিম (৩৭০)।

মুহাজির বিন কুনফুয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, “তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলেন, যখন তিনি পেশাব করছিলেন। এমন অবস্থায় তিনি তাঁকে সালাম দিলে তিনি ওযূ করা পর্যন্ত তার সালামের উত্তর দেননি। এরপরে তিনি এই বলে অজুহাত পেশ করলেন: আমি একমাত্র পবিত্র অবস্থা ব্যতীত অন্য কোনো অবস্থায় আল্লাহর যিকির করা পছন্দ করি না অথবা তিনি বলেছেন: পরিচ্ছন্ন অবস্থায়”। আবু দাউদ (১৭) ও অন্যান্যরা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটা সহীহ। হাদীসটি আমাদের শায়েখ আস সহীহুল মুসনাদে (১১৪৫) উল্লেখ করেছেন। তাদের পক্ষে আরো দলীল রয়েছে।

দ্বিতীয় মত: এটা জায়েয, মাকরূহ নয়। এটা ইবনু সিরিন ও নাখঈর মত। তাদের দলীল হলো: মুসলিমে বর্ণিত (৩৭৩) আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস: “নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন”। এই জাতীয় অন্যান্য ব্যাপক অর্থবোধক হাদিসসমূহ দ্বারা তারা দলীল পেশ করেছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি।

ইবনু মুনযির বলেছেন: এই স্থানগুলোতে আল্লাহর যিকির থেকে বিরত থাকা আমার নিকট অধিক প্রিয় আল্লাহর সম্মান রক্ষার স্বার্থে। এই বিষয়ে অনেকগুলো হাদীসের নির্দেশনা বিদ্যমান। তবে এই স্থানগুলোতে আল্লাহর যিকিরকারীকে আমি অপরাধী সাব্যস্ত করব না।

ইবনু কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই অবস্থায় মুখে যিকির করা আমাদের জন্য শরীআতসম্মত নয়। আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজের প্রতি উৎসাহ দেননি। এমনকি কোনো সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এটা বর্ণিতও হয়নি। এই সময় লজ্জাশীলতা, সচেতন থাকা, এবং এই অবস্থার নিআমতের অনুভূতি থাকাটাই যথেষ্ট। আর এগুলো যিকিরের উদ্দেশ্যেই। সুতরাং প্রত্যেকটি অবস্থার যিকির উক্ত অবস্থার উপযোগিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

তিনি আরো বলেছেন: আর মূল ইস্তিনজা ও স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করার সময় এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ক্ষেত্রগুলোতে কলবের দ্বারা যিকির করা মাকরূহ নয়। কারণ, কলবের জন্য যিকিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা খুবি জরুরী এবং ব্যক্তিকে তার নিকট সর্বাধিক প্রিয় সত্তার যিকির থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং যদি কলবকে তার প্রিয় সত্তাকে ভুলে যেতে বাধ্য করা হয়, তাহলে এটা হবে তাকে অসম্ভব কাজে বাধ্য করা।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৩৪০), আল মুগনী (১/১৬৬), তাফসীরুল কুরতুবী (৪/৩১০), আল মাজমূ’ (২/১০৪), আল ওয়াবিলুছ ছাইয়িব (৬৭) ।

١٥. عَن أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يَمَسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ".

১৫. আবূ কাতাদা আল হারেছ ইবনে রিবয়ী আল আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ পেশাব করাকালীন ডান হাত দ্বারা নিজের লিঙ্গকে স্পর্শ করবে না। পায়খানা করার সময়ও ডান হাত দ্বারা সৌচকার্য করবে না এবং পানি পান করার সময় পাত্রের মাঝে নিঃশ্বাস ছাড়বে না। [সহীহ বুখারী হা/১৫৩, ৫৬৩০, মুসলিম হা/২৬৭] ।

মলত্যাগের পরে নির্দিষ্ট অঙ্গটি হাত দ্বারা মাসাহ করার পদ্ধতি

হাফেয রহিমাহুল্লাহ আল ফাতহ গ্রন্থে (১/২৫৪) বলেছেন: খাত্তাবী কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর মাঝে সঠিক পদ্ধতিটি হলো, যা ইমামুল হারামাইন এবং তার পরে গাযালী আল ওয়াসীত এর মাঝে এবং বগবী আত তাহযীব এর মাঝে উল্লেখ করেছেন: ইস্তিনজাকারী তার নির্দিষ্ট অঙ্গের উপরে ডান হাতে ধরে রাখা বস্তুটির ওপর থেকে বাম হাত দ্বারা ডলতে থাকবে। আর ডান হাতটি স্থির অনড় থাকবে। ফলে সে ডান হাত দ্বারা ইস্তিনজাকারী বা স্পর্শকারী বলে বিবেচিত হবে না। আর যে ব্যক্তি এই অবস্থাকে ডান হাত ব্যবহার করা হয়েছে বলে দাবি করেন, তারা ভুল দাবি করেছেন। বরং এই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে ইস্তিনজা করা অবস্থায় ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপরে পানি ঢেলেছে।

ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার বিধান

প্রথম মত: হারাম। এটা যাহেরীদের মত। যা ইমাম সানআনী ও ইমাম শাওকানী গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল হলো: আবু কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। যেহেতু নিষেধাজ্ঞা হারাম হওয়ার দাবি রাখে। বরং মাকরূহের দিকে স্থানান্তরকারী কোনো নির্দেশিকা পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় মত: মাকরূহ। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তারা বলেছেন: হাদীসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা তানযিহী। তাহরিমী নয়।

সঠিকতার অধিক নিকটতম মত: প্রথম মতটি, বাহ্যিক হাদীসের ভিত্তিতে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ফায়দা: হাফেয বলেছেন: স্পর্শের বিষয়টি যদিও পুরুষাঙ্গের সাথেই নির্দিষ্ট, তথাপি এর সঙ্গে নিতম্বও সংযুক্ত হবে কিয়াসের ভিত্তিতে।

দ্রষ্টব্য: আল ফাতহ (১/২৪৫), আস সুবুল (১/৩১২), আশ শারহুল মুমতি' (১/১২১) ।

পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি কি শুধু পেশাব করা অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট নাকি সর্ব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য

হাফেয এই বিষয়ে মতানৈক্য উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো: কিছু আলেমগণ বলেছেন: পেশাব করা অবস্থায় ও অন্যান্য অবস্থায় সর্ব ক্ষেত্রেই এটা মাকরূহ হবে। বরং পেশাবের বাহিরে অন্যান্য অবস্থায় এটা মাকরূহ হওয়ার অধিক উপযুক্ত। কারণ, পেশাব অবস্থায় প্রয়োজনীয়তার সম্ভাবনা থাকার সুযোগ বিদ্যমান থাকার পরেও এই বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন: নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র পেশাবের অবস্থার সাথেই নির্দিষ্ট। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা মুবাহ তথা বৈধ, আবু কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের ভিত্তিতে। সেখানে বলা হয়েছে: "যখন সে পেশাব করে" ।

তারা মুবাহ হওয়ার পক্ষে তালক বিন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করেন: "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওযূর পরে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: এটা তো তোমার দেহের একটি অংশ মাত্র"। আবু দাউদ (১৮২), তিরমিযী (৮৫)।

সুতরাং এটা সর্বাবস্থায় জায়েয হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। আর পেশাবের অবস্থাটি আবু কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারা বের হয়ে যাবে। আর কায়েস বিন তালক বিন আলীর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তাদের মাঝে অন্যতম হলেন হাফেয। তিনি তাকরীব গ্রন্থে তার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন: তিনি অতিশয় সত্যবাদী। কেউ কেউ তাকে দুর্বল বলেছেন। সাধারণভাবে মনে হয়: দুর্বল রাবী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। উভয় মতের মাঝে কোন মতটি সঠিক?

সঠিক মতটি হলো: দ্বিতীয়টি। তালক বিন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের ভিত্তিতে, যদি এটাকে হাসান ধরে নেওয়া হয়। অথবা আবু কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের ভিত্তিতে, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল ফাতহ (১/৩৫৪), আশ শারহুল মুমতি' (১/১২১)।

ডান হাত দ্বারা ইস্তিনজা করার বিধান কী?

প্রথম মত: ডান হাত দ্বারা ইস্তিনজা করা মাকরূহ। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। এই মতের দলীল হলো: হাদীসে বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা শিষ্টাচার, নির্দেশনা ও উপদেশমূলক। যা পরিত্যাগ করা মাকরূহ তানযিহী পর্যায়ের।

দ্বিতীয় মত: হারাম। এটা যাহেরী আলেমগণ ও শাফেয়ী আলেমগণের বিশেষ একটি দলের মত। যা ইমাম সানআনী ও ইমাম শাওকানী গ্রহণ করেছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মতটি, হাদীসটির বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (২৬২), আল ফাতহ (১/২৫৩), আন নাইল (১/৩১২), আস সুবুল (১/১৯৩)।

যদি ডান হাতের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করা হয় তাহলে কি এমন ইস্তিনজা যথেষ্ট হবে?

প্রথম মত: যথেষ্ট হবে। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

দ্বিতীয় মত: যথেষ্ট হবে না। এটা যাহেরী আলেমদের মত এবং হাম্বলীদের মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। শায়খুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যদি কোনো ব্যক্তি হাড় এবং ডান হাত দ্বারা ইস্তিনজা করে, তাহলে এটা তার ইস্তিনজার জন্য যথেষ্ট হবে। কারণ, এর দ্বারা মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। যদিও সে গুনাহগার হয়েছে। পুনরায় কাজটি করার কোনো ফায়দা নেই। তবে তাকে হাড়টিকে ঐ ময়লা থেকে পরিষ্কার করার ব্যাপারে আদেশ দিতে হবে, যা সে তাতে মিশ্রিত করেছে।

ফায়দা: হাফেয বলেছেন: এই মতানৈক্যের প্রেক্ষাপট হলো সময়, যখন সে তার ডান হাতে বিদ্যমান কোনো বস্তু দ্বারা উক্ত অঙ্গটি স্পর্শ করবে। যেমন: পানি ও অন্যান্য বস্তু। আর ডান হাত দ্বারা সরাসরি উক্ত অঙ্গ স্পর্শ করাটা হারাম, ইস্তিনজার জন্য যথেষ্ট নয়। এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। আর বাম হাত এই ক্ষেত্রে ডান হাতের সমান মর্যাদা পাবে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/১৫৪), শারহু মুসলিম (২৬৭), মাজমূ‘উল ফাতাওয়া (২১/২১১), আল ফাতহ (১/২৫৩), আত তাওযিহ (১/৩৪১)।

ডান হাত দ্বারা ইস্তিনজা করার মাসআলায় নারীর বিধান পুরুষের ন্যায়

হাফেয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: নির্দিষ্টভাবে পুরুষাঙ্গের উল্লেখটা উদ্দেশ্যহীন। বরং নারীর ক্ষেত্রেও একই বিধান। নির্দিষ্টভাবে পুরুষাঙ্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু সম্বোধিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষগণই হয়ে থাকেন। আর নারীরা হলো বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদের অনুগামী। বিশেষ কিছু বিধানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে।

ইবনু মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ডান হাত দ্বারা সামনের ও পেছনের অঙ্গ স্পর্শ করার বিধানে নারীর বিধান পুরুষের ন্যায়।

দ্রষ্টব্য: আল ইলাম (১/৪৯৬), আল ফাতহ (১/২৫৪)।

ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার হিকমত কী?

ইবনু মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ আল ইলাম গ্রন্থে (১/৪৯৫) বলেছেন: ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার হিকমত হলো: ডান হাতের সম্মান রক্ষা করা। অথবা হয়ত সরাসরি উক্ত হাত দ্বারা নাপাকি স্পর্শ করলে উক্ত হাত দ্বারা পানাহার করার সময় স্পর্শকৃত নাপাকির কথা স্মরণ হতে পারে। ফলে স্বভাবতই উক্ত খাবারে তার ঘৃণা জন্মাবে।

পানীয়তে ফুঁক দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার হিকমত কী?

কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তার বক্তব্য: "সে যেনো পাত্রে নিঃশ্বাস না ছাড়ে"। এমন শিষ্টাচার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বারোপ করা। যেহেতু কখনো কখনো নিঃশ্বাসের সঙ্গে থুতু অথবা শ্লেষ্মা অথবা গরম বাষ্প নির্গত হয়ে তা থেকে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে। ফলে অন্যরা বা স্বয়ং পানকারীর জন্য সেটা ঘৃণা উদ্রেকের কারণ হতে পারে। এই নিষেধাজ্ঞাটা পানীয়তে ফুঁক দেওয়া এবং পাত্রের মুখ ভেঙ্গে পানি পান করার ক্ষেত্রে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার ন্যায়।

দ্রষ্টব্য: আল মুফহিম (১/৫১৯), শারহু মুসলিম (২৬৭), আল ফাতহ (১/২৫৩), আল ইলাম (১/৪৯৯) ।

١٦. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا».

১৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: এ কবর দু'টিতে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে খুব একটা বড় ব্যাপারে হচ্ছে না। এদের একজন পেশাব করার সময় নিজেকে রক্ষা করত না। অপরজন চোগলখুরী করত। এরপর তিনি খেজুরের একটি কাঁচা ডাল নিয়ে সেটিকে দু'ভাগে ভাগ করলেন। অতঃপর উভয় কবরে পুঁতে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এটা কেন করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, হয়তো মহান আল্লাহ তাদের কবরের শাস্তিকে হালকা করে দিবেন যতক্ষণ এ দু'টি শাখা শুকিয়ে না যায়। [সহীহ বুখারী হা/২১৮, মুসলিম হা/২৯২]

وما يعذبان في كبير — বাণীটির মর্ম

প্রথম মত: তোমাদের নিকট এই গুনাহ বড় না হলেও আল্লাহর নিকট বড়। অর্থাৎ এটা গুনাহের দিক থেকে বড়। যদিও তোমাদের নিকট তা ছোট মনে হয়।

দ্বিতীয় মত: এটা যদিও কবীরা গুনাহ। কিন্তু আকবার পর্যায়ের কবীরা গুনাহ নয়। যেহেতু কবীরা গুনাহসমূহের মাঝে স্তরের তারতম্য রয়েছে। সুতরাং কবীরা গুনাহকে আকবার হিসেবে বিবেচনা করা হবে। সুতরাং এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো: অন্যান্যদেরকে ধমকি ও সতর্কতা প্রদর্শন। অর্থাৎ কেউ যেনো এটা ধারণা না করে যে, শাস্তি একমাত্র বিধ্বংসী কবীরা গুনাহসমূহের ক্ষেত্রেই দেওয়া হবে। কারণ, শাস্তি অন্যান্য গিনাহসমূহেও দেওয়া হবে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

তৃতীয় মত: এমন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা তাদের জন্য কঠিন নয়। যেহেতু পেশাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকা এবং পরনিন্দা পরিহার করা কোনো কঠিন কাজ নয়। এই শেষের মতটিকে বগবী ও অন্যান্যরা নিশ্চিত সঠিক বলে দাবি করেছেন। ইবনু দাকিকিল ঈদসহ একদল আলেম এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই বিষয়ে আরো অনেকগুলো মত রয়েছে। যেগুলো জানার জন্য সংশ্লিষ্ট সূত্রসমূহ দ্রষ্টব্য।

দ্রষ্টব্য: আল ইলাম (১/৫২২), আল ফাতহ (১/৩১৮) ।

হাদীসটির ফায়দাসমূহ এবং অন্যতম একটি ফায়দা হলো কবরের শাস্তি সাব্যস্তকরণ

নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই পরিচ্ছেদ থেকে সাব্যস্ত ফিকহ হলো: কবরের শাস্তির সত্যায়ন, যা আহলুল হক আলেমদের মাযহাব। এই ক্ষেত্রে মুতাযিলাদের মত ভিন্ন। এখান থেকে আরো সাব্যস্ত হয়: পেশাবের নাপাকি, দ্বিতীয় বর্ণনার ভিত্তিতে: "সে পেশাব থেকে বেঁচে থাকত না"। এখান থেকে আরো সাব্যস্ত হয়: পরনিন্দা কঠোরভাবে হারাম হওয়া, ইত্যাদি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

হাফেয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই হাদীসে পূর্ববর্তী ফায়দা অর্থাৎ কবরের শাস্তি সাব্যস্ত হওয়া ব্যতীত আরো অনেকগুলো ফায়দা রয়েছে এবং এখানে পেশাবের স্পর্শ থেকে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে, এর সঙ্গে শরীরে ও কাপড়ে লাগতে পারে এমন নাপাকিসমূহও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এর দ্বারা নাপাকি দূর করা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করা যায়। তবে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, যারা নাপাকি দূর করা ওয়াজিব হওয়াকে সালাতের ইরাদার সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট করেছেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (২৯২), আল ফাতহ (১/৩২১) ।

কবরস্থ ব্যক্তিদ্বয়ের নাম কি জানা গিয়েছে?

হাফেয রহিমাহুল্লাহ আল ফাতহ গ্রন্থে (১/৩২০) বলেছেন: সতর্কবাণী: কবরস্থ ব্যক্তিদ্বয়ের কারোর নাম জানা যায়নি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে, তাদের পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যেই রাবীগণ ইচ্ছা করেই এমনটি করেছেন। এটা একটি মহৎ কর্ম পদ্ধতি। যার ক্ষেত্রে এমন তিরস্কারযোগ্য ঘটনা ঘটেছে তার নাম অনুসন্ধানে অতিরঞ্জন না করাই ভালো।

আর কুরতুবী আত তাযকিরাহ গ্রন্থে কোনো কোনো আলেমের সূত্রে এই মর্মে যেই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন এবং সেটাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন: তাদের একজন হলেন সা'দ বিন মুআয। এটা সম্পূর্ণ বাতিল কথা। এমন মন্তব্য একমাত্র মন্তব্যকারীর প্রকৃত বিবরণের সাথে সংযুক্ত করে উদ্ধৃত করা উচিত। এরপরে তিনি রহিমাহুল্লাহ এই মন্তব্যটি বাতিল হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন।

কবরস্থ ব্যক্তিদ্বয় কি মুসলিম ছিলেন নাকি কাফের?

হাফেয রহিমাহুল্লাহ আল ফাতহ গ্রন্থে (১/৩২১) — মতানৈক্য উল্লেখ করার পরে — বলেছেন: পরিচ্ছেদটির এই হাদীসের যাবতীয় সনদসমূহ বিশ্লেষণ করলে স্বাভাবিকভাবে এটাই সাব্যস্ত হয় যে, তারা উভয়েই মুসলিম ছিলেন। ইবনু মাজাহ এর বর্ণনানুসারে তিনি দুইটি নতুন কবরের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলেন। সুতরাং তাদের জাহিলী যুগের ব্যক্তি হওয়ার সম্ভাবনাটি নাকচ হয়ে গেল। আবু উমামার হাদীসে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে: "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বাকি' এর নিকট দিয়ে অতিক্রম কালে বললেন: আজকে এখানে তোমরা কাদেরকে দাফন করেছে?"।

সুতরাং এই বর্ণনার দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, তারা উভয়েই মুসলিম ছিলেন। কারণ, বাকি' হলো মুসলিমদের কবর স্থান। আর সম্বোধনও মুসলিমদেরকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে। আর এটাও স্বাভাবিক যে, প্রত্যেক জাতি তাদের দলভুক্ত সদস্যদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আর তাদের উভয়ের মুসলিম হওয়ার বিষয়টিকে আরো নিশ্চিত করে। এরপরে তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন: কারণ, কাফের যদিও ইসলামের বিধিসমূহ পরিত্যাগ করার কারণে শাস্তি ভোগ করবে, তবুও সে কাফের হওয়ার কারণে আরো অতিরিক্ত শাস্তি ভোগ করবে। এতে কোনো দ্বিমত নেই।

খেজুর গাছের ডাল মৃত ব্যক্তির কবরে রোপন করা কি শরীআতে বৈধ?

হাফেয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: খাত্তাবী ও তার অনুসরণে অনেক আলেমগণ এই হাদীসের ভিত্তিতে কবরে গাছের ডাল বা এই জাতীয় বস্তু রোপন করাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তুরতুশী বলছেন: যেহেতু এটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় হাতের সঙ্গে

নির্দিষ্ট। কাযী আয়ায বলেছেন: যেহেতু তিনি ডাল দুটি রোপন করার কারণটিকে গায়েবী বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। আর তা হলো: তার বক্তব্য: "তারা উভয়ে শাস্তি ভোগ করছে"।

আমি (হাফেয) বলব: মৃতব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কি না সেটা না জানার কারণে, যদি শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে আমরা তার শাস্তি লাঘব করে এমন উপায় অবলম্বন করতে পারব না, এটা সঠিক না। ঠিক যেভাবে কোনো ব্যক্তিকে রহম করা হয়েছে কি না এটা না জানার কারণে আমরা তার জন্য রহমতের দুআ করা থেকে বিরত থাকতে পারি না। এরপরে তিনি বুরাইদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আসারটি উল্লেখ করেছেন। তিনি তার কবরে দুইটি খেজুর ডাল রোপনের ব্যাপারে অসীয়ত করেছিলেন।

শায়েখ বিন বায রহিমাহুল্লাহ আল ফাতহ এর টীকায় বলেছেন: এই মাসআলায় খাত্তাবীর মতটি সঠিক। অর্থাৎ খেজুরের ডাল বা এই জাতীয় বস্তু কবরের উপরে রাখাকে প্রত্যাখ্যান করা। যেহেতু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি নির্দিষ্ট কবরগুলোর ক্ষেত্রেই করেছেন। যেগুলোর শাস্তির ব্যাপারে তিনি জানতে পেরেছিলেন। যদি এটা শরীআতে বৈধ হতো, তাহলে তিনি সকল কবরের ক্ষেত্রে একই রকম করতেন।

এবং বড় বড় সাহাবীগণ যেমন খলীফাগণ এমনটি অবশ্যই করতেন। তারা তো বুরায়দাহ - রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আনিল জামি' - থেকে সুন্নাহর ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। সুতরাং সাবধান! ।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (২৯২), আল ফাতহ (১/৩২০) ।

কবরের ফিতনা কি মুসলিমদের জন্য নাকি শুধু কাফেরদের জন্যই?

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই অধ্যায়ে সাব্যস্ত হাদীসগুলো থেকে এটাই বুঝা যায় যে, এই ফিতনা একমাত্র মুমিন অথবা মুনাফিক এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যারা দুনিয়াতে আহলুল কিবলা বলে পরিচিত ছিল এবং দীন ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অর্থাৎ (তাওহীদ ও রিসালাতের পক্ষে স্বীকারোক্তিমূলক) বাহ্যিক সাক্ষ্য দ্বারা যাদের জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল। আর অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট কাফের: এমন ব্যক্তিকে তার রব, দীন ও নাবী সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। বরং এই বিষয়ে শুধুমাত্র মুসলিমদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

তিনি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ফিতনা মুমিনের জন্য। আর শাস্তি মুনাফিক ও কাফেরের জন্য। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইবনু মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক মনে করেন যে, এই শাস্তি মুমিন, মুনাফিক ও কাফের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই মতটিকে কুরতুবী গ্রহণ করেছেন

এই বর্ণনার ভিত্তিতে: "আর মুনাফিক অথবা কাফের" আমার স্মরণে নেই যে, তিনি কার সম্পর্কে বলেছেন।

দ্রষ্টব্য: আল ইসতিযকার (৭/১২০), আত তামহীদ (২২/২৫২), আত তাযকিরাহ (১/১৮৬), আল ইলাম (১/৫২১) ।

কবরের শাস্তি কি রুহ ও দেহ উভয়টির উপরেই হবে নাকি শুধুমাত্র রুহের উপরে হবে?

ইবনু মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ আল ইলাম গ্রন্থে (১/৫১৯) বলেছেন: আহলুস সুন্নাহের নিকট শাস্তির প্রয়োগক্ষেত্র হলো দেহ অথবা দেহে বা দেহের কোনো অংশে রুহ ফিরে আসার পরে আংশিক দেহ। এই মতের বিরোধিতা করেছে আবু মুহাম্মাদ ইবনু হাযম, ইবনু কাররাম এবং একদল আলেম। তারা বলেছেন: দেহে রুহ ফিরে আসা শর্ত নয়। কিন্তু এই মতটি ফাসাদ। যেহেতু পূর্ববর্তী বর্ণনাগুলো থেকে বুঝা যায় যে, দুইজন শাস্তিপ্রাপ্ত মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছে। আর কণ্ঠস্বর একমাত্র জীবন্ত ফাঁপা দেহ থেকেই আসতে পারে।

২. بَابُ السِّوَاكِ

অধ্যায়-২: সিওয়াক (মিসওয়াক)

সিওয়াক এর সংজ্ঞা: سواك শব্দটির س – অক্ষরে যের হবে। শব্দটিকে ক্রিয়ার অর্থে প্রয়োগ করা হয়। যার অর্থ হলো: দাঁত পরিষ্কার করা এবং বিশেষ্য হিসেবে এমন কাঠির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়, যা দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা যায়। বলা হয়: سواك শব্দটি পুং লিঙ্গ হিসেবে ব্যবহার হয়। এই তথ্যটি ইমাম আযহারী আরবদের থেকে বর্ণনা করেছেন। লাইছ বলেছেন: শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গ হিসেবে ব্যবহার হয়। এটাকে আযহারী ভুল সাব্যস্ত করেছেন। আল মুহকাম গ্রন্থের লেখকও বলেছেন: শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গ হিসেবে ব্যবহার হয়। سواك শব্দটির বহুবচন হলো: سوك । س – ও واو – উভয় অক্ষরে পেশ হবে। যেমন: كتاب – এর বহুবচন كتب ।

পরিভাষায়: সিওয়াক হলো: দাঁতের ময়লা পরিষ্কারের উদ্দেশ্যে কোনো গাছের কাঠি বা দণ্ড দাঁতে ব্যবহার করা।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (১/৩২৬), আল ফাতহ (১/৩৫৫), আল ইলাম (১/৫৪৯) ।

١٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

১৭. আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যদি আমি আমার উম্মতের ওপর কঠিন মনে না করতাম, তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। [সহীহ বুখারী হা/৮৮৭ ও সহীহ মুসলিম হা/২৫২]

প্রত্যেক সালাতের পূর্বে মিসওয়াক করার বিধান

প্রথম মত: সুন্নাহ, ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। বরং তাদের কেউ কেউ এই বিষয়ে ইজমা' এর দাবি করেছেন।

দ্বিতীয় মত: প্রত্যেক সালাতের পূর্বে ওয়াজিব। সুতরাং কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এটা পরিত্যাগ করে, তাহলে তার সালাত বাতিল সাব্যস্ত হবে। এটা ইসহাক থেকে বর্ণিত হয়েছে। নববী বলেছেন: এই বর্ণনাটি ইসহাক থেকে অজ্ঞাত। তার থেকে এটা সাব্যস্ত হয়নি। দাউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, এটা ওয়াজিব। কিন্তু শর্ত নয়।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/৯৫), আল মাজমূ' (১/৩২৭), আল ফাতহ (২/৩৭৫) ।

সালাতে দাঁড়ানোর সময় মিসওয়াক করা মুস্তাহাব হওয়ার হিকমাহ

হাফেয রহিমাহুল্লাহ আল ফাতহ গ্রন্থে (২/৩৭৬) বলেছেন:

ফায়দা: ইবনু দাকিকিল ঈদ বলেছেন: সালাতে দাঁড়ানোর সময় মিসওয়াক করা মুস্তাহাব হওয়ার হিকমাহ হলো: এটা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের সময়। বিধায় এই নৈকট্যের দাবি হলো এই সময় পূর্ণাঙ্গ ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকা। ইবাদতের মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য। মুসনাদুল বাযযারে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এটা মুসল্লীর কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণকারী ফেরেশতার সাথে সম্পর্কিত। যে তার নিকটবর্তী হতে থাকে, এমনকি এক পর্যায়ে সে তার মুখকে মুসল্লীর মুখের উপরে স্থাপন করে। কিন্তু এটা পূর্বের হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

আমি বলব: আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি বাযযার তার মুসনাদে (৬০৩), বায়হাকী তার সুনানে (১/৩৮) বর্ণনা করেছেন। আলবানী সহীহাতে (১২১৩ নং) উল্লেখ করেছেন।

ফরয বা নফল সকল সালাতের পূর্বেই মিসওয়াক করা মুস্তাহাব

ইবনু মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন: এখানে একটি ফিকহী মাসআলার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হলো প্রত্যেক সালাতের পূর্বেই মিসওয়াক করা মুস্তাহাব। চাই তা ফরযে আইন হোক বা কিফায়া, নফল, ওযূর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন হোক বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে। এমনকি উভয় প্রকারের পবিত্রতা অর্জনক্ষম ব্যক্তির জন্যও এটা মুস্তাহাব। কারণ, অধিক সহীহ মতানুসারে এমন ব্যক্তির সালাত সহীহ হবে।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ’ (১/৩২৮), আল ইলাম (১/৫৫৬) ।

মিসওয়াক কি ডান হাত দ্বারা করবে নাকি বাম হাত দ্বারা?

প্রথম মত: ডান হাত দ্বারা মিসওয়াক করবে। এটা হানাফী ও মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। এটা কোনো কোনো শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমদের পছন্দনীয় মত। তাদের দলীল হলো: মিসওয়াক করা সুন্নাহ। আর সুন্নাহ হলো আনুগত্য ও আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য অর্জনের নাম। ফলে এটা বাম হাত দ্বারা করা যাবে না।

দ্বিতীয় মত: বাম হাত দ্বারা মিসওয়াক করবে। এটা হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। যা কিছু হানাফী আলেমগণ ও ইবনু তাইমিয়্যাহ গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল হলো: এটা নাপাকি দূর করার কাজ। আর নাপাকি দূর করার কাজ বাম হাত দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। যেমন: ইস্তিনজা ও ইস্তিজমার।

তৃতীয় মত: বিস্তারিত ব্যাখ্যা: যদি মুখ পরিষ্কারের উদ্দেশ্যে মিসওয়াক করা হয়, যেমন: ঘুম হতে জাগ্রত হওয়া ব্যক্তি অথবা খাবার-পানীয়ের ময়লা দূর করার উদ্দেশ্যে দাঁত পরিষ্কারকারী ব্যক্তি। এই জন্য এটা বাম হাত দ্বারা করবে। আর যদি কেউ সুন্নাহ পালনের স্বার্থে মিসওয়াক করে, তবে ডান হাত ব্যবহার করবে।

এই মাসআলার সারমর্ম হচ্ছে: বিষয়টিতে প্রশস্ততা রয়েছে। কেই চাইলে ডান হাত দ্বারা মিসওয়াক করবে, আর কেউ চাইলে বাম হাত দ্বারা করতে পারবে। কারণ, নির্দিষ্টরূপে কোনো নস (কুরআন হাদীসের দলীল) আসেনি। যদিও মিসওয়াক সম্পর্কিত হাদীস অনেকগুলো। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। শায়েখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই বিষয়ে উভয় পদ্ধতিই পালনীয়। যেহেতু স্পষ্ট কোনো সহীহ নস (কুরআন হাদীসের দলীল) নেই।

দ্রষ্টব্য: মাজমূ‘উল ফাতাওয়া (২১/১০৮), আল ইনছাফ (১/১০০), আশ শারহুল মুমতি’ ১/১৫৫), আহকামু সুনানিল ফিতরাহ (৭৭৯) ।

١٨. عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ».

১৮. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে ঘুম থেকে উঠতেন তখন তিনি মিসওয়াক দ্বারা স্বীয় মুখ ও দাঁত ঘষে পরিষ্কার করতেন। [সহীহ বুখারী হা/ ২৪৫ ও সহীহ মুসলিম হা/২৫৫]

ঘুম থেকে উঠার পরে মিসওয়াক করা মুস্তাহাব

হাফেয রহিমাহুল্লাহ আল ফাতহ গ্রন্থে (১/৩৫৬) বলেছেন: ইবনু দাকিকিল ঈদ বলেছেন: এই হাদীসে ঘুম থেকে উঠার পরে মিসওয়াক করা মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়। যেহেতু ঘুম মুখের মধ্যে গন্ধ সৃষ্টির কারণ। যেহেতু এই সময় পাকস্থলীর গরম বাষ্প মুখে উঠে আসে। আর মিসওয়াক হলো একটি পরিচ্ছন্নকারী যন্ত্র। বিধায় সেটাকে চাহিদা অনুপাতে ব্যবহার করা মুস্তাহাব। তিনি বলেছেন: রাবীর বক্তব্য: "রাত্রের যে কোনো সময়ে" বাহ্যিক মর্মানুসারে এটা সর্ব অবস্থার জন্য প্রযোজ্য। আবার এটা শুধুমাত্র সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হতে পারে।

আমি বলব: বুখারীতে (১১৩৬), মুসলিমে (২৫৫) এমন হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা এই 'আমকে খাছ করে। আর সেই খাছ সময়টি হলো যখন কোনো ব্যক্তি তাহাজ্জুদের জন্য দণ্ডায়মান হবে।

١٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَل عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُسْنِدَتهُ إِلَى صَدْرِي –وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ– فَأَبَدَّهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ، فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضَمْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَّ اسْتِنَانًا أَحْسَنَ مِنْهُ. فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ– ثُمَّ قَالَ: "فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى" ثَلاثًا، ثُمَّ قَضَى عَلَيهِ. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي.

وَفِي لَفْظٍ ((فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ , وَعَرَفْتُ: أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: أَنْ نَعَمْ)) هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ.

১৯. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুমূর্ষ অবস্থায় থাকা কালীন) আব্দুর রহমান ইবনু আবূবকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাড়িতে প্রবেশ করলেন। এমতাবস্থায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকের ওপর হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। আর আব্দুর রহমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে একটি তাজা মিসওয়াক ছিল যা দ্বারা তিনি মিসওয়াক করছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মিসওয়াক টির দিকে চোখ দ্বারা ইশারা করলেন। এরপর আমি মিসওয়াকটিকে নিয়ে চিঁবিয়ে উপযোগী ও নরম করে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সেই মিসওয়াকটি দিয়ে এত সুন্দর করে মিসওয়াক করলেন, আমি এরকম সুন্দর করে মিসওয়াক করতে আমি আর কখনো দেখিনি। মিসওয়াক করা শেষ হতে না হতেই তিনি তার হাত কিংবা আঙ্গুল দ্বারা আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন: রফীকে আলার ডাকের সাড়া দিলাম। এরপর তার মৃত্য সংঘটিত হয়ে গেলো। তিনি (আয়িশা) বলতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থুতনী ও চিবুকের মাঝে (বুকের ওপর) থাকা অবস্থায় মারা গিয়েছেন।

অন্য একটি শব্দে বর্ণিত রয়েছে, আমি তাঁকে আব্দুর রহমানের দিকে তাকাতে দেখলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি মিসওয়াক চাচ্ছেন। তখন আমি তাঁকে বললাম: আমি কি আপনার জন্যে মিসওয়াকটি নিবো? তিনি মাথার ইশারায় বললেন। হ্যাঁ। এই শব্দগুলো বুখারীর [সহীহ বুখারী হা/ ৪৪৪৯]। আর মুসলিমেও অনুরূপ রয়েছে। [সহীহ বুখারী হা/ ৪৪৩৮, সহীহ মুসলিম হা/২৪৪৪]

٢٠. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، قَالَ: وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: أُعْ أُعْ وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ؛ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ».

২০. আবূ মূসা আল আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলাম। এমতাবস্থায় তিনি একটি কাঁচা ডাল দ্বারা মিসওয়াক করছিলেন। তিনি (আবু মুসা) বলেন: আর মিসওয়াকের পার্শ্বটি তার জিহ্বার ওপর ছিল। মিসওয়াকটি তার মুখের ভিতরে থাকাবস্থায় তিনি উঃ উঃ করছিলেন যেন তিনি বমি করে ফেলবেন। [সহীহ বুখারী হা/ ২৪৪ ও মুসলিম হা/২৫৪]

যে সকল ক্ষেত্রে মিসওয়াক করা মুস্তাহাব

১. সালাতে দাঁড়ানোর সময়।

দলীল: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন।

২. রাত্রে সালাতে দাঁড়ানোর সময়।

দলীল: হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদীসের বাহ্যিক মর্ম থেকে বুঝা যায় যে, মিসওয়াক যেকোনো সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর কারণেই সাব্যস্ত হবে। কিন্তু কোনো কোনো বর্ণনায় এই মর্মকে আরো নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর তা হলো তাহাজ্জুদের সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর কারণে। সহীহ বুখারীতে (১১৩৬) হাদীসটি এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে: "যখন তিনি তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন"। একইভাবে বর্ণনাটি মুসলিমে (২৫৫) বর্ণিত হয়েছে।

৩. মৃত্যুশয্যায় অবস্থানকালে।

আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীসের ভিত্তিতে। যা লেখক উল্লেখ করেছেন।

৪. ওযূর সময়।

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের ভিত্তিতে। তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক ওযূতে তাদেরকে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম"। আহমাদ (২/৪৬০)। এর সনদ সহীহ। দ্রষ্টব্য: আল ইরওয়া (৭০)।

৫. কুরআন তিলাওয়াতের সময়।

দলীল হলো: আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। তিনি বলেছেন: আমাদেরকে মিসওয়াক করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন: "যখন কোনো বান্দা সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়, তার নিকটে একজন ফেরেশতা আগমন করেন এবং সে তার পিছনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে কুরআন শ্রবণ করতে থাকেন এবং ধীরে ধীরে আরো নিকটে আসতে থাকেন। সে এভাবে শ্রবণ করতে থাকে এবং আরো নিকটবর্তী হতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে তার নিজের মুখকে তার মুখের ভিতরে স্থাপন করে। ফলে সে যেই আয়াতটিই তখন তিলাওয়াত করে, সেটা উক্ত ফেরেশতার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে"। হাদীসটি বায়হাকী (১/৩৮) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ১৮ নং হাদীসের সাথে সম্পর্কিত মাসআলার অধীনে বর্ণিত হয়েছে।

৬. ঘরে প্রবেশের সময়।

দলীল হলো: আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজ ঘরে প্রবেশ করতেন, প্রথমেই মিসওয়াক করতেন"। সহীহ মুসলিম (২৫৩)।

৭. মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে।

৮. দাঁতসমূহ হলুদ হয়ে গেলে।

পূর্বের এবং এই তালিকার দলীল হলো: আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মিসওয়াক হলো মুখের পবিত্রতা ও রবের সন্তুষ্টির মাধ্যম"। হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য: আল ইরওয়া (৬৬), আহকামু সুনানিল ফিতরাত (৫২৭) ।

এগুলো বাদেও আলেমগণ মিসওয়াক ব্যবহারের আরো অনেক ক্ষেত্র বর্ণনা করেছেন। যেই স্থানগুলোতে মিসওয়াক করা মুস্তাহাব। তবে তাদের বক্তব্যের পক্ষে আমি কোনো দলীল পাইনি। মিসওয়াকের ব্যাপারে অনেক উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এই বিষয়ের দলীলও অনেক। তাই একজন ব্যক্তির জন্য তার ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো সময়ই মিসওয়াক করার অধিকার আছে।

এই দলীলগুলোর মাঝে অন্যতম হলো: লেখক কর্তৃক বর্ণিত আবু মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মিসওয়াক করা অবস্থায় এবং আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "আব্দুর রহমান মিসওয়াক করতে করতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই অবস্থায় দেখলেন"। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/৯৫), আল মাজমূ' (১/৩২৮), আল ইলাম (১/৫৬১), আহকামু সুনানিল ফিতরাহ (৭০৭) ।

যেই বস্তুগুলো দ্বারা মিসওয়াক করা মুস্তাহাব এবং মিসওয়াক এর আমল যথাযথ হবে

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আরাক গাছের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করা মুস্তাহাব। দাঁতের সাময়িক ময়লা দূর করতে সক্ষম এমন যেকোনো বস্তু দ্বারা মিসওয়াক করলেই আমলটি যথাযথ হবে। যেমন: অমসৃণ শক্ত কাপড়ের টুকরা দ্বারা, সুদ গুল্ম দ্বারা, উশনান (ক্ষার) গাছের ডাল দ্বারা। আর ইছবা' গাছের ডাল যদি নরম হয়, তাহলে মিসওয়াক যথাযথ হবে না। আর যদি শক্ত ও অমসৃণ হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের মাযহাবের আলেমগণের তিনটি মত রয়েছে।

প্রসিদ্ধ মত হলো: মিসওয়াকের আমল আদায় হবে না।

দ্বিতীয় মত হলো: আদায় হবে।

তৃতীয় মত হলো: আদায় হবে যদি অন্য ডাল না পাওয়া যায়। আর যদি অন্য ডাল পাওয়া যায়, তাহলে হবে না।

মুস্তাহাব হলো: এমন মধ্যম মানের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করা, যা এত অধিক শুকনা না হয়, যে দাঁতে আঘাত লাগে। আবার এত বেশি নরম না হয়, যে ময়লা দূর করতে পারে না।

মুস্তাহাব হলো: মিসওয়াকের প্রস্থ দ্বারা অর্থাৎ হালকা বাঁকা করে দাঁত মাজবে, দৈর্ঘ্যের দ্বারা অর্থাৎ মিসওয়াককে লম্বা করে দাঁত মাজবে না। যাতে করে দাঁতের মাংস থেকে রক্ত না ঝরে। যদি কেউ এই নিয়ম অমান্য করে মিসওয়াককে লম্বা করে ধরে দাঁত মাজে, তাহলে মিসওয়াক আদায় হবে। কিন্তু মাকরূহ হবে। দাঁতের বিভিন্ন দিকে এবং মাঢ়ীর দাঁতসমূহের প্রান্তে এবং কণ্ঠনালীর উপরে দিয়ে মিসওয়াক দ্বারা হালকা ঘষা দিবে।

মুস্তাহাব হলো মুখের ডান দিক থেকে মিসওয়াক করা শুরু করবে। অন্যের অনুমতিক্রমে তার মিসওয়াক ব্যবহার করাতে কোনো সমস্যা নেই। শিশুদেরকে মিসওয়াক এর অভ্যাস করাবে, যাতে করে সে মিসওয়াককে নিজের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (১/৩৩৫), শারহু মুসলিম (২৫২), আল মুগনী (১/৯৬) ।

٣. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

অধ্যায়-৩: মোজার ওপর মাসাহ করা

٢١. عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ؛ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا».

২১. মুগীরাহ ইবনে শু'বা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (তাবূক যুদ্ধের) সফরে ছিলাম। ওযূ করার সময় আমি তার পায়ের মোজা দু'টি খোলার জন্যে হাত বাড়ালাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, ছাড়ো ছাড়ো আমি ওগুলো পবিত্র (ওযূ) অবস্থায় পরেছিলাম। তারপর তিনি ঐগুলোর ওপর মাসাহ করলেন। (অর্থাৎ হাত ভিজিয়ে ভিজা হাত দিয়ে মোজার উপরিভাগ মাসাহ করলেন)। [সহীহ বুখারী হা/২০৬ ও মুসলিম হা/২৭৪]

٢٢. عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».

২২. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি পেশাব করে ওযূ করলেন এবং মোজার ওপর মাসাহ করলেন। [সহীহ বুখারী হা/২২৪ ও সহীহ মুসলিম হা/২৭৩]

দুই মোজার উপরে মাসাহ করার বিধান

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ আল মাজমূ' গ্রন্থে (১/৫০০) বলেছেন: আমাদের এবং সকল আলেমগণের মাযহাব হলো: সফরে এবং বাড়িতে উভয় মোজার উপরে মাসাহ করা জায়েয। শিয়া ও খারেজীদের মতে: জায়েয নেই। কাযী আবুত তাইয়্যিব আবু বকর বিন দাউদের সূত্রে এই মতটি বর্ণনা করেছেন। এই জাতীয় সকল মতানৈক্যই বাতিল, প্রত্যাখ্যাত।

ইবনু মুনযির আল ইজমা' গ্রন্থে মোজার উপরে মাসাহ করা জায়েয হওয়ার পক্ষে আলেমগণের ইজমা' নকল করেছেন। এটা জায়েয হওয়ার পক্ষে দলীল হলো: সফরে এবং বাড়িতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোজার উপরে মাসাহ করা, উক্ত বিষয়ে আদেশ দেওয়া, উক্ত বিষয়ে ছাড় প্রদান এবং সাহাবা ও তাদের পরবর্তীদের উক্ত বিষয়ে ঐকমত্য সম্পর্কিত পর্যাপ্ত পরিমাণ সহীহ হাদীস বিদ্যমান।

কোনটি অধিক উত্তম: ধৌত করা নাকি মাসাহ করা?

প্রথম মত: ধৌত করা অধিক উত্তম। এটা হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ীদের মত। যা উমার, ইবনু উমার ও আবু আইয়ুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত।

কিন্তু তাদের অনেকেই বলেছেন: ধৌত করা অধিক উত্তম। যদি সেটা সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরানোর উদ্দেশ্যে না হয়। তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার কিতাবে এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হয়েছে: "তোমাদের পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করো", যবর সহকারে পড়ার সুরতে। তারা আরো বলেছেন: যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনে অধিকাংশ সময় ধৌত করার উপরেই আমল করেছেন।

দ্বিতীয় মত: মাসাহ করা অধিক উত্তম। এটা শা'বী, হাকাম, এবং হাম্মাদের মত। আহমাদের দুইটি বর্ণনার মাঝে অধিক সহীহ বর্ণনা। তাদের দলীল হলো: "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন তাঁর সুবিধাজনক আমলসমূহ পালন করা হোক, ঠিক যেভাবে তিনি পছন্দ করেন তাঁর বাধ্যতামূলক আমলসমূহ পালন করা হোক"। ইবনু হিব্বান (৩৫৪) হাদীসটি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সনদ হাসান। এই হাদীসটি: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখনি দুইটি বিষয় পালনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তখনি তিনি অধিক সহজ বিষয়টিকেই গ্রহণ করেছেন"। সহীহ বুখারী (৩৫৬০), সহীহ মুসলিম (২৩২৭), যা আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে।

তারা আরো বলেছেন: এটা এই জন্যই অধিক উত্তম যে, এর দ্বারা বিদআতীদের বিরোধিতা করা হয়।

তৃতীয় মত: উৎকৃষ্টতার দিক থেকে উভয়টিই সমমানের।

সঠিক মত হলো: ইবনু কাইয়িমের মত, যা তিনি তার শায়েখ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি – রহিমাহুল্লাহ – বলেছেন: তিনি নিজের পায়ের স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীতে যেয়ে অনিচ্ছাকৃত কোনো আমল করতেন না। বরং তাঁর পায়ে মোজা থাকলে তিনি সেটার উপরেই মাসাহ করতেন, সেটা খুলতেন না। আর যদি উভয় পা খোলা থাকত, তাহলে উভয় পা ধৌত করতেন। মাসাহ করার জন্য মোজা পরিধান করতেন না। মাসাহ ও ধৌত করার মাঝে কোনটি অধিক উত্তম এই মাসআলায় এটাই সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত মত। যেমনটি আমাদের শায়েখ বলেছেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২৮১), আল মাজমূ' (১/৫০২), আয যাদ (১/১৯৯) ।

মোজার উপরে মাসাহ করার পদ্ধতি

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ইবনু আকিল বলেছেন: মাসাহ করার সুন্নাহ পদ্ধতি হলো এমন: দুই মোজা দুই হাত দ্বারা মাসাহ করবে। ডান মোজা ডান হাত দ্বারা। আর বাম মোজা বাম হাত দ্বারা।

ইমাম আহমাদ বলেছেন: যেভাবেই মোজার উপরে মাসাহ করা হোক না কেনো, সেটা জায়েয। চাই এক হাত দ্বারা অথবা দুই হাত দ্বারা করা হোক।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (১/৫৪৯), আল মুগনী (১/২৯৯)।

মোজার উপরে মাসাহ সহীহ হওয়ার পরিমাণ

প্রথম মত: মাসাহ সহীহ হওয়ার পরিমাণ হলো: পায়ের পিঠের অগ্রভাগের অধিকাংশ স্থানজুড়ে আঙ্গুলসমূহের দ্বারা রেখা টানার মত করে মাসাহ করা। এটা হাম্বলীদের মত। তাদের দলীল: মাসাহ শব্দটি সম্পূর্ণ মুক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কর্মের দ্বারা এর ব্যাখ্যা করেছেন। বিধায় তাঁর তাফসীরের দিকে ফিরে আসা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় মত: মাসাহ শব্দের প্রয়োগ করা যায় এতটুকু পরিমাণ মাসাহ করলেই মাসাহ সহীহ হবে। এটা শাফেয়ী আলেমগণ, ছাওরী, আবু ছাওর ও দাউদের মত। তাদের দলীল: মাসাহ শব্দটিকে মুক্তভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই বিষয়ে কোনো পরিমাণ ধার্য করা হয়নি। বিধায় মাসাহ বলা যায় এতটুকু পরিমাণ স্থানে মাসাহ করলেই সেটাকে মাসাহ বলা হবে।

তৃতীয় মত: তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাসাহ করলেই মাসাহ সহীহ হবে। এটা আবু হানীফার মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মত। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৪৫৫), আল মুগনী (১/২৯৮), আল মাজমূ' (১/৫৫২) ।

মোজার উপরে মাসাহ করা জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হলো মোজা দু'টিকে পবিত্রাবস্থায় (ওযূ) পরিধান করতে হবে

মোজার উপরে মাসাহ করা জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়টিকে পরিধানের পূর্বে পবিত্র হওয়ার শর্তের ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। দলীল হলো: মুগিরাহ বিন শু'বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "আমি উভয় মোজায় পা প্রবেশ করিয়েছি পা দুইটি পবিত্র করার পরে"। এরপরে তিনি উভয় মোজার উপরে মাসাহ করলেন।

দ্রষ্টব্য: আল ইসতিযকার (২/২৫৬), আল মুগনী (১/২৮২), আল ফাতহ (১/৩১০) ।

দুই মোজার উপরে মাসাহ করার জন্য কি উভয়টিকে পূর্ণ পবিত্র (ওযূ) অবস্থায় পরিধান করা শর্ত?

প্রথম মত: উভয় মোজা পূর্ণ পবিত্রাবস্থায় পরিধান করা শর্ত। যদি ডান পা ধৌত করার পরে ডান পায়ের মোজা পরিধান করে এবং বাম পা ধৌত করার পরে বাম পায়ের মোজা পরিধান করে, তাহলে উভয় মোজার উপরেই তার জন্য মাসাহ করা জায়েয হবে না। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। এই মতের দলীল: মুগিরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, সেখানে বলা হয়েছে: "আমি উভয় মোজায় পা দুইটি প্রবেশ করিয়েছি পা দুইটি পবিত্র করার পরে"।

দ্বিতীয় মত: যেকোন একটি পা ধৌত করার পরে উক্ত পায়ের মোজা পরিধান করা। এরপরে অপর পায়ের পা ধৌত করার পরে উক্ত পায়ের মোজা পরিধান করা জায়েয আছে। এটা আবু হানীফা, ছাওরী, ইয়াহয়া বিন আদাম, মুযানী, আবু ছাওর, দাউদ, মালেকের ছাত্র মুতাররিফ ও ইবনু মুনযিরের মত। যা ইবনু তাইমিয়্যাহ গ্রহণ করেছেন।

সহীহ এর নিকটতম মত: প্রথম মতটি। দলীল হলো: মুগিরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি, যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। একইভাবে এই হাদীসটি: "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুকিমের জন্য ওযূ করার পরে ছাড় দিয়েছেন মোজার উপরে মাসাহ করা ও পা ধৌত করার মাঝে। তিনি এক দিন ও এক রাত দুই মোজার উপরে মাসাহ করার জন্য তা পরিধান করেছেন"। সুতরাং যে বাম পা ধৌত করেনি, সে ওযূ করেছে এই কথা বলা যায় না।

ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ এই মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বলেছেন: এই মতটি সর্বদা অধিক সতর্কতামূলক মত, তাই এই মত মেনে চলাই অধিক উত্তম। কিন্তু এর ভিত্তিতে ডান পা ধুয়ে মোজা পরিধান করেছে, এরপরে বাম বা ধুয়ে উক্ত পায়ে মোজা পরিধান করেছে এমন ব্যক্তিকে আমরা এই কথা বলতে পারব না: তোমার সালাত ও ওযূ পুনরায় আদায় করো। কিন্তু যে এই নিয়মটি পালন করেনি, তাকে আমরা আদেশ দিব সাবধানতা বশত সে যেনো এমনটি না করে।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২৮২), শারহু মুসলিম (২৭৪), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (২১/২০৯), আল ফাতহ (১/৩১০), আশ শারহুল মুমতি' (১/২৪৮) ।

গোসল করার সময় মোজা খুলা ওয়াজিব

ছাফওয়ান বিন আসসাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলিহি ওয়াসাল্লাম সফরে থাকাবস্থায় তিনদিন ও তিনরাত পর্যন্ত আমাদেরকে মোজা না খুলার জন্য আদেশ দিতেন, জানাবাত (ফরয গোসল সাব্যস্তকারী কারণ) ব্যতীত। তবে মলত্যাগ, পেশাব ও ঘুমের কারণে ওযূ নষ্ট হলে মোজা খুলতে হবে না"। তিরমিযী হাদীসটি (৯৬) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাসান।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: জানাবাতের গোসলের ক্ষেত্রে মোজার উপরে মাসাহ করা জায়েয নয়। এই মতটি শাফেয়ী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তার অনুসারীগণ ও অন্যান্য আলেমগণ এই মতের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আমি এই বিষয়ে কোনো একজন আলেমের দ্বিমত রয়েছে বলে জানি না। একইভাবে হায়েযের গোসল, নিফাসের গোসল, সন্তান জন্মদানের গোসল এবং সুন্নত গোসলসমূহের ক্ষেত্রে মোজার উপরে মাসাহ করা জায়েয নয়। যেমন: জুম'আহ, ঈদ ও হাজ্জের গোসল ও গোসলসমূহ। এই বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। তার মাযহাবের আলেমগণ এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এই সবগুলো মাসআলা ছাফওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে গবেষণাকৃত।

হাফেয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: দুই মোজার উপরে মাসাহ করা ওযূর সঙ্গে নির্দিষ্ট। এই মাসআলায় গোসলের কোনো সম্পর্ক নেই এটা ইজমা' দ্বারা সাব্যস্ত।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (৫/৫০৫), আল ফাতহ (১/৩১০) ।

মুসাফির ও মুকিমের জন্য দুই মোজার উপরে মাসাহ করার ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ

আলী বিন আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলন: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিনদিন ও তিনরাত এবং মুকিমের জন্য একদিন ও একরাত ধার্য করেছেন"। সহীহ মুসলিম (২৭৬) ।

আবু বাকরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "তিনি মুসাফিরের জন্য তিনদিন এবং তিনরাত, আর মুকিমের জন্য একদিন ও একরাত মোজার উপরে মাসাহ করার সুযোগ দিয়েছেন। যদি সে ওযূ করে দুই পায়ে মোজা পরিধান করে, এরপরে পুনরায় নতুন করে ওযূ করে"। ইবনু মাজাহ হাদীসটি (৫৫৬) বর্ণনা করেছেন। সনদ হাসান। এটা আমাদের শায়েখ রহিমাহুল্লাহ এর মুসনাদে (১১৬৫) বর্ণিত হয়েছে। এটা একদল সাহাবী থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

এটা অধিকাংশ সাহাবা, তাবেঈন ও তাদের পরবর্তী আলেমগণের মত। আর এই মতটিই সহীহ। পূর্ববর্তী দলীলগুলোর ভিত্তিতে। তবে এখানে মতানৈক্যও রয়েছে।

যদি তুমি চাও, তাহলে এই সূত্রগুলো দেখতে পার: আল আওসাত (১/৪৩৪), আল মাজমূ' (১/৫০৮), আল মুগনী (১/২৮৬) ।

মাসাহ এর মেয়াদ কখন থেকে শুরু হয়?

প্রথম মত: মাসাহ এর মেয়াদ শুরু হবে কোনো নাপাকির পরে ওযূ করার সময় মাসাহ করার সময় থেকে। এটা আওযাঈ, আবু ছাওর, দাউদ এর মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। যা ইবনু মুনযির গ্রহণ করেছেন। এমন মত উমার ইবনু খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নববী বলেছেন: দলীলের দিক থেকে এই মতটি প্রাধান্যযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় মত: মাসাহ এর মেয়াদ শুরু হবে মোজা পরিধানের পরে প্রথমবার নাপাক হওয়ার সময় থেকে। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

তৃতীয় মত: মোজা পরিধানের সময় থেকেই মাসাহ এর মেয়াদ শুরু হবে। এটা হাসান বাসরীর মত। এই বিষয়ে আরো কয়েকটি মত রয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। এই মতের প্রাধান্যতাকে আরো জোরালোভাবে সাব্যস্ত করে আবু বাকরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। যা তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: "তিনি মুসাফিরের জন্য তিনদিন এবং তিনরাত, আর মুকিমের জন্য একদিন ও একরাত মোজার উপরে মাসাহ করার সুযোগ দিয়েছেন। যদি সে ওযূ করে দুই পায়ে মোজা পরিধান করে, এরপরে পুনরায় নতুন করে ওযূ করে"। হাদীসটির তাখরিজ এই মাসআলার পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৪৪৩), আল মুগনী (১/২৯১), আল মাজমূ' (১/৫১২) ।

যে ব্যক্তি মুকিম থাকাবস্থায় মাসাহ শুরু করে এরপরে সফরে গমন করে সে কোন মেয়াদ পর্যন্ত মাসাহ করবে?

প্রথম মত: এমন ব্যক্তি মুকিমের মেয়াদ অনুসারে মাসাহ করবে। এটা শাফেয়ী, ইসহাক, মালেকের মত। আহমাদ ও দাউদের একটি বর্ণনা। তাদের দলীল হলো: এটা এমন একটা ইবাদত, যা বাড়িতে এবং সফরে উভয় স্থানেই পালনযোগ্য। বিধায় বাড়ির বিধানটি সফরের বিধানের উপরে প্রাধান্য পাবে। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সন্দেহের পথ পরিত্যাগ করে নিশ্চয়তার পথে আসো"।

দ্বিতীয় মত: এমন ব্যক্তি মুসাফিরের মেয়াদ অনুসারে মাসাহ করবে। চাই সে বাড়িতে একটি সালাতের জন্য মাসাহ করুক বা একাধিক সালাতের জন্য মাসাহ করুক। এটা আবু হানীফার মাযহাব। ছাওরী, ইবনু হাযম এর মত। আহমাদ ও দাউদের একটি বর্ণনা। তাদের দলীল হলো: সে ঐ উপকরণ পেয়েছে, যা দ্বারা বাড়ির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই সফরের মেয়াদ প্রবেশ করবে। এটা শক্তিশালী মত। তবে প্রথম মতটি অধিক সুরক্ষিত।

ফায়দা: শায়েখ ইবনু উসাইমীন বলেছেন: যদি বাড়ির মেয়াদ সফরে গমনের পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, যেমন মাসাহকারী সফরে যাওয়ার পূর্বেই পূর্ণ একদিন ও একরাত মাসাহ করল, এরপরে মাসাহ শুরুর পূর্বেই সফরে বের হলো, তাহলে ওযূর সময় মোজা খুলে ফেলা তার উপরে ওয়াজিব।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৪৪৫), আল মুগনী (১/২৯১), আল মাজমূ' (১/৫১৪), আশ শারহুল মুমতি' (১/২৫১)।

যে ব্যক্তি সফরে থাকাবস্থায় মাসাহ শুরু করেছে পরে যদি সে মুকিম হয় তাহলে তার বিধান কী?

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আমরা ইলম সংরক্ষণ করেছি যাদের সূত্রে এমন সকল আলেমই এই বিষয়ে ইজমা' করেছেন: যে ব্যক্তি মাসাহ করল, বাড়িতে আগমন করল, সে তার উভয় পায়ের মোজা খুলে ফেলবে, যদি সে মুসাফির অবস্থায় একদিন ও একরাত মাসাহ করে। এরপরে যদি সে মুকিম হয়, তাহলে তার জন্য মুকিমের বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি সে সফরে একদিন ও একরাতের কম সময় মাসাহ করে থাকে, তাহলে মুকিম হওয়ার পরে পূর্ণ একদিন ও একরাত পর্যন্ত মাসাহ করবে। এটা সুফয়ান ছাওরী, শাফেয়ী, আহমাদ বিন হাম্বল এবং যুক্তিবাদীদের মত।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৪৪৬), আল মুগনী (১/২৯৩), আল মাজমূ' (১/৫১৫)।

ছিদ্রযুক্ত মোজার উপরে মাসাহ করার বিধান কী?

প্রথম মত: মোজার উপরে ততক্ষণ পর্যন্ত মাসাহ করা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা পরিধান করা সম্ভব হয়। এটা সুফয়ান ছাওরী, ইসহাক, ইবনু মুবারাক, ইবনু উয়ায়নাহ, ইয়াযীদ বিন হারুন, আবু ছাওর ও ইবনু মুনযিরের মত। ইবনু তাইমিয়্যাহ এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

এই মতের দলীল হলো: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কথা ও কাজের মাধ্যমে দুই মোজার উপরে মাসাহ করার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এটা জানা কথা যে, তারা বেশি পরিমাণে সফর করতেন। আর তাদের মাঝে অনেকেই ছিলেন দরিদ্র। তাদের থেকে এমনটি বর্ণিত হয়নি যে, তারা উক্ত ব্যক্তিকে নতুন করে মাসাহ শুরু করার আদেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসসমূহ মুক্ত অর্থ বিশিষ্ট। আমাদের উল্লিখিত কারণ ব্যতীতও তাদের আরো বহু কারণ রয়েছে। যেগুলো নির্দিষ্ট সূত্রসমূহে দেখা যেতে পারে।

দ্বিতীয় মত: যদি মোজার উপরে এতটুকু ফাঁটা থাকে, যার ফলে ওযূর কোনো একটি অংশ প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তাহলে উক্ত মোজার উপরে মাসাহ করা যাবে না। এটা শাফেয়ী, আহমাদ ও মুয়াম্মার এর মত। প্রথম মতের উত্তর এবং এই মতের দলীলটি হলো: মুক্তভাবে মোজার উপরে মাসাহ করার বৈধতার বিষয়টিকে নির্দিষ্ট মোজার জন্য ধার্য করা হয়েছে। আর সেটা হলো ভালো মোজা। এছাড়াও তাদের নিকটে অন্যান্য অনেকগুলো দলীল রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোতে দৃষ্টি বুলানো চাই।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটিই প্রাধান্যযোগ্য। যেহেতু এই বিষয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসগুলো অনেক বেশি। যেগুলো মুক্ত অর্থ বিশিষ্ট। ফাঁটা মোজার উপরে মাসাহ থেকে বিরত থাকতে হবে এমন কোনো আদেশ আসেনি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৪৪৮), আল মাজমূ' (১/৫২৩), আল মুগনী (১/২৯৬), আল ফাতাওয়া (২১/১৭২)।

জাওরাব মোজার উপরে মাসাহ করার বিধান

জাওরাবের (চামড়া ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর তৈরী মোজা। যা সুতা, পশম, তুলা বা অন্য কিছু দ্বারা গঠিত) উপরে মাসাহ করা জায়েয আছে। এটা জমহুর সাহাবা, তাবেঈন ও তাদের পরবর্তী আলেমগণের মত। ইবনু মুনযির এই মতটিকে নয়জন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। এই মতের দলীল হলো: ছাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। সেখানে বলা হয়েছে: আর তাদেরকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন পাগড়ি ও মোজার উপরে মাসাহ করার ব্যাপারে। আহমাদ (৫/২৭৭), আবু দাউদ (১৪৬)। এটা সহীহ

হাদীস। এই বিষয়ে অনেকগুলো দুর্বল হাদীসও রয়েছে। যেগুলো মুগিরাহ থেকে, আবু মূসা থেকে ও বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত।

দ্বিতীয় মত: জাওরাব মোজার উপরে মাসাহ করা মাকরূহ। এটা মালেক, আওযাঈ, শাফেয়ী ও আবু হানীফার মত। যা মুজাহিদ, আমর বিন দিনার ও হাসান বিন মুসলিম এর মত। যা আতা এর একটি বর্ণনা।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। দলীল হলো: ছাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। আর যেহেতু এটা সাহাবীদের একটি দলের মত, যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এটা ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু উসাইমীনের নিকট গ্রহণযোগ্য মত।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (১/৪৬২), আল মুগনী (১/২৯৪), আল মাজমূ' (১/৫৭২), আল ফাতাওয়া (২১/১৮৪-২১৪), আশ শারহুল মুমতি' (১/২৩৪) ।

জুরমুক এর উপরে মাসাহ করার বিধান কী?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ আল মাজমূ' গ্রন্থে (১/৫৩৬) বলেছেন: আমাদের মাযহাবের নতুন মতের ভিত্তিতে, অধিক স্পষ্ট মত হলো: জুরমুকের (সাধারণ মোজার উপরে পরিহিত প্রশস্ত মোজা) উপরে মাসাহ করা নিষিদ্ধ। এটা মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মত।

সুফয়ান ছাওরী, আবু হানীফা, হাসান বিন সালেহ, আহমাদ, দাউদ, মুযানী এবং অধিকাংশ আলেমের মতে জায়েয আছে।

শায়েখ আবু হামেদ বলেছেন: এটা সকল আলেমদের মত। মুযানী তার মুখতাসারে বলেছেন: এমন মোজার উপরে মাসাহ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই।

আমি বলব: অধিকাংশ আলেমের মতটিই সঠিক।

খুফ, জাওরাব এবং জুরমুক কাকে বলে?

খুফ (خف) হলো: চামড়ার তৈরী মোজা, যা পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঢেকে রাখে। এর বহু বচন হলো خِفَافٌ ও أخفاف।

জাওরাব (جورب) হলো: পায়ের পরিধেয় পোশাক, যা মোজার চাইতে বড়, পায়ের নলা পর্যন্ত লম্বা হয়। এর দ্বারা সাধারণত ঠাণ্ডা থেকে বাঁচা উদ্দেশ্য হয়। যা পশম, তুলা বা এই

জাতীয় বস্তু থেকে সুই দ্বারা তৈরী হয়ে থাকে। অথবা কাপড়ের টুকরা সেলাই করে বানানো হয়। এখান থেকেই যুগের সমষ্টিকে শুররাব তথা সুতার গোছা বলা হয়।

জুরমুক (الجُرمُوقُ) হলো: এমন পরিধেয়, যা মোজার ন্যায়। কিন্তু এটাও মোজার চাইতে বড় ও প্রশস্ত হয়। যা বরফের দেশগুলোতে মোজার উপরে পরিধান করা হয়। পানি, মাটি ও এই জাতীয় ময়লা থেকে বাঁচার জন্য।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (১/৫৩১), কিতাবু ফিকহিত তাহারাহ (৩৬৫, ৩৯৫, ৪০০)।

যদি একটি মোজার উপরে আরেকটি মোজা অথবা একটি জাওরাবের উপরে আরেকটি জাওরাব পরিধান করে?

এই মাসআলার কয়েকটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: যদি একটি মোজার উপরে আরেকটি মোজা পরিধান করে এবং উভয়টিই যদি ওযূ ভঙ্গের আগেই পরিধান করে, তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে উপরের মোজার উপরে মাসাহ করা জায়েয আছে। তবে শাফেয়ীর নতুন মত অনুসারে জায়েয নেই। ইমাম মালেক থেকেও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: জায়েয নেই।

সঠিক মত হলো: অধিকাংশ আলেমের মত।

দ্বিতীয় অবস্থা: যদি প্রথম মোজাটি পরিধানের পরে ওযূ ভঙ্গ হয়, এরপরে সেটার উপরে আরেকটি মোজা পরিধান করে, তাহলে উপরের মোজায় মাসাহ করা জায়েয নেই। কারণ, এটা নাপাক অবস্থায় পরিধান করা হয়েছে।

তৃতীয় অবস্থা: উপরের মোজা ওযূ ভঙ্গের পরে পরিধান করা হয়, আর নিচের মোজার উপরে ইতোমধ্যে মাসাহ করা হয়ে থাকে, তাহলে এই ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলেমের মতে, একমাত্র নিচের মোজার উপরেই মাসাহ করতে হবে। তারা বলেছেন: কারণ, উপরের মোজাটি সে পানি বিশিষ্ট পবিত্রতার ভিত্তিতে পরিধান করেনি। কোনো কোনো শাফেয়ী আলেম এবং মালেকী মাযহাবের একটি মত অনুসারে: উপরের মোজায় মাসাহ করা জায়েয। তারা বলেছেন: যেহেতু দুই মোজার উপরে কৃত মাসাহ নাপাকি দূরকারী।

সঠিক মত হলো: অধিকাংশ আলেমের মত।

চতুর্থ অবস্থ: যদি উপরের মোজার উপরে মাসাহ করে, এরপরে সেটা খুলে ফেলে: তাহলে কি নিচের মোজার উপরে মাসাহ করা জায়েয হবে? হানাফী এবং মালেকী মাযহাব মতে: নিচের মোজার উপরে মাসাহ করা যাবে। তবে মালেকী আলেমগণ শর্ত দিয়েছেন: নিচের মোজার উপরে তাৎক্ষণিক মাসাহ করতে হবে। কারণ, তাদের মতে বিরতিহীনতা শর্ত। কিন্তু হানাফীদের মতে তা শর্ত নয়।

হাম্বলীদের মতে: যদি উপরের মোজায় মাসাহ করার পরে তা খুলে ফেলে, তাহলে পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে এবং উভয় মোজা খুলে ফেলা এবং দুই পা ধৌত করা ওয়াজিব হবে। যেহেতু মাসাহ এর ক্ষেত্র বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তারা বলেছেন: যেহেতু মাসাহ করার এই সুবিধাটি উপরের মোজা দুইটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। ফলে এটা পা খুলে যাওয়ার মতই হয়েছে।

তুলনামূলক সহীহ মত: প্রথম মতটি, যা ইবনু উসাইমীন গ্রহণ করেছেন। তিনি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই মতটি মানুষের জন্য সহজ। কারণ, অনেক মানুষ জাওরাবের উপরে সাধারণ মোজা পরিধান করে। আর উভয়টির উপরেই সে মাসাহ করবে, প্রয়োজনে ঘুমের সময় উভয়টি খুলে রাখবে।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২৮৪), আল মাজমূ' (১/৫৩১-৫৩৩), হাশিয়াতুর রওয (১/২৩৩), আশ শারহুল মুমতি' (১/২৫৬), আহকামুল মাসাহ আলাল হায়িল (১/৪৪৩), ফিকহুত তাহারাহ (১/৩৯৬) ।

মোজার উপরে মাসাহ করার পরে তা খুলে ফেললে কি ওযূ নষ্ট হয়ে যায়?

প্রথম মত: শুধুমাত্র দুই পা ধৌত করাই যথেষ্ট। এটা আতা, আলকামাহ ও আসওয়াদ এর মত। আবু হানীফা ও তার অনুসারীগণ, সুফয়ান ছাওরী, আবু ছাওর ওপ মুযানীর মত। এবং আহমাদের একটি বর্ণনা। তাদের দলীল হলো: পায়ে নাপাকি সংক্রমিত হয়নি যেহেতু তা মোজা দ্বারা ঢাকা ছিল, কিন্তু মোজা খুলার দ্বারা সেটা দুই পায়ে সংক্রমিত হয়েছে। আর হানাফীদের মতে বিরতিহীনতা পবিত্রতার জন্য শর্ত নয়।

দ্বিতীয় মত: তার ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। তার জন্য নতুন করে ওযূ করা জরুরী। এটা মাকহুল, নাখঈ, যুহরী, ইবনু আবি লায়লা, আওযাঈ। হাসান বিন সালেহ, ইসহাক ও আহমাদের সবচেয়ে সহীহ মত। তাদের দলীল হলো: ওযূ কোনো কোনো অঙ্গের ক্ষেত্রে নষ্ট হয়েছে। বিধায় তা সকল অঙ্গের ক্ষেত্রেই নষ্ট হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। যেমন সরাসরি হাদাসের দ্বারা ওযূ নষ্ট হলে ওযূর সকল অঙ্গেই নাপাকি সংক্রমিত হয়।

তৃতীয় মত: যদি মোজা খুলে ফেলার পরে দুই পা ধৌত করে, তাহলে সেটাই যথেষ্ট। আর যদি দীর্ঘ বিরতি হয়, তাহলে নতুন করে ওযূ করতে হবে। এটা মালেক, লাইছ এর মত। তাদের দলীল হলো: প্রথম মতের দলীল। যেহেতু বিরতিহীনতা তাদের মতে শর্ত।

তারা বলেছেন: ওযর (অপারগতা) থাকলে বিরতিহীনতার শর্তটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর প্রথম পবিত্রতা এবং দুই পা ধৌত করার মাঝে দীর্ঘ বিরতিকে তারা এমন অযরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যার দ্বারা বিরতিহীনতার শর্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়।

চতুর্থ মত: দুই পা ধৌত করা বা অন্য কিছুই করার দরকার নেই। বরং তার পবিত্রতা সহীহ থাকবে। যতক্ষণ তার ওযূ নষ্ট না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সালাত আদায় করতে পারবে।

ঠিক যেমনটি মোজা খুলার পূর্বে ছিল। এটা হাসান বাসরী, কাতাদাহ, সুলায়মান বিন হারব এর মত।

এই মতটি ইবনু মুনযির, ইবনু হাযম, নববী, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু উসাইমীন ও আমাদের শায়েখ আল ওয়াদেঈ গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল হলো: এই পবিত্রতা শারঈ দলীলের দাবির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। আর যেটা শারঈ দলীলের দাবি[1] থেকে সাব্যস্ত হয়, সেটা শারঈ দলীল ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা অকার্যকর হয় না। বিধায় মৌলিক অবস্থার ভিত্তিতে পবিত্রতা এখনো অবশিষ্ট আছে।

গ্রহণযোগ্য মত: চতুর্থ মত।

ফায়দা: শায়েখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: কিন্তু সে এই অবস্থায় নতুন করে মাসাহ করার জন্য পুনরায় মাসাহ শুরু করবে না। কারণ, যদি এটা করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে মাসাহ এর মেয়াদ নির্ধারণের কোনো অর্থ থাকে না। কারণ, এতে স্থায়ীভাবে মাসাহ করতে চায় এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই মোজা খুলে ফেলবে, এরপরে সে মোজা পরিধান করবে, তারপরে পুনরায় নতুন মেয়াদ অনুযায়ী মাসাহ করবে।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (১/৩৩৭), আল মুগনী (১/২৮৮), আল মাজমূ' (১/৫৫৭), আশ শারহুল মুমতি' (১/২৬৩) ।

ইস্তেহাযাগ্রস্থ নারী এবং স্থায়ী নাপাকগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য কি মোজার উপরে মাসাহ করা জায়েয?

প্রথম মত: ইস্তেহাযাগ্রস্থ নারী এবং স্থায়ী নাপাকগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য মোজার উপরে মাসাহ করা জায়েয আছে। এটা মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। তাদের দলীল হলো: স্থায়ী নাপাকগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে পবিত্রতা পূর্ণাঙ্গ বলে গণ্য হবে। আর যখন বিষয়টি এমনই, বিধায় সে যদি পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করে, তাহলে তার জন্য মাসাহ করা জায়েয। এটাকে নিষেধ করে এমন কোনো দলীল নেই।

তারা আরো বলেছেন: যখন নাপাকি নির্গত হওয়াটা তার পবিত্রতা নষ্ট করছে না, বরং উক্ত পবিত্রতা দ্বারা তার সালাত বৈধ সাব্যস্ত হচ্ছে, তখন এর দ্বারা মোজার উপরে মাসাহ বৈধ সাব্যস্ত হবে আরো উত্তমভাবে।

দ্বিতীয় মত: যদি ওযূর পরে মোজা পরিধান করে, এরপরে স্থায়ী নাপাকি ব্যতীত অন্য কোনো নাপাকির দ্বারা ওযূ নষ্ট হয় এবং একটি ফরয সালাত আদায়ের পূর্বেই ওযূ নষ্ট হয়, তাহলে সে মাসাহ করবে এবং এর দ্বারা একটি মাত্র ফরয সালাত আদায় করবে। আর যতগুলো ইচ্ছা নফল নফল সালাত আদায় করবে। আর যদি উক্ত ফরয সালাত আদায়ের পরে তার

---

১ মুকতাযান নস: নসের অতিরিক্ত অর্থ, যেটা ব্যতীত নসের প্রকৃত অর্থ সাব্যস্ত হয় না।

ওযূ নষ্ট হয়, তাহলে শুধুমাত্র নফলের জন্য মাসাহ করতে পারবে। কিন্তু কোনো ফরয সালাতের জন্য মাসাহ করতে পারবে না। এটা শাফেয়ীদের মাযহাব। তাদের দলীল হলো: এমন পবিত্রতা শুধুমাত্র একটি ফরয সালাত এবং নফলসমূহ বৈধ হওয়ার সাথে সীমাবদ্ধ। সে একটি ফরযের অধিক সালাতের ক্ষেত্রে নাপাক বলে বিবেচিত হবে। বিধায় সে নাপাক অবস্থায় মাসাহ করেছে বলেই বিবেচিত হবে। কারণ, তাদের মতে এমন পবিত্রতা নাপাকি স্থায়ীরূপে দূর করতে পারে না।

তৃতীয় মত: স্থায়ী নাপাকগ্রস্থ ব্যক্তি কখনোই মাসাহ করবে না। এটা শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের একটি মত। তারা বলেছেন: কারণ, সে মূলত নাপাক। আর স্থায়ী নাপাকগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য সালাতকে বৈধ করা হয়েছে জরুরী অবস্থার কারণে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মত। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২৮৩), আল মাজমূ' (১/৫৪৩), আহকামুল মাসাহ আলাল হায়িল (১৫৫) ।

তায়াম্মুমকারীর জন্য কি মোজার উপরে মাসাহ করা জায়েয আছে?

প্রথম মত: যদি পানি না থাকার কারণে তায়াম্মুম করে, এরপরে মোজা পরিধান করে, তাহলে পানি পাওয়া গেলে আর মাসাহ করা জায়েয হবে না। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"নিশ্চয় উচ্চভূমির (ঢিবি) পবিত্র মাটি মুসলিম ব্যক্তির জন্য পবিত্রকারী উপকরণ, যদিও সে দশ বছর পানি না পায়। যদি সে পানি পায়, তাহলে সে উক্ত পানি দ্বারা তার ত্বক ভিজিয়ে নিবে। কারণ, সেটা অধিক উত্তম"। তিরমিযী (১২৪), আবু দাউদ (৩৩২)। হাদীসটি দুর্বল। কারণ, এটা আমর বিন বুজদানের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যে মাজহুল রাবী। কিন্তু আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস এই হাদীসের শাহেদ। ফলে এটা হাসানের পর্যায়ে উন্নীত হয়। আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে আল ইরওয়া গ্রন্থে (১৫৩) সহীহ বলেছেন।

হাদীসে বিদ্যমান দলীল: "সে যেনো উক্ত পানি দ্বারা তার ত্বক ভিজিয়ে নেয়"। তারা বলেছেন: কারণ, পানি পাওয়ার কারণে তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি তার পূর্ববর্তী নাপাক অবস্থায় ফিরে এসেছে।

দ্বিতীয় মত: সে মাসাহ করবে। এটা আহমাদের একটি বর্ণনা। এই মতের দলীল হলো: মুগীরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "আমি উভয় পা পবিত্র অবস্থায় প্রবেশ করিয়েছি"। তারা বলেছেন: তিনি এখানে একমাত্র

পবিত্র হওয়াকেই শর্ত নির্ধারণ করেছেন। তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি কুরআনের নস (কুরআন হাদীসের দলীল) দ্বারা পবিত্র বলে সাব্যস্ত। সেটা হলো: তায়াম্মুমের পবিত্রতার কথা বলার পরে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী: "কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান" (আল মায়িদাহ: ৬) এবং সুন্নাহর নস (হাদীসের দলীল) দ্বারা: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমার জন্য জমিনকে মাসজিদ বানানো হয়েছে এবং পবিত্র হওয়ার উপকরণ (মাধ্যম) বানানো হয়েছে" ।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মত: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের ভিত্তিতে। যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে: "সে যেনো আল্লাহকে ভয় করে এবং তার ত্বককে পানি দ্বারা ভিজিয়ে নেয়"।

পানি হারানো ব্যতীত অন্য কোনো কারণে তায়াম্মুম করলে বিধান কী এই বিষয়ক আলোচনাটি অবশিষ্ট আছে। এই বিষয়ে ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যদি তায়াম্মুমকারী পানি হারানোর কারণে নয়, বরং অন্য কোনো কারণে তায়াম্মুম করে থাকে, তাহলে তার বিধান ইস্তেহাযাগ্রস্থ ব্যক্তির ন্যায়। কারণ, পানি পাওয়া গেলেও তার পবিত্রতার মাঝে কোনো প্রভাব পড়বে না। কিন্তু সে নিজেই দুর্বল। বিধায় তার অবস্থা ইস্তেহাযাগ্রস্থ নারীর ন্যায়। এই মতটি রাফেঈ সহ একদল আলেম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২৮৩), আল মাজমূ' (১/৫৪৫), আহকামুল মাসাহ আলাল হায়িল (২৩৫) ।

٤. بَابٌ فِي الْمَذْيِ وَغَيْرِهِ

অধ্যায়: ৪- মযী এবং অন্যান্য বিষয় প্রসঙ্গ

মযী (المذي)- এটা এমন সাদা পিচ্ছিল পানি, যা নারী-পুরুষ একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার দ্বারা, মিলনের কথা কল্পনার দ্বারা বা মিলনের ইচ্ছা করার দ্বারা নির্গত হয়। কখনো এটা নির্গত হওয়ার বিষয়টি অনুভব করা যায় না।

অদী (الودي) হলো: এমন আর্দ্র পানি, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেশাবের পরে পুরুষাঙ্গ থেকে নির্গত হয়। আবার কখনো ভারী বোঝা বহনের ফলেও এটা নির্গত হতে পারে।

٢٣. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّى، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ ابْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ». وَلِلْبُخَارِيِّ: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ». وَلِمُسْلِمٍ: «تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ».

২৩. আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি এমন এক ব্যক্তি ছিলাম, যার অত্যাধিক মযি বের হতো। কিন্তু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা (ফাতেমা) আমার ঘরে থাকার কারণে আমি তাকে (সে বিষয় সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা বোধ করলাম। অতএব, আমি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে বললাম যেন তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে ব্যক্তি প্রথমে তার পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, অতঃপর ওযূ করবে। [সহীহ বুখারী হা/ ১৩২, ২৬৯ ও সহীহ মুসলিম হা/৩০৩]। সহীহ বুখারীতে আছে, পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, অতঃপর ওযূ করবে। [সহীহ বুখারী হা/ ২৬৯] সহীহ মুসলিমে আছে, পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, অতঃপর ওযূ করবে। [সহীহ মুসলিম হা/৩০৩]

মযী পানি দ্বারা ধৌত করা জরুরী নাকি ঢিলা দ্বারা পরিষ্কার করলেই যথেষ্ট হবে?

হাফেয রহিমাহুল্লাহ হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ হাদীসটি দ্বারা ইবনু দাকিকিল ঈদ এই বিষয়ে দলীল পেশ করেছেন যে, এই ক্ষেত্রে একমাত্র পানিই পবিত্র হওয়ার নির্দিষ্ট উপকরণ। ঢিলা বা এই জাতীয় অন্যান্য বস্তু গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ পানি ব্যবহারকেই নির্ধারিত করছে। আর দলীলে নির্ধারিত বিষয়টিকে সরাসরি না পালন করলে সেটা মান্য করা হয় না। এই মতটিকেই ইমাম নববী শারহু মুসলিমে সহীহ বলেছেন এবং অন্যান্য গ্রন্থসমূহে তিনি শুধু পানি ব্যবহারকে সহীহ বলেছেন এই ভিত্তি যে, এটা (মযী) পেশাবের অন্তর্ভূক্ত, আর উক্ত হাদীসে ধৌত করার আদেশটি মুস্তাহাব পর্যায়ের। অথবা ধৌত করার আদেশটি এখানে প্রচলিত বাচনভঙ্গির কারণে। আর এটা মাযহাবের (শাফেয়ী) একটি পরিচিত মূলনীতি।

ইবনু বায রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীর টীকায় ইবনু দাকিকিল ঈদ এর মতটিকেই সঠিক বলেছেন। আর এটাই সঠিক মত।

দ্রষ্টব্যঃ শারহু মুসলিম (৩০৩), আল ফাতহ (১/৩৮০) ।

মযী ও অদী এর বিধান কী?

অধিকাংশ আলেমের মতে, বরং অনেক আলেমগণ এই বিষয়ে ইজমা' বর্ণনা করেছেন যে, অদী ও মযী নাপাক। নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: গোটা উম্মত এই বিষয়ে ইজমা' করেছে: মযী ও অদী নাপাক। এরপরে আমাদের এবং জমহুরের মাযহাব হলো: মযী ধৌত করা ওয়াজিব। এর উপরে শুধু পানি ছিটিয়ে দেওয়া যথেষ্ট নয়।

কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ মযীর সংজ্ঞা দেওয়ার পরে বলেছেন: আলেমগণের সর্বসম্মতিক্রমে এটা নাপাক। তবে আহমাদ বিন হাম্বলের একটি বর্ণনা মতে, এটা পাক। যেমন: মনী (বীর্য) তার মতে পাক। এটা শায (অগ্রহণযোগ্য) মতানৈক্য।

আমি বলব: জমহুর আলেমগণের দলীল: আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "সে তার পুরুষাঙ্গকে ধৌত করবে এবং ওযূ করবে"। আরেকটি শব্দে বলা হয়েছে: "তুমি ওযূ করো এবং তোমার পুরুষাঙ্গে পানি ছিটিয়ে দাও"। আর এটা মযী নাপাক হওয়ার স্পষ্ট দলীল।

দ্রষ্টব্য: আল মুফহিম (১/৫৬২), আল মাজমূ' (২/৫৭১), আল ফাতহ (১/৩৮১) ।

٢٤. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ المَازِنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

২৪. আব্বাদ ইবনে তামীম হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম আল মাযিনী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ মর্মে অভিযোগ করা হলো যে, যদি সালাতে কোনো মানুষের সন্দেহ হয় যে, (তার পেটের মধ্য হতে কিছু বের হয়েছে কি না? এক্ষেত্রে সে কি মাসজিদ হতে বের হবে? নাকি হবে না?) উত্তরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (তার পেটের মধ্য হতে কিছু বের হয়েছে ভেবে) সে মাসজিদ হতে বের হবে না, যে পর্যন্ত সে বায়ু বের হবার শব্দ শুনতে না পাবে অথবা বায়ুর গন্ধ না পাবে। [সহীহ বুখারী হা/১৩৭ ও মুসলিম হা/৩৬১]

এই হাদীসটি ফিকহের অন্যতম একটি মহান কায়দা

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ শারহু মুসলিমে (৩৬১) বলেছেন: এই হাদীসটি ইসলামের অন্যতম একটি মূলনীতি। ফিকহের অন্যতম একটি মহান কায়দা। আর তা হলো: সকল বস্তুর ক্ষেত্রেই "বস্তুটি তার মৌলিক অবস্থার উপরে বহাল আছে" এই বিধান প্রযোজ্য হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এর বিপরীত বিধান নিশ্চিতরূপে সাব্যস্ত না হয়।

এমনকি বস্তুটির উপরে আপতিত সন্দেহ তার বিধানকে দুর্বল করতে পারবে না। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো: এই পরিচ্ছেদের একটি মাসআলা, যেই বিষয়ে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

মাসআলাটি হলো: যে ব্যক্তি পবিত্র হয়েছে এই বিষয়ে নিশ্চিত, কিন্তু তার ওযূ নষ্ট হয়েছে কি না সেই বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছে, তাহলে সে পবিত্র আছে এই বিধান তার জন্য প্রযোজ্য হবে। আর এই সন্দেহ সালাতের ভিতরে সৃষ্টি হোক অথবা সালাতের বাইরে হোক, এতে কোনো পার্থক্য হবে না। বিধান উভয় ক্ষেত্রে একই হবে। এটা আমাদের এবং জমহুর আলেমগণ অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলেমগণের মত।

ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ থেকে দুইটি বর্ণনা পাওয়া যায়: একটি মত: যদি সালাতের বাইরে এমন সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তাহলে তার জন্য ওযূ করা আবশ্যক। আর যদি সে সালাতের মাঝে থাকে, তাহলে তার জন্য ওযূ আবশ্যক নয়। দ্বিতীয় মত: সর্ব ক্ষেত্রেই তার জন্য ওযূ করা আবশ্যক। প্রথম বর্ণনাটি হাসান বাসরী থেকে বর্ণিত হয়েছে। যা একটি ব্যতিক্রমী ও অগ্রহণযোগ্য মত, যা আমাদের মাযহাবের কিছু আলেমগণ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। যা ধর্তব্য নয়।

২৫. عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْها: «أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ».

عَنْ عَائِشَةَ – أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ».

وَلِمُسْلِمٍ: «فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ».

২৫. উম্মু কায়েস বিনতু মিহছান (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদিন তিনি তার এমন এক ছোট ছেলেকে নিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন যে শিশু এখনো খাবার খেতে শিখেনি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আপন কোলে বসালেন। শিশুটি তার কোলে প্রস্রাব করে দিল। তিনি পানি আনালেন এবং প্রস্রাবের ওপর পানি ছিটিয়ে দিলেন। আর ধুলেন না। [সহীহ বুখারী হা/২২৩ ও মুসলিম হা/২৮৭]

আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর একটি বর্ণনায় রয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একদা একটি বালক সন্তানকে আনা হলো, শিশুটি তার কোলে পেশাব করে দিলো। অতঃপর তিনি পানি আনতে বললেন এবং সেই পানি উক্ত পেশাবের ওপর ছিটিয়ে দিলেন। [সহীহ

বুখারী হা/২২২] আর মুসলিম এর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি সেই পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিলেন আর তার কাপড় ধুলেন না। [সহীহ মুসলিম হা/২৮৬]

দুগ্ধপানকারী শিশুর পেশাবের বিধান

প্রথম মত: এটা নাপাক। যা সকল আলেমগণের মত। বরং নববী এই বিষয়ে ইজমা' বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: জেনে রাখো, এই মতানৈক্যটি বাচ্চার পেশাবকৃত বস্তুটিকে পবিত্রকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে। বস্তুটির নাপাক হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। আমাদের মাযহাবের কোনো কোনো আলেম শিশুর পেশাব নাপাক হওয়ার পক্ষে ইজমা' বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়ে দাউদ যাহেরী ব্যতীত আর কেউ মতানৈক্য করেননি। খাত্তাবী ও অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন: যারা শিশুর পেশাবযুক্ত স্থানে ভালোভাবে পানি ঢেলে দেওয়াকে যথেষ্ট এবং জায়েয বলেছেন, তারা এটা এই জন্য বলেননি যে, এটা নাপাক নয়। বরং শিশুর পেশাবের নাপাকি দূর করার ক্ষেত্রে শিথিলতা থাকার কারণে। এটাই সঠিক মত। আবুল হাসান বিন বাত্তাল এবং কাযী আয়ায শাফেয়ী ও অন্যান্যদের থেকে এই মতটি বর্ণনা করেছে যে, শিশুর পেশাব পাক, বিধায় শুধু ঢেলে দেওয়াটাই যথেষ্ট হবে। এটা নিশ্চিত বাতিল বর্ণনা।

দ্বিতীয় মত: এটা পবিত্র। যা দাউদ যাহেরীর মত। মতটি শাফেয়ী, আহমাদ, হাসান, ইবনু ওয়াহিব থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইতোপূর্বেই উক্ত মতটি ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য আলেমদের মত হওয়ার ব্যাপারে ইমাম নববীর অস্বীকৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। বরং এই মতটি দাউদ যাহেরীর মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মত। আর শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেওয়ার যেই বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে, তা মূলত শিথিলতার কারণে।

কুরতুবী বলেছেন: ঐ সকল আলেমদের মত আশ্চর্যকর, যারা শিশুর পেশাবযুক্ত স্থানে পানির ছিটা বা পানি ঢেলে দেওয়ার আদেশ সংক্রান্ত হাদীস দ্বারা সেটা পাক হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করেন অথচ উক্ত বর্ণনায় সেটা পাক হওয়ার পক্ষে কোনো দলীল নেই। সর্বোচ্চ বর্ণনাটিতে পবিত্র করার পদ্ধতির মাঝে শিথিলতার নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেহেতু সম্পূর্ণ স্থানজুড়ে পানি ঢেলে দেওয়া ও পানি ছিটানোর ক্ষেত্রে শিথিলিতা দেওয়া হয়েছে। আর সেটা ধৌত করার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে শিথিলতার কারণেই। এই বিধানের সঙ্গে পুরুষকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, তারা সর্বদা পুরুষ সন্তান ধারণ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করত, যেহেতু তারা পুরুষদের অত্যধিক ভালোবাসত এবং তাদের ব্যাপারে আনন্দিত হতো।

দ্রষ্টব্য: আল মুফহিম (১/৫৪৭), শারহু মুসলিম (২৮৬)।

দুগ্ধপানকারী শিশুর পেশাব পবিত্র করার পদ্ধতি

প্রথম মত: বালক শিশুর পেশাবের ক্ষেত্রে শুধু পানি ঢেলে দেওয়াই যথেষ্ট। আর বালিকা শিশুর পেশাবের ক্ষেত্রে শুধু পানি ঢেলে দেওয়া যথেষ্ট নয়। এটা আলী, আতা, হাসান, যুহরী, আহমাদ, ইসহাক, ইবনু ওয়াহাব ও অন্যান্যদের মত।

দ্বিতীয় মত: উভয়ের পেশাবের ক্ষেত্রেই পানি ঢেলে দেওয়াই যথেষ্ট। এটা আওযাঈর মাযহাব। যা মালেক ও শাফেয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় মত: উভয়ের পেশাবের ক্ষেত্রেই বিধান সমান; পেশাবযুক্ত বস্তু ধৌত করা ওয়াজিব। এটা আবু হানাফী ও মালেকীদের মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আর তা হলো: বালক শিশুর পেশাবযুক্ত স্থানে পানি ঢেলে দেওয়াই যথেষ্ট। লেখক কর্তৃক বর্ণিত উম্মে কায়েস ও আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসের ভিত্তিতে।

আর বালিকা শিশুর পেশাবের বিধান হলো: এটা ধৌত করতে হবে। আবুস সামহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের ভিত্তিতে। তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বালিকা শিশুর পেশাব ধৌত করতে হবে। আর বালক শিশুর পেশাবযুক্ত স্থানে পানি ঢেলে দিতে হবে"। আবু দাউদ (৩৭৬), হাদীসের সনদ হাসান। এটা আমাদের শায়েখের সহীহ মুসনাদে (১২৩০) বর্ণিত হয়েছে।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (৫২৮), আল ফাতহ (১/৩২৭)।

বালক শিশু যদি খাদ্যের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে আহার করে তাহলে তার পেশাব ধৌত করতে হবে

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: পানি ঢেলে দেওয়া ততক্ষণ যথেষ্ট হবে, যতক্ষণ বালক শিশু মায়ের দুধ পান করবে। যদি সে খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য কোনো খাদ্য আহার করে, তাহলে সর্বসম্মতিতে তার পেশাব ধৌত করা ওয়াজিব।

ইবনু মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "শিশু খাদ্য আহার করে না" এর অর্থ হলো: সে শুধু খাদ্য আহার করে তার চাহিদা পূর্ণ করতে পারে না, উক্ত খাদ্য তার জন্য দুগ্ধ পানের বিকল্প খাবার হয় না। এমন না যে, তার পেটে কোনো খাদ্যই প্রবেশ করেনি।

হাফেয বলেছেন: খাদ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সে যেই দুধ পান করে, যেই খেজুর তাকে চিবিয়ে নরম করে দেওয়া হয় এবং ঔষধ ইত্যাদি সেবন করানোর জন্য যেই মধু তাকে পান করানো হয় এই জাতীয় খাদ্য ব্যতীত অন্য যেকোনো খাদ্য। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হলো: দুধ ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য দ্বারা খাবার গ্রহণের চাহিদা পরিপূর্ণভাবে পূর্ণ হয় না। এটা শারহু মুসলিমে ও শারহুল মুহাযযাবে বর্ণিত নববীর বক্তব্যের মূল দাবি।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (২৭৮), আল ইলাম (১/৬৮১), আল ফাতহ (১/৩২৬) ।

শিশুদেরকে ধর্মীয় মর্যাদাশীল ও সংস্কারকগণের দ্বারা বরকত হাসিল করা ও তাদের মুখ থেকে খেজুর ভিজিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট যাওয়ার বিধান

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: জন্ম নেওয়া সন্তানকে খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় বস্তু চিবিয়ে তাদের মুখে দেওয়া মুস্তাহাব হওয়ার ব্বিষয়টি সাব্যস্ত হয়। এর দ্বারা ধর্মীয় সংস্কারক ও মহান ব্যক্তিদের দ্বারা বরকত হাসিল করা এবং শিশু সন্তানদেরকে বরকত হাসিলের জন্য ধর্মীয় বুযুর্গগণের নিকট নিয়ে যাওয়াও সাব্যস্ত হয়।

হাফেয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই হাদীসে অনেকগুলো ফায়দা বিদ্যমান: উত্তম আচরণ, বিনয়, ছোটদের সঙ্গে নরম ব্যবহার, জন্ম নেওয়া সন্তানদেরকে খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় বস্তু চিবিয়ে তাদের মুখে দেওয়া, ধর্মীয় মহান ব্যক্তিদের থেকে বরকত হাসিল করা, শিশুদেরকে সন্তান জন্ম হওয়ার সময় এবং এর পরে তাদের নিকট নিয়ে যাওয়া।

আমি বলব: এই মতটিকে খণ্ডন করেছেন এবং বরকত হাসিলের বিষয়টি একমাত্র নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গেই নির্দিষ্ট তা ইবনু বায রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি ফাতহুল বারীর টীকায় বলেছেন: এই মতটি ত্রুটিপূর্ণ। সঠিক মত হলো: এটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে নির্দিষ্ট। অন্য কাউকে তাঁর উপরে কিয়াস করা যাবে না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাঝে বরকত রেখেছেন এবং তাঁকে এই বরকতকে তাঁর সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, অন্যদেরকে নয়। আর যেহেতু সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম অন্যের সঙ্গে এমনটি করেননি। অথচ তারা শরীআতের ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী। বিধায় তাদের অনুকরণ করা ওয়াজিব। আর এই জাতীয় কাজ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারোর জন্য জায়েয হলে, সেটা শিরকের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিবে।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (২৮৬), আল ফাতহ (১/৩২৭) ।

٢٦. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ».

২৬. আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একজন গ্রাম্যলোক এসে মাসজিদে (নব্বীর) এক ধারে পেশাব করতে লাগলে, লোকেরা তাকে ধমক দিতে লাগলো। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে ধমক দিতে নিষেধ করলেন। সেই ব্যক্তির পেশাব করা শেষ হলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ অনুযায়ী সেই

পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দেয়া হলো। [সহীহ বুখারী হা/২২১ ও মুসলিম হা/২৮৪-২৮৫]

এই হাদীসের বিধান ও ফায়দাসমূহ

১) মানুষের পেশাব নাপাক হওয়াটা সাব্যস্ত হয়, যা সর্বসম্মত মত। এই বিষয়ে একদল আলেম ইজমা' বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন: তাহাবী, ইবনু হাযম, ইবনু জুযাই আল মালেকী, নববী।

২) মাসজিদকে সম্মান করা এবং এটাকে নাপাক থেকে পবিত্র রাখা।

৩) জমিনের উপরে পানি ঢেলে দেওয়ার দ্বারাই তা পাক হয়ে যায়। সেটা খননের কোনো প্রয়োজন নেই। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

৪) মুর্খের প্রতি সহানুভূতি দেখানো, তাকে তিরস্কার না করে, কষ্ট না দিয়ে তার জন্য জরুরী বিষয় তাকে শিক্ষা দেওয়া। যদি সে অবহেলা এবং একগুয়েঁমি না করে থাকে।

৫) দুইটি ক্ষতির মাঝে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটির সমাধান করা, আর তুলনামূলক সহজ ক্ষতিটিকে সহ্য করা। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের কোনো কোনো শব্দে সহীহাইনে বর্ণনা করেছেন: "এটাকে পরিহার করো"। আলেমগণ বলেছেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য: "এটাকে পরিহার করো" দুইটি কল্যাণের স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত:

একটি হলো: যদি তার পেশাব বন্ধ করা হয়, তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আর মূল নাপাকি তো আগেই আপতিত হয়েছে। সুতরাং তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করার চাইতে আরো অধিক নাপাকের বোঝা সহ্য করাটাই অধিক উত্তম।

দ্বিতীয়টি হলো: নাপাক মাসজিদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে ছড়িয়েছে। যদি তারা তাকে পেশাবের মাঝেই বাঁধা প্রদান করত, তাহলে তার কাপড়, শরীর এবং মাসজিদের বিভিন্ন স্থান নাপাক হয়ে যেত।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (২৮৫), আল মাজমূ' (২/৫৬৭), আল ইলাম (১/২৯৫), শারহুল মা'আনী (১/১০৯), আল মারাতিব (১৯), আল কাওয়ানিন আল ফিকহিয়্যাহ (৩৫), আল ফাতহ (১/৩২৪) ।

২৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ».

২৭. আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: ফিতরাত তথা ইসলামী স্বভাব প্রকৃতি পাঁচটি: খাতনা করা, ক্ষুর দ্বারা নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, গোঁফ কাটা, নখ কাটা, বগলের নিচের লোম উপড়ে ফেলা। [সহীহ বুখারী হা/৫৮৮৯ ও মুসলিম হা/২৫৭]

পুরুষ ও নারীদের খাতনা করার বিধান কী?

প্রথম মত: পুরুষদের জন্য ওয়াজিব, আর নারীদের জন্য সম্মানের কাজ। তাদের জন্য ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ আলেমগণের মত। যারা পুরুষদের উপরে ওয়াজিব হওয়ার মত দিয়েছেন তাদের দলীল: আল্লাহ তা‘আলার বাণী: “এরপরে আমরা আপনার নিকট এই মর্মে অহী প্রেরণ করলাম যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহিমের আদর্শের অনুসরণ করুন” (আন নাহল: ১২৩) ।

বুখারী (৩৩৫৬) ও মুসলিমে (২৩৭০) আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আশি বছর বয়সে কুঠার দ্বারা খাতনা করেছেন”। আর কুলাইব আল জুহানী অথবা হাদরামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক নও মুসলিমকে বললেন: “তুমি তোমার মাথা থেকে কুফরের চুল মুণ্ডন করে ফেলো এবং খাতনা করো”। আবু দাউদ (৩৫৬) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আলবানী এটাকে তার শাওয়াহেদ এর ভিত্তিতে হাসান বলেছেন। দ্রষ্টব্য: আল ইরওয়া (৭৯)। তবে স্বাভাবিকভাবে এটা হাসানের পর্যায়ে উন্নীত হয় না বলেই মনে হয়। এই বিষয়ের তাহকীককের জন্য দ্রষ্টব্য: সুনানুল ফিতরাহ লিদ দিবয়ান (১০৫) ।

তারা বলেছেন: আর যেহেতু পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া নাপাকি আটকে রাখে, তাই এটা কাটার উপরে সালাত সহীহ হওয়া নির্ভরশীল। যেমন: কোনো ব্যক্তি তার মুখে নাপাক ধরে রাখল। এই দলীল উওস্থাপনের ব্যাপারে অনেকে সমালোচনা করেছেন। তারা আরো বলেছেন: সতর ঢাকা ওয়াজিব।

যদি খাতনা করা ওয়াজিব না হতো, তাহলে খাতনার উপযুক্ত ব্যক্তির সতরের দিকে তাকিয়ে তার মানহানি করা জায়েয হতো না। আর যেহেতু এটা মুসলিমদের প্রতিক। বিধায় এটা অন্যান্য প্রতিকের ন্যায় ওয়াজিব হবে।

দ্বিতীয় মত: এটা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ওয়াজিব। ইমাম নববী বলেছেন: সালাফগণের অনেকেই এই মত পোষণ করেছেন। যারা নারীদের জন্য ওয়াজিব বলে মত দিয়েছেন, তারা মুসনাদুল বাযযারে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন: একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার সাহাবীদের মহিলাগণের নিকট প্রবেশ করলেন, এরপরে বললেন: “হে আনসার নারীগণ, তোমরা হালকা পরিমাণ খেযাব লাগাও,

খাতনায় সামান্য পরিমাণ চামড়া কর্তন করো, বেশি করো না। কারণ, এটা তোমাদের স্বামীদের নিকট অধিক পছন্দনীয়। তোমাদেরকে আমি অনুগ্রহকারীদের (স্বামী) অবাধ্য হতে সাবধান করছি"। এটা মানদাল বিন আলী আল আনাযী এর সনদে বর্ণিত। তিনি দুর্বল রাবী। তাবারানী আল মু'জাম আস সগীর গ্রন্থে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "যখন তুমি খাতনা করবে, সামান্য পরিমাণ কর্তন করবে। বেশি করবে না"। এটাও দুর্বল হাদীস। এই হাদীসটি এবং পূর্বের হাদীসটির তাহকীক দেখার জন্য সুনানুল ফিতরাহ (৬০) দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় মত: এটা সকল আলেমগণের মতেই সুন্নাহ। এটা মালেক ও আবু হানীফার মত। এই মতের দলীল হলো: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "পাঁচটি কাজ ফিতরাতের (স্বভাব) অন্তর্ভুক্ত"। উক্ত পাঁচটি কাজের একটি হলো: খাতনা করা। আর এই হাদীস: "যখন দুই খিতান (পুরুষ ও নারীর লজ্জাস্থান) মিলিত হবে" ।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/৮৫), আল মাজমূ' (১/৩৯৪), শারহু মুসলিম (২৫৭), আল ফাতহ (১০/৩৪০), তুহফাতুল মাওদুদ ।

পুরুষাঙ্গ খাতনা করার পদ্ধতি

হাফেয রহিমাহুল্লাহ আল ফাতহ গ্রন্থে (১০/৩৪০) বলেছেন: মাওয়ারদী বলেছেন: পুরুষের খাতনা হলো, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ঢেকে রাখে এমন চামড়া কাটা। মুস্তাহাব হলো পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের সম্পূর্ণ চামড়া কেটে ফেলা। তবে অগ্রভাগের কোনো কিছু ঢেকে না থাকে এতটুকু পরিমাণ চামড়া কাটা খাতনা সহীহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ইমামুল হারামাইন বলেছেন: পুরুষদের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া পূর্ণরূপে কেটে ফেলা। এমনকি সামান্য পরিমাণ চামড়াও যেন ঝুলে না থাকে। ইবনুস সাব্বাগ বলেছেন: এমনকি সম্পূর্ণ অগ্রভাগটা যেনো প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

স্ত্রীলিঙ্গের খাতনা করার পদ্ধতি

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: স্ত্রীলিঙ্গের সর্ব উপরে বিদ্যমান চামড়ার আংশিক পরিমাণ কাটা।

হাফেয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: মাওয়ারদী বলেছেন: নারীর জন্য খাতনা হলো, তার লিঙ্গের সর্ব উপরে পুরুষাঙ্গ প্রবশের স্থানের উপরে বিদ্যমান চামড়া কর্তন করা। বীচির ন্যায় অথবা মোরগের ঝুঁটির ন্যায়। ওয়াজিব হলো: স্ত্রীলিঙ্গের উপরে সংযুক্ত চামড়া আংশিক পরিমাণ কাটা, সম্পূর্ণ চামড়া নয়।

ফায়দা: হাফেয বলেছেন: নববী বলেছেন: পুরুষের খাতনাকে ই'যার বলে। আর নারীর খাতনাকে খাফদ বলে। আবু শামাহ বলেছেন: ভাষাবিদদের বক্তব্যের দাবি অনুযায়ী প্রত্যেকটাকেই ই'যার বলা উচিত। আর খাফদ নারীর সঙ্গে নির্দিষ্ট।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (২৫৭), আল ফাতহ (১০/৩৪০) ।

যেই সময়ে খাতনা করা শরীআতসম্মত

খাতনার সময়ের ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। কেউ বলেছেন: বালেগ হওয়ার পরে। অভিভাবকের জন্য তার সন্তানকে বাল্যকালেই খাতনা করানো মুস্তাহাব। কেউ কেউ বলেছেন: সপ্তম দিবসে খাতনা করাতে হয়। যদি বিলম্ব হয়, তাহলে চল্লিশতম দিবসে। আর যদি আরো বিলম্ব হয়, তাহলে বছর শেষে। কেউ কেউ বলেছেন: দশ বছর হওয়া পর্যন্ত খাতনা করানো যাবে না।

নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ইবনু মুনযির আল ইশরাফ গ্রন্থে আল খিতান (খাতনা) অধ্যায়ে বলেছেন: খাতনা অধ্যায়ে নিষেধাজ্ঞামূলক কোনো নস (কুরআন হাদীসের দলীল) সাব্যস্ত হয়নি। এর কোনো নির্ধারিত সময়ও নির্দিষ্ট হয়নি এবং অনুকরণীয় কোনো সুন্নাহও পাওয়া যায়নি। যাবতীয় বিষয় স্বাভাবিক অবস্থায় বৈধ বলেই বিবেচিত হবে। এগুলোর কোনোটিকেই দলীল প্রমাণ ব্যতীত নিষিদ্ধ করা যাবে না। সপ্তম দিবসে খাতনা করতে নিষেধকারীর পক্ষে কোনো প্রমাণ আছে বলে আমরা জানি না। শায়খুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: খাতনা যখন ইচ্ছা হয়, তখনি করানো যাবে। কিন্তু যখন বালেগ হওয়ার উপক্রম হবে, তখন খাতনা করিয়ে নেওয়া উচিত। যেমনটি আরবরা পূর্বে করত। যাতে করে খাতনা না করা অবস্থায় সে বালেগ না হয়।

আমি বলব: বুখারী রহিমাহুল্লাহ আত তারিখুল আওসাত গ্রন্থে (১/১২৭) বলেছেন: আমাদেরকে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে উবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল মাজিদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাকে শু'বাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাকে আবু বিশর জানিয়েছেন, তিনি সাঈদ বিন জুবাইরকে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার

সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছে, তিনি বলেছেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর সময় আমার বয়স ছিল দশ বছর, তখন আমি খাতনাকৃত একজন বালক ছিলাম। যে মুফাচ্ছাল সূরাগুলো পাঠ করতে পারত। হাদীসটির সনদ হাসান।

তিনি এই হাদীসটিকে ইবনু ইসহাকের সূত্রে, তিনি সাঈদ বিন জুবাইরের থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন আমি খাতনাকৃত একজন বালক"। এই বর্ণনায় ইবনু ইসহাক স্পষ্টভাবে তার বয়সের বিবরণ দেননি, যেমনটি তুমি দেখছ। কিন্তু এটা পূর্বের বর্ণনার অনুগামী হিসেবে বিবেচিত।

এটা গেল খাতনার অনির্দিষ্ট সময়ের বর্ণনা। কিন্তু এমন দুইটি হাদীস আছে, যেখানে সপ্তম দিবসকে খাতনা করার নির্ধারিত দিবস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রথম: ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস: তিনি বলেছেন: সপ্তম দিবসে শিশুর ক্ষেত্রে পালনীয় সাতটি সুন্নাহ রয়েছে: এই দিবসে তার নাম রাখা হবে, তাকে খাতনা করানো হবে, তাকে অনিষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়া হবে (মাথার চুল মুণ্ডন করার মাধ্যমে)" হাদীসের শেষ পর্যন্ত। তাবারানী আল আওসাতে (৫৫৮) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এর সনদ দুর্বল। কারণ, এটা রাওওয়াদ ইবনু জাররাহ এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আত তাকরিবে তার ব্যাপারে বলা হয়েছে: "তিনি সত্যবাদী (তা'দীলের দ্বিতীয় স্তর) রাবী। তবে শেষজীবনে তিনি সঠিক এবং ভুল মিশ্রিত করে ফেলতেন। ফলে তিনি মাতরুক সাব্যস্ত হয়েছেন" ।

দ্বিতীয়: জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম দিবসে হাসান ও হুসাইন এর জন্য আকিকা দিয়েছেন এবং উভয়কে খাতনা করিয়েছেন"। তাবারানী আল মু'জাম আস সগীরে (৮৯২) বর্ণনা করেছেন। উকবাহ বলেছেন: এই হাদীসের রাবীদের কেউ সপ্তম দিবসে খাতনার কথা বলেননি ওয়ালীদ ব্যতীত।

আমি বলব: হাদীসটি মুহাম্মাদ বিন আবিস সাররি থেকে বর্ণিত হয়েছে। তার নাম হলো: মুহাম্মাদ বিন আল মুতাওয়াক্কিল। তিনি বলেন: ওয়ালীদ বিন মুসলিম আমাদেরকে যুহাইর বিন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ বিন আল মুনকাদির থেকে, তিনি জাবির থেকে। এরপরে তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটিতে কয়েকটি 'ইল্লাত আছে।

প্রথম 'ইল্লাত: মুহাম্মাদ বিন আবিস সাররি। আত তাকরিব গ্রন্থে বলা হয়েছে: তিনি ছদুক (সত্যবাদী), আরিফ (অভিজ্ঞ)। তবে তার অনেক ভুল অনুমান করতেন।

দ্বিতীয় 'ইল্লাত: ওয়ালীদ হলো মুদাল্লিস। যে তার শায়েখের শায়েখ এর নাম বিলুপ্ত করে হাদীস বর্ণনা করে। যেটাকে তাদলিসু তাসবীয়াহ বলে। আর সে 'আন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে।

তৃতীয় ‘ইল্লাত: যুহাইর বিন মুহাম্মাদ। শামীয়দের বর্ণনা তার সূত্রে দুর্বল। আবু হাতিম বলেছেন: তিনি শামে নিজ স্মৃতি থেকে বর্ণনা করে অনেকগুলো ভুল করেছেন। এটা সেই ভুলগুলোর একটি। কারণ, তার পরবর্তী রাবী হলো ওয়ালীদ বিন মুসলিম, যিনি শামী বা সিরীয়।

চতুর্থ ‘ইল্লাত: হাদীসটি আরেকটি সনদে জাবির থেকে বর্ণিত হয়েছে, এমনকি জাবির ব্যতীত অন্যের সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে খাতনা করার কথা উল্লেখ নেই।

এই আলোচনার ভিত্তিতে: এই হাদীসটি কি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার পূর্ববর্তী হাদীস সহ আদৌ শক্তিশালী হয়েছে? সঠিক উত্তর হলো: না, শক্তিশালী হয়নি। আল্লাহই ভালো জানেন। আহকামু সুনানিল ফিতরাহ (৭৮) লিদ দিবয়ান - হাফিযাহুল্লাহ - দ্রষ্টব্য ।

শায়েখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ তামামুল মিন্নাহ গ্রন্থে (৬৭) হাদীস দুইটি বর্ণনা করার পরে বলেছেন: কিন্তু হাদীস দুইটির একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। যেহেতু উভয়টির উৎস ভিন্ন ভিন্ন। আর উভয়টিতে কোনো মুততাহাম (বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী অথবা সাধারণ কথায় যার মিথ্যাবাদিতা সাব্যস্ত হয়েছে) রাবী নেই।

এটা এখনো অমীমাংসিত থাকল: মাসআলার সঠিক মত কোনটি?

সঠিক মত হলো: ইবনু মুনযির ও ইবনু তাইমিয়্যাহ যেটা বলেছেন। তবে ইমাম নববী শাফেয়ী আলেমগণ থেকে যেমনটি বর্ণনা করেছেন, সেটাও ধর্তব্য। আর তা হলো: “কিন্তু অভিভাবকের জন্য মুস্তাহাব হলো বালক শিশুর খাতনা শিশু কালেই করানো। কারণ, এটা তার জন্য অধিক সহনীয়।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ’ (১/৩৫০), আল ফাতহ (১/২৪২) ।

নাভীর তলদেশের চুল মুণ্ডন করা এর বিধান কী?

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ইসতিহদাদ হলো: নাভীর তলদেশের চুল মুণ্ডানো। এটা মুস্তাহাব। কারণ, এটা ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। এটা পরিত্যাগ করলে স্থানটি অত্যধিক নোংরা হয়। বিধায় এটা দূর করা মুস্তাহাব। যেকোনো বস্তুর সাহায্যেই সেটাকে দূর করা হোক না কেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই।

নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আর নাভীর তলদেশের চুল মুণ্ডানো, এটা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নাহ। স্বামীর আদেশে কি স্ত্রীর জন্য এটা মুণ্ডানো ওয়াজিব? এই বিষয়ে দুইটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে: অধিক সহীহ মতটি হলো: ওয়াজিব, যদি সেটার পরিমাণ এত বেশি না হয়, যে কামনাকারীর (স্বামী) রুচিতে সেটা ঘৃণা সৃষ্টি করে। আর যদি পরিমাণে এত বেশি হয়, যার ফলে কামনাকারীর অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করে, তাহলে সেটা মুণ্ডন করা অকাট্য ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে।

আমি বলব: একইভাবে পুরুষকেও নারীর জন্য এই ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন হতে বাধ্য করা হবে। যদি তার তলদেশের চুল অধিক বেশি হয় এবং সেটা সহবাসের উদ্দীপনাকে নষ্ট করে দেয়। কারণ, এটা উত্তম আচরণের মধ্যে বিবেচিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "তাদের (নারীগণ) সঙ্গে তোমরা সদাচারণ করো" (আন নিসা: ১৯)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন: "তাদের (নারীগণ) ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য অধিকার ততটুকুই, যতটুকু তাদের দায়বদ্ধতায় ন্যায়সঙ্গতরূপে (পুরুষদের জন্য) রয়েছে"। (আল বাকারাহ: ২২৮) ।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/৮৬), আল মাজমূ' (১/৩৪২), সুনানুল ফিতরাহ (১/১৮৩) ।

নাভীর তলদেশের চুল মুণ্ডানোর দ্বারা অপসারণ করা মুস্তাহাব এবং অন্যান্য মাধ্যম দ্বারা অপসারণ করা জায়েয

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: পেটের তলদেশের চুল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: পুরুষাঙ্গের উপরে এবং চার পার্শ্বে যেই চুলগুলো রয়েছে। একইভাবে নারীর লজ্জাস্থানের চার পার্শ্বে যেই চুলগুলো রয়েছে। আবুল আব্বাস বিন সুরাইজ থেকে বর্ণিত: এটা হলো নিতম্বের বৃত্তের চার পার্শ্বে উৎপন্ন চুল। এই সামষ্টিক বিশ্লেষণ থেকে বুঝা গেল যে, লজ্জাস্থানের সম্মুখভাগ ও পশ্চাদ্ভাগের উপরে এবং উভয়টির চার পার্শ্বে উৎপন্ন চুল মুণ্ডানো মুস্তাহাব।

তিনি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তলদেশের চুলের ক্ষেত্রে সুন্নাহ হলো: মুণ্ডন করা। যেমনটি হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কেউ সেটাকে টেনে উঠায় বা ছেঁটে ফেলে, অথবা চুন দ্বারা অপসারিত করে, তাহলে সেটাও জায়েয আছে। তবে সে অধিক উত্তম পদ্ধতি পরিত্যাগকারী। আর তা হলো মুণ্ডানো। তলদেশের চুল নিজ হাতে মুণ্ডন করবে। একমাত্র স্ত্রী ব্যতীত অন্য কাউকে দিয়ে এটা করানো হারাম। অথবা দাসীকে দিয়েও এটা করানো যাবে, যার জন্য উক্ত পুরুষের সতর দেখা এবং তাকে স্পর্শ করা জায়েয, কিন্তু মাকরূহ হবে।

হাফেয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: নববী রহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্যরা বলেছেন: তলদেশের চুল মুণ্ডন করার ক্ষেত্রে সুন্নাহ হলো পুরুষ এবং নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই ক্ষুর দ্বারা মুণ্ডন করা। জাবির থেকে স্ত্রীদের নিকটে রাত্রিবেলা আগমনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যাতে করে ঐ সময় এলোমেলো কেশধারিনী চুল আঁচড়াতে পারে এবং স্বামী থেকে দূরে অবস্থানকারী স্ত্রী লজ্জাস্থান পরিষ্কার করতে পারে। এর ব্যাখ্যা বিবাহ অধ্যায়ে বিদ্যমান। কিন্তু মূল সুন্নাহ সর্বপ্রকার অপাসরণকারী বস্তু দ্বারাই আদায় হয়ে যায়।

নববী আরো বলেছেন: পুরুষের ক্ষেত্রে অধিক উত্তম হলো মুণ্ডন করা। আর নারীর ক্ষেত্রে উপড়ানো। এখানে আপত্তি উঠতে পারে এই যুক্তিতে যে, নারীর জন্য এটা ক্ষতিকারক। এবং স্বামীর জন্যও। কারণ স্ত্রীর লজ্জাস্থানটি ঢিলা হয়ে যাবে। আর উপড়ানোর দ্বারা উক্ত স্থানটি চিকিৎসকদের সর্বসম্মতিক্রমে ঢিলা হয়ে যায়। এই জন্যই ইবনু দাকিকিল ঈদ

বলেছেন: কোনো কোনো আলেম নারীদের ক্ষেত্রেও মুণ্ডনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, উপড়ানোর দ্বারা স্থানটি ঢিলা হয়ে যায়।

তিনি রহিমাহুল্লাহ আরো বলেছেন: আবু শামা বলেন: মুস্তাহাব হলো: অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্ভাগের চুল অপসারণ করা, বরং এটা পশ্চাদ্ভাগ থেকে করা অধিক উত্তম। কারণ, সংশ্লিষ্ট স্থানে কোনো প্রকার মল আটকে থাকলে ইস্তিনজাকারী সেটাকে পানি ব্যতীত অন্য কিছু ব্যবহার করে পরিষ্কার করতে পারবে না। কারণ, তখন তার জন্য ঢিলা ব্যবহার করা সম্ভব হবে না।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (২৫৭), আল মাজমূ' (১/৩৪২), আল ফাতহ (১০/৩৪৪) ।

তলদেশের চুল মুণ্ডন করার সময়সীমা নির্ধারণ

নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তলদেশের চুল মুণ্ডন করার সময়: গ্রহণীয় মত হলো সে তার প্রয়োজন ও চুল বড় হওয়ার পরিমাণের ভিত্তিতে সময় ধার্য করবে। সুতরাং চুল দীর্ঘ হলে মুণ্ডন করবে। একই মূলনীতি মোচ ছাঁটা, বগলের পশম উপড়ানো, নখ কাটার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর কিতাবে বর্ণিত আনাসের হাদীসটি হলো: "তিনি আমাদের জন্য মোচ ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ানো ও নাভীর তলদেশের চুল মুণ্ডন করার ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন: এগুলো যেনো চল্লিশ রাতের বেশি সময় পর্যন্ত অকর্তিত অবস্থায় রাখা না হয়"।

এই কথার অর্থ হলো: এতদিন পর্যন্ত কাটা থেকে বিরত থাকা যাবে না, যে চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হয়ে যায়। তাদেরকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে, বিষয়টি এমন নয়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

আমি বলব: যদি এই কাজ চল্লিশ দিনেও সম্পন্ন না করা হয়, তাহলে এর বিধান কী?

অধিকাংশ আলেমের মতে: এটা জঘন্য পর্যায়ের মাকরূহ কাজ হবে। আর হানাফীদের মতে ও শাওকানীর নিকট প্রাধান্যযোগ্য মত - এমনটি করা হারাম।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (১/১৩৯), আন নাইল (১/৩৫০), আহকামু সুনানিল ফিতরাহ (১/১৮৬)।

মোচের সীমানা

شارب (মোচ) হলো: ঐ চুল, যা উপরের ঠোটের উপরে উৎপন্ন হয়। মোচের দুই পাশের সীমানা নির্ধারণে মতানৈক্য রয়েছে। মোচের দুই পার্শ্বকে سبال– সিবাল বলা হয়। কেউ কেউ বলেছেন: উভয় পার্শ্ব মোচের অন্তর্ভুক্ত। মোচের সাথে সাথে উভয়টিই কাটা শরীআতের

বিধান। কেউ কেউ বলেছেন: উভয়টি দাড়ির অংশ। কেউ কেউ বলেছেন: উভয় পার্শ্ব মূলত মোচ ও দাড়ির সমন্বিত অংশ।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (২৫৭), আল ফাতহ (১০/৩৪৬), আহকামু সুনানিল ফিতরাহ (১/৩২৭) ।

মোচ ছাঁটার বিধান কী?

প্রথম মত: মোচ ছাঁটা সুন্নাহ। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। বরং আলেমগণের একটি দল এটা সুন্নাত হওয়ার পক্ষে ইজমা' বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় মত: মোচ ছাঁটা ওয়াজিব। এটা ইবনু হাযম ও ইবনু আরাবীর মত। তাদের দলীল হলো: সহীহাইনে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেছেন: "তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো, তোমাদের দাড়ি লম্বা করো এবং মোচ খাট করো" । বুখারীর এক বর্ণনায়: "মোচ ভালোভাবে ছেঁটে রাখো"। মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা মোচ কর্তনের ন্যায় ছোট করো, দাড়িকে আপন অবস্থায় রেখে দাও, মাজুসীদের বিরোধিতা করো"। তারা বলেছেন: এগুলো হলো আদেশ। আর আদেশ ওয়াজিব হওয়ার দাবি রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে, তারা যেনো সাবধান থাকে। যেকোনো সময় তাদের উপরে কোনো ফিতনা বা কঠিন শাস্তি আপতিত হতে পারে" (আন নুর: ৬৩)।

যায়েদ বিন আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"যে ব্যক্তি মোচের কোনো অংশ ছাঁটল না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"। আহমাদ (৪/৩৬৬)। হাদীসটির সনদ সহীহ।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মতটি পূর্ববর্তী দলীলগুলোর ভিত্তিতে। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (১/৪২৩), আল মাজমূ' (১/৩৪০), আন নাইল (১/৩৪৮), সুনানুল ফিতরাহ (১/৩০৩) ।

মোচ মুণ্ডানো কি জায়েয?

প্রথম মত: মোচ এতটুকু ছাঁটতে হবে, যাতে করে ঠোটের কিনারা দৃশ্যমান হয়। কিন্তু গোড়া থেকে কর্তন করবে না। এটা শাফেয়ী মাযহাবের মত।

আর মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে: মোচ গোড়া থেকে কর্তন করা আমার নিকট অঙ্গবিকৃতি। হাদীসের উদ্দেশ্য হলো: মোচ এত বেশি পরিমাণ ছাঁটতে হবে, যেনো দুই ঠোটের কিনারা দৃশ্যমান হয়। আশহাব থেকে বর্ণিত: আমি মালেককে মোচ গোড়া থেকে কর্তনকারীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: আমি মনে করি, তাকে যন্ত্রণাদায়ক প্রহার করা দরকার। আর মোচ মুণ্ডনকারীর ব্যাপারে তিনি বললেন: এটা একটা বিদআত, যা বর্তমানে মানুষদের মাঝে প্রচলিত হয়েছে। এই মতের দলীল হলো: যা হাফেয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আর القص– তথা ছাঁটা বা আংশিক কর্তন করা, যা অধিকাংশ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন এখানে বর্ণিত হয়েছে। এরপরে তিনি বলেছেন: এই বিষয়ক হাদীস কয়েকটি শব্দে বর্ণিত হয়েছে: جزوا– أحفوا– ও أنهكوا– ইত্যাদি। এরপরে তিনি বলেছেন: এই শব্দগুলো ইঙ্গিত করছে যে, মোচ ছাঁটার মাঝে একটু বেশি পরিমাণ ছাঁটার দাবি করা হয়েছে। কারণ, جز– শব্দটি ج ও ز– অক্ষর দ্বারা গঠিত, যা ভারী অক্ষর। অর্থ হলো: চুল ও পশম ত্বক এর সীমা পর্যন্ত খাটো করা।

দ্বিতীয় মত: আহমাদ বলেছেন: যদি গোড়া থেকেও ছেঁটে ফেলে, তাতে সমস্যা নেই। আর যদি খাটো করে, তাতেও সমস্যা নেই। তিনি এই মতের পক্ষে ঐ হাদীসগুলো দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, যেগুলোতে أحفوا الشوارب– বাক্যটি বিদ্যমান। এবং যেই হাদীসগুলোতে جزوا الشوارب– বাক্য বিদ্যমান। প্রথম মতের প্রবক্তাগণ এটাকে ঠোটের কিনারা থেকে ছেঁটে ফেলার অর্থে ধার্য করেছেন। গোড়া থেকে কেটে ফেলার অর্থে নয়।

তৃতীয় মত: মোচ গোড়া থেকে কাটতে হবে। এটা আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মত। তাদের দলীল হলো: দ্বিতীয় মতে বর্ণিত হাদীসগুলো। যেগুলোর বিশ্লেষণও করা হয়েছে। এমনকি حلق– শব্দও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যা নাসাঈ বর্ণনা করেছেন এবং এই শব্দে সুফয়ান বিন উয়াইনাহ এর বর্ণনার শব্দ নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। উয়াইনাহ এর অধিকাংশ ছাত্রগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন قص– শব্দ সহকারে। যেমনটি ফাতহুল বারীতে বর্ণিত হয়েছে।

সম্ভাব্য সহীহ মতটি হলো: প্রথম মতটি। যা শাফেয়ীদের মত। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (১/৩৪০), শারহু মুসলিম (২৫৭), আল ইলাম (১/৭০৩), আল ফাতহ (১০/৩৪৬)।

তাকলিমুল আযফার এর সংজ্ঞা

তাকলিম শব্দটির উৎপত্তি قلم– থেকে। যার অর্থ: কর্তন করা, কাটা। আর أظفار– শব্দটি ظفر– এর বহুবচন। অর্থ নখসমূহ। এখানে উদ্দেশ্য হলো: নখের ঐ অংশ, যা আঙ্গুলের মাথার সাথে সংযুক্ত নখের উপরে অতিরিক্তভাবে উৎপন্ন হয়েছে।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (১/৩৩৭), শারহু মুসলিম (২৫৭), আল ফাতহ (১০/২৪৪)।

নখ কাটা মুস্তাহাব

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আর নখ কাটার বিধান হলো: সর্বসম্মতিতে এটা সুন্নাহ। এই ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী, উভয় হাত ও পা সমান।

মুস্তাহাব হলো: ডান হাত থেকে শুরু করা, এরপরে বাম হাত। এরপরে ডান পা, তারপরে বাম পা।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/৮৭), আল মাজমূ' (১/৩৩৯), আল ফাতহ (১০/২৪৪)।

বগলের পশম উপড়ানো সুন্নাহ যদি কেউ মুণ্ডানোর মাধ্যমে বা অন্যকোনো মাধ্যমে এটা অপসারণ করে তাহলে সেটাও জায়েয হবে

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: বগলের পশম উপড়ানো সুন্নাহ। কারণ, এটা ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। যা না উপড়ানো হলে অধিক বড় হয়। যদি পশম মুণ্ডানোর দ্বারা অথবা চুন ব্যবহারের দ্বারা দূর করা হয়, তাহলেও জায়েয হবে।

ইউনুসা বিন আব্দিল আলা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ এর নিকট প্রবেশ করলাম, তখন একজন নাপিত তার বগলের পশম কর্তন করছিল। তখন শাফেয়ী বললেন: আমি জানি সুন্নাহ হলো উপড়ানো। কিন্তু আমি এই ব্যাথা সহ্য করতে পারি না।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/৮৭), আল মাজমূ' (১/৩৪১), শারহু মুসলিম (২৫৭), আল ফাতহ (১০/৩৪৪)।

৫. بَاب الغُسْل مِنَ الجنَابَة

অধ্যায়: ৫-শারীরিক অপবিত্রতা হতে গোসল করার পদ্ধতি

غسل– শব্দটি আভিধানিক অর্থ: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরে পানি প্রবাহিত করা। শারঈ পরিভাষায়: গোটা শরীরে বিশেষ পদ্ধতিতে পবিত্র পানি ব্যবহার করা।

جنابة– শব্দের আভিধানিক অর্থ: জানাবাত হলো এমন কর্ম ফল, যা গোসলকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে বীর্যপাতের কারণে অথবা সহবাসের কারণে। এটাকে জানাবাত এই জন্যই বলা হয় যে, পানি তার অবস্থান স্থল থেকে দূরে। অথবা জুনুবী ব্যক্তিকে ঐ সকল বিষয় থেকে দূরে থাকতে হয়, যা থেকে একজন পবিত্র ব্যক্তিকে দূরে থাকতে হয় না।

২৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ المَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».

২৮. আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনার কোনো এক রাস্তায় তার সাক্ষাত হয়। এমতাবস্থায় তিনি (আবু হুরায়রা) অপবিত্র ছিলেন। তিনি বলেন, আমি (অপবিত্রতার কারণে) সরে পড়লাম। অতঃপর আমি গোসল করতে গেলাম, অতঃপর (গোসল শেষে) আমি তার নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেন: হে আবূ হুরায়রা, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আবু হুরায়রা বললেন: আমি অপবিত্র ছিলাম। সেজন্যে আমি পবিত্রতা অর্জন না করে আপনার নিকট বসা অপছন্দ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন: সুবহানাল্লাহ! মুমিন কখনো অপবিত্র হয় না। [সহীহ বুখারী হা/২৮৩ ও মুসলিম হা/৩৭১]

হাদীসটি থেকে অর্জিত ফায়দাসমূহ

১) মহান ব্যক্তিদের কাছে যেতে হলে পবিত্র থাকা মুস্তাহাব।

২) মহান ও সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে সম্মান করা এবং তাদের সঙ্গে সাহচর্য অবলম্বন করার সময় সর্বোত্তম পন্থায় তাদের নিকট যাওয়া মুস্তাহাব।

৩) গোসল ওয়াজিব হওয়ার প্রথম সময় থেকে একটু বিলম্ব করে গোসল করা।

৪) গোসল করার পূর্বে জুনুবী ব্যক্তি তার যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করতে পারবে। বুখারী এই মর্মে পরিচ্ছেদ গঠন করেছেন: "জুনুবী ব্যক্তি ঘর থেকে বের হতে পারবে এবং বাজারে ও অন্যান্য স্থানে যাওয়া আসা করতে পারে" বিষয়ক পরিচ্ছেদ।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (৩৭২), আল ইলাম (২/১৫), আল ফাতহ (১/৩৯০) ।

٢٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ؛ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».

وَكَانَتْ تَقُولُ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ؛ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا»

২৯. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নাপাকির গোসল করতেন, তখন তিনি তার দু'হাত (কবজি পর্যন্ত) ধৌত করতেন। অতঃপর তিনি সালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন। এরপর তিনি তার দু'হাত দিয়ে তার চুল খিলাল করতেন। অবশেষে যখন তিনি ধারণা করতেন যে, তার চামড়া সিক্ত হয়েছে তখন তিনি তার ওপর তিনবার পানি বয়ে দিতেন এবং সম্পূর্ণ শরীর ধুয়ে ফেলতেন। [সহীহ বুখারী হা/২৭২ ও মুসলিম হা/৩১৬]

আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) আরো বলেন, আমি এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র হতে এক সাথে গোসল করতাম। পাত্র হতে আমরা উভয়ে একই সাথে অঞ্জুলি ভরে পানি উঠিয়ে নিতাম। [সহীহ বুখারী হা/২৭৩ ও মুসলিম হা/৩২১]

٣٠. عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا– زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهَا قَالَتْ: « وَضَعْتُ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ – أَوْ ثَلَاثًا –، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ – أَوِ الْحَائِطِ – مَرَّتَيْنِ – أَوْ ثَلَاثًا –، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ».

৩০. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী মাইমুনা বিনতে হারেছ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাপাকির গোসলের জন্য পানি রেখে দিলাম। প্রথমে তিনি তার দুই হাতের ডান হাত দ্বারা বাম হাতের ওপর দুইবার কিংবা তিনবার পানি ঢাললেন। তারপর তিনি তার লজ্জাস্থান ধৌত করলেন। তারপর তিনি

তার হাত মাটিতে কিংবা দেয়ালে দুইবার অথবা তিনবার মারলেন, তারপর তিনি কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এরপর তিনি তার মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। তারপর তিনি তার মাথায় পানি ঢেলে দিলেন ও পূর্ণ শরীর ধুয়ে ফেললেন। তারপর তিনি (পূর্বস্থান হতে কিছুটা) সরে গিয়ে তার দুই পা ধৌত করলেন। অতঃপর আমি (পানি মুছে ফেলার জন্য) একটি কাপড় নিয়ে তার নিকট আসলাম। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। অতঃপর তিনি তার হস্তদ্বয় দিয়ে পানি ঝাড়তে শুরু করলেন। [সহীহ বুখারী হা/২৫৭, ২৭৪ ও মুসলিম হা/৩১৭]

গোসলের নিয়্যাত করার বিধান কী?

ওযূর আলোচনায় মতানৈক্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সঠিক মত হলো: নিয়্যাত গোসলে, ওযূতে ও তায়াম্মুমে শর্ত। এই হাদীসের ভিত্তিতে: "যাবতীয় আমল নিয়্যাতের উপরে নির্ভরশীল"।

আভিধানিক অর্থে নিয়্যাত হলো: কোনো কাজের ইচ্ছা করা। পরিভাষায়: কোনো কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে অন্তরে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করা।

নিয়্যাতের স্থান হলো অন্তর। মুখের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এই নিয়মের ভিত্তিতে: নিয়্যাত জোরে বা আস্তে বলা যাবে না। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাদের দীনে দীন বহির্ভূত কোনো নতুন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করল, তার উক্ত পদ্ধতি প্রত্যাখ্যাত"। সহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।

গোসলে বিসমিল্লাহ বলার বিধান কী?

ওযূর আলোচনায় এই সম্পর্কিত মতানৈক্য উল্লিখিত হয়েছে। সহীহ মত হলো: ওযূর ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব।

সুতরাং গোসলের ক্ষেত্রে এটা অধিক উত্তম রূপে প্রযোজ্য হবে। যেহেতু এটা বড় পবিত্রতা। বিধায়, গোসলের সময়ও বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হবে। ওয়াজিব নয়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার বিধান কী?

ওযূর মধ্যে এই বিষয়ক আলোচনাও অতিবাহিত হয়েছে। সহীহ মত হলো: কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উভয়টি ওযূ ও গোসলে ওয়াজিব।

দ্রষ্টব্য: আল ফাতহ লি ইবনি রজব (১/২৭১), আশ শারহুল মুমতি' (১/২০৮, ৩৬২) ।

গোসলে কীভাবে দুই হাতের কবজি ধৌত করতে হয়?

মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "এরপরে তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতের (কবজি) উপরে পানি ঢেলে দিলেন দুইবার, অথবা তিনবার। এরপরে তিনি লজ্জাস্থান ধৌত করলেন"। বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায় যে, দুই হাতের কবজি লজ্জাস্থান ধৌত করার পূর্বেই ধৌত করতে হবে। নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: জানাবাতের গোসলের পূর্ণাঙ্গ নিয়ম হলো:

গোসলকারী প্রথমে দুই হাত পাত্রে প্রবেশ করানোর পূর্বে দুই হাতের কবজি তিনবার ধৌত করবে। এরপরে সে তার লজ্জাস্থান ও শরীরের অন্যান্য স্থানের ময়লা ধৌত করবে। এরপরে সে সম্পূর্ণ সালাতের ন্যায় ওযূ করবে।

হাফেয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই হাদীস থেকে অর্জিত একটি বিষয় হলো: লজ্জাস্থান ধৌত করার পূর্বেই দুই হাতের কবজি ধৌত করা, ঐ ব্যক্তির জন্য যে দুই অঞ্জলিতে পানি নিতে চায়, যাতে পাত্রে উভয় হাত না ডুবাতে হয়। হয়ত পাত্রে অরুচিকর কোনো কিছু আছে, যার কারণে সে পাত্রে হাত ডুবাতে চায় না। আর যদি পানি জগের ভিতরে থাকে — উদাহরণ স্বরূপ — তাহলে উত্তম হলো আগে লজ্জাস্থান ধৌত করা। যাতে করে ওযূর অঙ্গগুলোর ধারাবাহিক ক্রমিকতা বজায় থাকে।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (৩১৬), আল ফাতহ (১/৩৬৩)।

গোসলকারী ব্যক্তি প্রথমে তার লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং লজ্জাস্থান ধৌত করার সময় সে জানাবাতের গোসলের নিয়্যাত করবে

এ কথার দলীল হলো: মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, যা লেখক বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "এরপরে তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতের (কবজি) উপরে পানি ঢেলে দিলেন দুইবার অথবা তিনবার। এরপরে তিনি লজ্জাস্থান ধৌত করলেন"।

খারাশী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এরপরে উক্ত অঙ্গটিকে ধৌত করবে জানাবাতের গোসলের নিয়্যাতে, চাই তা লজ্জাস্থান হোক বা অন্য কোনো স্থান। যাতে করে সে এরপরে লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে ওযূ ভঙ্গের সমস্যা থেকে নিরাপদ থাকে। আর যদি সে লজ্জাস্থান ধৌত করার সময় জানাবাত দূর করার নিয়্যাত না করে, তাহলে তাকে লজ্জাস্থান দ্বিতীয়বার ধৌত করতে হবে। যাতে জানাবাতের গোসল তার সমস্ত শরীরের জন্য প্রযোজ্য হয়। অনেক মানুষ এ বিষয়ে সচেতন নয়। ফলে সে লজ্জাস্থান ধৌত করার পরে নিয়্যাত করে। কিন্তু এরপরে লজ্জাস্থান আর স্পর্শ করে না ওযূ ভঙ্গ হওয়ার ভয়ে। ফলে পূরা গোসলটাই বাতিল হয়ে যায়। কারণ, লজ্জাস্থান ধৌত করার সময় সে নিয়্যাত করেনি। লেখক 'আল মুদাওনাহ' (লাখমীর টীকা সম্বলিত) গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলেছেন। যদি লজ্জাস্থান থেকে নাপাকি পরিষ্কার করার সময় জানাবাত অপসারণের নিয়্যাত করে এবং একবার মাত্র গোসল করে, তাহলে

সেটাই পবিত্রতার জন্য যথেষ্ট হবে ‘মুদাওওনাহ’ (মালেকী মাযহাবের দ্বিতীয় উৎস ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ) গ্রন্থের নিয়ম অনুসারে।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (৩১৬), শারহু মুখতাছারিল খলীল লিল খারাশী (২/৩৩৫), আহকামুল গুসল (৪৬৯)।

নারীর জন্য কি পানি তার লজ্জাস্থানের ভিতরে পৌঁছানো ওয়াজিব?

নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যদি নারী অবিবাহিত হয়, তাহলে লজ্জাস্থানের ভিতরে পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়। আর যদি সে বিবাহিত হয়, তাহলে ইস্তিনজা করার সময় বসলে লজ্জাস্থানের যতটুকে দৃশ্যমান হয়, ততটুকু স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে হবে। কারণ, এটা এখন বাহিরের অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ইমাম শাফেয়ী এবং আমাদের মাযহাবের জমহুর আলেমগণ এই কথাই বলেছেন। আমাদের মাযহাবের কোনো কোনো আলেম বলেছেন:

বিবাহিত নারীর জন্য লজ্জাস্থানের ভিতরের অংশ ধৌত করা ওয়াজিব নয়। কেউ কেউ বলেছেন: ভিতরের অংশ ধৌত করা ওয়াজিব হায়েয ও নেফাসের গোসলের ক্ষেত্রে, জানাবাতের গোসলের ক্ষেত্রে নয়।

সহীহ মত হলো: প্রথমটি। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (৩৩২), আল মাজমূ’ (২/২১৫)।

গোসলের পূর্বে ওযূ করা মুস্তাহাব

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তবে তারা এই বিষয়েও ইজমা’ পোষণ করেছেন: জানাবাতের গোসলের পূর্বে ওযূ করা মুস্তাহাব, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুকরণে। তাঁর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। আর যেহেতু এটা গোসলের জন্য সহায়ক। তবে গোসলের পরে ওযূ করার বিষয়ে কোনো গুরুত্ব আলেমগণের নিকট নেই।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: গোসলের মাঝে ওযূ সুন্নাত। ওয়াজিবও নয়, শর্তও নয়। এটাই আমাদের মাযহাব। সকল আলেমগণ এই মতই পোষণ করেছেন। তবে দাউদ ও আবু ছাওর থেকে ভিন্ন মত বর্ণিত হয়েছে: তারা উভয়েই এটাকে শর্ত আখ্যা দিয়েছেন। এমনটিই আমাদের মাযহাবের আলেমগণ তাদের থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু জারীর এই বিষয়ে ইজমা’ বর্ণনা করেছেন যে, ওযূ করা গোসলের মাঝে ওয়াজিব নয়। এই মতের দলীল হলো: আল্লাহ তা‘আলা গোসলের আদেশ দিয়েছেন, গোসলের মাঝে ওযূ করার আদেশ দেননি।

দ্রষ্টব্য: আত তামহিদ (২২/৯৩), আল ইসতিযকার (৩/৬০), আল মুগনী (১/২১৯), আল মাজমূ' (২/২১৫), আল ফাতহ লি ইবনি রজব (১/২৪৯) ।

যদি গোসলের পূর্বে ওযূ করে তাহলে কি সম্পূর্ণ ওযূ করবে নাকি দুই পা বাকি রাখবে?

প্রথম মত: যদি গোসলের পূর্বে ওযূ করে, তাহলে তার জন্য মুস্তাহাব হলো দুই পা পরে ধৌত করা। উভয় পা সে গোসলের পরে ধৌত করবে। হাফেয ইবনু হাজারের মতে, এটা অধিকাংশ আলেমের মত। এই মতের দলীল হলো: পূর্বে বর্ণিত মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস। সেখানে বলা হয়েছে: "এরপরে তিনি স্বীয় মুখ এবং দুই হাত ধৌত করলেন। এরপরে তিনি মাথায় পানি ঢাললেন, তারপরে সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করলেন। এরপরে একটু দূরে সরে গিয়ে দুই পা ধৌত করলেন"।

আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে: "এরপরে তিনি সম্পূর্ণ শরীরে পানি ঢাললেন। তারপরে দুই পা ধৌত করলেন"। উভয় হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি ওযূর সময় দুই পা ধৌত করা থেকে বাদ রাখতেন, পরে গোসল শেষ হলে উভয় পা ধৌত করতেন।

দ্বিতীয় মত: যখন গোসলের পূর্বে ওযূ করবে, পরিপূর্ণ ওযূ করবে। যেহেতু ওযূর মধ্যে দুই পা ধৌত করার বিধান আছে। এটা মালেক এবং শাফেয়ী একটি মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। যা তার অনুসারীদের নিকট প্রসিদ্ধ। এই মতের দলীল হলো: আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস। সেখানে বলা হয়েছে: এরপরে তিনি সালাতের ন্যায় ওযূ করলেন। এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থের দাবি হলো: তিনি পরিপূর্ণ ওযূই করেছেন। হাফেয বলেছেন: আয়িশার হাদীসগুলোর মাঝে এটা মাহফুয[২]। এরপরে তিনি প্রথম মতে বর্ণিত মুসলিমের বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেছেন: বর্ণনাটি আবু মু'আবিয়ার সূত্রে, তিনি হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন। হিশাম থেকে তার বর্ণনা সহীহ হওয়ার বিষয়টি সমালোচনার যোগ্য।

আমি বলব: "এরপরে তিনি দুই পা ধৌত করলেন" এটা আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন আবু মু'আবীয়া। তিনি এককভাবে হিশাম থেকে, এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বড় একদল মুহাদ্দিস এই অতিরিক্ত বাক্যটুকু বাদ দিয়ে তার বিপরীত বর্ণনা করেছেন। তারা হিশাম থেকেই এমন বর্ণনা করেছেন। তাদের মাঝে অন্যতম হলেন: যায়েদাহ, হাম্মাদ, জারীর, ওয়াকী' এবং আলী বিন মুসহির। দ্রষ্টব্য: আল আহাদীসুল মুনতাকাদাহ ফিস সহীহাইন (১/১১৫), যা মুছতফা বাহু রচনা করেছেন।

---

২ মাহফুয হল এমন হাদীস, যা অধিক বিশ্বস্ত রাবী তুলনামূলক কম বিশ্বস্ত রাবীর বিপরীত তথ্যসহ বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় মত: সে দুই পা গোসলের পরে ধৌত করার ব্যাপারে এবং পূর্ণ ওযূ করার ব্যাপারে স্বাধীন। এটা আহমাদের একটি বর্ণনা।

প্রাধান্যযোগ্য মত: তৃতীয় মতটি। আয়িশা ও মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসের মাঝে সমন্বয় করার মাধ্যমে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২১৮), আল মাজমূ' (২/২১০), শারহু মুসলিম (৩২৬), আল ফাতহ লি ইবনি রজব (১/২৩৯), আল ফাতহ (১/৩৬১, ৩৬২)।

যদি গোসলের পূর্বে পূর্ণ ওযূ করে তাহলে কি গোসলের পরে উভয় পা পুনরায় ধৌত করতে হবে?

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ আল ফাতহ গ্রন্থে (১/২৪০) বলেছেন: যারা বলেছেন: গোসলের পূর্বে পূর্ণ ওযূ করতে হবে, তারা বলেছেন: গোসলের পরে দুই পা ধৌত করবে না। এটা ইবরাহিম নাখঈ, মুসলিম বিন ইয়াসার, হিশাম বিন উরওয়া ও আবুল আসওয়াদ এর মত। আহমাদ স্পষ্টভাবে এই মত ব্যক্ত করেছেন। আমাদের মাযহাবের কিছু আলেম বলেছেন:

যখন সে তার পূর্বের স্থান থেকে সরে যাবে, তখন পুনরায় তার দুই পা ধৌত করা মুস্তাহাব। পবিত্র ও পরিষ্কার করার জন্য। তিরমিযি তার কিতাবে আলেমগণের সূত্রে এই মত বর্ণনা করেছেন। এই মতটি ত্রুটিযুক্ত।

যদি গোসলের পূর্বে ওযূ করে তাহলে গোসলের পরে পুনরায় ওযূ করবে না

নববী রহিমাহুল্লাহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় (৩১৬) লিখেছেন: যদি প্রথমে ওযূ করে, তাহলে দ্বিতীয়বার ওযূ করবে না। কারণ, আলেমগণ এই বিষয়ে একমত: দুইটি ওযূ কখনো মুস্তাহাব হতে পারে না। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

যদি গোসলকারীর ওযূ গোসলের মাঝে নষ্ট হয়ে যায়

নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যদি গোসলকারীর ওযূ গোসলের মাঝেই নষ্ট হয়, তাহলে সেটা তার গোসলের পবিত্রতার মাঝে কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না। বরং সে তার গোসলকে পূর্ণ করবে। আর এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে। যদি সে সালাতের ইচ্ছা করে, তাহলে তার জন্য ওযূ করা জরুরী। এই মতটি স্পষ্টভাবে ইমাম শাফেয়ী "আল উম্ম" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তার অনুসারীগণ এটা উল্লেখ করেছেন। আমাদের নিকট এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এই মতটি ইবনু মুনযির, আতা, আমর বিন দিনার ও সুফয়ান ছাওরী থেকে

বর্ণনা করেছেন। এটাকে ইবনু মুনযির গ্রহণ করেছেন। হাসান বাসরী থেকে বর্ণিত: সে পুনরায় গোসল করবে।

আমাদের দলীল হলো: গোসল সম্পন্ন করার পরে হাদাস গোসল নষ্ট করে না। সুতরাং এটা গোসলের মাঝেও গোসলকে নষ্ট করতে পারে না। যেমন: পানাহার গোসলকে নষ্ট করতে পারে না।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২১৯), আল মাজমূ' (২/২৩১) ।

যদি ওযূ না করে শুধু গোসল করে তাহলে গোসলটা কি ওযূর জন্য প্রযোজ্য হবে?

ইবনু আরাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই বিষয়ে কোনো আলেম মতানৈক্য করেননি: গোসল ওযূকে অন্তর্ভুক্তকারী। আর জানাবাত থেকে পবিত্র হওয়ার নিয়্যাত হাদাসকে শামিল করে এবং হাদাসকে মিটিয়ে দেয়। অর্থাৎ ফরয গোসলের নিয়্যাতের দ্বারা ওযূর পবিত্রতা অর্জিত হয়ে যায়। পৃথকভাবে ওযূ করার প্রয়োজন নেই।

মুহাম্মাদ আল আব্বী বলেছেন: সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো: প্রথমে নাপাকি পরিষ্কার করবে। এরপরে পুনরায় জানাবাত থেকে পবিত্র হওয়ার নিয়্যাতে নাপাক স্থানটি আবার ধৌত করবে। এরপরে গোসল পূর্ণ করবে। আর এই গোসল তার ওযূর পবিত্রতার জন্য সর্বসম্মতি ক্রমে যথেষ্ট হবে। একইভাবে আইনী ও অন্যান্যরা এই বিষয়ে ইজমা' বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে এই মাসআলায় মতানৈক্য রয়েছে।

হাফেয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ইবনু বাত্তাল এই বিষয়ে ইজমা' বর্ণনা করেছেন: গোসলের সঙ্গের পৃথকভাবে ওযূ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা প্রত্যাখ্যাত মত। আবু ছাওর, দাউদ ও অন্যান্যরা সহ একদল আলেমের মত হলো: এই গোসল হাদাস নাপাকিযুক্ত ব্যক্তির ওযূর জন্য যথেষ্ট নয়।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যদি সে গোসল করে এবং ওযূ না করে, তাহলে কি তার উভয় হাদাস (বড় ও ছোট) অপসারণ হবে। নাকি শুধুমাত্র বড় হাদাসটিই অপসারিত হবে। আর ছোট হাদাসটি অবশিষ্ট থাকবে। ফলে নতুনভাবে ওযূ না করা পর্যন্ত সালাত বৈধ হবে না?

এই বিষয়ে আলেমগণের দুইটি মত রয়েছে। দুইটিই আহমাদ থেকে বর্ণিত। অধিক প্রসিদ্ধ বর্ণনাটি হলো: এর দ্বারা তার উভয় হাদাসই উঠে যাবে। যদি সে গোসলের সময় উভয় হাদাস অপসারণের নিয়্যাত একত্রে করে। দ্বিতীয় বর্ণনাটি হলো: ছোট হাদাস ওযূ ব্যতীত অপসারণ হবে না। যা মালেক, আবু ছাওর ও দাউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। যদি সে গোসল করে, কিন্তু ওযূ না করে, তাহলে তার বড় হাদাসটি অপসারিত হবে। কিন্তু ছোট হাদাসটি ওযূ না করা পর্যন্ত উপসারিত হবে ।

শায়খুল ইসালাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ কুরআনের দাবি অনুসারে শুধু গোসলই যথেষ্ট এবং জানাবাতের গোসলের পরে তার উপরে অন্য কোনো হাদাসের প্রভাব থাকে না। বরং ছোট হাদাসটি বড় হাদাসের একটি অংশ হয়ে যায়। ঠিক যেমন ছোট হাদাসের ফরয অঙ্গগুলো বড় হাদাসের ফরয অঙ্গগুলোর একটি অংশ। সুতরাং বড় হাদাস ওযূর চারটি অঙ্গ ধৌত করার কার্যকে শামিল করে।

আমি বলবঃ সহীহ মত হলোঃ ওযূ গোসলের মাঝে অন্তর্ভুক্ত। আর গোসলটা ওযূর জন্য প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বড় হাদাস অপসারণের নিয়্যাতই যথেষ্ট।

ইবনু রজব বলেছেনঃ শাফেয়ীর মাযহাব হলোঃ নির্দিষ্টভাবে শুধু বড় হাদাস অপসারণের নিয়্যাত করলে উভয় হাদাসই দূর হয়ে যাবে। বরং ছোট হাদাস অপসারণের নিয়্যাতের প্রয়োজন নেই। এটা ইবনু তাইমিয়্যাহ এর পছন্দনীয় মত। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে এবং ইবনু কাইয়িম, শাওকানী এবং ইবনু উসাইমীন গ্রহণ করেছেন।

দ্রষ্টব্যঃ আল ইসতিযকার (৩/৬০), আল ফাতাওয়া (২১/৩৯৭), আল ফাতহ লি ইবনি রজব (১/২৪৫), আল ফাতহ (১/৩৬০), আন নাইল (২/৬৫), আশ শারহুল মুমতি' (১/৩৬৭), ইজমা'আতু ইবনি আব্দিল বার ফিল ইবাদাত (১/২৯৩), জামি'উল ফিকহ (১/২২৭) ।

মাথার চুল খিলাল করার পদ্ধতি এবং এর বিধান

হাফেয রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ খিলাল করার অর্থঃ পানি চুলের গোড়া এবং ত্বক পর্যন্ত পৌঁছানো, হাত সরাসরি চুলে লাগানো, যাতে সর্বাঙ্গে পানি পৌঁছে যায়। আর ত্বককে মোলায়েমভাবে স্পর্শ করা, যাতে ত্বককে স্পর্শকারী পানির দ্বারা ত্বকের কোনো ক্ষতি না হয়।

এই খিলাল সর্বসম্মতিতে ওয়াজিব নয়। তবে চুল বা পশম যদি এমন কোনো বস্তু দ্বারা জটবদ্ধ থাকে, যা উক্ত পশমের গোড়া এবং পানির মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে এই খিলাল ওয়াজিব। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্যঃ শারহু মুসলিম (৩১৬), আল ফাতহ (১/৩৬০) ।

মাথা ধৌত করার পদ্ধতি

লেখক কর্তৃক বর্ণিত আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে বলা হয়েছেঃ "এরপরে তিনি নিজ হাত দ্বারা চুল বা পশম খিলাল করতেন। যখন মনে করতেন ত্বক ভালোভাবে সিক্ত হয়েছে, তখন তিনবার ত্বকের উপরে পানি ঢালতেন"। আর তার থেকেই সহীহ বুখারীত (২৫৮), মুসলিমে (৩১৮) বর্ণিত হয়েছেঃ তিনি বলেনঃ "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাবাতের গোসল করতেন, দুধ দোহনের ন্যায় পাত্র চেয়ে পাঠাতেন।

এরপরে হাতের পানি নিয়ে মাথার ডান দিকের অর্ধাংশ পানি দ্বারা খিলাল করতেন, তারপরে বাম দিকের অর্ধাংশ। তারপরে উভয় হাত দ্বারা মাথায় পানি দিয়ে ডলতেন। এরপরে উভয় হাত দ্বারা মাথায় পানি ঢেলে দিতেন"।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: মোট কথা: এটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত যে, তিনি পানি দ্বারা মাথার চুল খিলাল করতেন। যখন বুঝতেন যে, ত্বক সিক্ত হয়েছে, তখন মাথায় পানি ঢালতেন। সুতরাং প্রথমে খিলালটা করতেন মাথার চামড়া সিক্ত করার জন্য। এরপরে মাথার চুল ধৌত করার জন্য তিনবার পানি ঢালতেন। এই তথ্যের দিকেই সকল হাদীসের ইঙ্গিত।

কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই তিন মুষ্ঠি পানি দ্বারা খিলাল করার কারণে এটা ভাবার সুযোগ নেই যে, তিনি তিনবার মাথা ধৌত করতেন। কারণ, গোসলের মধ্যে একাধিকবার ধৌত করা শরীআতসম্মত বহির্ভূত। যেহেতু এটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বরং এই সংখ্যা এই জন্যই সৃষ্ট হয়েছে যে, তিনি প্রথমে মাথার ডান দিক থেকে শুরু করতেন, এরপরে মাথার বাম দিক, এরপরে মাথার মাঝখানে পানি ঢালতেন। এরপরে তিনি রহিমাহুল্লাহ আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার দ্বিতীয় হাদীসটি উল্লেখ করলেন।

আমি বলব: কুরতুবীর বক্তব্যটি সঠিক। এটা আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীসের বাহ্যিক মর্ম, যা লেখক কর্তৃক বর্ণিত পূর্ববর্তী তিনটি হাদীসের মধ্যে দ্বিতীয়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুফহিম (১/৫৭৬), আল ফাতহ লি ইবনি রজব (১/৩১১), আশ শারহুল মুমতি' (১/৩৬০) ।

জানাবাত ও হায়েযের গোসলের সময় কি চুলের বেণীসমূহ খোলা জরুরী?

প্রথম মত: যদি গোসলকারীর চুলের ভেতরে ও বাহিরে বেণী না খুলেই পানি পৌঁছানো যায়, তাহলে বেণী খোলা ওয়াজিব নয়। আর যদি বেণী না খুলে পানি পৌঁছানো সম্ভব না হয়, তাহলে তা খুলা ওয়াজিব। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

তাদের দলীল হলো: "উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস: তিনি বলেছেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমার চুলের বেণী অত্যন্ত শক্ত করে বেঁধে রাখি, আমাকে কি হায়েয ও জানাবাতের গোসলের কারণে চুলের বেণী খুলতে হবে? তিনি বললেন: না। বরং তোমার মাথায় তিন অঞ্জলি পরিমাণ পানি ঢালা তোমার জন্য যথেষ্ট। এরপরে তুমি সারা দেহে পানি ঢেলে দিবে। তাহলেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে"। সহীহ মুসলিম (৩৩০), তবে এখানে "হায়েযের ক্ষেত্রে" শব্দটুকু অতিরিক্ত। এটা সংরক্ষিত নয়।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই শব্দটুকু আব্দুর রাযযাক ছাওরী থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বিধায় এটা মাহফুয বর্ণনা নয়। কারণ, অন্যান্যরা ছাওরী থেকে বর্ণনা করেছেন এই শব্দটি ব্যতীত।

তারা আরো দলীল দলীল পেশ করেছেন: মুসলিমে (৩৩১) বর্ণিত আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস দ্বারা, তিনি বলেছেন: "যখন তার নিকটে এই সংবাদ পৌঁছাল যে, আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা মহিলাদেরকে গোসলের সময় মহিলাদেরকে বেণী খোলার আদেশ দিচ্ছেন, তখন তিনি বললেন: ইবনু উমারের কাজ কী আশ্চর্যময়, তিনি গোসলের সময় নারীদেরকে তাদের বেণী খোলার আদেশ দিচ্ছেন, তাহলে তিনি কেনো তাদেরকে মাথার চুল মুণ্ডানোর আদেশ দেন না? আমি এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করেছি। কিন্তু আমি আমার মাথার চুলে তিনবারের বেশি পানি ঢালিনি"।

দ্বিতীয় মত: হায়েযের গোসলে বেণী খুলতে হবে, জানাবাতের গোসলে নয়। এটা তাউস, হাসান ও ইবনু হাযামের মত। যা হাম্বলীদের প্রসিদ্ধ মত। তাদের দলীল হলো: আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস: "একদা আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে যুল হিজ্জাহ মাসের কিছু দিন পূর্বে হাজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলাম — এরপরে তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন — সেখানে বলা হয়েছে: "আরাফার দিবসে আমার হায়েয হলো। তখন আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার সমস্যার কথা বললাম। তিনি বললেন: তুমি তোমার উমরাহ পরিত্যাগ করো। তোমার চুলের বেণী খুলে ফেলো। চুল আচড়ে নাও এবং হাজ্জের তালবীয়া পাঠ করে হাজ্জ শুরু করো। তখন আমি এমনটিই করলাম"। সহীহ বুখারী (৩১৭), সহীহ মুসলিম (১২১১)।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ এই দলীল উপস্থাপনের উপরে আপত্তি করেছেন। তিনি বলেছেন: বরং এই হাদীসে দুইটি বিষয়ের কোনোটির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়নি। কারণ, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার যেই গোসলের ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন, তা হায়েযের কারণে নয়। বরং তিনি তখনও পর্যন্ত হায়েযা ছিলেন। তার হায়েয অবশিষ্ট ছিল, হায়েয কাল শেষ হয়নি। কারণ, তার হায়েয শেষ হয়ে থাকলে তিনি উমরার তাওয়াফ করতে পারতেন, তার এই প্রশ্নের কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু তাকে তার হায়েয বিদ্যমান থাকাবস্থায় গোসলের আদেশ দিয়েছেন এবং এবং হাজ্জের তালবীয়া পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং এটা হলো হায়েয অবস্থায় ইহরামের পূর্ববর্তী গোসল বলে বিবেচিত হবে। ঠিক যেমন আসমা বিনতে উমাইসকে যুল হুলায়ফাতে গোসল করতে ও তালবীয়া পাঠ করে মুহরিম হওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

তৃতীয় মত: চুলের বেণীতে পানি প্রবেশ করুক অথবা না করুক সর্বাবস্থায় তা খুলতে হবে। এটা নাখঈ ও আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। যা মুসলিমে বর্ণিত

হয়েছে। পূর্বে আয়িশ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার পক্ষ থেকে এই মতের খণ্ডন সম্পর্কিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল ইশরাফ (১/৩১৫), আল মুগনী (১/২২৫), শারহু মুসলিম (৩৩০), আল ফাতহ লি ইবনি রজব (২/১০৩), আহকামুল হায়েয (১/৪৩৩) ।

খোলা চুলের ভেতরে ও বাহিরে কি ধৌত করা ওয়াজিব?

প্রথম মত: ওয়াজিব। এটা মালেকী ও শাফেয়ীর মত। হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। তাদের দলীল হলো: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয় প্রতিটি চুলের নিচে জানাবাত (বড় হুকমী নাপাকি) বিদ্যমান, বিধায় তোমরা প্রত্যেকটা চুল ধৌত করো এবং ত্বক পর্যন্ত পানি পৌঁছে দাও"। আবু দাউদ (২৪৮), তিরমিযি (১০৬)। হাদীসটির সনদ দুর্বল। এই সনদে হারিছ বিন ওয়াজিহ বিদ্যমান। তিনি দুর্বল রাবী। হাদীসটি আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকেও মুসনাদে আহমাদে (৬/১১০) বর্ণিত হয়েছে। এই সনদটিও দুর্বল। কারণ, এটা কাযী শুরাইকের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি দুর্বল স্মৃতি বিশিষ্ট। তার থেকে খছিফ বিন আব্দুর রহমান বর্ণনা করেছেন, তিনিও দুর্বল রাবী। তিনি একজন বেনামী রাবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছেন: যেহেতু এটা গোসলের স্থানে উৎপন্ন চুল, তাই এটা ধৌত করা ওয়াজিব। যেমন: দুই চোখের উপরে উৎপন্ন ভ্রুর চুল এবং দু চোখের লোম।

দ্বিতীয় মত: ওয়াজিব নয়। এটা হানাফীদের মত। হাম্বলী মাযহাবের একটি মত। তাদের দলীল হলো: মুসলিমে (৩৩০) বর্ণিত উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমার জন্য তোমার মাথায় তিন অঞ্জলি পরিমাণ পানি ঢালা যথেষ্ট হবে"। যদিও তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি চুলের বেণী অত্যন্ত শক্ত করে বেঁধে রাখতেন। আর এই পরিমাণ পানি বেঁধে রাখা চুলের বেণী ভিজানোর জন্য যথেষ্ট নয়। আর এই জন্যই যদি চুলের বেণী ভিজানো ওয়াজিব হতো, তাহলে তা খুলা ওয়াজিব হতো। তখনি জানা সম্ভব হতো যে, পানি উক্ত বেণীর গোড়ায় গোড়ায় পৌঁছেছে কি না। তাদের এটা ছাড়াও আরো অনেক দলীল রয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মত। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২২৮), আহকামুল হায়েয (১/৪৪৬) ।

গোসলকারীর জন্য সম্পূর্ণ শরীর পানি দ্বারা ভিজানো ওয়াজিব

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: নারী ও পুরুষের জন্য শরীরের কোনায় কোনায়, নাভীর ভিতরে, দুই কান ও বগলের ভিতরে, দুই নিতম্বের মাঝখানে, পায়ের আঙ্গুলের কোনায় এবং বাহ্যিক অঙ্গের মধ্যে গণ্য হয় এমন অন্যান্য অঙ্গসমূহ এবং ঠোঁটের লাল অংশে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। এই অঙ্গগুলোতে পানি পৌঁছানো সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। যেই অঙ্গগুলোর ব্যাপারে কখনো কখনো অবহেল করা হয়, সেগুলো হলো: দুই নিতম্ব ও বগলের ভিতরের অংশ, পেটের ভাঁজ হয়ে থাকা মোটা চামড়াসমূহ, নাভী ইত্যাদি।

সুতরাং এগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং কানের ছিদ্রে বিদ্যমান ময়লা মনে করে পরিষ্কার করতে হবে। তিনি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যে লোটা বা জগ জাতীয় পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করবে, তার জন্য সমীচীন হলো: ঐ মুহূর্তকে স্মরণে রাখা, যেটার ব্যাপারে অনেকেই অচেতন থাকেন। সেটা হলো: যখন ইস্তিনজা করা শেষ হবে এবং ইস্তিনজার অঙ্গ তিনি পরিষ্কার করবেন, তখন তার জন্য পুনরায় জানাবাতের গোসলের নিয়্যাতে ইস্তিনজার অঙ্গটি ধৌত করা উচিত। কারণ, সে এখন ধৌত না করলে পরে হয় আর মনে থাকবে না। ফলে উক্ত স্থানটি পরিত্যাগ করার কারণে তার গোসল সহীহ হবে না।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (২/২২৮), শারহু মুসলিম (৩১৬) ।

গোসলের সময় কি সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢালা মুস্তাহাব?

প্রথম মত: মুস্তাহাব। এটা হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। এটা ইসহাকের মত। তাদের দলীল হলো: মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "এরপরে তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপরে দুইবার বা তিনবার পানি ঢালতেন"। একইভাবে আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: "যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিও আসাল্লাম জানাবাতের গোসল করতেন, দুই হাত ধৌত করতেন। এরপরে সালাতের ন্যায় ওযূ করতেন" ।

এটা একটি জানা বিষয় যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তিনবার করে ওযূ করতেন। তারা বলেছেন: ওযূটা জানাবাতের গোসলের একটি অংশ। বিধায় যেহেতু তিনি ওযূতে তিনবার করে ধৌত করেছেন, তাই গোটা শরীরে তিনবার করে পানি ঢালাটাও এর উপরে কিয়াস করা যায়। আর সা'দী রহিমাহুল্লাহ এই কথার উত্তরে বলেছেন: গোসলে ওযূর উপরে কিয়াস করাটা স্বীকৃত নয়। যেহেতু উভয়টির মাঝে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য বিদ্যমান।

দ্বিতীয় মত: জানাবাতের গোসলে একাধিকবার শরীর ধৌত করা মুস্তাহাব নয়। এটা মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। আহমাদ ও খিরাকীর বক্তব্যের প্রকাশ্য দাবি। এই মতটি শাফেয়ীদের

মাঝে মাওয়ারদী স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। যা ইবনু তাইমিয়্যাহ ও সা'দীর পছন্দনীয় মত। বুখারী রহিমাহুল্লাহ এই বিষয়ে পরিচ্ছেদ লিখেছেন: "পরিচ্ছেদ: গোসলে একবার দেহ ধৌত করা প্রসঙ্গে"। এরপরে তিনি লেখক কর্তৃক বর্ণিত মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাদের দলীল হলো: লেখক কর্তৃক বর্ণিত আয়িশা ও মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস দুইটি। উভয়টিতেই বলা হয়েছে: এরপরে তিনি সমস্ত শরীর ধৌত করলেন। সেখানে কোনো সংখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (২/২১৩), আল ফাতহ লি ইবনি রজব (১/২৬৫), আল ফাতহ (১/৩৬৯), আশ শারহুল মুমতি' (১/৩৬০), আহকামুল হায়েয (১/৪৬৪) ।

গোসল ও ওযূর পরে দেহের অঙ্গসমূহ মোছার বিধান

প্রথম মত: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোছা মাকরূহ নয়। এটা অধিকাংশ আলেমগণের মত। ইবনু রজব বলেছেন: তাঁর এই কাজটি একদল সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে: তাদের অন্যতম হলেন: উমার, উসমান, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। তাবেঈদের মাঝে রয়েছেন খালফ বিন আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে। যা শা'বী, ছাওরী, আওযাঈ, মালেক, আবু হানীফা ও প্রসিদ্ধ মতানুসারে আহমাদ, ইসহাক ও অন্যান্যদের মত। যা শাফেয়ীদের প্রসিদ্ধ মত।

দ্বিতীয় মত: মাকরূহ। এটা হাসান বিন সালিহ, আব্দুর রহমান বিন মাহদীর মত। যা শাফেয়ীদের একটি মত। এটা আহমাদ থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনা, যা খাল্লাল অস্বীকার করেছেন। এই মতকে তিনি আহমাদ থেকে সাব্যস্ত করেননি। ইবনু আব্বাস ওযূর ক্ষেত্রে এটাকে মাকরূহ বলেছেন, গোসলের ক্ষেত্রে নয়।

তাদের দলীল হলো: মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "এরপরে আমি এক টুকরা কাপড় (তোয়ালে) তাঁকে এনে দিলাম, তখন তিনি সেটা ফিরিয়ে দিলেন। আর নিজ হাত দ্বারা পানি ঝাড়তে থাকলেন"। এটা "আমি তাঁকে একটি তোয়ালে দিলাম, কিন্তু তিনি সেটা ফিরিয়ে দিলেন" মর্মে একটি বর্ণনা এসেছে। এই বিষয়ে ইবনু রজব উত্তর দিয়ে বলেছেন: এই বিষয়ে মাকরূহ হওয়ার পক্ষ কোনো দলীল নেই। বরং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মোছা মুস্তাহাব নয় এই বিষয়ে দলীল আছে। আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না মোছা সর্বোত্তম কাজ এই বিষয়েও কোনো প্রমাণ নেই। কারণ, হাদীসটিতে এই বিষয়ে (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মোছা মুস্তাহাব হওয়া) এর চাইতে অধিক কিছুর উল্লেখ নেই। যেমনটি ইমাম আহমাদ সহ অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (২১৭), আল ফাতহ লি ইবনি রজব (১/৩২৪), আল ফাতহ (১/৩৬৩)।

ওযূ ও গোসলে কি দেহের উপরে হাত বুলানো ওয়াজিব?

প্রথম মত: ওযূ ও গোসলে দেহের অঙ্গসমূহ হাত দ্বারা ঘষা সুন্নাহ, ওয়াজিব নয়। সুতরাং কেউ যদি শরীরে পানি ঢালে এবং হাত দ্বারা স্পর্শ না করে অথবা গভীর পানিতে ডুব দেয়, অথবা কোনো নালার নিচে দাঁড়িয়ে থাকে অথবা বৃষ্টির পানিতে দাঁড়িয়ে থাকে গোসল ও ওযূর নিয়্যাতে এবং তার দেহের চুল ও পশমের গোরায় পানি সিক্ত হয়, তাহলে তার ওযূ ও গোসল সহীহ হবে। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

তাদের দলীল হলো: উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, তিনি বলেছেন: "আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমি এমন একজন নারী, যে নিজের মাথার চুল অত্যন্ত শক্ত করে বেঁধে রাখে, আমাকে কি জানাবাতের গোসলের জন্য আমার চুলের বেণী খুলতে হবে? তিনি বললেন: না। বরং তোমার জন্য মাথায় তিনবার পানি ঢালাই যথেষ্ট। এরপরে তুমি তোমার দেহে পানি ঢাললেই পবিত্র হয়ে যাবে"। সহীহ মুসলিম (৩৩০) ।

আর আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে কোনো হায়েযগ্রস্থ নারী পানি ও বরই এর পাতা মিশিয়ে সেটা দ্বারা ভালোভাবে দেহ পরিষ্কার করবে। এরপরে মাথায় পানি ঢালবে। এরপরে ভালোভাবে মাথা ঘষবে, যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাতে পারে। এরপরে নিজের দেহে পানি ঢালবে"। সহীহ মুসলিম (৩৩২) ।

আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ঢিবির (উঁচু ভূমি) পবিত্র মাটি মুসলিম ব্যক্তির ওযূর বিকল্প। যদিও সে দশ বছর যাবৎ পানি না পায়। যখনি সে পানি পাবে, তখনি যেনো নিজের ত্বকে পানি স্পর্শ করায়। কারণ, এটা অধিক উত্তম"। এটা হাসান হাদীস। যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। তাদের আরো অনেক দলীল রয়েছে।

দ্বিতীয় মত: দেহের যতদূর পর্যন্ত হাত পৌঁছায়, ততদূর পর্যন্ত হাত দ্বারা ডলা ওয়াজিব। এটা মালেক, আবুল আলীয়া ও মুযানীর মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: অধিকাংশ আলেমের মতটিই প্রাধান্যযোগ্য পূর্ববর্তী দলীলগুলোর ভিত্তিতে। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২১৯), আল মাজমূ' (২/২১৪), আহকামুল গোসল (৫৫৫) ।

যদি ওয়াজিব গোসলের দুইটি কারণ একত্রিত হয় তবে কি একটি গোসলই যথেষ্ট হবে যদি উভয়টির নিয়্যাত করে।

প্রথম মত: যদি ওয়াজিব গোসলের দুইটি কারণ একত্রিত হয়, যেমন হায়েয ও জানাবাত, আর গোসলকারী উভয়টিরই নিয়্যাত করে, তাহলে একটি গোসলই উভয়টির জন্য সহীহ হবে। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: এখানে দুইটি উপকরণই একটি বিষয় তথা গোসলকে ওয়াজিব করছে, ফলে একটি গোসলই উভয়টির ক্ষেত্রে সহীহ হবে। যেমন: হাদাস (বিধানগত নাপাকি) ও হাকিকি নাপাকির ক্ষেত্রে। তারা আরো বলেছেন: যদি কোনো ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে, আর সালাতের সময় ফরয ও তাহিয়্যাতুল মাসজিদের সালাতের নিয়্যাত করে, তাহলে একটি সালাতই উভয়টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

তারা আরো বলেছেন: আমরা দেখছি, সকল ওযূ ভঙ্গকারী বিধানগত নাপাকির ক্ষেত্রে একটি ওযূ ও একটি তায়াম্মুমই যথেষ্ট হচ্ছে। একটি গোসলই অনেকগুলো জানাবাতের জন্য সহীহ সাব্যস্ত হচ্ছে। একটি গোসলই ধারাবাহিক কয়েকদিনের হায়েযের জন্য যথেষ্ট হচ্ছে। কিরান হজ্জে একটি তাওয়াফই উমরাহ ও হাজ্জের জন্য যথেষ্ট হয়। বিধায়, একইভাবে একটি গোসলই গোসল ওয়াজিবকারী সকল উপকরণের জন্য যথেষ্ট। এই সকল কিয়াসের উত্তর ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় মত: একটি গোসল একাধিক গোসল ওয়াজিবকারী উপকরণের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং প্রতিটি উপকরণের জন্য একবার করে গোসল করতেই হবে। উদাহরণ স্বরূপ: হায়েযের জন্য একবার গোসল, জানাবাতের জন্য একবার গোসল এবং জুমআর জন্য পৃথক আরেকটি গোসল করতে হবে।

ইবনু হাযম বলেছেন: এটা জাবির বিন যায়েদ, হাসান, কাতাদাহ, নাখঈ, হাকাম, তাউস, আতা ইবনু আবি রাবাহ, আমর বিন শুয়াইব, যুহরী ও মায়মুন বিন মিহরান এর মত। এটা যাহেরীদের মত। এটা আবু কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুরও মত।

"তিনি একদা স্বীয় পুত্র আব্দুল্লাহ এর ঘরে প্রবেশ করলেন, যখন তার পুত্র জুমআর দিনে গোসল করছিলেন। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: এটা কি জানাবাতের গোসল, নাকি জুমআর গোসল? তিনি বললেন: জানাবাতের গোসল। তিনি বললেন: তাহলে আরেকবার গোসল করো"। এই হাদীসটিকে আলবানী রহিমাহুল্লাহ আস সহীহাহ গ্রন্থে (২৩২১) হাসান বলেছেন এবং তামামুল মিন্নাহ গ্রন্থেও।

এই মতের দলীল: এই গোসলগুলোর প্রতিটি গোসল পৃথকভাবে ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে দলীল সাব্যস্ত হয়েছে। বিধায় এই গোসলগুলোকে একটি একক গোসলের মধ্যে একত্রিত করা জায়েয হবে না। কারণ, রমযান মাসের সিয়াম কারোর উপরে কাযা হয়, তাহলে তার জন্য রমযান মাসের আদায় (চলমান) সিয়ামের সাথে কাযা সিয়াম পালনের নিয়্যাত করা জায়েয হবে না। একই নিয়ম সালাত ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। আর এই

ইবাদতসমূহ ও গোসলের মাঝে পার্থক্যের পক্ষে কোনো দলীল নেই। এই মতটি ইবনু হাযম ও আলবানীর নিকট গ্রহণযোগ্য মত। তারা উভয়েই এই মাসআলার বিশ্লেষণে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

তুলনামূলক সঠিক মত: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল ইশরাফ (৪/৪৩), আল মুহাল্লা (১/২৮৯), আল মুগনী (১/২২১), (২/৩৪৭), আল মাজমূ' (৪/৪০৬), তামামুল মিন্নাহ (১২৬) ।

যদি দুইটি গোসল ওয়াজিব হওয়ার দুইটি উপকরণ থাকে কিন্তু যেকোনো একটির জন্য নিয়্যাত করে।

মাসআলাটি ইতোপূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে। মাসআলাটি হলো: যখন গোসল ওয়াজিব হওয়ার দুইটি উপকরণ পাওয়া যাবে, তখন যদি গোসলকারী তার গোসলে উভয়টির জন্যই নিয়্যাত করে, তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে, তার গোসল উভয়টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। কিন্তু সে যদি কোনো একটি গোসলের নিয়্যাত করে, তাহলে কি একটি গোসল যথেষ্ট হবে এই বিষয়ে তারা মতানৈক্য করেছেন।

প্রথম মত: যদি সে যেকোনো একটির জন্য নিয়্যাত করে, তাহলে উক্ত গোসল অপরটির জন্যও প্রযোজ্য হবে। এটা হাম্বলী মাযহাবের একটি মত। কারণ, এটা সহীহ গোসল, যেখানে ফরয গোসলের নিয়্যাত করা হয়েছে। বিধায় উক্ত গোসলটি তার জন্য যথেষ্ট হবে, যেমন সালাত বৈধ হওয়ার নিয়্যাতে গোসল করলে উক্ত গোসল পবিত্রতার জন্য যথেষ্ট হয়।

দ্বিতীয় মত: সে যেটার নিয়্যাত করবে, সেটা যথেষ্ট হবে, অন্যটা যথেষ্ট হবে না। এটা হাম্বলী মাযহাবের একটি মত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বক্তব্যের ভিত্তিতে: "প্রত্যেক মানুষ তার নিয়্যাত অনুসারে কর্মফল পাবে" ।

সঠিক মত হলো: দ্বিতীয় মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২২১), আল মাজমূ' (৪/৪০৬)।

এক পাত্র থেকে পুরুষ ও নারী উভয়েরই গোসল করা জায়েয।

আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "নারী ও পুরুষ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে একত্রে ওযূ করতেন"। সহীহ বুখারী (১৯৩)। হাফেয ইবনু হাজার তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে (১/৩০০) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন: তাহাবী, তারপরে কুরতুবী ও নববী একই পাত্রের পানি দ্বারা পুরুষ ও নারীর গোসল বৈধ হওয়ার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই বর্ণনায়

সমস্যা রয়েছে। যেহেতু ইবনু মুনযির আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন: "তিনি এই বিষয়ে নিষেধ করতেন"। একইভাবে ইবনু আব্দিল বার কোনো একদল আলেম থেকে মতটি বর্ণনা করেছেন। আর এই হাদীসটি তাদের বিপক্ষে একটি শক্ত প্রমাণ।

আমি বলব: তাদের বিপক্ষে আরেকটি দলীল হলো: লেখক কর্তৃক বর্ণিত আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে, তিনি বলেছেন: "আমি ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমরা উভয়েই উক্ত পাত্র থেকে অঞ্জলি ভরে পানি তুলতাম"।

৩১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ».

৩১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, উমার ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাদের কেউ কি নাপাক অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকতে পারে কি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। যখন তোমাদের কেউ ওযূ করবে তখন ঘুমাতে পারে। [সহীহ বুখারী হা/২৮৭ ও মুসলিম হা/৩০৬]

জুনুবী ব্যক্তির জন্য গোসল করার পূর্বে ঘুমানো, পানাহার করা ও সহবাস করা জায়েয

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ হাদীসগুলোর ব্যাখ্যায় বলেছেন: প্রত্যেকটি হাদীসের সারমর্ম হলো: জুনুবী ব্যক্তির জন্য গোসলের পূর্বে ঘুমানো, পানাহার এবং সহবাস করা জায়েয আছে। এটা সর্বসম্মত মত। তারা এই বিষয়েও ইজমা' করেছেন যে, জুনুবী ব্যক্তির দেহ ও শিরাসমূহ পবিত্র। উক্ত হাদীসগুলোর থেকে এটাও বুঝা যায় যে, এই কাজগুলো করার পূর্বে তার জন্য ওযূ করা ও লজ্জাস্থান ধৌত করা মুস্তাহাব। বিশেষত, সহবাস করেনি এমন নারীর সাথে সহবাস করার পূর্বে। কারণ, তখন লজ্জাস্থান ধৌত করা মুস্তাহাব হওয়ার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (৩০৫), আল ফাতহ (১/৩৯৩) ।

জুনুবী ব্যক্তির জন্য ঘুম, পানাহার করা ও সহবাসের পূর্বে ওযূ করা মুস্তাহাব

ইমাম নব্ববী রহিমাহুল্লাহ শারহু মুসলিম গ্রন্থে (৩০৫) বলেছেন: আমাদের মাযহাবের আলেমগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন: ওযূর পূর্বে ঘুম, পানাহার ও সহবাস করা মাকরূহ। এই হাদীসগুলো উক্ত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে। আমাদের নিকট এই বিষয়ে কোনো মতানৈক্য

নেই যে, উক্ত ওযূ ওয়াজিব নয়। জমহুর ও মালেক একই মত পোষণ করেছেন। মালেকের অনুসারীদের মাঝে ইবনু হাবীব এটা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। এটা দাউদ যাহেরীর মাযহাব। তাদের মতে, এখানে ওযূ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সালাতের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ ওযূ।

٣٢. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَتْ: «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ – امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ – إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ؛ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ؛ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ».

৩২. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু ত্বলহার স্ত্রী উম্মু সুলাইম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তা'আলা হক কথা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। যখন সে বীর্য দেখতে পাবে। [সহীহ বুখারী হা/২৮২ ও মুসলিম হা/৩১৩]

উক্ত হাদীস থেকে অর্জিত ফায়দাসমূহ

১ – হাফেয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ইবনু বাত্তাল বলেছেন: এই হাদীসে প্রত্যেকটি নারী সহবাসের স্বপ্ন দেখেন এই বিষয়ে স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান। অন্যরা এর হুবহু এর বিপরীত দাবিকে সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলেছেন: এখানে এই বিষয়েরও (অর্থাৎ হুবহু বিপরীত দাবি) দলীল আছে যে, কিছু নারী সহবাসের স্বপ্ন দেখেন না। মূলত ইবনু বাত্তালের উদ্দেশ্য হলো: সম্ভাবনা অর্থাৎ প্রত্যেক নারীর ক্ষেত্রেই স্বপ্নদোষ ঘটা সম্ভব। বাস্তবায়িত হওয়াটা জরুরী নয়। অর্থাৎ: তাদের 'সহবাসের স্বপ্ন দেখার' সক্ষমতা আছে।

২ – এই হাদীসে বীর্যপাত হওয়ার ফলে নারীর জন্য গোসল ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে দলীল বিদ্যমান। এই বিষয়ে কোনো মতানৈক্য আছে এমন দাবি ইবনু বাত্তাল নাকচ করে দিয়েছেন। অথচ এটা আমরা নাখঈর সূত্রে পূর্বে বর্ণনা করেছি। আমি বলব: নাখঈর মতানুসারে: স্বপ্নদোষ নারীদের ক্ষেত্রে ঘটা অসম্ভব, পুরুষদের ক্ষেত্রে নয়। হাফেয বলেছেন: এই বর্ণনাটি ইবনু আবী শায়বা শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন।

৩ – উক্ত হাদীসে ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত ফায়দাটি বিদ্যমান। তিনি বলেছেন: সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করলেন যে, নারীরও পুরুষের ন্যায় বীর্য রয়েছে। আর সে যদি ঘুমের মাঝে সহবাসের স্বপ্নের পরে পানি দেখতে পায়, তাহলে তার

উপরে উক্ত পানির কারণে গোসল করা ওয়াজিব। এখানে এই সতর্কবার্তা রয়েছে যে, পুরুষেরও একই বিধান। একইভাবে যদি সে স্বপ্ন ও পানি উভয়টি দেখে, তখন তার উপরে গোসল করা ওয়াজিব। এই বিষয়ে আলেমগণের মাঝে কোনো মতানৈক্য নেই।

৪ – হাফেয বলেছেন: এই হাদীসে তাদের মতকে খণ্ডন করা হয়েছে, যারা দাবি করেন: নারীর বীর্য নির্গত হয়ে বের হয় না। বরং তার শারীরিক অনুভূতির দ্বারা তার বীর্যপাত অনুভব করা যায়। আর যারা "যখন সে পানি (বীর্য) দেখবে" এই বাক্যটিকে "যখন সে বীর্য সম্পর্কে জানতে পারবে" এই অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন, তাদের মতকেও খণ্ডন করা হয়েছে। যেহেতু এখানে জানতে পারাটা সম্ভব নয়।

৫ – এই হাদীসে নারীর নিজের সমাধানের জন্য নিজের নিয়ে গবেষণা করার কথা বলা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য: আল ইলাম (২/৩৭), ইবনু রজব (১/৩৩৯), আল ফাতহ (১/৩৮৯), আত তাওযীহ (১/৩৭৩) ।

যদি বীর্য উত্তেজনার কারণে স্বজোরে নির্গত হয় তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে

কাসানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: জানাবাত যেসকল বিষয় দ্বারা সাব্যস্ত হয়, তার মাঝে কিছু সর্বসম্মতি ক্রমে সাব্যস্ত। আর কিছু বিষয় মতানৈক্যপূর্ণ। সর্বসম্মতি ক্রমে সাব্যস্ত বিষয়গুলো দুই প্রকার:

এক: স্পর্শ করা, দৃষ্টি দেওয়া এবং স্বপ্নদোষ হওয়া এই জাতীয় যেকোনো কারণে যৌনাঙ্গে প্রবেশ করানো ব্যতীত স্বজোরে উত্তেজনা সহকারে বীর্যপাত হওয়া। এমন ক্ষেত্রে সর্বসম্মতি ক্রমে গোসল ওয়াজিব হবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বক্তব্যের ভিত্তিতে: "পানির কারণে পানি"। অর্থাৎ বীর্য নির্গত হলে পানি তথা গোসল ওয়াজিব হয়।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: বীর্য যদি কামভাবের সাথে স্বজোরে নির্গত হয়, তাহলে নারী ও পুরুষ উভয়েরই গোসলকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করবে। চাই সেটা ঘুমের মাঝে হোক অথবা জাগ্রত অবস্থায়। এটা সাধারণ সকল ফকীহর মত। যা ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এই বিষয়ে আমরা কোনো মতানৈক্য আছে বলে জানি না।

দ্রষ্টব্য: বাদায়িউছ ছানায়ে' (১/৩৭৩), আল মুগনী (১/১৯৯), আল মাজমূ' (২/১৫৮)।

যদি ঘুম থেকে জেগে উঠার পরে হালকা তারল্য দেখতে পায় কিন্তু সেটা বীর্য না অন্যকিছু তা বুঝতে না পারে

প্রথম মত: তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব। এটা ইবনু আব্বাস, আতা, শা'বী, নাখঈ, আবু হানীফা, সুফয়ান ও আহমাদের প্রকাশ্য মাযহাব। তবে আহমাদ বীর্যপাত হওয়ার অন্যকোনো কারণ বিদ্যমান থাকার অবস্থাকে এই মতের বাহিরে রেখেছেন। যেমন: ঘুমের পূর্বেই স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া অথবা ঘুমের পূর্বে যদি এই বিষয়ে ভেবে থাকে অথবা উক্ত স্থানে কোনো সুঁই জাতীয় বস্তু ফুটে থাকলে সেটার কারণে তরল পানি নির্গত হতে পারে। এমন কিছু হলে গোসল ওয়াজিব হবে না।

তাদের দলীল হলো: ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নদোষের মাধ্যমে বীর্যপাত হওয়ার সম্ভাবনাটা অধিক শক্তিশালী। সুতরাং এই তরল বস্তুকে সন্দেহের ক্ষেত্রে বীর্য হিসেবেই ধর্তব্য হবে। মযী বা অন্যকিছু বলে ধর্তব্য হবে না। কারণ, ঘুমের মধ্যে মযী বা অন্যকিছু নির্গত হওয়া অধিক বিরল। আর যেহেতু তার দায় অকাট্যরূপে পবিত্রতা অর্জনের দায়িত্বে দায়বদ্ধ হয়েছে, কিন্তু নিশ্চিতরূপে পবিত্রতার প্রকারটা নির্ণয় করা যাচ্ছে না, বরং প্রবল ধারণার ভিত্তিতেও ওযূ ও গোসলের পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত এখন তার সালাত সহীহ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। যেহেতু তার উপরে গোসল না ওযূ কোনটা ওয়াজিব হয়েছে, তা অনিশ্চিত। বিধায় তার জন্য গোসলটাই বাধ্যতামূলক করা হবে। যা ছোট পবিত্রতাকেও শামিল করে।

দ্বিতীয় মত: তার জন্য গোসল বাধ্যতামূলক নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা নিশ্চিতরূপে বীর্য সাব্যস্ত না হয়। এটা মুজাহিদ, কাতাদাহ, হাকাম, হাম্মাদ, মালেক, শাফেয়ী, ইসহাক ও আবু ইউসুফ এর মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। এটা ইবনু মুনযির, ইবনু কুদামা ও ইবনু রজব রহিমাহুমুল্লাহ এর মত। ইবনু ইবনু মুনযির বলেছেন: তরল বস্তুটি বীর্য নাকি মযী, এই বিষয়ে সন্দেহ হলে অধিক নিরাপদ সিদ্ধান্ত হলো তখন গোসল করা। যদি তার জন্য উভয়টির মাঝে গন্ধ দ্বারা পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব হয়, তাহলে তাই করবে। যেমনটি কাতাদাহ বলেছেন। কারণ, পুরুষের বীর্যের গন্ধ অনেকটা খেজুরগাছের শীষের গন্ধের মত।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (২/৮৬), আল মুগনী (১/২০৩), ইবনু রজব (১/৩৩৯) ।

যদি বীর্য কাপড়ে বা বিছানায় দেখতে পায়

শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে, যদি বীর্য এমন বিছানায় দেখতে পায়, যেখানে সে ব্যতীত অন্যকেউ ঘুমায় না অথবা তার পরিহিত পোশাকে, যা অন্যকেউ পরিধান করে না, তাহলে তার উপরে গোসল করা ওয়াজিব। কারণ, এটা একমাত্র তারই বীর্য হওয়ার সম্ভাবনা, অন্য কারোর নয়। এমন ক্ষেত্রে গোসল না করে সালাত আদায় করলে, উক্ত বিছানায় সর্বশেষ ঘুমের পরবর্তী সালাতটি পুনরায় আদায় করতে হবে। তবে উক্ত বীর্য সর্বশেষ ঘুমের আগেই

নির্গত হয়েছে, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলে সর্বশেষ ঘুমের পরবর্তী সালাত পুনরায় আদায় করা লাগবে না। কিন্তু তখন সে ঐ সালাতটি পুনরায় আদায় করবে, যেটা উক্ত বীর্য নির্গত হওয়ার ঘুমের সবচেয়ে নিকটতম পরবর্তী সালাত।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২০৩), আল মাজমূ' (২/১৬২)।

যদি এমন কাপড়ে বীর্য দেখতে পায় যাতে সে এবং অন্য কেউ ঘুমায়

প্রথম মত: উভয়ের উপরেই গোসল করা ওয়াজিব। এটা হানাফীদের মাযহাব। তাদের দলীল হলো: সালাত সহীহ হওয়ার শর্ত হলো পবিত্রতা। আর পবিত্রতা নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান থাকা জরুরী।

দ্বিতীয় মত: তাদের কারোর উপরেই গোসল করা ওয়াজিব নয়। এটা শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মাযহাব। হানাফী মাযহাবের একটি মত। তাদের দলীল হলো: পবিত্রতা বিদ্যমান এটা নিশ্চিত। বরং হাদাস সংঘটিত হওয়ার বিষয়টিই সন্দেহপূর্ণ। আর নিশ্চয়তা সন্দেহকে মুছে দেয়। বিধায় আমরা (পবিত্রতা) নিশ্চিত বিষয়টিকেই বহাল রাখব, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটার অপসারণ নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত না হয়। এই কায়দার পক্ষে সহীহ বুখারী (১৩৭), এবং সহীহ মুসলিমে (৩৬১) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে একজন ব্যক্তির সমস্যা উত্থাপন করলেন, যার মনে সালাতের মধ্যে তার শরীর থেকে কিছু নির্গত হয়েছে এমন অনুভূতি আসত। তিনি বললেন: "সে তার স্থান থেকে নড়বে না অথবা উঠবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো আওয়াজ না শুনতে পায় অথবা কোনো গন্ধ তার নাকে না আসে"।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মত। কিন্তু ইবনু কুদামা বলেছেন: তাদের একজন অপরজনের ইকতেদা করতে পারবে না। কারণ, তাদের কোনো একজন নিশ্চিতরূপে জুনুবী। সুতরাং ইকতেদা করলে উভয়ের কারোর সালাতই সহীহ হবে না। এমন কথা নববীও বলেছেন। নববী বলেছেন: প্রত্যেকের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২০৩), আল মাজমূ' (২/১৬২), আল ইনছাফ (১/১৬৯), আহকামুল গুসল (৩৯) ।

যদি অসুস্থতা বা ঠাণ্ডার কারণে কামভাব বিহীন বীর্যের ন্যায় কোনো তরল পদার্থ নির্গত হয়

প্রথম মত: তার উপরে গোসল করা ওয়াজিব। এটা শাফেয়ীর মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। ইবনু কুদামা বলেছেন: খিরাকীর বক্তব্য এই মতকে ধারণ করে। যা ইবনু হাযমের নিকট গ্রহণযোগ্য। তাদের দলীল হলো: স্বপ্নদোষ হলে নারীর জন্য গোসল করা ওয়াজিব

কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "হ্যাঁ, যদি সে (নারী) পানি দেখতে পায়"। আর এই হাদীসটি: "পানি (গোসল) ওয়াজিব হয় পানির (বীর্য) কারণে"। আর যেহেতু এটা নির্গত বীর্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিধায় এটার কারণে গোসল ওয়াজিব হবে। ঠিক যেমন গোসল ওয়াজিব হয় বেহুশ অবস্থায় নির্গত হলে।

দ্বিতীয় মত: কামভাব বিহীন এমন বীর্য জাতীয় তরল বস্তু নির্গত হওয়ার ফলে গোসলে ওয়াজিব হবে না। এটা আবু হানীফা, মালেক, ও হাম্বলী মাযহবের প্রসিদ্ধ মত। যা ইবনু উসাইমীন গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল হলো: "যদি তোমরা জুনুবী হও, তাহলে পূর্ণাঙ্গরূপে পবিত্র হও" (আল মায়িদাহ: ৬)। আর জুনুব বলা ঐ ব্যক্তিকে, যার দেহ থেকে স্বজোরে কামভাবের সাথে বীর্য নির্গত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্বজোরে নির্গত বীর্য থেকে" (আত তারিক্ব: ৬)। তারা বলেছেন: যদি জাগ্রত অবস্থায় কামভাব বিহীন বীর্য নির্গত হয়, তাহলে এটা গোসল ওয়াজিব করবে না। তারা এমন বীর্যের তিনটি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন:

প্রথম নিদর্শন: স্বজোরে নির্গত হওয়া।

দ্বিতীয় নিদর্শন: গন্ধ। যদি সেটা শুকনা হয়, তাহলে এর গন্ধ হবে ডিমের গন্ধের ন্যায়। আর যদি শুকনা না হয়, তাহলে এর গন্ধ হবে ময়দা ও খেজুরের পরাগ রেণুর ন্যায়।

তৃতীয় নিদর্শন: এটা নির্গত হওয়ার পরে শরীর ক্লান্ত হওয়া। তারা "পানি (গোসল) ওয়াজিব হয় পানির (বীর্য) কারণে" এই হাদীসের উত্তরে বলেছেন: হাদীসটিকে সুনির্দিষ্টভাবে ঐ পানির ক্ষেত্রে ধার্য করা হবে, যা কামভাব সহকারে নির্গত হয় এবং এর ফলে শারীরিক ক্লান্তি সৃষ্টি হয়।

তুলনামূলক সঠিক মত: দ্বিতীয় মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (১/২৫২), আল মুগনী (১/১৯৯), আল ইনছাফ (১/১৬৮), আশ শারহুল মুমতি' (১/৩৩৩) ।

যদি সে কামভাবের সময় বীর্য চলাচল অনুভব করে কিন্তু পুরুষাঙ্গ আঁকড়ে ধরে সেটাকে নির্গত হতে বাঁধা দেয় যার ফলে বীর্য নির্গত না হয় তাহলে এর বিধান কী

এর দৃষ্টান্ত হলো: কোনো একজন ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হলো, তখন সে বীর্য চলাচল অনুভব করার সাথে সাথে জাগ্রত হয়ে গেল। এমন অবস্থায় সে তার কামভাব নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত পুরুষাঙ্গ আঁকড়ে ধরে রাখল, ফলে সেটা নির্গত হলো না।

আরেকটি দৃষ্টান্ত: সে তার কামভাবের তাড়না অনুভব করল, এরপরে কোনো একটি কারণে তার কামভাবের তাড়না শেষ হয়ে গেল, ফলে বীর্য নির্গত হলো না। এই আলেমগণের মতসমূহ:

প্রথম মত: যদি বীর্য চলাচল করে, কিন্তু নির্গত না হয়, তাহলে তার উপরে গোসল করা ওয়াজিব নয়। এটা আহমাদের একটি বর্ণনা, খিরাকীর প্রকাশ্য মত। যা ইবনু কুদামা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন: এটা অধিকাংশ ফকীহদের মত। এটা ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু উসাইমীনের নিকট গ্রহণযোগ্য। তাদের দলীল হলো: উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, যা লেখক বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "হ্যা, যখন সে পানি দেখতে পাবে"। আর মুসলিমে (৩৪৩) বর্ণিত আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এর হাদীস, সেখানে বলা হয়েছে: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "পানি (গোসল) ওয়াজিব হয় পানির (বীর্য) কারণে"। তারা (উক্ত মতের প্রবক্তাগণ) বলেছেন: যেহেতু এই ক্ষেত্রে কোনো পানি নির্গত হয়নি, আর হাদীসটির ভাবার্থ থেকে বুঝা যায় যে, পানি (বীর্য) নির্গত না হলে কোনো পানি (গোসল) ওয়াজিব হবে না।

তারা আরো বলেছেন: মূলনীতি অনুসারে পবিত্রতা অবশিষ্ট থাকবে এবং গোসল ওয়াজিব হবে না। এই মূলনীতিকে একমাত্র দলীল ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা পরিত্যাগ করা যাবে না।

দ্বিতীয় মত: গোসল ওয়াজিব হবে। এটা আহমাদের প্রসিদ্ধ বর্ণনা। কারণ, পানি নির্দিষ্ট স্থান থেকে দূরে স্থানান্তরতি হয়েছে। বিধায় তাকে জুনুবী বলা যায়। কারণ, নাজাবাতের আসল অর্থ হলো দূরত্ব বা দূরে সরে যাওয়া। আর যেহেতু গোসলের মধ্যে কামভাব দূরীভূত করার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। আর কামভাব বীর্য স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে তৈরী হয়েছে। সুতরাং এটা বীর্য নির্গত হওয়ার মতই।

প্রাধান্যযোগ্য মত হলো: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২০০), আল ইনছাফ (১/১৬৯), আশ শারহুল মুমতি' (১/৩৩৬) ।

যদি বীর্য কামভাব সহকারে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে পুরুষাঙ্গ আঁকড়ে ধরে রাখার ফলে কামভাব নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পরে বীর্য নির্গত হয় তাহলে এর বিধান কী

প্রথম মত: যদি বীর্য তার উৎস থেকে কামভাব সহকারে স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু কামভাব নিস্তেজ হওয়ার পরে তা নির্গত হয়, তাহলে তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব। যা আবু হানীফা, মুহাম্মাদ বিন হাসান এর মত। যা হাম্বলী মযহাবের মত এবং মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। তাদের দলীল হলো: গোসল ওয়াজিব হয় দুইটি বিষয়ের ভিত্তিতে: বীর্য নির্গত হওয়া এবং কামভাব বিদ্যমান থাকা। তাই বীর্য স্থানান্তরিত হওয়ার সময় যদি কামভাব থাকে, এর অনেক পরে যদি তা (কামভাব বিহীন) নির্গত হয়, তাহলে গোসল ওয়াজিব সাব্যস্তকারী কারণ উপস্থিত। আর তা হলো কামভাবের কারণে বীর্য নির্গত হওয়া। আর কামভাব বীর্য নির্গত হওয়ার সময় বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক এর মাঝে বিধানগত পার্থক্য নেই। এই দাবিকে উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীসটি সত্যায়িত করে। সেখানে

বলা হয়েছে: “স্বপ্নদোষ হলে নারীর উপরে কি গোসল করা ওয়াজিব? তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “হ্যাঁ, যদি সে পানি দেখতে পায়”।

দ্বিতীয় মত: যদি বীর্য নির্গত হওয়ার সময় কামভাব বিদ্যমান থাকে, তাহলে গোসল করা ওয়াজিব। অন্যথায় ওয়াজিব নয়। এটা আবু ইউসুফের মত। মালেকী মাযহাবের একটি মত। তাদের দলীল হলো: গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য উভয় কারণই একত্রিতভাবে সংঘটিত হতে হবে। যদি উভয়টির একটি অনুপস্থিত থাকে, যেমন বীর্য নির্গত হয়, কিন্তু কামভাব বিহীন, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না। কারণ, এমন অবস্থায় বীর্য আর মযীর মাঝে কোনো তফাৎ থাকে না। কারণ, কামভাব নিঃশেষ হওয়ার পরে মযীও নির্গত হয়, কিন্তু উক্ত অবস্থায় গোসল ওয়াজিব হয় না।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: বাদায়িউছ ছানায়ে’ (১/২৭৭), আল মুগনী (১/২০০), আল ইনছাফ (১/১৭০), আহকামুল গুসল (২১) ।

৩৩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ».

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ».

৩৩. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে বীর্য ধুয়ে ফেলতাম। এরপর তিনি ঐ কাপড় পরিধান করেই সালাত আদায় করতে চলে যেতেন। অথচ ধোয়ার চিহ্ন আমি তার কাপড়ের মধ্যে দেখতে পেতাম। [সহীহ বুখারী হা/২২৯ ও মুসলিম হা/২৮৯]

সহীহ মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে আমি বীর্যকে ভালোভাবে ঘষে উঠিয়ে ফেলতাম। অতঃপর তিনি ঐ কাপড় পরিধান করেই সালাত আদায় করতেন। [সহীহ মুসলিম হা/২৮৮]

মানুষের বীর্যের বিধান কী?

প্রথম মত: পবিত্র। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস: তিনি বলেছেন: “আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় থেকে বীর্য ঘষে ঘষে তুলতাম। আর তিনি উক্ত কাপড়েই সালাত আদায় করতেন”।

অপর বর্ণনার শব্দ অনুসারে: “শুকিয়ে যাওয়া বীর্য তার কাপড় থেকে আমার নখ দ্বারা ঘষে ঘষে তুলতাম”।

দ্বিতীয় মত: নাপাক। এটা ছাওরী, আওযাঈ, মালেক ও আবু হানীফার মত। তাদের দলীল হলো: আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। এটা বুখারীর শব্দ। আর মুসলিমের শব্দ অনুসারে: “আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীর্য ধুয়ে উক্ত কাপড় পরিধান করেই সালাতে গমন করতেন”।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। অর্থাৎ মানুষের বীর্য পবিত্র। পূর্বে বর্ণিত আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীসের ভিত্তিতে। সেখানে বলা হয়েছে: “তিনি বীর্য ভালোভাবে ঘষে উঠাতেন”।

দ্বিতীয়ত: বীর্য ধৌত করার পক্ষে কোনো আদেশ সংক্রান্ত দলীল বর্ণিত হয়নি।

তৃতীয়ত: আল্লাহর অনুমতিক্রমে বীর্য থেকেই সন্তান নির্গত হয়। এই কথা কখনোই বলা যাবে না: মানুষের সৃষ্টি শুরু হয়েছে নাপাক থেকে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (২/৫৭২), শারহু মুসলিম (২৯০), আল মুফহিম (১/৫৪৯), আল ফাতাওয়া (২১/৫৮৭)।

٣٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ». وَفِي لَفْظٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».

৩৪. আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীর চার শাখার (দুই হাত ও দুই পায়ের) সম্মুখে বসে এবং (সঙ্গমে রত হয়ে বীর্যপাতের জন্য) প্রচেষ্টা করে, তখন তাদের ওপর গোসল ফরয হয়। [সহীহ বুখারী হা/২৯১ ও মুসলিম হা/৩৪৮] অন্য বর্ণনায় আছে, যদিও সে বীর্যপাত না করে। [সহীহ মুসলিম হা/৩৪৮]

যদি সহবাসের পরেও বীর্যপাত না হয় তাহলে কি গোসল ওয়াজিব হবে?

প্রথম মত: দুই লজ্জাস্থান একত্রিত হওয়ার দ্বারা গোসল ওয়াজিব হবে। চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক। এটা অধিকাংশ আলেমের মধ্যে সাহাবী, তাবেঈন ও তাদের পরবর্তীদের মত। তাদের মধ্যে চার ইমামও রয়েছেন। আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ এবং তাদের অনুসারীগণ।

ইবনু মুনযির বলেছেন: আজকে পর্যন্ত আলেমগণের মাঝে এই বিষয়ে কোনো মতানৈক্য হয়েছে বলে আমি জানি না। তাদের দলীল হলো: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস,

যা লেখক উল্লেখ করেছেন। আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে মুসলিমে (৩৪৯) বর্ণিত হয়েছে: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন পুরুষ নারীর চার বাহু (দুই হাত ও দুই পা) এর মাঝে বসবে, এবং পুরুষের পুরুষাঙ্গ (অগ্রভাগ) নারীর লজ্জাস্থানের ভেতরে প্রবেশ করবে, তখন গোসল ওয়াজিব হবে"।

দ্বিতীয় মত: বীর্যপাত হওয়া ব্যতীত গোসল ওয়াজিব হবে না। এটা আবু সাঈদ খুদরী, যায়েদ বিন খালেদ, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস, মুয়ায ও রাফে' বিন খাদীজ এর মত। আর আলী - রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম - থেকেও বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীদের বাহিরে উমার বিন আব্দুল আযীয ও যাহেরীদের থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এই মতের দলীল হলো: "পানি (গোসল) ওয়াজিব হয় পানির (বীর্য) কারণে"। এটা আবু সাঈদ ও অন্যান্য সাহাবীদের থেকে বর্ণিত মুত্তাফাক আলাইহি হাদীস।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আর "পানি (গোসল) ওয়াজিব হয় পানির (বীর্য) কারণে" এই হাদীস এবং এই জাতীয় অর্থবোধক হাদীস রহিত হয়ে গেছে। এই বিষয়ে অনেকগুলো দলীল বিদ্যমান। কিছু দলীল পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। তবে "পানি (গোসল) ওয়াজিব হয় পানির (বীর্য) কারণে" হাদীসটির বিধান এখনো স্বপ্নের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট রয়েছে। বিধায় স্বপ্নদ্রষ্টার উপরে গোসল ওয়াজিব হবে না, যতক্ষণ তার বীর্যপাত না হয়।

নববী বলেছেন: ইবনু আব্বাস থেকে আরেকটি উত্তর বর্ণিত হয়েছে, সেটা হলো: "পানি (গোসল) ওয়াজিব হয় পানির (বীর্য) কারণে" অর্থাৎ: স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে একমাত্র বীর্যপাত না হলে গোসল ওয়াজিব হবে না।

দ্রষ্টব্য: আল ইশরাফ (১/২৯০), আল মুগনী (১/২০৪), আল মাজমূ' (২/১৫৪), ইবনু রজব (১/৩৭৫) ।

গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য কি পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ সম্পূর্ণরূপে ভেতরে প্রবেশ করানো শর্ত

প্রথম মত: পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ সম্পূর্ণরূপে নারীর লজ্জাস্থানের ভেতরে ঢুকে যাওয়া শর্ত। কিন্তু অগ্রভাগের বেশি প্রবেশ করা শর্ত নয়। চাই উভয়ের লজ্জাস্থান খাতনাকৃত হোক বা না হোক। এটা সকল আলেমগণের মত। তাদের দলীল হলো: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। আর মুসলিমে (৩৪৯) আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, যেখানে তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন পুরুষ নারীর চার বাহু (দুই হাত ও দুই পা) এর মাঝে বসবে, এবং পুরুষের পুরুষাঙ্গ (অগ্রভাগ) নারীর লজ্জাস্থানের ভেতরে প্রবেশ করবে, তখন গোসল ওয়াজিব হবে"।

দ্বিতীয় মত: পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ আংশিক ঢুকলেও গোসল ওয়াজিব হবে। এটা কিছু শাফেয়ী আলেমদের মত। নববী বলেছেন: এটা অত্যন্ত দুর্বল ও বিরল মত। এটা বাতিল হওয়ার জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণীটাই যথেষ্ট: "যখন দুই লজ্জাস্থান একটি অপরটির সাথে মিলিত হবে, তখন গোসল ওয়াজিব হবে"।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। শাফেয়ী বলেছেন: দুই লজ্জাস্থান মিলিত হওয়ার অর্থ হলো: পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ (খাতনার স্থান) নারীর যোনির ভেতরে এমনভাবে প্রবেশ করা, যাতে করে অগ্রভাগের পরের অংশটা (খাতনার শেষসীমা) নারীর লজ্জাস্থানের মুখের সাথে থাকে। আহমাদ বলেছেন: 'উভয়ের লজ্জাস্থান অর্থাৎ খাতনাকৃত অংশ (খাতনার স্থান) পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে মিলে যাওয়া। ফলে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ভেতরে প্রবেশ করলে খাতনার শেষ সীমাটা অগ্রভাগের পরে দৃশ্যমান হবে'। অর্থাৎ খাতনা বিহীন অংশটা এখন নারীর লজ্জাস্থানের মুখে অবস্থান করবে।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২০৪), আল মাজমূ' (২/১৫১), ইবনু রজব (১/৩৭২), আহকামুল গুসল (৮৭) ।

যদি পুরুষের লজ্জাস্থান (খাতনার স্থান) নারীর যোনির ভেতরে প্রবেশ না করে শুধু স্পর্শ করে তাহলে তার উপরে গোসল ওয়াজিব হবে না

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যদি একজনের লজ্জাস্থান অপরজনের লজ্জাস্থানকে (খাতনার স্থান) স্পর্শ করে, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ না করে, তাহলে সর্বসম্মতি ক্রমে গোসল ওয়াজিব হবে না।

নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যদি পুরুষের খাতনার স্থানটা নারীর খাতনার স্থানে রাখা হয়, কিন্তু নারীর লজ্জাস্থান (খাতনার স্থান) পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে প্রবেশ না করানো হয়, তাহলে সকলের ইজমা' অনুসারে গোসল ওয়াজিব হবে না। এটা শায়েখ আবু হামিদ ও অন্যান্যদের মত।

শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আলেমগণ এই বিষয়ে ইজমা' করেছেন – যেই দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন সেই অনুসারে – যদি পুরুষাঙ্গকে নারীর খাতনার স্থানে রাখা হয়, কিন্তু সেটাকে ভেতরে প্রবেশ না করানো হয়, তাহলে কারোর উপরেই গোসল ওয়াজিব হবে না। সুতরাং সাক্ষাতের চাইতে অধিক পরিমাণ স্থান অতিক্রম করা জরুরী। এরপরে তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে: "যদি পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ভেতরে প্রবেশ করে" ।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২০৪), আল মাজমূ' (২/১৪৯), আন নাইল (১/২২১) ।

যদি পুরুষাঙ্গের কিছু অংশ কাটা হয়

যদি পুরুষাঙ্গের কিছু অংশ কাটা হয়, তাহলে অবশিষ্ট অংশটুকু অগ্রভাগের পরিমাণের চাইতে কম হলে সকল ইমামগণের ঐক্যমতে উক্ত লজ্জাস্থানের সাথে কোনো বিধানের সম্পর্ক থাকবে না। আর যদি অবশিষ্ট অংশ অগ্রভাগের সমান হয়, তাহলে উক্ত লজ্জাস্থানের পুরো অংশ ভেতরে প্রবেশ করার সাথে যাবতীয় বিধান প্রযোজ্য হবে, আংশিক প্রবেশ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। আর যদি উক্ত অংশটি অগ্রভাগের চাইতে পরিমাণে বেশি হয়, তাহলে দুইটি মত আছে: প্রথম মত: অবশিষ্ট সম্পূর্ণ অংশ ভেতরে প্রবেশ করলে তবেই গোসল ওয়াজিব হবে, এটা শাফেয়ী মাযহাবের একটি মত।

দ্বিতীয় মত: গোসল ওয়াজিব হওয়ার বিধান পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত। এটা হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। এটা নববীর নিকট গ্রহণযোগ্য মত। এই মতের দলীল হলো: পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের উপরে কিয়াসের ভিত্তিতে গোসলের বিধান নির্ধারিত হয়। বিধায় যখন সেটাকে কেটে ফেলা হবে, তখন সেটার পরিমাণকেই ভিত্তি নির্ধারণ করতে হবে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২০৫), আল মাজমূ' (২/১৫১), আহকামুল গুসল (৯১) ।

যদি পুরুষাঙ্গে কোনো কাপড়ের টুকরা পেঁচানো হয় অথবা সেটাকে কোনো থলেতে ঢুকিয়ে যদি নারীর লজ্জাস্থানে প্রবেশ করানো হয় তাহলে কি তার উপরে গোসল করা ওয়াজিব?

প্রথম মত: তার উপরে গোসল করা ওয়াজিব, এটা কোনো কোনো মালেকী মাযহাবের আলেমের মত। শাফেয়ী মাযহাবের সবচেয়ে শক্তিশালী মত। হাম্বলী মাযহাবের একটি মত। তাদের দলীল হলো: এই বিষয়ের বিধানসমূহ লজ্জাস্থানে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানোর সাথে সম্পর্কিত। আর এটা সংঘটিত হয়েছে। একইভাবে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "এরপরে যদি সে (পুরুষাঙ্গ প্রবেশের জন্য) নারীর উপরে শক্তি প্রয়োগ করে"। এখানে শক্তি প্রয়োগ সংঘটিত হয়েছে, যদিও সে ব্যবধানের উপস্থিতিতে হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: যদি ব্যবধানটি পাতলা হয়, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে। আর যদি সেটা পুরু হয়, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না। এটা শাফেয়ী মাযহাবের একটি মত। মালেকী মাযহাবের খাত্তাবী বলেছেন: এই মতটা আমাদের মাযহাবের নীতির সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। ইবনু উসাইমীন বলেছেন: এটাই সঠিকতার অধিক নিকটতম। তবে সবচেয়ে নিরাপদ ও সর্বোত্তম কাজ হলো: গোসল করে নেওয়া। আমি বলব: মালেকীরা পাতলা ব্যবধানের সংজ্ঞায় বলেছেন: পাতলা ব্যবধান হলো এমন, যার সাথে কামভাব সৃষ্টি হয়। আর কোনো কোনো শাফেয়ী আলেম এটার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন: যা নারীর যোনির পানি

পুরুষাঙ্গের পর্যন্ত পৌঁছাতে বাঁধা দেয় না এবং নারীর উষ্ণতা পুরুষাঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছাতে বাঁধা দেয়।

তৃতীয় মত: তার জন্য কোনো অবস্থাতেই গোসল করা ওয়াজিব নয়। এটা শাফেয়ী মাযহাবের একটি মত। হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। তারা বলেছেন: যেহেতু সে পুরুষাঙ্গকে একটি কাপড়ের টুকরায় ঢুকিয়েছেন, ফলে সেটা নারীর লজ্জাস্থানের ত্বককে স্পর্শ করেনি।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মত। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। রুয়ানী বলেছেন: এমন মিলনের দ্বারা হাজ্জ ফাসেদ হওয়ার ক্ষেত্রেও একই মতানৈক্য একই নীতির আলোকে বিদ্যমান। এই মতানৈক্যটা সকল বিধানের মধ্যেই চলমান থাকাটা যৌক্তিক।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (২/১৫২), আল ইনছাফ (১/১৭১), আশ শারহুল মুমতি' (১/৩৩৯), আহকামুল গোসল (৯৯) ।

যদি পুরুষাঙ্গ নারীর নিতম্বে অথবা চতুষ্পদ জন্তু অথবা মৃত ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করানো হয়

প্রথম মত: সঙ্গমকারী ও সঙ্গমকৃত উভয়ের জন্যই গোসল করা ওয়াজিব। যদি তারা গোসলের উপযুক্ত হয়। চাই লজ্জাস্থান সামনে হোক অথবা পেছনে, সকল মানুষের ক্ষেত্রে একই বিধান। অথবা চতুষ্পদ জন্তু জীবিত হোক অথবা মৃত, স্বেচ্ছায় সঙ্গম করা হোক অথবা জোরপূর্বক করা হোক। ঘুমন্ত অবস্থায় করা হোক অথবা জাগ্রত অবস্থায়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: এখানে লজ্জাস্থানের ছিদ্রে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানো হয়েছে। তাই এর দ্বারা গোসল ওয়াজিব হবে। যেমন: জীবিত নারীর সঙ্গে সহবাস করলে ওয়াজিব হতো। আর মৃত নারীর সাথে সঙ্গমের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোর সাধারণ মর্মের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় মত: মৃত ব্যক্তি, চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সঙ্গম করার দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয় না। এটা আবু হানীফার মত। তার দলীল হলো: কারণ, এর দ্বারা কামভাব চরিতার্থ হয় না। ফলে এটা যেনো শুধুমাত্র আঙ্গুল প্রবেশ করানোর ন্যায় হলো। এই মতের বিপক্ষে দুইটি পদ্ধতিতে উত্তর দেওয়া হবে:

এক: এই মতটি অকার্যকর হয়ে যায় 'অত্যন্ত ঘৃণিত কুৎসিত, অন্ধ, দেহের বিভিন্ন স্থানের চামড়া খসে পড়া কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, শ্বেতীরোগী বৃদ্ধা নারীর সঙ্গে সঙ্গম করার' যুক্তি দ্বারা। কারণ, এই ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে গোসল করা ওয়াজিব। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এমন ক্ষেত্রে কামভাব চরিতার্থ উদ্দেশ্য হয় না।

দুই: আঙ্গুলসমূহ সঙ্গমের মাধ্যম নয়। এই জন্যই যদি কোনো জীবন্ত নারীর লজ্জাস্থানে এগুলো প্রবেশ করানো হয়, তাহলে গোসল ওয়াজিব হয় না। কিন্তু পুরুষাঙ্গের বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২০৫), আল মাজমূ' (১/১৫১-১৫৬) ।

সঙ্গমকারী অথবা সঙ্গমকৃত ব্যক্তি নাবালেগ হলে কি তার উপরে গোসল করা ওয়াজিব?

প্রথম মত: গোসল করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এটা হানাফী ও মালেকী মাযহাবের মত। হাম্বলী মাযহাবের একটি মত এবং আবু ছাওরের মত। তাদের দলীল হলো: নাবালেগ শিশু মুকাল্লাফ নয়। এমনকি তার উপরে সালাতও ওয়াজিব নয়, যার কারণে পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিব হবে। আর গোসল ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো বীর্যপাত হওয়া। কিন্তু সে এখন বালেগ পুরুষদের দলভুক্ত হয়নি। আর দুই লজ্জাস্থানের মিলনকে বীর্যপাতের স্থলাভিওষিক্ত ধার্য করা হয়েছে এই জন্যই যে, এটা বীর্যপাতের কারণ। আর যেহেতু বীর্যপাতের সামর্থের বয়স হওয়া পর্যন্ত তার উপরে জুনুবী শব্দের প্রয়োগ করা যায় না।

দ্বিতীয় মত: তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব। এটা শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মাযহাব। তবে হাম্বলীগণ এই মর্মে শর্ত যুক্ত করেছেন যে, সঙ্গমকারী ও তার সঙ্গীর বয়স সম পর্যায়ের হতে হবে। যদিও সে বালেগ না হয়। কেউ কেউ শর্ত করেছেন যে, পুরুষের বয়স কমপক্ষে দশ বছর, আর নারীর বয়স কমপক্ষে নয় বছর হতে হবে।

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন: 'আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় বছর বয়সে বিবাহ করেছেন'। তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমি এবং এই নারী (আয়িশা) এমন করি। এরপরে আমরা গোসল করে নেই"। সহীহ মুসলিম (৩৫০)। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন: "যদি লজ্জাস্থান একটি অপরটির ভেতরে প্রবেশ করে, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে"। সহীহ মুসলিম (৩৪৯) ।

এই মতের প্রবক্তাগণ বলেন: নাবালেগ শিশুর ক্ষেত্রে গোসল ওয়াজিব হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, সে গোসল পরিত্যাগ করলে গুনাহগার হবে। বরং এর অর্থ হলো: এটা সালাত, তাওয়াফ ও অন্যান্য ইবাদত সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। বরং বালেগ পুরুষ একমাত্র এমন স্থানেই গোসল বিলম্ব করার দ্বারা গুনাহগার হবে, যেখানে গোসল বিলম্ব করার দ্বারা কোনো ওয়াজিব ইবাদত পালনে বিলম্ব হয়।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মত। এই নীতির ভিত্তিতে অভিভাবকের দায়িত্ব হলো তাকে গোসলের আদেশ দেওয়া, যদি সে বুদ্ধিমান বালক হয়। যেমন: সাত বছর বয়সে তাকে ওযূ

ও সালাতের নির্দেশ দিবে। যেমনটি আব্দুল্লাহ বিন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "সাত বছর বয়সে তোমরা নিজ সন্তানদেরকে সালাত আদায়ের আদেশ দাও। দশ বছর বয়সে তাদেরকে সালাত পরিত্যাগের বিপরীতে প্রহার করো। তাদের বিছানা পৃথক করে দাও"। আবু দাউদ (৪৯৫)। এই হাদীসের পক্ষে আবু দাউদেই (৪৯৪) সাবরাহ বিন মা'বাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি শাহেদ হাদীস পাওয়া যায়। উভয়টির সনদের সামগ্রিক বিচারে হাদীসটি হাসানের মানে উন্নীত হয়েছে।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যদি বালক শিশু কোনো নারীর লজ্জাস্থানের ছিদ্রে অথবা পুরুষের নিতম্বে অথবা পুরুষ ব্যক্তি তার নিতম্বে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করায়, তাহলে উক্ত নারী ও পুরুষের জন্য গোসল করা ওয়াজিব। একইভাবে যদি কোনো নারী নাবালেগ শিশুর পুরুষাঙ্গ নিজের লজ্জাস্থানে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করায়, তাহলে তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব। এই সকল অবস্থায় উক্ত নাবালেগ সন্তান জুনুবী বলে বিবেচিত হবে। একইভাবে কোনো কন্যা শিশুর লজ্জাস্থানে যদি কোনো বালেগ পুরুষ, অথবা নাবালেগ পুরুষ পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করায়, অথবা নাবালেগ পুরুষ যদি অপর নাবালেগ পুরুষের নিতম্বে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করায়, তাহলেও একই বিধান। অর্থাৎ সকলের জন্যই গোসল করা ওয়াজিব। এই ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ও অবুঝ নাবালেগ সন্তানের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। যখন সে জুনুবী হবে, তখন তার সালাত সহীহ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে গোসল না করবে। যেমন, কোনো ব্যক্তি পেশাব করার পরে ওযূ না করা পর্যন্ত তার সালাত সহীহ হবে না। তার ব্যাপারে এটাও বলা যাবে না: তার উপরে গোসল ওয়াজিব। যেমন এটাও বলা যাবে না: তার উপরে ওযূ করা ওয়াজিব। বরং তাকে বলা হবে: সে মুহদিস (বিধানগত নাপাক ধারণকারী) হয়েছে। অভিভাবকের উপরে তাকে গোসল করার আদেশ দেওয়া ওয়াজিব, যদি সে বুদ্ধিমান হয়। যদি সে এমতাবস্থায় গোসল না করে, তাহলে বালেগ হওয়ার পরে তার জন্য গোসল করা জরুরী। যেমন পেশাব করার অনেক পরে কেউ যদি বালেগ হয়, তাহলে তার জন্য ওযূ করা আবশ্যক। আর যদি বুদ্ধিমান নাবালেগ পুত্র গোসল করে, তাহলে তার গোসল সহীহ হবে। এরপরে সে বালেগ হলে উক্ত কারণে তাকে পুনরায় গোসল করতে হবে না। যেমন পেশাবকারী বালেগ হওয়ার পূর্বে ওযূ করলে, সে বালেগ হওয়ার পরে উক্ত ওযূ দ্বারা সালাত আদায় করতে পারবে। যদি সেটা অবশিষ্ট থাকে।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২০৬), আল মাজমূ' (২/১৫০), আহকামুল গুসল (৭৯) ।

যদি আঙ্গুল বা এই জাতীয় বস্তু লজ্জাস্থানে ঢুকানো হয় তাহলে কি গোসল ওয়াজিব হবে?

প্রথম মত: গোসল ওয়াজিব হবে না। এটা সকল ইমামগণের মত। তাদের দলীল হলো: আঙ্গুলসমূহ সঙ্গমের মাধ্যম নয়। বিধায় এই ক্ষেত্রে কোনো গোসল ওয়াজিব হবে না। চাই সেটাকে লজ্জাস্থানের সামনে থেকে ঢুকানো হোক বা পেছন থেকে ঢুকানো হোক। চাই কামভাব বিদ্যমান থাকুক অথবা না থাকুক।

দ্বিতীয় মত: তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব। এটা হানাফী মাযহাবের মত।

সঠিক মত হলো: প্রথম মতটি।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (২/১৫৬), আহকামুল গুসল (৯৭) ।

যদি সহবাসের গোসল শেষ হওয়ার পর পুনরায় বীর্য নির্গত হয়?

প্রথম মত: তার জন্য কোনো অবস্থাতেই গোসল করা ওয়াজিব নয়। এটা আলী বিন আবী তালেব, ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম, যুহরী, মালেক, ছাওরী, আবু ইউসুফ এবং ইসহাক বিন রাহওয়াইহের মত। আর এটি আহমাদের অন্যতম প্রসিদ্ধ মত।

দ্বিতীয় মত: যদি কারোর বীর্যপাত হওয়ার পরে সে গোসল করে, এরপরে গোসলের কিছুক্ষণ পরে আবার বীর্য নির্গত হয়, তাহলে তার জন্য দ্বিতীয় বার গোসল করা ওয়াজিব। চাই এটা প্রথম বার বীর্য নির্গত হওয়ার পরে পেশাব করার আগে হোক অথবা পেশাবের পরে প্রথম বার বীর্য নির্গত হওয়ার পরে হোক। এটা শাফেয়ী, তার অনুসারীগণ ও লাইছের মত এবং আহমাদের একটি বর্ণনা।

তৃতীয় মত: যদি বীর্য পেশাবের পরে নির্গত হয়, তাহলে তার উপরে গোসল ওয়াজিব হবে না। আর যদি পেশাবের পূর্বে নির্গত হয়, তাহলে গোসল করবে। এটা আওযাঈ, আবু হানীফার মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। যা হাসান থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তারা বলেছেন: যেহেতু এটা (পেশাবের পূর্বে নির্গত বীর্য) কামভাব সহকারে ও স্বজোরে নির্গত বীর্যের অবশিষ্ট অংশ, বিধায় এটা প্রথম অংশের ন্যায় গোসল ওয়াজিব করবে। আর পেশাবের পরে যেই অংশ নির্গত হয়েছে, সেটা গতিহীন ও কামভাব বিহীন নির্গত হয়েছে। আমরা এটা নিশ্চিতভাবে জানি না যে, এটা প্রথমবার নির্গত বীর্যের অংশ কি না। যদি প্রথমবারের অংশই হতো, তাহলে পেশাবের পরে নির্গত হতো না।

প্রাধান্যযোগ্য মত: যখন পুরুষ বীর্যপাত করবে এবং গোসল করবে, এরপর যদি পুনরায় বীর্য নির্গত হয়, তাহলে তার জন্য গোসল ওয়াজিব হবে না। একইভাবে নারীর বিধানও তাই। চাই নির্গত বীর্য তার বীর্য হোক অথবা তার স্বামীর বীর্য হোক।

দ্রষ্টব্য: আল ইশরাফ (১/৩০৪), আল মুগনী (১/২০১), আল মাজমূ' (২/১৫৮) ।

৩৫. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَال جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَرُ مِنْكَ شَعْرًا، وَخَيرٌ مِنْكَ– يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثُمَّ أمَّنَا فِي ثوْبٍ. وَفِي لَفْظٍ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا».

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ «مَا يَكْفِينِي»: هُوَ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ أَبُوهُ: مُحَمَّدُ ابْنُ الحَنَفِيَّةِ.

৩৫. আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাঈন ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি এবং তার পিতা জাবির ইবনে আব্দিল্লাহর নিকট ছিলেন। এমতাবস্থায় তার নিকট একদল লোক ছিল। তারা জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন: এক সা পানিই তোমার জন্য যথেষ্ট। এরপর এক লোক বলল, আমার জন্য এক সা যথেষ্ট হবে না। জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তোমার চেয়েও যার চুল বেশি ছিল ও তোমার চেয়েও যিনি শ্রেষ্ঠ (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জন্য এতটুকু পানিই যথেষ্ট ছিল। এরপর একটি কাপড়ে তিনি আমাদের ইমামতি করলেন। [সহীহ বুখারী হা/২৫২ ও মুসলিম হা/৩২৯], অন্য একটি শব্দে বর্ণিত রয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মাথায় তিনবার পানি ঢেলে দিতেন। [সহীহ বুখারী হা/২৫৫ ও মুসলিম হা/৩২৮]

মুসান্নিফ রহি: বলেন: যে লোকটি বলেছিল এতটুকু পরিমাণ পানি আমার যথেষ্ট হবে না। সে ছিল হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু), তার পিতা হলেন মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়্যাহ।

ওযূ ও গোসলে যথেষ্ট হয় এই পরিমাণ পানি কি নির্দিষ্ট?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ওযূ ও গোসলের জন্য যথেষ্ট হয় এতটুকু পরিমাণ পানি অনির্দিষ্ট। বরং এই ক্ষেত্রে অল্প ও বেশি পানি যথেষ্ট হবে, যদি গোসলের শর্ত পাওয়া যায়। শর্ত হলো: সকল অঙ্গের উপরে পানি প্রবাহিত করা।

শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: কখনো অল্প পানি সঠিক নিয়মে ব্যবহারের ফলে যথেষ্ট হয়। আবার কখনো অনেক পানি অনিয়মে ব্যবহারের ফলে যথেষ্ট হয় না। আলেমগণ বলেছেন: মুস্তাহাব হলো: গোসলের ক্ষেত্রে পানি যেনো এক সা' এর কম না হয়। আর ওযূতে এক মুদ্দ এর কম যেন না হয়।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (৩১৯), আল মাজমূ' (২/২১৯), ইবনু রজব (১/২৪৯)।

ওযূ ও গোসলে পানি অপচয়ের বিধান

নববী রহিমাহুল্লাহ আল মাজমূ' গ্রন্থে (২/২২০) বলেছেন: আমাদের মাযহাবের আলেমগণ এবং অন্যান্য আলেমগণ ওযূ ও গোসলে অপচয়ের নিন্দা করেছেন। বুখারী তার সহীহ মুসনাদ গ্রন্থে বলেছেন: আলেমগণ পানির অপচয়ের নিন্দা করেছেন। প্রসিদ্ধ মতে, এটা মাকরূহে তানযিহি। বগবী ও মুতাওয়াল্লী বলেছেন: এটা হারাম। এর নিন্দায় যেই সকল হাদীস রয়েছে, তার মাঝে অন্যতম হলো আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেছেন:

আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন একদল আসবে, যারা পবিত্রতা অর্জন এবং দুআ নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে"। আবু দাউদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

আমি বলব: আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি আবু দাউদ (৯৬) বর্ণনা করেছেন। সনদ সহীহ। যেমনটি নববী বলেছেন।

٦. بَابُ التَّيَمُّمِ

অধ্যায়: ৬-তায়াম্মুম

তায়াম্মুমের সংজ্ঞা: تيمم– শব্দের আভিধানিক অর্থ: ইচ্ছা পোষণ করা, সিদ্ধান্ত করা। এই অর্থে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী বর্ণিত হয়েছে: "তাহলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো" (আন নিসা: ৪৩, আল মায়িদাহ: ৬)। অর্থাৎ তায়াম্মুম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো।

শারঈ পরিভাষায়: সালাত ও এই জাতীয় বিষয়; যেগুলো পবিত্র করার প্রয়োজন আছে বৈধ করার নিয়্যাতে চেহারা ও দুই হাত পর্যন্ত পবিত্র মাটি পৌঁছে দেওয়া এবং উভয় অঙ্গকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মাসাহ করা।

তায়াম্মুমের শারঈ মান: তায়াম্মুম শরীআতসম্মত হওয়ার পক্ষে কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা' এর দলীল আছে। কিতাবের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "যদি তোমরা জুনুবী (অপবিত্র) হও, তাহলে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করো। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও, বা সফরে থাক অথবা কেউ যদি মলত্যাগ করে আসে অথবা যদি স্ত্রীদের সাথে সহবাস করার পরে তোমরা পানি না নাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো এবং তা দ্বারা তোমাদের চেহারা ও দুই হাত মাসাহ করো" (আল মায়িদাহ: ৬) ।

সুন্নাহর দলীল হলো: যা লেখক ও অন্যান্য সংকলক এই পরিচ্ছদের হাদীসসমূহ উল্লেখ করা।

আর ইজমা' হচ্ছে: ইবনু আব্দিল রহিমাহুল্লাহ বার বলেছেন: আমার জানামতে, হিজায, 'ইরাক, ও সিরিয়াতে, পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রসমূহ এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় রাষ্ট্রসমূহের শহরের আলেমগণ 'তায়াম্মুম শরীআতসম্মত এই বিষয়ে ইজমা' করেছেন। তাদের ঐকমত্যে, পানি না থাকাবস্থায় প্রত্যেক অসুস্থ ব্যক্তি, মুসাফির ব্যক্তি ও জুনুবী ব্যক্তির জন্য পবিত্র মাটি হলো পবিত্রতা অর্জন করা, চাই তায়াম্মুমকারী জুনুবী হোক অথবা ওযূ অবস্থায় থাকুক। তারা এই বিষয়ে কোনো মতানৈক্য করে না।

একইভাবে এই বিষয়ে নববী ও ইবনু তাইমিয়্যাহ ইজমা' বর্ণনা করেছেন।

দ্রষ্টব্য: আত তামহীদ (১৯/২৯৩), আল ইসতিযকার (২/১৪৬), আল মাজমূ' (২/৩০০), আল ফাতাওয়া (২১/৩৫০), ফিকহুত তাহারাহ (৫২৯)।

٣٦. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلَا مَاءَ؛ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ».

৩৬. ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা হতে পৃথক অবস্থায় দেখতে পেলেন। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে অমুক, জামাআতের সাথে সালাত আদায় করতে তোমাকে কোনো জিনিস বাঁধা প্রদান করল। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার জন্য গোসল ফরয হয়েছে অথচ পানি নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর, মাটিই তোমার জন্য যথেষ্ট। [সহীহ বুখারী হা/৩৪৮ ও মুসলিম হা/৬৮২]

صعيد (ছঈদ) কাকে বলে?

আল মিছবাহুল মুনির অভিধানে (২৭৯) বলা হয়েছে: صعيد হলো: ভূপৃষ্ঠ, চাই সেটা মাটির হোক বা অন্য কিছুর। যুজাজ বলেছেন: আমি এই বিষয়ে ভাষাবিদদের মাঝে কোনো মতানৈক্য আছে বলে মনে করি না। কেউ কেউ বলেছেন: صعيد শব্দটিকে আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়: এমন মাটির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে থাকে এবং ভূপৃষ্ঠের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। আর চলাচলের রাস্তার উপরেও প্রয়োগ করা

হয়। আযহারী বলেছেন: অধিকাংশ আলেমগণের মতে: “তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো” (আল মায়িদাহ: ৬)। আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীতে বিদ্যমান صعيد– শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: এমন পবিত্র মাটি, যা ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে থাকে অথবা জমিনের ভেতর থেকে নির্গত হয়।

আন নিহায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে: صعيد– হলো: মাটি। এমনটিই আবু উবায়দাহ, ইবনু কুতায়বাহ বলেছেন এবং ইবনু জাওযী তাদের গ্রন্থ গরিবুল হাদীসে বলেছেন। খলীল ‘কিতাবুল আইন’ এ বলেছেন: صعيد হলো: ভূপৃষ্ঠের উপরের অংশের মাটি। চাই সেটা কম হোক বা বেশি।

তায়াম্মুম কি শুধু মাটির সাথেই নির্দিষ্ট নাকি অন্যান্য বস্তু দ্বারাও সহীহ হয়?

প্রথমত: ইবনু মুনযির ও ইবনু আব্দিল বার এই বিষয়ে আলেমগণের ইজমা’ বর্ণনা করেছেন: মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। অন্যান্য বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয কি না সেই বিষয়ে তারা মতানৈক্য করেছেন।

প্রথম মত: একমাত্র এমন মাটি দ্বারাই তায়াম্মুম করা জায়েয হবে, যা ধুলাযুক্ত, হাতের সঙ্গে লেগে থাকে। এটা শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক, আবু ইউসুফ ও দাউদের মত। এই মতের দলীল হলো: আল্লাহ তা‘আলার বাণী: “তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো” (আল মায়িদাহ: ৬)। صعيد– এর ক্ষেত্রে কেউ বলেছেন: এটা মাটি। কেউ বলেছেন: ভূপৃষ্ঠের উপরের ভাগ। উক্ত বিষয়ে মতানৈক্য পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী: “তোমরা তোমাদের চেহারা এবং হাতসমূহ এর (তুরাব তথা মাটি) দ্বারা মাসাহ করো” (আল মায়িদাহ: ৬)।

ইবনু কাছীর বলেছেন: শাফেয়ী উক্ত আয়াত দ্বারা এই বিষয়ে দলীল দিয়েছেন যে, তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে এমন পবিত্র ধুলাযুক্ত মাটি থাকা আবশ্যক, যা চেহারা ও হাতের সাথে লেগে থাকে। আর হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যেখানে বলা হয়েছে: “আমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠের মাটিকে পবিত্রতার মাধ্যম ধার্য করা হয়েছে”। সহীহ মুসলিম (৫২২)।

দ্বিতীয় মত: তায়াম্মুম ভূপৃষ্ঠের উপরে বিদ্যমান মাটি জাতীয় সকল উপাদান এর দ্বারা জায়েয আছে। যেমন: চুন, চুনাপাথর অথবা বালি অথবা অন্যান্য উপাদান। এটা হানাফী ও মালেকী মাযহাবের মত। এটাকেই ইবনু উসাইমীন অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই মতের দলীল হলো: আল্লাহ তা‘আলার বাণী: “তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো” (আল মায়িদাহ: ৬)। এবং জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। যা (৪০) নং হাদীসের

অধীনে আসবে। সেখানে বলা হয়েছে: "আমার জন্য জমিনকে মাসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম ধার্য করা হয়েছে"।

দলীলের ব্যাখ্যা হলো: যেসকল স্থানে সালাত আদায় করা জায়েয, এমন সকল স্থানের উপাদান দ্বারা তায়াম্মুম করাও জায়েয।

তারা বলেছেন: আর যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণ বালুর ওপর দিয়ে অতিক্রম করেছেন, কিন্তু নিজের সাথে কোনো প্রকার ধুলা-মাটি বহন করে নিয়ে যাননি। অথচ 'তিনি তায়াম্মুম ব্যতীত সালাত আদায় করেছেন' মর্মে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য; আল আওসাত (২/২৭), আল ইসতিযকার (৩/১৫৯), আল মাজমূ' (২/২২৬), আল মুগনী (১/২৪৭), আশ শারহুল মুমতি' (১/৩৯২) ।

৩৭. عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ».

৩৭. আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোনো এক প্রয়োজনে সফরে পাঠিয়েছিলেন। এরপর আমি নাপাক হয়ে যাই। কিন্তু কোনো পানি পেলাম না। অতঃপর আমি মাটিতে গড়াগড়ি করলাম যেমন চতুস্পদ জীব জন্তু মাটিতে গড়াগড়ি করে। এরপর আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলাম এবং ঘটনাটি তার কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মাটির ওপর একবার মারলেন। অতঃপর বাম হাতকে ডান হাতের ওপর মাসাহ করলেন। এভাবে উভয় হাতের পিঠ কব্জি পর্যন্ত ও মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন। [সহীহ বুখারী হা/৩৪৭ ও মুসলিম হা/৩৬৮]

হাদীসটির ফায়দাসমূহ:

১) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে পুনরায় তায়াম্মুম করার আদেশ দেননি। এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, কোনো ব্যক্তি যদি না জেনে শরীআতবহির্ভূত পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করে, তবে তাকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা দেওয়া

হবে। না জানা কালে অনাদায়ী কর্মসমূহ কাযা করার আদেশ দেওয়া যাবে না। এই মাসআলার পক্ষে অনেকগুলো শারঈ দলীল বিদ্যমান। অন্যতম একটি হলো: এই হাদীসটি। আরেকটি হলো: ভুল নিয়মে সালাত আদায়কারী ব্যক্তির হাদীস।

শায়খুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যেই কর্ম ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকার কারণে পরিত্যাগ করা হয়, যেমন: কোনো ব্যক্তি প্রত্যেক রুকনের ধীরস্থিরতা পালন না করে সালাত আদায় করল, কিন্তু সে জানে না যে, এটা ওয়াজিব। এমন ক্ষেত্রে সহীহ মত হলো: তার জন্য উক্ত সালাত পুনরায় আদায় করা জরুরী না। কারণ, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ বুখারীতে সাব্যস্ত হয়েছে: তিনি ভুল নিয়মে সালাত আদায়কারী গ্রাম্য ব্যক্তিটিকে বললেন: "তুমি যাও, আবার সালাত আদায় করো, কারণ, তুমি সালাত আদায় করনি"। কিন্তু তিনি তাকে উক্ত সময়ের পূর্বে আদায়কৃত সালাত পুনরায় কাযা করার আদেশ দেননি। যদিও সে এই কথা বলেছে: "ঐ মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে ন্যায়সহ নাবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমি এর চাইতে অধিক ভালো করে আদায় করতে পারি না"। কিন্তু তিনি তাকে উক্ত সালাতটি পুনরায় আদায়ের আদেশ দিলেন, যেহেতু উক্ত সালাতের সময় তখনো বাকি ছিল। বিধায়, সে উক্ত সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করার ব্যাপারে আদিষ্ট। আর যেই সালাতের সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, সেটা পুনরায় আদায় করার ব্যাপারে তাকে আদেশ দেননি। অথচ পূর্বের সালাতেরও কিছু ওয়াজিব আদায় করেনি। কারণ, সে উক্ত বিষয়টি ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে জানত না। শেষ।

২) কথা ও কর্ম দ্বারা শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন এমন বিষয় দৃষ্টান্ত ও সুন্দর উপস্থাপনার দ্বারা শিক্ষা দিতে হয়। বর্তমানে এটাকে বিশ্লেষণের মাধ্যম বলা হয়।

৩) এই শরীআতের মহত্ত্ব ও উদারতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "তিনি দীনের বিষয়ে তোমাদের প্রতি কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি" (আল হাজ্জ: ৭৮)।

৪) ইজতিহাদের মাধ্যমে পালনকৃত আমলের ক্ষেত্রে আলেমগণের স্মরণাপন্ন হওয়া। কারণ, আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার ইজতিহাদকৃত বিষয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (৩৬৮), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (২১/৪২৯), আল ইলাম (২/১৩৪), আল ফাতহ (১/৪৫৬), আত তাওযীহ (১/৪১৬)।

বড় ও ছোট হাদাসের ক্ষেত্রে তায়াম্মুমের বিধান কী?

ছোট হাদাসের ক্ষেত্রে তায়াম্মুম জায়েয আছে। এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এই বিষয়ে কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা' এর দলীল বিদ্যমান। আর বড় হাদাসের ক্ষেত্রে, সাহাবী তাবেঈ ও তাদের পরবর্তীদের মধ্যে প্রায় সকল আলেমগণের মত হলো: বড় হাদাসের ক্ষেত্রেও তায়াম্মুম জায়েয আছে।

তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো", "আর যদি তোমরা জুনুবী হও, তাহলে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করো", এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "এরপরে যদি তোমরা পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো" (আল মায়িদাহ: ৬)। এখানে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জনের আদেশটি ছোট হাদাস বিশিষ্ট ব্যক্তি (বিধানগত নাপাক) ও জুনুবী উভয়ের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। আর আম্মার এবং পূর্বে বর্ণিত ইমরান বিন হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর হাদীস দুইটি, যা লেখক উল্লেখ করেছেন, উক্ত বিষয়টি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে। উমার ও ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলতেন: 'তায়াম্মুম একমাত্র ছোট হাদাসের জন্যই জায়েয হবে, কিন্তু জানাবাতের ক্ষেত্রে তায়াম্মুম জায়েয হবে না'। তারা উভয়ে বলতেন: 'জুনুবী ব্যক্তি পানি না পাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না। যদিও সে এক মাস যাবৎ পানি না পায়'। এই মত ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্রদের একদল থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আসওয়াদ, আবু আতীয়্যা ও নাখঈ। এটা ছাড়াও এই বিষয়ে উমার ও আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার আলোচনা, আব্দুল্লাহ বিন ইবনু মাসউদ ও আবু মুসা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার আলোচনাও দলীল, যা সহীহাইনে বিদ্যমান। তাদের পক্ষে দলীলের মর্ম হলো: উক্ত আয়াতটিতে শুধুমাত্র ছোট হাদাস বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্যই তায়াম্মুমকে বৈধ করা হয়েছে। কিন্তু এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, উমার ও আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা উক্ত মত থেকে ফিরে এসেছে। এবং অন্যান্য সাহাবীদের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। কারণ, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টিকে আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্তে সোপর্দ করে দিয়েছেন। আর তাকে বলেছেন: 'তোমার সিদ্ধান্তই আমার সিদ্ধান্ত'। একইভাবে ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, তিনি পরে উক্ত মত থেকে ফিরে এসেছেন।

সর্বক্ষেত্রে: প্রাধান্যযোগ্য মত হলো: অধিকাংশ আলেমের মত। আর তা হলো বড় হাদাসের ক্ষেত্রে তায়াম্মুম জায়েয। আর সেটা হলো জানাবাত, হায়েয ও নেফাস তথা গোসল ফরয হওয়ার সকল ক্ষেত্রে। পূর্ববর্তী দলীলসমূহের ভিত্তিতে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (২/২৪০), ইবনু রজব (২/২৮৩) ।

চেহারা ও দুই হাতের কবজির সম্পূর্ণ অংশ মাটি দ্বারা মাসাহ করা ওয়াজিব?

প্রথম মত: সম্পূর্ণ মুখের ত্বক এবং মুখের উপরে অবস্থিত দৃশ্যমান চুল মাটি দ্বারা মাসাহ করা ওয়াজিব, চাই উক্ত চুলের নিচে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব হোক, যেমন: পাতলা চুল, যেই চুলের নিচের ত্বক দৃশ্যমান থাকে। অথবা উক্ত চুলের নিচে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব না হোক। সর্বপ্রকার চুলের উপরেই মাসাহ করা ওয়াজিব। একইভাবে উভয় হাতের কবজিদ্বয় সম্পূর্ণরূপে মাসাহ করা ওয়াজিব। এটা অধিকাংশ আলেমের মত।

তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতসমূহ মাটি দ্বারা মাসাহ করো" (আল মায়িদাহ: ৬)। আর আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: "এরপরে তিনি বাম দ্বারা ডান হাত, উভয় হাতের কবজি এবং মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন"। হাদীস ও আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ অনুসারে হাত ও মুখের সকল স্থানই মাসাহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে এমনটিই মনে হয়। তবে এখানে বিদ্যমান باء— অক্ষরটি আংশিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ, এই আয়াতে বিদ্যমান باء— অক্ষরটি "তারা যেনো প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে" (আল হাজ্জ: ২৯) এই আয়াতে বিদ্যমান باء— অক্ষরটির অনুরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে। বায়তুল্লাহর আংশিক তাওয়াফ করা জায়েয নেই এটা ইজমা' দ্বারা সাব্যস্ত। এছাড়াও তারা পানি দ্বারা অর্জিত পবিত্রতার সাথে এটাকে কিয়াস করেছেন। সুতরাং দুই হাত ও মুখমণ্ডলের প্রতিটি স্থান যেভাবে ধৌত করা ওয়াজিব, একইভাবে তায়াম্মুমের পবিত্রতা ইর্জনের ক্ষেত্রেও। কারণ, বদলের (বিকল্প/স্থলাভিষিক্ত) জন্য মুবদালের (মূল কাজ) বিধান প্রযোজ্য করা যায়। এই যুক্তির উত্তর হলো: বদল (বিকল্প বিধান অর্থাৎ তায়াম্মুম) মুবদাল (আসল বিধান অর্থাৎ ওযূ) এর স্থলাভিষিক্ত হবে বিধানগত দিক থেকে, বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে নয়। অর্থাৎ দুই হাত ও মুখমণ্ডলের প্রতিটি স্থানে পানি পৌঁছানো এটা বৈশিষ্ট্য, বিধান নয়। আর কিয়াসের দ্বারা বিকল্প তার মূলের সাথে বিধানগত দিক থেকে স্থলাভিষিক্ত হয়, বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে নয়।

দ্বিতীয় মত: যে সকল চুলের নিচে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। শুধুমাত্র সে সকল চুলের নিচেই মাটি পৌঁছানো ওয়াজিব। এটা শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের একটি মত। হাম্বলীদের মতে: মুখের ভিতরে ও নাকে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়। যদিও তাদের মতে ওযূতে কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব।

তৃতীয় মত: প্রতিটি স্থানে মাটি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়। যদি তায়াম্মুমকারী প্রতিটি স্থানে মাটি পৌঁছানোর চেষ্টা করে, কিন্তু অনিচ্ছায় কিছু স্থান বা জায়গা বাদ পড়ে যায়, তাহলে তার তায়াম্মুম সহীহ হবে। এটা আবু হানীফার একটি বর্ণনা, আবু ইউসুফ, যুফার, ইসহাক, ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া নায়সাবুরী, সুলায়মান বিন দাউদ আল হাশেমী এবং মুহাম্মাদ বিন মাসলামার মত। এটা ইবনু হাযম ও আমাদের শায়েখ ইয়াহয়া তার গ্রন্থ 'আহকামুত তায়াম্মুম' এ গ্রহণ করেছেন।

ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া বলেছেন: তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে মাসাহ করতে হবে মাথা মাসাহের ন্যায়। তায়াম্মুমের কোনো স্থান ইচ্ছাকৃত বাদ দেওয়া যাবে না।

ইসহাক বলেছেন: তুমি দুই হাতের তালু দ্বারা মাটিতে আঘাত করবে, এরপরে উভয় হাত দ্বারা তোমার মুখমণ্ডল মাসাহ করবে এবং তোমার দুই হাত দ্বারা সমস্ত মুখমণ্ডল ও দাঁড়ির উপরে মাসাহ করবে। এর দ্বারা যতটুকু স্থানে মাসাহ হবে, ততটুকুই যথেষ্ট। আর যা বাদ পড়বে, বাদ থাকবে। মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ বলেছেন: পানি দ্বারা মুখমণ্ডলকে যেভাবে

দ্বিতীয়বার ধৌত করতে হয়, সেভাবে মাটি দ্বারা পুনরায় মাসাহ করা ওয়াজিব নয়। তাদের দলীল হলো: তায়াম্মুমকারী তার মুখমণ্ডলকে একবার উভয় হাত দ্বারা মাসাহ করে। কিন্তু তার দুই হাত মুখমণ্ডলের প্রতিটি স্থানে মাটি পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট হয় না। যতবারই করুক না কেনো, শুধু দুই হাত দ্বারা কখনোই একত্রে মুখের সকল স্থানে মাটি পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাছাড়াও: মাসাহ এর পবিত্রতা শিথিলতার উপরে ভিত্তিশীল। পক্ষান্তরে, পানি দ্বারা ধৌত করার পবিত্রতা এর বিপরীত। সেখানে কোনো শিথিলতা নেই। বিধায়, মাসাহ এর পবিত্রতার ক্ষেত্রে সকল স্থানে মাটি পৌঁছানো ওয়াজিব সাব্যস্ত করার মধ্যে কষ্ট ও অসাধ্যতা বিদ্যমান।

প্রাধান্যযোগ্য মত: তৃতীয় মত: আর দুই হাতের কবজি ও মুখমণ্ডলের প্রতিটি স্থানে মাটি পৌঁছানো ওয়াজিব নয়। আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের ভিত্তিতে, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখমণ্ডল ও হাতের কবজিদ্বয় একবার করে মাসাহ করেছেন। আর এটা জানা বিষয় যে, একবার মাসাহ করার দ্বারা উভয় অঙ্গের প্রতিটি স্থানে কখনোই মাটি পৌঁছানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে, মুখমণ্ডল, যেখানে সকল চুল বিদ্যমান। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আভিধানিক অর্থে মাসাহ কোনো অঙ্গের সকল স্থানকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি রাখে না। বিধায় এমন শব্দের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের প্রতিটি স্থানজুড়ে মাসাহ করতে হবে, এই মর্মে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা' এবং কোনো সাহাবীর মত পাওয়া যায় না। এই মাসআলায় তার আরো বিশ্লেষণ ও দীর্ঘ সমালোচনা রয়েছে, তুমি চাইলে সেটা অধ্যায়ন করতে পার।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (১/৩৭৬), আল মুগনী (১/২৪৬), আল মাজমূ' (২/২৪৩, ২৭৪), ইবনু রজব (২/২৪৫), আহকামুত তায়াম্মুম লিদ দিবয়ান (৩২১) ।

দুই হাতের তালু দ্বারা জমিনে আঘাত করার পরে দুই হাত ঝেড়ে ফেলা বা ফুঁ দেওয়ার বিধান

সহীহ বুখারীতে (৩৩৮), সহীহ মুসলিমে (৩৬৮) আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় হাতের তালু দ্বারা মাটিতে আঘাত করলেন, এরপরে উভয় হাতে ফুঁ দিলেন। আর বুখারীতে (২৪৭), এবং মুসলিমে (৩৬৮) হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। মুসলিমের শব্দ হলো: এরপরে তিনি দুই হাত ঝাড়া দিলেন। আর বুখারীর শব্দ হলো: তিনি হাতটি ঝেড়ে ফেললেন।

মাসআলার বিধান হলো:

প্রথম মত: মুস্তাহাব। এটা আবু হানীফা, মালেক ও ছাওরীর মত। তাদের মতে এর উদ্দেশ্য হলো: হাতে লেগে থাকা ধুলা-মাটি দূর করা। কারণ, মাটি দ্বারা তায়াম্মুমকারীর জন্য তার হাতে উক্ত মাটির ধুলা লেগে থাকা শর্ত নয়।

দ্বিতীয় মত: মুস্তাহাব। এটা শাফেয়ীগণ ও ইসহাকের মত। তাদের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: যদি মাটির পরিমাণ হালকা হয়, তাহলে সেটা কমিয়ে ফেলা। যাতে করে ফুঁ দেওয়া বা ঝেড়ে ফেলার পরে পরিমাণ মত মাটি হাতে লেগে থাকে। কারণ, তারা তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে হাতে মাটি লেগে থাকাকে শর্ত বলেছেন। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

তৃতীয় মত: আহমাদ বলেছেন: এটা করা বা না করাতে কোনো সমস্যা নেই। ইবনু মুনযির এই মতটিকে গ্রহণ করেছেন।

সঠিক মত: শাফেয়ীগণ ও ইসহাকের মতটি। শারবিনী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: দুই হাত বিদ্যমান ধুলা বা এর স্থলাভিষিক্ত উপাদান হ্রাস করা হবে ঝেড়ে ফেলার মাধ্যমে অথবা ফুঁ দিয়ে। যদি পরিমাণে বেশি হয়। এতটুকু পরিমাণ কমানো হবে, যাতে প্রয়োজন পরিমাণ ধুলা হাতে অবশিষ্ট থাকে। আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ও অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে এবং তার চেহারা যাতে কুৎসিত না হয়। আর তায়াম্মুমের অঙ্গসমূহ থেকে মাটি মুছে ফেলার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা হলো, এটা সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটা করবে না। যেমনটি তিনি 'আল উম্ম' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন।

দ্রষ্টব্য: আল ইশরাফ (১/২৭৭), আল ফাতহ লি ইবনি রজব (২/২৩৭), মুগনিল মুহতাজ (১/১৭০), আহকামুত তায়াম্মুম (৩৭১)। মিসকুল খিতাম ১/২২৩।

মুখমণ্ডল ও দুই হাতের মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার বিধান

প্রথম মত: মুখমণ্ডলকে দুই হাতের পূর্বে মাসাহ করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এটা হানাফী ও মালেকী মাযহাবের মত এবং হাম্বলী মাযহাবের একটি মত।

তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতসমূহ মাসাহ করো" (আল মায়িদাহ: ৬)। উক্ত আয়াতে হাতসমূহকে মুখমণ্ডলের সাথে واو— অক্ষর দ্বারা আতফ (সংযুক্ত) করা হয়েছে। কিন্তু واو— অক্ষরটি তারতীবের দাবি রাখে না। বরং এটা সাধারণ অংশীদারত্ব বুঝায়। তারা এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মুখমণ্ডল দ্বারা প্রারম্ভ করেছেন। সহীহ মুসলিমে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাজ্জের বিবরণ সম্বলিত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দীর্ঘ হাদীসে (১২১৮) বর্ণিত হয়েছে: "যখন তিনি সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন, এই আয়াত পাঠ করলেন: "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নিদর্শন" (আল বাকারাহ: ১৫৮), আল্লাহ যা দ্বারা শুরু করেছেন, আমিও তা দ্বারাই শুরু করব"। সুতরাং তিনি সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন। তারা আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করেছেন। সেই হাদীসে মুখমণ্ডলের পূর্বে দুই হাত থেকে শুরু করার বিবরণ রয়েছে।

দ্বিতীয় মত: আগে মুখমণ্ডল, পরে দুই হাত এই পদ্ধতিতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। এটা শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মাযহাব। তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তোমরা মুখমণ্ডল ও দুই হাত মাটি দ্বারা মাসাহ করো" (আল মায়িদাহ: ৬) ।

এই জন্য তিনি মুখমণ্ডল দ্বারা শুরু করেছেন। একইভাবে আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন, উক্ত হাদীসের অধিকাংশ বর্ণনায়, দুই হাতের পূর্বে মুখমণ্ডল মাসাহ করার বিবরণ আগে এসেছে। যেমন: সহীহ বুখারী (৩৩৮), (৩৩৯), একইভাবে সহীহ মুসলিম (৩৬৮)। তারা প্রথম মতের সাথে বর্ণিত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করেছেন। হাদীসটির শব্দ হলো: "তোমরা সেটা দ্বারা শুরু করো, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা শুরু করেছেন"। আদেশসূচক শব্দে নাসাঈ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সংরক্ষিত বর্ণনা হলো: যেটা মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে খবর তথা সংবাদসূচক শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (২/২৬৮), তাফসিরুল কুরতুবী (৫/২০৮), আহকামুত তায়াম্মুম (৩৪৯)।

হাত কীভাবে মাসাহ করবে এবং এর সীমা কতটুকু?

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ (২/২৭৪) বলেছেন: দুই হাতের ব্যাপারে অধিকাংশ আলেমগণের মত হলো: উভয় হাতের কবজির তালু ও পিঠ থেকে কবজি পর্যন্ত মাটি দ্বারা মাসাহ করা।

তিনি রহিমাহুল্লাহ (২/২৫৬) বলেছেন: কবজি হলো: হাতের মুষ্ঠির সন্ধিস্থল। কবজির দুইটি প্রান্ত রয়েছে। দুইটি দৃশ্যমান হাড় রয়েছে। বৃদ্ধাঙ্গুলের সাথে অবস্থিত হাড়কে – كوع বলে।

আর কনিষ্ঠাঙ্গুলের সাথে অবস্থিত হাড়কে كرسوع– বলে।

আমি বলব: সারকথা হলো: দুই হাত এর কবজি পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে।

তায়াম্মুমের পূর্বে কি পানি সন্ধান করতে হবে?

প্রথম মত: পানি না পাওয়া গেলে পানি সন্ধান করা ওয়াজিব। চাই, পানির আশা করা হোক অথবা পানির উপস্থিতির ব্যাপারে সংশয় থাক। এটা দাউদ, মালেক ও শাফেয়ীগণের মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। তাদের দলীল হলো: "যদি তোমরা পানি না পাও" (আন নিসা: ৪৩)। তারা বলেছেন: তায়াম্মুমকারীর উপরে এই কথা সত্যায়িত হবে না যে, 'সে পানি পায়নি', যদি সে পানি সন্ধান না করে। তারা আরো বলেছেন: তায়াম্মুম হলো পানির পবিত্রতার বিকল্প। আর বিকল্প কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত সহীহ হয় না, যতক্ষণ আসল কাজে

অপারগতা না আসে। আর এই অপারগতা সাব্যস্ত হবে না, যদি পানি অনুসন্ধান না করা হয়।

দ্বিতীয় মত: যদি পানি নিকটে থাকার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে পানি সন্ধান করা আবশ্যক। অন্যথায় সন্ধান করার প্রয়োজন নেই। এটা আবু হানীফার মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "যদি তোমরা পানি না পাও" (আন নিসা: ৪৩)। তারা বলেছেন: যার সাথে পানি নেই, সে পানির সন্ধান প্রাপ্ত নয়। অর্থাৎ সে পানি ব্যবহারে অক্ষম। কারণ, পানির উপস্থিতি কখনো তা সন্ধানের দাবি জানায় না। বরং পানির অনুপস্থিতিই পানি সন্ধানের দাবি রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "যে (মুমিন দাস আযাদ করার) সামর্থ্য রাখে না, তাকে ধারাবাহিক দুই মাস সিয়াম রাখতে হবে" (আন নিসা: ৯২)। এর অর্থ হলো: তার মালিকানায় কোনো দাস নেই এবং এমন দাসের মূল্যও পরিশোধের সামর্থ্য তার নেই। আল্লাহ তা'আলা তার উপরে এমন দাস বা দাসীর মূল্য সন্ধান করা তার উপরে ওয়াজিব করা হয়নি।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। কিন্তু যদি উক্ত স্থানেই পানির উপস্থিতির সম্ভাবনা না থাকে, যেখানে সে বর্তমানে আছে, তাহলে অনুসন্ধানের কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/২৩৬), আল মাজমূ' (২/২৮৮), আহকামুত তায়াম্মুম (২২৯) ।

পানি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নিয়ম কী?

শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আর সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত পানি অনুসন্ধানের পক্ষে কিতাব, সুন্নাহ, সহীহ কিয়াস ও ইজমা' এর কোনো দলীল পাওয়া যায়নি। যদি তুমি বলো: তাহলে পানি না পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নিয়ম কী? আমি বলব: যখন মুসল্লী সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াবে, তার নিকটে যদি পানি না থাকে, এমনকি তার আশে পাশেও যদি পানি না থাকে, যেখান থেকে পানি হস্তগত করে যথাসময়ে সালাত আদায় করা যায়, তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয আছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা সালাতের প্রস্তুতির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন: "যখন তোমরা সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে" (আল মায়িদাহ: ৬)। এরপরে তিনি পানি না থাকার ক্ষেত্রে তায়াম্মুমের সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং গ্রহণযোগ্য নিয়ম হলো: সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণের সময় পানি না থাকা এবং নিকটতম কোনো স্থানে পানি থাকার ব্যাপারে মুসল্লীর জ্ঞান না থাকা।

নৈকট্যের সীমা হলো: পানি পর্যন্ত পৌঁছানো, উক্ত পানি দ্বারা পবিত্র অর্জন করা এবং যথাসময়ে সালাত আদায় করা তার জন্য সম্ভব হওয়া। যার অবস্থা এমন হবে, সে পানির সন্ধানপ্রাপ্ত হয়েছে। আর যার অবস্থা এমন নয়, সে পানির সন্ধানপ্রাপ্ত নয় বলে বিবেচিত।

শায়েখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তার নিকটতম স্থানে পানি অনুসন্ধান করা তার জন্য ওয়াজিব। সে এতটুকু সন্ধান করবে যে, তার নিকটে কোথাও কি পানি আছে বা তার পাশে কূপ বা পুকুর আছে? নৈকট্যের কোনো নির্দিষ্ট সীমা হয় না। বিধায় এটা সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। আর সামাজিক অবস্থা কালের পরিবর্তনে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমাদের যুগে যেহেতু মোটর গাড়ি পাওয়া যায়, তাই দূরতম স্থান নিকটতম হয়ে গিয়েছে। আর অতীতে উটের প্রচলন ছিল, ফলে নিকটতম স্থানও দূরবর্তী হয়ে যেত। সুতরাং নিকটতম স্থানে অনুসন্ধান করবে, এতটুকু নিকটে, যেখানে যেয়ে অনুসন্ধান করাতে তার কোনো কষ্ট হবে না। এবং সংশ্লিষ্ট ওয়াক্তের সালাতও যেনো ছুটে যাবে না।

দ্রষ্টব্য: আস সায়লুল জাররার (১/৩১৬), আশ শারহুল মুমতি' (১/৩৮৬) ।

যদি পানি পাওয়ার পরে সন্ধানকারীর মাঝে এবং পানির মাঝে কোনো বাঁধা সৃষ্টি হয়

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ আল মুগনী গ্রন্থে (১/২৩৯) বলেছেন: যেই ব্যক্তির মাঝে এবং পানির মাঝে হিংস্র জন্তু অথবা শত্রু অথবা আগুন অথবা দস্যু এই জাতীয় প্রতিবন্ধকতা থাকে, সে পানির সন্ধানপ্রাপ্ত ব্যক্তি নয়। একইভাবে নারী পানি যদি বখাটে লোকদের আড্ডাস্থলে থাকে, যাদেরকে নারী নিজের ব্যাপারে ভয় করে, তাহলে সেও পানির সন্ধানপ্রাপ্ত ব্যক্তি নয়। কেউ যদি তার আসবাবপত্রের কাছে অবস্থান করে, আর তার মনে আশঙ্কা হয়, যদি সে পানি আনতে যায়, তাহলে তার কিছু আসবাব হারিয়ে যেতে পারে অথবা তার বাহন পালিয়ে যেতে পারে বা চুরি হয়ে যেতে পারে অথবা পরিবারকে দস্যু আক্রমণ করতে পারে অথবা হিংস্র জন্তু অথবা (কোনো কারণে) খুব ভয় পায়, তাহলে সেও পানির সন্ধানপ্রাপ্ত ব্যক্তি নয়। তবে কেউ যদি ভয়ের উপযুক্ত কারণ ব্যতীত শুধুমাত্র কাপুরুষতার কারণে ভয় পায়, তাহলে তার সালাত তায়াম্মুম দ্বারা জায়েয হবে না।

যদি পানি বাজার দরে কিনতে পাওয়া যায়

যদি পানি বাজার দরে পণ্য হিসেবে বিক্রয় হয় এবং বিক্রেতাকে পাওয়া যায়, একই সাথে সে উক্ত মূল্য পরিশোধে সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য উক্ত পানি ক্রয় করা আবশ্যক। যেভাবে কাফফারার ক্ষেত্রে একটি দাস ক্রয় করা তার জন্য আবশ্যক। এটা চার ইমামের মাযহাব।

ইমাম নববী বলেছেন: যদি পানি ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় হতে দেখতে পায়, একই সাথে সে উক্ত মূল্য পরিশোধে সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য উক্ত পানি ক্রয় করা আবশ্যক। এতে কোনো মতানৈক্য নেই। আমি বলব: এই বিষয়ে ইবনু হাযমের একটি আশ্চর্য মত রয়েছে: তিনি বলেছেন: যার সাথে পানি নেই, তার জন্য ওযূ করার লক্ষ্যে পানি ক্রয় আবশ্যক নয়। এবং গোসলের জন্যও নয়। অল্প মূল্য দ্বারাও নয়, বেশি মূল্য দ্বারাও নয়। যদি সে তা ক্রয় করে,

তাহলে উক্ত পানি দ্বারা তার ওযূ, গোসল কোনোটাই জায়েয হবে না। তার জন্য একমাত্র ফরয হলো তায়াম্মুম করা।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (২৪১), আল মুগনী (১/২৪০), আল মাজমূ' (২/২৯২), আহকামুত তায়াম্মুম (১৩৭) ।

যদি পানি ন্যায্য মূল্যের চাইতে অধিক দরের বিক্রি হতে দেখা যায়

প্রথম মত: তার জন্য ক্রয় করা আবশ্যক। যদিও তার কাছে বিদ্যমান সকল সম্পদের বিনিময়েও ক্রয় করতে হয়। হাসান বাসরী এই মতটি পোষণ করেছেন।

দ্বিতীয় মত: যদি অতিরিক্ত মূল্য সামান্য হয়, তাহলে তার জন্য উক্ত পানি ক্রয় করা ওয়াজিব। আর যদি মাত্রাতিরিক্ত হয়, তাহলে তার তায়াম্মুম করার অনুমতি আছে। এটা হানাফী ও হাম্বলীদের মাযহাব।

তৃতীয় মত: যদি ন্যায্য মূল্যের চাইতে বেশি দাম হয়, তাহলে তার জন্য তা ক্রয় করা আবশ্যক নয়। যদিও সেটা সামান্য পরিমাণ বেশি হয়। এটা শাফেয়ী মাযহাব। হাম্বলী মাযহাবের একটি মত। কিন্তু সর্বোত্তম হলো: সেটা ক্রয় করা।

সঠিক মত হলো: শায়খ উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ এর মত। তিনি বলেছেন: সঠিক মত হলো: যদি তার নিকটে পানির মূল্য থাকে, সে উক্ত মূল্য পরিশোধে সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য সেটা ক্রয় করা আবশ্যক। যেই মূল্যের বিনিময়েই হোক না কেনো। এই মতের পক্ষে দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তোমরা যদি পানি না পাও" (আন নিসা ৪:৪৩) । এখানে আল্লাহ তা'আলা পানি না পাওয়াকে তায়াম্মুমের শর্ত ধার্য করেছেন। আর এখানে তো পানি বিদ্যমান এবং তার সামর্থ্য থাকার কারণে উক্ত পানি ক্রয় করতে তার কোনো ক্ষতি নেই।

দ্রষ্টব্য: প্রাগুক্ত, আশ শারহুল মুমতি' (১/৩৭৮), আহকামুত তায়াম্মুম (১৪১) ।

যদি কোনো ব্যক্তির নিকট পানি থাকে কিন্তু সে তৃষ্ণার কারণে নিজের জীবনে কোনো বিপদের আশঙ্কা করছে

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যাদের সূত্রে আমরা ইলম সংরক্ষণ করছি এমন সকল আলেমগণ এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন: যদি মুসাফির তৃষ্ণার কারণে নিজের জীবনের ভয় করে এবং তার সাথে পবিত্রতা অর্জনের উপযুক্ত পানি বিদ্যমান থাকে, তাহলে সে উক্ত পানি পান করার জন্য অবশিষ্ট রাখবে। আর তায়াম্মুম করবে।

দ্রষ্টব্য: আল ইশরাফ (১/২৬৪), আল মুগনী (১/২৬৫) ।

যদি মুহদিস তথা ছোট বা বড় নাপাকগ্রস্থ ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনে অপ্রতুল পানি পায়

প্রথম মত: যদি মুহদিস তথা ছোট বা বড় নাপাকগ্রস্থ ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনে অপ্রতুল পানি পায়, যা পবিত্রতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়, তাহলে তার জন্য সঙ্গে থাকা পানিটুকু ব্যবহার করবে। এরপরে তায়াম্মুম করবে। এটা আতা, হাসান বিন ছালিহ, মা'মার ও দাউদের মত। শাফেয়ী ও আহমাদের একটি বর্ণনা। ইবনু হাযম, শাওকানী ও ইবনু উসাইমীনের নিকট গ্রহণযোগ্য মত।

তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "যদি তোমরা পানি না পাও" (আন নিসা: ৪৩)। আর আল্লাহ তা'আলার এই বাণী: "সাধ্যানুযায়ী তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো" (আত তাগাবুন: ১৬)। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী: "যখন আমি তোমাদেরকে কোনো বিষয়ে আদেশ দেয়, তখন সেটাকে তোমরা সাধ্যমত পালন করার চেষ্টা করো"। তারা বলেছেন: যেহেতু এতটুকু পরিমাণ পানি পাওয়া গিয়েছে, যা তার শরীরের আংশিক স্থানে ব্যবহার করা সম্ভব, তাই ততটুকুই ব্যবহার করা তার জান্য আবশ্যক।

দ্বিতীয় মত: শুধুমাত্র তায়াম্মুম করতে হবে। এটা মালেক, আবু হানীফা, ছাওরী, আওযাঈ, ইবনু মুনযির ও মুযানীর মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। শাফেয়ীর প্রথম মত।

বগবী বলেছেন: এটা অধিকাংশ আলেমদের মত। তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "যদি তোমরা পানি না পাও, তাহলে তায়াম্মুম করো" (আন নিসা: ৪৩)। এই আয়াত দুইটি বস্তুর যেকোনো একটি ওয়াজিব হওয়ার দাবি করছে: হয়ত পানি, যদি সেটা বিদ্যমান থাকে অথবা মাটি, যদি পানি না থাকে। বিধায় পানি ও মাটিকে একত্রে ওয়াজিব সাব্যস্ত করাটা উক্ত আয়াতের দলীলের খেলাফ। তারা বলেছেন: যেহেতু তায়াম্মুম পানির বিকল্প, তাই আসল ও বিকল্প একত্রে পালন করা যাবে না।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন: যে ব্যক্তির নিকট ওযূর জন্য যথেষ্ট পানি আছে, কিন্তু সে জুনুবী, "সে ওযূ ও তায়াম্মুম করবে"।

শায়েখ ইবনু উসাইমীন বলেছেন: এর দৃষ্টান্ত হলো: কারোর নিকট মুখমণ্ডল ও দুই হাত ধৌত করার মতো পানি আছে, তার জন্য ওয়াজিব হলো প্রথমে পানি ব্যবহার করে মুখ ও দুই হাত ধৌত করবে। এরপরে অবশিষ্ট অঙ্গসমূহের জন্য তায়াম্মুম করবে। আর পানি আগে ব্যবহার করার কারণ হলো, যাতে 'পানির সন্ধানপ্রাপ্ত নয়' এই কথা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। যখন সে পানিটুকু তায়াম্মুমের পূর্বে ব্যবহার করবে।

দ্রষ্টব্য: আল ইশরাফ (১/২৬৫), আল মুগনী (১/২৩৭), আল মাজমূ' (২/৩০৯), আন নাইল (২/১০৬), আশ শারহুল মুমতি' (১/৩৮১), আহকামুত তায়াম্মুম (১০৭) ।

তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে কি সালাতের সময় শুরু হওয়া শর্ত?

প্রথম মত: যদি সালাতটি ফরয এবং যথাসময়ের আদায়ী সালাত হয়, তাহলে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে তায়াম্মুম করা জায়েয নয়। আর যদি সালাতটি নফল হয়, তাহলে নফলের জন্য নিষিদ্ধ সময়ে তায়াম্মুম করা জায়েয নেই। কারণ, সেটা নফলের সময় নেই। আর যদি সালাতটি কাযা হয়, তাহলে যেকোনো সময় উক্ত সালাতের জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয আছে। যেহেতু উক্ত সালাতটি যেকোনো সময় আদায় করা জায়েয। এটা জমহুর: মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মাযহাব। এটা আলী, ইবনু উমার ও আমর ইবনু আছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত।

তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে" এখান থেকে আয়াতের এই অংশ পর্যন্ত; "এরপরে যদি তোমরা পানি না পাও" (আল মায়িদাহ: ৬)।

সুতরাং আয়াতটির দাবি হলো: ওযূ এবং তায়াম্মুম সালাতের প্রস্তুতি বা সালাতে দাঁড়ানোর পূর্বে করতে হবে। আর সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বে ওযূ করা জায়েয হওয়ার বিষয়টি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্ম ও ইজমা' এর দ্বারা এই আয়াতের সীমা থেকে বের হয়ে যায়। অবশিষ্ট থাকে শুধু তায়াম্মুম। যা আয়াতটির দাবির উপরেই অবশিষ্ট থাকবে। কারণ, সে যদি তায়াম্মুমের প্রয়োজন সাব্যস্ত হওয়ার আগেই তায়াম্মুম করে, তাহলে তার তায়াম্মুম সহীহ হবে না। ঠিক যেমন পানি সাথে থাকলে তায়াম্মুম সহীহ হয় না।

দ্বিতীয় মত: সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বেই তায়াম্মুম করা জায়েয আছে। এটা সাঈদ ইবনু মুসায়্যিব, হাসান বাসরী, যুহরী, ছাওরী, আবু হানীফা ও ইবনু হাযমের মত। যা ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু উসাইমীন গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল হলো: আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াত এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো সুন্নাহ ওয়াক্তের পূর্বে তায়াম্মুম জায়েয হওয়াকে নিষেধ করে না। যদি কেউ এমনটা দাবি করে, তাহলে তাকে উক্ত দাবির পক্ষে বিবাদমুক্ত দলীল পেশ করতে হবে। তারা আরো দলীল পেশ করেছেন: ওযূ, মোজার উপরে মাসাহ, নাপাকি দূর করার উপরে কৃত কিয়াসের দ্বারা। কারণ, এই সময়টা যেহেতু মূল বিধানের জন্য উপযুক্ত সময়, তাই সেটা বিকল্প বিধানের জন্যও উপযুক্ত হবে। ঠিক যেমন সময় শুরু হওয়ার পরে যেকোনো সময় মূলের অনুপস্থিতিতে বিকল্প বিধান পালন করা জায়েয আছে।

গ্রহণযোগ্য মত: দ্বিতীয় মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (১/৯২), আল মুগনী (১/২৩৬), আল মাজমূ' (২/২৭৯), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (২১/৩৫২), আশ শারহুল মুমতি' (১/৩৭৭) ।

পানি ব্যবহারে শারীরিক ক্ষতি হতে হওয়ার আশঙ্কাকারীর জন্য তায়াম্মুমের বিধান কী?

প্রথম মত: প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে যে ব্যক্তি পানি ব্যবহার করতে ভয় পায়, সে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে। চাই সে জুনুবী হোক অথবা মুহদিস হোক অথবা আঘাতগ্রস্থ হোক। এই মতের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো" (আত তাগাবুন: (১৬)। আমর ইবনু আছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: সেখানে বলা হয়েছে: "প্রচণ্ড ঠাণ্ডার রাত্রিতে আমার স্বপ্নদোষ হলো, তখন আমি আশঙ্কা করলাম, যদি আমি গোসল করি, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। অর্থাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ব। বিধায় আমি তায়াম্মুম করলাম। এরপরে আমার ফজরের সালাতে আমার সাথীদের ইমামতি করলাম। এরপরে আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে তাঁকে বিষয়টি বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন: তুমি জুনুবী অবস্থায় তোমার সাথীদের ইমামতি করেছ? তিনি বলেন: আমি বললাম: হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার রাত্রিতে আমার স্বপ্নদোষ হলো, তখন আমি আশঙ্কা করলাম, যদি আমি গোসল করি, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। অর্থাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ব। তখন আমি আল্লাহ তা'আলার এই বাণীটি স্মরণ করলাম: "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু" (আন নিসা: ২৯)। বিধায় আমি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করালাম। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন, কিছু বললেন না। হাদীসটিকে শায়েখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ আল ইরওয়া গ্রন্থে (১/১৮১) সহীহ বলেছেন।

দ্বিতীয় মত: জুনুবী ব্যক্তিকে গোসল করতেই হবে, এতে যদি সে মরেও যায়। এটা আতা ও হাসান থেকে বর্ণিত। তারা আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দ্বারা দলীল পেশ করেছেন: "যদি তোমরা জুনুবী হও। তাহলে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করো (আল মায়িদাহ: ৬)।

তৃতীয় মত: সে তায়াম্মুম করবে। কিন্তু তার জন্য পুনরায় উক্ত সালাত আদায় করা আবশ্যক। চাই সে মুসাফির হোক বা মুকিম। এটা শাফেয়ীর একটি মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। তাদের উভয়ের আরেকটি মত হলো: যদি সে মুসাফির হয়, তাহলে তার জন্য পুনরায় উক্ত সালাত আদায় করা লাগবে না। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনু হাসান এর মত।

গ্রহণযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (২/২৬), আল ইসতিযকার (৩/১৭৩), আল মুগনী (১/২৫৭), তাফসিরুল কুরতুবী (৫/২১৬), আল ফাতাওয়া (২১/৩৯৯), ইবনু রজব (২/২৭৯) ।

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

প্রথম মত: তায়াম্মুম হলো: একবার মাটিতে হাত দ্বারা আঘাত করে সেটা দ্বারা মুখমণ্ডল ও দুই হাত কবজি পর্যন্ত মাসাহ করা। এটা আতা, আওযায়ী, মাকহুল, শাবী, ইবনু মুসায়্যিব, নাখঈ, আহমাদ, ইসহাক ও ইবনু মুনযিরের মত। এমতটি খাত্তাবী প্রায় সকল আহলুল হাদীস আলেমগণ থেকে বর্ণনা করেছেন। এই মতের দলীল হলো: আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় মত: তায়াম্মুম হলো দুইবার মাটিতে হাত দ্বারা আঘাত করার নাম। একবার চেহারা মাসাহ করার জন্য, আর দ্বিতীয়বার দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার জন্য।

হাদীসটি দ্বারাকুতনী (১/১৭৯)। এটা দুর্বল মারফূ' হাদীস। উক্ত হাদীসের বিষয়ে সঠিক মত হলো: হাদীসটি মাওকুফ। দারাকুতনী ও বায়হাকী হাদীসটি মাওকুফ হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

নববী রহিমাহুল্লাহ এটা 'শাফেয়ীদের মত' এই বিষয়টি করে বলেছেন: আমাদের মাযহাবের আলেমগণ অনেকগুলো বিষয় দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, যেগুলো দ্বারা উক্ত বিষয়ে দলীল সাব্যস্ত হয় না। ফলে সেগুলো আমি পরিত্যাগ করেছি। দলীলগুলো মধ্যে তুলনামূলক সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলা ওযূতে দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করতে আদেশ দিয়েছেন। আয়াতের শেষে তিনি বলেছেন: "যদি এরপরে তোমরা পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো। তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতসমূহ মাসাহ করো" (আল মায়িদাহ: ৬)। আয়াতটির মর্ম থেকে উদ্ভাবিত দলীলের বাহ্যিক দাবি হলো: আয়াতটির প্রথমাংশে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে কনুইয়ের কথা। আর এখানে বর্ণিত মুতলাক শব্দটিকে (তোমাদের হাতসমূহ) বিশেষত উক্ত মুকাইয়্যাদ শব্দটির অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের ভিত্তিতে। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে তিনি ঐ মতানুসারেই ফতোয়া দিতেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (২/৪৭), আল ইসতিযকার (৩/১৬২), আল মুগনী (১/২৪৪), আল মাজমূ' (২/২৪৩), আল ফাতাওয়া (২১/৪২২), ইবনু রজব (২/২৫৬)। মিসকুল খিতাম ১/২৩১।

তায়াম্মুমে নিয়্যাতের বিধান

মাসআলাটি ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর নিয়্যাত ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুমে ওয়াজিব।

তায়াম্মুমে বিসমিল্লাহ বলার বিধান

ওযূর আলোচনায় বিসমিল্লাহ সম্পর্কিত বিধান ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এই বিষয়ক মতানৈক্য উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ মত হলো: বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। একইভাবে এখানেও। শায়েখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এখানে বিসমিল্লাহ বলার বিধান ওযূতে বিসমিল্লাহ বলার বিধানের ন্যায়। মতানৈক্য ও মাযহাবের দিক থেকে। যেহেতু তায়াম্মুম বিকল্প কাজ। আর বিকল্প কাজে মূল কাজের বিধান প্রযোজ্য হয়।

দ্রষ্টব্য: আশ শারহুল মুমতি' (১/৪০১), আল মুগনী (১/২৫১) ।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ

ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ওযূ ভঙ্গকারী প্রত্যেকটি হাদাস (বিধানগত নাপাক) এর দ্বারা তায়াম্মুমও ভঙ্গ হবে। এই বিষয়ে মুসলিমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই।

মুরদাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: সুতরাং ছোট হাদাসের তায়াম্মুম ওযূ ভঙ্গের কারণের দ্বারা ভঙ্গ হবে এতে কোনো দ্বিমত নেই। আর বড় হাদাসের তায়াম্মুম গোসল ওয়াজিবকারী কারণের দ্বারা ভঙ্গ হবে। আর হায়েয ও নিফাসের তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে হায়েয ও নিফাসের দ্বারা। সুতরাং হায়েযা নারী যদি হায়েয থেকে মুক্ত হওয়ার পরে তায়াম্মুম করে, এরপরে সে জুনুবী হয়, তাহলে তার জন্য সহবাস করা জায়েয আছে হায়েযের তায়াম্মুমের বিধান অবশিষ্ট থাকার কারণে। কারণ হায়েযের তায়াম্মুম জানাবাতের কারণে নষ্ট হয় না। বিধায় সে হায়েয থেকে পবিত্র হয়েছে এবং সেটা অবশিষ্ট আছে। আর সহবাস জানাবাতকে ওয়াজিব করে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি বলব: একইভাবে পানির সন্ধানহীন ব্যক্তির তায়াম্মুম সন্ধান পাওয়ার দ্বারা এবং পানি ব্যবহারে অক্ষম ব্যক্তির তায়াম্মুম সক্ষমতা ফিরে আসার দ্বারা ভঙ্গ হবে।

দলীল হলো এই হাদীসটি: "পবিত্র মাটি মুসলিম ব্যক্তি ওযূ হিসেবে বিবেচিত হবে। যদিও সে দশ বছর পর্যন্ত পানি না পায়। যদি সে পানি পায়, তাহলে সেটা দ্বারা তার ত্বককে সিক্ত করবে"। ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তায়াম্মুম এই কয়েকটি কারণেও ভঙ্গ হবে: পানির সন্ধান পাওয়া, চাই তা সালাত চলাকালীন হোক অথবা সালাত শেষ হওয়ার পরে। আর তার পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার কারণে যেই সালাত সে আদায় করছিল, সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে। তখন সে আবার ওযূ বা গোসল করে তারপরে উক্ত সালাত আবার শুরু করবে। তবে

তায়াম্মুম এর পবিত্রতা দ্বারা যেই সালাত সে সম্পন্ন করেছে, সেটা কাযা করার প্রয়োজন নেই।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (২৩৩), আল ইনছাফ (১/২১৫) ।

এক তায়াম্মুম দ্বারা একাধিক সালাত আদায় করা যায়?

প্রথম মত: তায়াম্মুমকারী এক তায়াম্মুম দ্বারা যতগুলো ইচ্ছা ফরয ও নফল সালাত আদায় করতে পারবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার তায়াম্মুম কোনো হাদাস (বিধানগত নাপাক) অথবা পানির সন্ধান পাওয়ার দ্বারা ভঙ্গ না হবে। এটা হাসান, ইবনু মুসায়্যিব, যুহরী, আবু জাফর, ছাওরী, যুক্তিবাদীগণ ও ইয়াযিদ বিন হারুনের মত। যা ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

দ্বিতীয় মত: সে প্রত্যেক সালাতের জন্যই পৃথক পৃথক তায়াম্মুম করবে। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের মাঝে রয়েছেন: আলী, ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। তবে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনাটি হারিছ আল আওয়ার থেকে বর্ণিত হয়েছে। যিনি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়েছেন। আর ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার মতটি হাসান বিন উমারাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। সে একজন মাতরুক রাবী। এই বর্ণনাগুলো ইবনু মুনযির উল্লেখ করেছেন। এখন দেখার বিষয় হলো, এগুলোর অন্যান্য সনদ বা সূত্র আছে কি না? এই বিষয়ে আরো অনেকগুলো মত রয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: যেই মতটিকে ইবনু হাযম প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: তায়াম্মুমকারী তার তায়াম্মুমের দ্বারা যতগুলো ইচ্ছা ফরয ও নফল আদায় করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার তায়াম্মুম কোনো হাদাস বা পানির সন্ধান পাওয়ার দ্বারা ভঙ্গ না হয়। আর অসুস্থ ব্যক্তির তায়াম্মুমের পবিত্রতা ভঙ্গ হবে একমাত্র মূল পবিত্রতাকে ভঙ্গকারী হাদাস দ্বারা। অন্য কিছু দ্বারা ভঙ্গ হবে না।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (২/৫৬), আল ইসতিযকার (৩/১৭৩), আল মুহাল্লা (২৩৬), আল মুগনী (১/২৫২), আল মাজমূ' (২/২৫৬) ।

যে ব্যক্তি তায়াম্মুম করার পরে সালাত শুরুর পূর্বে পানির সন্ধান পেল

ইবনু মুনযির, ইবনু আব্দিল বার ও কুরতুবী রহিমাহুমুল্লাহ এই বিষয়ে ইজমা' বর্ণনা করেছেন: যে ব্যক্তি তায়াম্মুম করার পরে সালাত শুরু করার পূর্বে পানির সন্ধান পেল, তার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাকে আবার পবিত্রতা অর্জন করে তারপরে সালাত শুরু করতে হবে। আবু সালামাহ বিন আব্দির রহমান ও শা'বী থেকে বর্ণিত হয়েছে: যদি তায়াম্মুম সম্পন্ন করার পরে পানির সন্ধান পায়, তাহলে তায়াম্মুম বাতিল হবে না। আর যদি সে তায়াম্মুমের

মাঝে পানির সন্ধান পায়, তাহলে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। তাদের পক্ষে এই মর্মে দলীল পেশ করা হয় যে, বিকল্প ইবাদত পালন করার পরে মূল ইবাদতের সামর্থ্য তৈরী হলেও সেটা বিকল্পকে বাতিল করতে পারে না। যেমনঃ অনিচ্ছায় হত্যার কাফফারার ক্ষেত্রে সিয়াম রাখার পরে দাস আযাদ করার সামর্থ্য তৈরী হলেও সেটা এখন আগের ইবাদত তথা বিকল্পকে বাতিল করতে পারবে না।

সঠিক মত: অধিকাংশ আলেমের মতটি সঠিক। দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো" (আল মায়িদাহ: ৬)। এখানে আল্লাহ তা'আলা সালাতের প্রস্তুতি বা সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর সময় পবিত্রতা অর্জনের আদেশ দিয়েছেন। ইনশা আল্লাহ অচিরেই মাসআলাগুলো সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (২/৬৫), আল ইসতিযকার (৩/১৬৮), আল মুগনী (১/২৪৩), আল মাজমূ' (২/৩৪৯), তাফসীরুল কুরতুবী (৫/২০৪), আহকামুত তায়াম্মুম (৩৯৩) ।

যদি সালাত শুরু করার পরে তা শেষ হওয়ার আগেই পানির সন্ধান পায়

প্রথম মত: তার সালাত বাতিল হবে না। বরং সে উক্ত সালাত পূর্ণ করবে। উক্ত সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। এটা মালেক, ইসহাক, আবু ছাওর, ইবনু মুনযির ও দাউদ এর মত। এটা শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। কেউ কেউ বলেছেন: তিনি উক্ত মত থেকে ফিরে এসেছেন। তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বাতিল করো না" (মুহাম্মাদ: ৩৩)। এখন সে যেই সালাতে আদায় করছে, তা একটি নেক কাজ, যা শারঈ নিয়ম মেনে শুরু করা হয়েছে। বিধায় এটা তার জন্য বাতিল করার পক্ষে কোনো দলীল নেই। আর এই বিষয়ে কোনো স্পষ্ট দলীল নেই। তারা আরো দলীল দিয়েছেন: মুসলিমে বর্ণিত (৩৬২) আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি দ্বারা: যেখানে বলা হয়েছে: "সালাত আদায়কারী যেনো মাসজিদ থেকে একমাত্র আওয়াজ শোনা বা গন্ধ পাওয়া (বায়ু নির্গত হওয়ার কারণে) ব্যতীত বের না হয়"।

এই হাদীসটি যদিও একটি প্রেক্ষাপট কেন্দ্রিক, তবুও দলীলের শব্দের 'উমুমিয়াত বা ব্যাপকতাটাই গ্রহণযোগ্য, নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট নয়। তারা বলেছেন: যেহেতু পানির সন্ধান পাওয়াটা কোনো হাদাস (বিধানগত নাপাক) নয়। কিন্তু এটার অস্তিত্ব তায়াম্মুমের প্রতিবন্ধক।

দ্বিতীয় মত: তার জন্য সালাত ছেড়ে দেওয়া এবং ওযূ করে পুনরায় উক্ত সালাত আদায় করা ওয়াজিব। এটা ছাওরী, আবু হানীফা ও মুযানীর মত। এটা হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। এটা শাওকানী, ইবনু হাযম ও ইবনু উসাইমীন গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল হলো: আল্লাহ

তা‘আলার বাণী: “যদি তোমরা পানির সন্ধান না পাও” (আল মায়িদাহ: ৬)। তারা বলেছেন, এখান থেকে বুঝা যায় যে, পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যায়। বিধায় উক্ত সালাত আদায়কারীর তায়াম্মুম বাতিল হয়ে গিয়েছে। আর যেহেতু তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে গিয়েছে, তাই তার সালাতও বাতিল হয়ে গিয়েছে। কারণ, তার পূর্বের হাদাস আবার তার প্রতি ফিরে এসেছে। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই হাদীস দ্বারাও দলীল দিয়েছেন: যদি সে পানির সন্ধান পায়, তাহলে যেনো আল্লাহকে ভয় করে এবং তার ত্বককে পানি দ্বারা সিক্ত করে”। আর এই ব্যক্তি যেহেতু পানি পেয়েছে, তাই তার জন্য আবশ্যক হলো নিজের ত্বককে পানি দ্বারা সিক্ত করা। আর এটাই তার তায়াম্মুম বাতিল হওয়ার দাবি রাখে। তবে উক্ত আয়াত আর হাদীসের ব্যাপারে এই উত্তর দেওয়া যায় যে, উভয়টিই পানির সন্ধানপ্রাপ্ত ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যে সালাত শুরু করার পূর্বে পানি পেয়েছে।

তারা এই কিয়াসের দ্বারাও দলীল পেশ করেছেন: পানির অবিদ্যমানতায় তায়াম্মুম পানির পবিত্রতার বিকল্প। বিধায় পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুমের বিকল্প হওয়ার বৈশিষ্ট্য আর থাকে না। ফলে উক্ত বিকল্পের বিধানটিও দূর হয়ে যায়। আর তখনি তার উপরে উক্ত সালাত থেকে বের হওয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। তখন সে আবার নতুন করে ওযূ করবে এবং নতুন করে সালাত শুরু করবে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল ইশরাফ (১/২৮৩), আল মুগনী (১/২৬৮), আল মাজমূ’ (২/৩৬৪), আন নাইল (২/১১৮), আশ শারহুল মুমতি’ (১/৪০৩) ।

যদি তায়াম্মুমকারী সালাত সম্পন্ন করার পরে পানির সন্ধান পায়

যদি সালাত সম্পন্ন করার পরে পানির সন্ধান পায়, তাহলে তার উপরে উক্ত সালাত পুনরায় আদায় করা জরুরী নয়, যদি পানির সন্ধান সালাতের ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পরে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ ইজমা’ বর্ণনা করেছেন। আর যদি সালাতের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই পানির সন্ধান পায়, তাহলে এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে:

প্রথম মত: তার জন্য উক্ত সালাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: তিনি বলেছেন: “দুইজন ব্যক্তি একদা সফরে বের হলেন, পথিমধ্যে সালাতের সময় হলো। তাদের সঙ্গে তখন পানি ছিল না। তখন তারা উভয়ে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করল এবং সালাত আদায় করল। এরপরে তারা উক্ত ওয়াক্তের মধ্যেই পানির সন্ধান পেল। তখন তাদের একজন পুনরায় ওযূ করে আবার সালাতটি আদায় করলেন। কিন্তু অপরজন তা পুনরায় আদায় করলেন না। এরপরে তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে উক্ত ঘটনাটি

উল্লেখ করলেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'যিনি পুনরায় সালাত আদায় করেননি' তাকে বললেন: তুমি সুন্নাহ পালনে সঠিক পথ অনুসরণ করেছে। তোমার সালাত তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে (তোমার দায় থেকে মুক্ত হয়েছে) । আর যে ব্যক্তি পুনরায় ওযূ করে সালাত আদায় করেছে তাকে বললেন: তোমার প্রতিদান হবে দিগুণ"। আবু দাউদ (৩৩৪)। হাদীসটি মুরসাল। আবু দাউদ বলেছেন: আবু সাঈদ আল খুদরীর বর্ণনা এই হাদীসে সংরক্ষিত নয়। এটা মুরসাল বর্ণনা। তারা আরো দলীল দিয়েছেন এই আসার দ্বারা: ইবনু উমার তায়াম্মুম করেছেন এবং আসরের সালাত আদায় করেছেন, যখন তার মাঝে আর মদীনার মাঝে এক বা দুই মাইলের দূরত্ব ছিল। এরপরে তিনি মদীনায় ঢুকেছেন। তখনও সূর্য উর্ধগামী ছিল। কিন্তু তিনি সালাত পুনরায় আদায় করেননি।

দিবয়ান হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন: হাদীসের সনদ সহীহ। তারা আরো বলেছেন: যে ব্যক্তি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করেছে এবং পানির সন্ধান পাওয়ার পূর্বেই সালাত সম্পন্ন করেছে, সে শরীআতের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। যে এমন ব্যক্তির উপরে সালাত পুনরায় আদায়কে ওয়াজিব বলবে, তার নিকটে আল্লাহর কিতাব অথবা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ অথবা সাহাবীগণের ইজমা' থেকে দলীল পেশ করার দাবি করা হবে। ঐ ইবাদত বাতিল হওয়ার পক্ষে কখনোই শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যাবে না, যার আদায়কারী শরীআতের আদেশ মান্যকারী।

দ্বিতীয় মত: ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকলে তার জন্য উক্ত সালাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। এটা তাউস, আতা, কাসিম বিন মুহাম্মাদ, মাকহুল, ইবনু সিরীন, যুহরী ও রবিআহ এর মত। আওযাঈ মতটিকে মুস্তাহাব বলেছেন, ওয়াজিব বলেননি। তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তুমি সালাত কায়েম করো" (আল ইসরা: ৭৮), এবং এই আয়াত "যখন তোমরা সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে" (আল মায়িদাহ: ৬)। এখানে সালাত সহীহ হওয়ার জন্য ওযূকে শর্ত করা হয়েছে। আর আমাদের আলোচিত বিষয়ে যথাসময়ে তার জন্য ওযূ করা সম্ভব এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণীর ভিত্তিতে: "যদি সে পানি পায়, তাহলে যেনো আল্লাহকে ভয় করে। এবং তার ত্বককে পানি দ্বারা সিক্ত করে"। হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহি। যা ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। যা ইবনু মুনযির, শাওকানী ও ইবনু উসাইমীনের মত।

দ্রষ্টব্য: আল ইশরাফ (১/২৮১), আল মুগনী (১/২৪৩), আল মাজমূ' (২/৩৫৩), আন নাইল (২/১১৭), আশ শারহুল মুমতি' (১/৪০৬), আহকামুত তায়াম্মুম (৪০৯) ।

পানি ও মাটি উভয় পবিত্রকারী বস্তুর সন্ধানহীন ব্যক্তির বিধান কী?

প্রথম মত: এমন ব্যক্তি পানি ও তায়াম্মুম ব্যতীতই সালাত আদায় করবে। তাকে উক্ত সালাত কাযা করতে হবে না। এটা মালেক ও আহমাদের একটি বর্ণনা। যা আবু ছাওর, মুযানী, সাহনুন ও ইবনু মুনযিরের মত। ইমাম শাফেয়ীর প্রথম মত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। বুখারী এই মতের উপরে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন। এটা ইবনু হাযম, ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু উসাইমীনের নিকট গ্রহণযোগ্য মত। তাদের দলীল হলো: আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস: তিনি নিজের (গলার) হার হারিয়ে ফেললেন। সেখানে বর্ণিত হয়েছে: "তখন সালাতের সময় হয়ে গেল, কিন্তু তাদের সাথে পানি ছিল না। এরপরে তারা সালাত আদায় করলেন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে গিয়ে পানি না থাকার সমস্যার কথা বললেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। সহীহ বুখারী (৩৩৬), সহীহ মুসলিম (৩৬৭)। হাদীসে বিদ্যমান দলীলটি হলো: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পুনরায় সালাত আদায়ের আদেশ দেননি। তারা যথাক্রমে এই আয়াত ও হাদীস দ্বারাও দলীল দিয়েছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "তোমরা আল্লাহকে তোমার সাধ্যমত ভয় করো" (আত তাগাবুন: ১৬)। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কাজ পালনের আদেশ দেই, তখন তোমরা সেটা সাধ্যমত পালনের চেষ্টা করো" (সহীহ বুখারী (৭২৮৮), সহীহ মুসলিম (১৩৩৭)। যা আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস।

দ্বিতীয় মত: সে সালাত আদায় করবে। কিন্তু পরে উক্ত সালাতটি পুনরায় আদায় করবে। এটা মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদের দ্বিতীয় মত।

তৃতীয় মত: সে তখন সালাত আদায় করবে না। বরং তার জন্য পরে কাযা করা ওয়াজিব। এটা ছাওরী, আওযাঈ ও আবু হানীফার মত। তাদের দলীল হলো: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা বিহীন কোনো সালাত কবুল করবেন না"। সহীহ মুসলিম (২২৪)। যা ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। এই মতের উত্তর হলো: এই বিষয়টি সামর্থের ভিত্তি অনুসারে নির্ণীত হবে। যেমনটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণীতে বলা হয়েছে: "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কারোর সালাত নাপাক অবস্থায় কবুল করবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওযূ না করবে"। এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই: যদি পানি না পাওয়া যায় এবং তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করা হয়, তাহলে তার সালাত কবুল করা হবে।

চতুর্থ মত: সে সালাত আদায় করবে না এবং তার উপরে উক্ত সালাত পরবর্তীতে পুনরায় আদায় করা জরুরী নয়। এটা মালেকের একটি বর্ণনা। কিছু যাহেরী আলেমগণের মত। কেউ কেউ এই মতটি আবু ছাওরের সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যে ব্যক্তি নিজ এলাকায় বা সফরে এমন স্থানে বন্দী হয়ে আছে যে, সেখানে সে মাটি ও পানি কিছুরই সন্ধান পাচ্ছেন

না। অথবা তাকে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে যে, সে নড়তে পারছে না। এমন সময় সালাতের ওয়াক্ত হলে সে যেই অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায়ই সালাত আদায় করবে। তার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। উক্ত সালাত পুনরায় আদায় করা জরুরী নয়। চাই সে যথাসময়ে পানির সন্ধানপ্রাপ্ত হোক অথবা না হোক।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (২৪৬), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (২১/৪৬৭), ইবনু রজব (২/২২২), আল ফাতহ (১/৪৪০), আশ শারহুল মুমতি' (১/৩৮৯)।

তায়াম্মুম কি হাদাসকে (বিধানগত নাপাক) পানির সন্ধান পাওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে বিলুপ্ত করে নাকি এটা হাদাসকে বিদ্যমান রেখে আদিষ্ট ইবাদত পালনের বৈধতা দেয় মাত্র?

প্রথম মত: তায়াম্মুম পানির সন্ধান পাওয়া পর্যন্ত হাদাসকে সাময়িকভাবে বিলুপ করে দেয়। এটা হানাফী, কিছু মালেকী ও দাউদের মাযহাব। আহমাদের একটি বর্ণনা। যা ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু কাইয়্যিম ও ইবনু উসাইমীনের নিকট গ্রহণযোগ্য। তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা আ'আলার বাণী: "যদি তোমরা পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো। মাটি দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতসমূহ মাসাহ করো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কোনো কষ্ট চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা রাখেন না। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান" (আল মায়িদাহ: ৬)।

দলীলের বিশ্লেষণ: আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়ে স্পষ্টভাষায় বলছেন যে, তিনি আমাদের জন্য ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুম দুইটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে শরীআতসম্মত করেছেন:

প্রথম: এই উম্মাহ থেকে কষ্ট দূর করা।

দ্বিতীয়: পবিত্র করার ইচ্ছা। সুতরাং এই নস (কুরআন হাদীসের দলীল) একটি স্পষ্ট দলীল যে, তায়াম্মুম আমাদের জন্য পবিত্রকারী সাব্যস্ত হবে।

তারা জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস দ্বারা দলীল দিয়েছেন, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: 'আমার জন্য জমিনকে মাসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ ধার্য করা হয়েছে" এবং আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারা: পবিত্র মাটি মুসলিমের জন্য পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ"।

দ্বিতীয় মত: তায়াম্মুম হাদাসকে সাময়িকভাবে বিলুপ্ত করে না। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: আবু যর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস: "পবিত্র মাটি মুসলিম ব্যক্তির ওযূ হিসেবে বিবেচিত হবে। যদিও সে দশ বছর পর্যন্ত পানি না পায়। যদি সে পানি পায়, তাহলে যেনো নিজের ত্বককে তা দ্বারা সিক্ত করে। কারণ, সেটা তার জন্য কল্যাণময়"।

দলীলের বিশ্লেষণ: যদি হাদাস তায়াম্মুমের দ্বারা সাময়িক বিলুপ্ত হতোই, তাহলে পানি পাওয়া গেলে তার পূর্বের হাদাস আবার ফিরে আসত না। তাদের আরো অনেকগুলো দলীল আছে।

সঠিক মত: প্রথম মতটি সঠিক। সেটা হলো, তায়াম্মুম হাদাসকে সাময়িকভাবে বিলুপ্তকারী। হ্যাঁ, তবে হাদাসকে বিলুপ্তকরণটা মূল তথা পানির সন্ধান পাওয়া পর্যন্তই স্থায়ী হবে। যখনি পানির সন্ধান পাওয়া যাবে, তার হাদাস আবার ফিরে আসবে। উভয় মতের মাঝে মতানৈক্যের ফলাফল হলো: যারা বলেন: তায়াম্মুম হাদাসকে বিলুপ্তকারী, তাদের মতে এক তায়াম্মুম দ্বারা একাধিক সালাত আদায় করা জায়েয। একইভাবে তায়াম্মুমকারীর জন্য ওযূকারীর ইমাম হওয়া জায়েয আছে। একইভাবে হায়েযা নারীর সঙ্গে সহবাস করা জায়েয আছে যদি সে পবিত্র হওয়ার পরে তায়াম্মুম করে নেয়, এই জাতীয় কাজসমূহ জায়েয আছে, যেগুলো একজন পানি ব্যবহারকারীর জন্য করা জায়েয হয়।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (২/২৫৫), মাজমু'উল ফাতাওয়া (২১/৩৫২), আয যাদ (১/২০০), আশ শারহুল মুমতি' (১/৩৭৫), আহকামুত তায়াম্মুম (৫১) ।

মুসাফিরের জন্য কি মাটি বহন করা মুস্তাহাব?

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ আল ফাতহ গ্রন্থে (২/২২৪) বলেছেন: ছাওরী ও আহমাদ মুস্তাহাব বলেছেন: মুসাফিরের জন্য সঙ্গে মাটি বহন করাকে ঠিক যেভাবে পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে তার জন্য পানি বহন করা মুস্তাহাব। মুতাআখখিরিন আলেমগণের মধ্যে কেউ কেউ এটাকে খণ্ডন করেছেন এবং বিদআত বলেছেন।

ব্যান্ডেজধারী ব্যক্তির উপরে যদি ওযূ বা গোসল ওয়াজিব হয় তাহলে তার ব্যান্ডেজের বিধান কী?

প্রথম মত: যেই সকল অঙ্গে ওযূ বা গোসলে পানি ব্যবহার করতে পারবে, কোনো সমস্যা হবে না সে সকল অঙ্গে পানি ব্যবহার করবে। আর অন্যান্য অঙ্গগুলোতে মাসাহ করবে। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: ঐ সকল হাদীস, যেখানে জখমের পট্টির উপরে মাসাহ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হাদীসগুলো সহীহ সনদে সাব্যস্ত হয়নি। যেমনটি আলবানী রহিমাহুল্লাহ ও দিবয়ান হাফিযাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। তারা আরো দলীল দিয়েছেন: মোজার উপরে মাসাহ করার দলীলের উপরে কিয়াস করে।

দ্বিতীয় মত: যেই অঙ্গগুলোতে সম্ভব হয় গোসল বা ওযূ করবে। অর্থাৎ পানি ব্যবহার করবে। আর ব্যান্ডেজের উপরে মাসাহ করবে এবং তায়াম্মুম করবে। এটা 'আল উম্ম' গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ীর দলীল। এটাই অধিকাংশ আলেমের মত। এটা আহমাদের একটি বর্ণনা। তাদের দলীল হলো: "জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যেখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যার মাথায় পাথর পড়ার দরুণ বীর্যপাত হলো। এরপরে সে গোসল করে মৃত্যুবরণ করল। তখন তিনি বললেন: তার জন্য তায়াম্মুম করাটাই যথেষ্ট ছিল। জখমের উপরে পট্রি বেঁধে সেখানে মাসাহ করবে। এবং অবশিষ্ট শরীর পানি দ্বারা ধৌত করবে"। হাদীসটিতে গোসল, মাসাহ ও তায়াম্মুম তিনটিই একত্রে করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হাদীসটি সাব্যস্ত হয়নি। দ্রষ্টব্য: আল ইরওয়া (১০৫)।

তৃতীয় মত: তার উপরে হয়ত ওযূ নতুবা গোসল করা ওয়াজিব। পট্টির উপরে মাসাহ করবে না এবং তায়াম্মুমও করবে না। এটা ইবনু সিরীন ও শা'বী থেকে বর্ণিত। যা যাহেরীদের মত। এটাকে শায়েখ আলবানী গ্রহণ করেছেন। ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই মতের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "আল্লাহ তা'আলা কোনো ব্যক্তিকে সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না" (আল বাকারাহ: ২৮৬) এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "যখন আমি তোমাদেরকে কোনো ইবাদত পালনের নির্দেশ দেই, তখন সেটা সাধ্যমত পালনের চেষ্টা করো" ।

ফলে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা 'মানুষ পালন করতে অক্ষম' এমন সকল ইবাদতের দায়িত্ব মানুষের দায় থেকে মুক্ত হয়ে গেল। এরপরে তিনি রহিমাহুল্লাহ পট্টির উপরে মাসাহ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে সেগুলোকে দুর্বল সাব্যস্ত করলেন।

চতুর্থ মত: যতটুকু সম্ভব হয় গোসল করবে অথবা ওযূ করবে। আর শুধুমাত্র তায়াম্মুম করবে। কিন্তু পট্টির উপরে মাসাহ করবে না। এটা কিছু শাফেয়ী আলেমগণের মত। যা নববী হান্নাতী, 'উদ্দাহ' গ্রন্থের লেখক ও কাযী আবুত তায়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন। এই মতটি আমাদের শায়েখ ইয়াহইয়া হাফিযাহুল্লাহ এর নিকট গ্রহণযোগ্য। যেমনটি তার কিতাব 'আহকামুত তায়াম্মুম' এ তিনি উল্লেখ করেছেন। এই মতের দলীল হলো: পট্টির উপরে মাসাহ সংক্রান্ত হাদীসগুলো সাব্যস্ত হয়নি। আর যখন বিষয়টি এমনি, তাহলে যেই স্থানে গোসল করা বা ধৌত করা সম্ভব হবে, সেখানে ধৌত করবে। আর যেখানে সম্ভব হবে না, সেখানে তায়াম্মুম করবে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "যদি তোমরা জুনুবী হও, তাহলে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করো। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পন্ন করে আসে অথবা নারীদেরকে যদি তোমরা স্পর্শ (সহবাস) করো, এরপরে যদি পানি না পাও, তাহলে তায়াম্মুম করো" (আল মায়িদাহ: ৬)। এই জখমটাও এক প্রকার অসুস্থতা। আর সম্পূর্ণ শরীরে পানি ব্যবহারে সক্ষম না হলেও যেসকল স্থানে পানি ব্যবহার সম্ভব, সেস্থানগুলোতে পানি ব্যবহারের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করো" (আত তাগাবুন: ৬)। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "যখন আমি তোমাদেরকে কোনো ইবাদত পালনের আদেশ দেই, তখন তোমরা সেটা সাধ্যমত পালন করো" ।

প্রাধান্যযোগ্য মত: চতুর্থ মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (২/২৩), আল মুহাল্লা (১/৩১৬), আল মুগনী (১/২৭৭), আল মাজমূ' (২/৩৭০, ৩৭৩), আল ইনছাফ (১/১৪০), আন নাইল (২/৯৭), তামামুল মিন্নাহ (১৩৩), আশ শারহুল মুমতি' (১/২৪৩), আহকামুল মাসাহ আলাল হায়িল (৫৯৩) ।

জখমী বা অসুস্থ ব্যক্তি যদি ওযূ বা গোসল করতে চায়

প্রথম মত: যদি শরীরের কিছু অঙ্গ ধোয়া সম্ভব হয়, আর কিছু অঙ্গ সম্ভব না হয়, তাহলে সম্ভব অঙ্গসমূহ ধোয়া তার জন্য আবশ্যক। আর অবশিষ্ট অঙ্গগুলোর জন্য তায়াম্মুম করবে। এটা শাফেয়ী ও আহমাদের মত। এটাকে ইবনু উসাইমীন গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তোমরা সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো" (আত তাগাবুন: ৬)। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: "যখন আমি তোমাদেরকে কোনো ইবাদত পালনের আদেশ দেই, তখন তোমরা সেটা সাধ্য অনুযায়ী মানার চেষ্টা করো"। আর জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যেখানে পাথরের আঘাতে মাথা ফেটে যাওয়া ব্যক্তি গোসল করে মৃত্যুবরণ করলে তার ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: "তার জন্য তায়াম্মুম করা এবং জখমের উপরে পট্রি বেঁধে তার উপরে মাসাহ করে অবশিষ্ট শরীর ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট ছিল"। হাদীসটি সাব্যস্ত হয়নি। দ্রষ্টব্য: আল ইরওয়া (১০৫) ।

দ্বিতীয় মত: যদি তার দেহের অধিকাংশ অঙ্গ সুস্থ হয়, তাহলে গোসল করবে, তার উপরে তায়াম্মুম করা জরুরী নয়। আর যদি অধিকাংশ অঙ্গ জখমী হয়, তাহলে তায়াম্মুম করবে। তার জন্য কোনো গোসলের বিধান নেই। এটা আবু হানীফা ও মালেকের মত। তারা বলেছেন: কারণ, মূল আর বিকল্প একত্রে পালন করা ওয়াজিব নয়। যেমন: কাফফারার মাসআলায় সিয়াম রাখা এবং মিসকীনদের খানা খাওয়ানো।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল বায়ান (১/৩০৯), আল মুগনী (১/২৫৮), আল মাজমূ' (২/৩৭১), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (২১/৪৫৩), আশ শারহুল মুমতি' (১/২৪৭, ৩৮৩)।

তায়াম্মুম ও গোসল করার ক্ষেত্রে কোনটাকে আগে সম্পন্ন করতে হবে গোসল নাকি তায়াম্মুম?

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যদি জখমী ব্যক্তি জুনুবী হয়, তাহলে তার স্বাধীনতা রয়েছে: যদি সে মনে করে, তায়াম্মুম গোসলের পূর্বে করবে, তাই করতে পারবে। আর যদি সে মনে করে, তায়াম্মুমের পূর্বে গোসল করবে, তাহলে সেটাও করতে পারবে। পক্ষান্তরে, তায়াম্মুম যদি পানির স্বল্পতার কারণে হয়, তাহলে তার জন্য প্রথমে পানি ব্যবহার করা

জরুরী, কারণ তায়াম্মুম পানি না থাকার কারণে করা হয়। আর পানির অনুপস্থিতি তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন পানির ব্যবহার শেষ হবে। আর এখানে তায়াম্মুম করা হচ্ছে জখমযুক্ত স্থানে পানি ব্যবহার করার সামর্থ্য না থাকার কারণে। যেটা (জখম) সর্বাবস্থায় (সুস্থ হওয়া পর্যন্ত) বিদ্যমান থাকবে।

দ্রষ্টব্য: আল বায়ান (১/৩০৯), আল মুগনী (১/২৫৯), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (২১/৪৫৩) ।

যদি পানি জখমের ভিতরে ছড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যেই সুস্থ অঙ্গ ধৌত করলে নিশ্চিতভাবে পানি জখম পর্যন্ত পৌঁছে যায়, সেই সুস্থ অঙ্গের বিধানও জখমী অঙ্গের ন্যায়। যদি তার জন্য উক্ত (সুস্থ) অঙ্গটি বাঁধা সম্ভব না হয়, তবে তা বেঁধে দেওয়ার জন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার (অর্থের বিনিময়ে) সামর্থ্য রাখে, তাহলে তার জন্য সেটাই করা আবশ্যক। যদি সেটাও করার সামর্থ্য না রাখে, তাহলে তায়াম্মুম করবে এবং সালাত আদায় করবে। আর সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। যেহেতু সে উক্ত অঙ্গ ধৌত করার সামর্থ্য রাখে না। বিধায়, তার জন্য উক্ত অঙ্গ ধৌত করার বিপরীতে তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট। যেমন: জখমী অঙ্গের বিধান।

দ্রষ্টব্য: আল বায়ান (১/৩১০), আল মুগনী (১/২৫৯) ।

٣٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً».

৩৮. জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে পাঁচটি বিশেষ বিষয় দান করা হয়েছে যেগুলি আমার আগে কাউকে দেওয়া হয়নি।

[১] আমাকে শত্রুর বিরুদ্ধে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যে, শত্রুরা একমাসের দূরুত্ব থেকে আমাকে ভয় করে।

[২] পুরো পৃথিবী আমার জন্যে পবিত্র ও সালাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে। ফলে যার যেখানে সালাত পড়ার সময় হবে, সে তখন সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে।

[৩] গণীমত আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে। আমার পূর্বে আর কোনো নবীর উম্মতের জন্য বৈধ করা হয়নি।

[৪] শাফাআত (পাপীদের জন্য) বা সুপারিশের অধিকার প্রাপ্ত হয়েছি এবং

[৫] প্রত্যেক নাবী ও রাসূল কে তার কওমের কাছে নির্দিষ্ট করে প্রেরণ করা হয়েছে। আর আমাকে কোনো গোত্র বা অঞ্চল বিশেষের জন্য নাবী না করে সমস্ত বিশ্বের জন্য নাবী করে প্রেরণ করা হয়েছে। [সহীহ বুখারী হা/৩৩৫ ও মুসলিম হা/৫২১]

٧. بَابُ الحَيْضِ

অধ্যায়: ৭-হায়েয (ঋতুস্রাব) এর বিবরণ

হায়েয শব্দের আভিধানিক অর্থ: প্রবাহিত হওয়া, ভেসে যাওয়া। যেমন: আরবীতে বলা হয়: حاض الوادي– অর্থাৎ উপত্যকাটি প্রবাহিত হলো বা ভেসে গেল।

পরিভাষায়: এমন রক্তকে হায়েয বলা হয়, যা নারী সাবালিকা হওয়ার পরে তার অভ্যাস অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে জরায়ু থেকে সৃষ্টি হয়ে প্রবাহিত হয়। হায়েযের রক্ত নির্গত হয় জরায়ুর অভ্যন্তর থেকে। যা জ্বলন্ত (গাঢ়) কালো, অর্থাৎ গরম, যেনো এটা জ্বলন্ত রক্ত। আর এটাকে হায়েয বলা হয়, কারণ, এই রক্ত হায়েযের নির্দিষ্ট সময়ে প্রবাহিত হয়। হায়েযের অনেকগুলো নাম রয়েছে: ‘মুগনীল মুহতাজ’ অভিধানে বলা হয়েছে: এর দশটি নাম রয়েছে: حيض– طمث– ضحك– إكبار– إعصار– دراس– عراك– فراك– طمس– نفاس। এই নামগুলোকে কোনো একজন কবিতা আকারে উল্লেখ করেছেন:

حيض نفاس دراس طمس إعصار ضحك عراك فراك طمث إكبار

“হায়েযুন, নিফাসুন, দিরাসুন (মুছে দেওয়া), তমসুন (নিশ্চিহ্ন করা), ই’ছারু (তরুণী প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া), যিহকুন (হায়েয হওয়া, ঋতুবতী হওয়া), ‘ইরাকুন (হায়েযের উপযুক্ত হওয়া), ফিরাকুন (পাকা, উপযুক্ত হওয়া), তমছুন (মাসিক স্রাব হওয়া), ইকবারু (বড় হওয়া, হায়েযগ্রস্থ হওয়া) ।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ’ (২/৩৭৯), মুগনীল মুহতাজ (১/১৮৩), আল ইলাম (২/১৭৩) ।

৩৯. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ: سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا؛ إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».

وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ؛ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا: فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».

৩৯. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি ইস্তিহাযা (প্রদর) রোগে আক্রান্ত হই। ফলে আমি পবিত্রতা অর্জন করতে পারি না। আমি কি সালাত আদায় করা হতে বিরত থাকব? উত্তরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, এটি হায়েয নয়; বরং একটি শিরা থেকে বের হওয়া রক্ত। বরং যে কয়েকদিন তোমার হায়েয তথা ঋতু হবে সেই কয়েকদিন তুমি সালাত আদায় করা হতে বিরত থাকবে। এরপর তুমি গোসল করে সালাত আদায় করবে। [সহীহ বুখারী হা/৩২৫ ও মুসলিম হা/৩৩৩]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এটা হায়েয নয়। অতএব যখন তোমার হায়েয হবে তখন তুমি সালাত আদায় করা হতে বিরত থাকবে। এরপর এটার সময় চলে গেলে তুমি তোমার হায়েযের রক্ত ধুয়ে ফেলে পবিত্র হবে ও সালাত আদায় করবে। [সহীহ বুখারী হা/৩০৬ ও মুসলিম হা/৩৩৩]

হায়যের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মেয়াদ কতদিন?

প্রথম মত: হায়েযের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ এমন কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই, যা দিবসের সীমা দ্বারা নির্ধারণ করা যায়। এটা আলী ইবনু মাদিনী ও আওযাঈর মত। যা ইবনু তাইমিয়্যাহ, শাওকানী ও ইবনু উসাইমীন গ্রহণ করেছেন। মালেক বলেছেন: এর সর্বনিম্ন কোনো মেয়াদ নেই।

দ্বিতীয় মত: হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ হলো: একদিন ও একরাত। আর সর্বোচ্চ মেয়াদ হলো: পনের দিন। এটা আতা, শাফেয়ী, আবু ছাওর ও আহমাদের মত।

তৃতীয় মত: হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিনদিন। আর সর্বোচ্চ মেয়াদ দশদিন। এটা ছাওরী, আবু হানীফা ও আবু ইউসুফের মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি, আর সেটা হলো: সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মেয়াদ বলে কিছু নেই। বরং যখন রক্ত দেখা যাবে, তখন সে হায়েযা বলে বিবেচিত হবে। আর যখন রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে, তখনি সে পবিত্র হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "তারা আপনাকে হায়েয (ঋতুস্রাব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তা নাপাক। বিধায় তোমরা ঋতু কালে তাদের (সহবাস করা) থেকে দূরে থাকো। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না" (আল বাকারাহ: ২২২)। আর আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে: "কিন্তু যেই দিনগুলোতে তুমি হায়েযগ্রস্থ থাকবে, সালাত পরিত্যাগ করবে"। অপর বর্ণনায়: যখন হায়েয আসবে, উক্ত হায়েয চলা কালে তুমি সালাত ছেড়ে দিবে"।

সুতরাং উক্ত আয়াতে ও হাদীসে কোথাও হায়েযের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ সীমার কথা নেই। বিধায় বিধানটি হায়েযের সতিত্ব থাকা ও না থাকার সাথে চলমান থাকবে।

ইবনু কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবীগণ থেকে হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ সম্পর্কিত কোনো সীমানা বর্ণিত হয়নি। কিয়াসের দাবি অনুসারেও এমন কোনো সীমা নেই। শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এর আলোচনাও তুমি লক্ষ্য করবে এই মাসআলার পরে। এই আলোচনায় ইবনু কাইয়িমের বক্তব্য: "আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবীগণ থেকে হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ সম্পর্কিত কোনো সীমানা বর্ণিত হয়নি" সম্পূর্ণ সঠিক নয়। বরং এই বিষয়ে অনেকগুলো মারফু' হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে হায়েযের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমার বর্ণনা পাওয়া যায়। যেগুলো অত্যন্ত দুর্বল হাদীস। যা দিবয়ান হাফিযাহুল্লাহ তার গ্রন্থ 'আহকামুল হায়েয' এ (১/১৩৪) লিপিবদ্ধ করেছেন। এই জন্য পূর্বে বর্ণিত কিছু আলেম উক্ত হাদীসগুলোকে গ্রহণ করেছেন। যদিও সেগুলো কঠিন দুর্বল বরং কিছু হাদীস মাওযূ' পর্যায়ের।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (২/২২৭), ইখতিলাফুল উলামা লিল মারওয়াযী (৩৭), আল মুগনী (১/৩০৮), আল মাজমূ' (২/৪০৮), আল ফাতাওয়া (১৯/২৩৭), ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন (১/৩৭১), ইবনু রজব (২/১৫০-১৫৩), আস সাইল (১/৩৩৭), আশ শারহুল মুমতি' (১/৪৭১) ।

দুই হায়েযের মধ্যে পবিত্র অবস্থার সর্বনিম্ন সীমা

প্রথম মত: পবিত্র অবস্থার কোনো সর্বনিম্ন সীমা নেই। এটা আহমাদ ও ইসহাকের মত।

দ্বিতীয় মত: পবিত্র অবস্থার সর্বনিম্ন সীমা হলো পনের দিন। যা ছাওরী ও আবু ছাওরের মত। এই বিষয়ে আরো অনেকগুলো মত রয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আর সেটা হলো: পবিত্রতার সর্বনিম্ন কোনো মেয়াদ নেই। এটা শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, শাওকানী ও ইবনু উসাইমীনের মত। শায়খুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এর মধ্যে অন্যতম হলো 'হায়েয' নামটি। আল্লাহ তা'আলা এই শব্দটির সাথে কিতাব ও সুন্নাহয় বিদ্যমান অনেকগুলো বিধানকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। এমনকি এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কোনো সীমা নির্ধারণ করে দেননি। দুই হায়েযের মধ্যবর্তী

পবিত্রতারও কোনো মেয়াদ নির্ধারণ করেননি, যদিও বিষয়টি উম্মতের সাধারণ সমস্যা এবং প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আর ভাষা কখনো এক পরিমাণের সাথে অন্য পরিমাণের পার্থক্য করে না। ফলে ভাষার দৃষ্টিতে সকল পরিমাণ নির্ধারণই অবাস্তবিক। সুতরাং যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করল, সে কিতাব ও সুন্নাহ এর বিরোধিতা করল।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (২/২৫৫), আক মুগনী (১/৩১০), আল মাজমূ' (২/৪০৯), আল ফাতাওয়া (১৯/২৩৭), ওয়াইলুল গামাম (১/২২২), আশ শারহুল মুমতি' (১/৪৭৫) ।

পবিত্রতার সর্বোচ্চ কোনো মেয়াদ নেই

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আলেমগণ এই বিষয়ে ইজমা' করেছেন: পবিত্রতার সর্বোচ্চ কোনো সীমা নেই। কাসানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আর পবিত্রতার সর্বোচ্চ মেয়াদের কোনো শেষ সীমা নেই। এমনকি কোনো মহিলা যখন অনেক বছর যাবৎ পবিত্র থাকে, তাহলে সে পবিত্র অন্যান্য নারীদের মতই। এই বিষয়ে ইমামগণের কোনো দ্বিমত নেই। ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আর দুই হায়েযের মধ্যবর্তী পবিত্রতার সর্বোচ্চ কোনো মেয়াদ নেই, এটা সর্বসম্মত মত।

দ্রষ্টব্য: বাদায়িউছ ছানায়ে' (১/২৯১), আল মাজমূ' (২/৪০৮), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (১৯/২৩৮) ।

হায়েয ও ইস্তেহাযা শনাক্তকারী হায়েযা নারী যদি ইস্তেহাযাগ্রস্থ হয় তাহলে তার বিধান কী?

প্রথম মত: সে অভ্যাস অনুসারে কাজ করবে। শনাক্তকরণ পদ্ধতি অনুসারে কাজ করবে না। এটা হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। শাফেয়ী মাযহাবের একটি মত। যা ইসহাক, আওযাঈ, আবু হানীফা ও সুফয়ানের মত। এই মতের দলীল হলো:

১) আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় এটা শিরা (ফেটে যাওয়ার ফলে) থেকে নির্গত রক্ত। কিন্তু যেই দিনগুলোতে তোমার ঋতুস্রাব হতো, সেই দিনগুলোর পরিমাণ অনুসারে সালাত পরিত্যাগ করো। এরপরে গোসল করে সালাত আদায় করে নাও"।

২) উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার ঘটনায় আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে: "তোমাকে তোমার হায়েয যে কয়দিন পর্যন্ত সালাত থেকে আটকে রাখত, সে কয়দিন পর্যন্ত তুমি অবস্থান করো (হায়েযের দিন গণনা করো), এরপরে গোসল করে সালাত আদায় করো"। সহীহ মুসলিম (৩৩৩) ।

৩) উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, সেখানে বলা হয়েছে: “সে (হায়েযা নারী) যেনো মাসের সে কয়দিন ও রাত্রি বিবেচনায় রাখে, মাসের যে কয়দিন তার হায়েয হতো”। আহমাদ (৬/৩২০), আবু দাউদ (২৭৪) হাদীসের সনদ সহীহ।

দ্বিতীয় মত: সে (হায়েযা নারী) শনাক্তকরণ পদ্ধতি অনুসারে কাজ করবে। এটা শাফেয়ীর মত এবং আহমাদের একটি বর্ণনা। যা ইমাম খিরাকী গ্রহণ করেছেন। এই মতের দলীল হলো: উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস, সেখানে বলা হয়েছে: “হায়েযের রক্ত কালো রক্ত, যা চেনা যায়”। আবু দাউদ (২৮৬)। আবু হাতিম হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। যেমনটি ‘আল ‘ইলাল’ গ্রন্থে (১/৫০) উল্লেখ হয়েছে। তাদের আরো কিছু দলীল রয়েছে, যেগুলোর কিছু দুর্বল।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। পূর্ববর্তী দলীলসমূহের ভিত্তিতে। যেটাকে ইবনু রজব ও ইবনু উসাইমীন প্রাধান্য দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (২/২২২), ইখতিলাফুল উলামা লিল মারওয়াযী (৩৫), আল মুগনী (১/৩১৯), আল মাজমূ’ (২/৪৪৪), ইবনু রজব (২/৫৭, ৬১), আশ শারহুল মুমতি’ (১/৪৯২)।

হায়েয ও ইস্তেহাযার রক্তের মাঝে পার্থক্য ও শনাক্তকরণ পদ্ধতি কী?

শায়েখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ আশ শারহুল মুমতি’ গ্রন্থে (১/৪৮৭) বলেছেন: তাময়ীয বা শনাক্তকরণ হলো এমনভাবে স্পষ্ট করা, যাতে করে প্রবাহিত রক্ত কি হায়েযের রক্ত নাকি ইস্তেহাযার রক্ত সেটা চেনা যায়। শনাক্তকরণের চারটি নিদর্শন রয়েছে:

১) রং: হায়েযের রক্ত কালো, আর ইস্তেহাযার রক্ত লাল।

২) সূক্ষ্মতা: হায়েযের রক্ত গাঢ়-ঘন এবং শক্ত। আর ইস্তেহাযার রক্ত পাতলা।

৩) গন্ধ: হায়েযের রক্ত পচা ও দুর্গন্ধময়। আর ইস্তেহাযার রক্ত দুর্গন্ধযুক্ত নয়। কারণ, এটা স্বাভাবিক শিরার রক্ত।

৪) জমাটবদ্ধতা: হায়েযের রক্ত বের হওয়ার পরে আর জমাটবদ্ধ হয় না। কারণ, এটা জরায়ুতে প্রথমে জমাটবদ্ধ হয়, এরপরে তা স্ববেগে ফেটে প্রবাহিত হয়। ফলে সেটা দ্বিতীয়বার আর জমাটবদ্ধ হয় না। আর ইস্তেহাযা (বের হওয়ার পরে) জমাটবদ্ধ হয়।

সাধারণ অভ্যাস ও শনাক্তকরণ পদ্ধতি এবং নারীদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রচলিত অভ্যাস এগুলোর মধ্যে কোনটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে?

শায়খুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ মাজমূ‘উল ফাতাওয়া গ্রন্থে (২১/৬৩০) বলেছেন: ইস্তেহাযার ক্ষেত্রে আলেমগণের বিতর্ক রয়েছে। ইস্তেহাযার রক্তের সাথে হায়েযের রক্তের সাদৃশ্যতা

গভীর হওয়ার কারণে বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। বিধায়, এমন একটি নির্ণায়ক থাকা জরুরী, যা এই রক্তকে ঐ রক্ত থেকে পৃথক করবে। আর যে ছয়টি নিদর্শনকে নিদর্শন বলে দাবি করা হয়েছে, সেগুলো হলোঃ

১) হয়ত স্বভাব বা নিয়মানুবর্তিতা, যেহেতু স্বভাব হলো সবচেয়ে শক্তিশালী। কারণ, হায়েযের ক্ষেত্রে আসল মাপকাঠি হলো হায়েযের স্থায়িত্ব, অন্যকিছু নয়।

২) অথবা তাময়ীয বা শনাক্তকরণ পদ্ধতি। কারণ, এটা কালো ও গাঢ়-মোটা দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত। আর এই রক্তই হায়েয হওয়ার অধিক উপযুক্ত লাল রক্তের তুলনায়।

৩) অথবা নারীদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রচলিত স্বভাব বিবেচনা। কারণ, আসল হলো একজন সদস্যকে ব্যাপক সর্বাধিক প্রচলিত স্বভাবের সাথে যুক্ত করা। এই তিনটি নিদর্শনের উপরেই সুন্নাহ এবং বুদ্ধির বিবেচনা ইঙ্গিত করে।

রক্ত নির্ণয়ে মুতাহায়্যিরাহ বা দিশেহারা নারীর সমস্যার সমাধানের মূলনীতি

নববী রহিমাহুল্লাহ আল মাজমূ' গ্রন্থে (২/৪৫৯) বলেছেনঃ আমাদের মাযহাবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণ এই বিষয় ঐকমত্য পোষণ করেছেনঃ যে নারী হায়েযের সময় (শুরু ও শেষ হওয়ার দিন-তারিখ) ও সংখ্যা মনে রাখতে পারে না, সে মুতাহায়্যিরাহ বা দিশেহারা নারী। তাকে মুহায়্যিরাহও বলা হয়। কারণ, সে ফকীহকে তার বিষয়ে দিশেহারা করেছে। আর মুতাহায়্যিরাহ শব্দটি একমাত্র তার উপরেই প্রয়োগ করা হয় যে, তার স্বভাবের দিন-তারিখ ও স্থায়িত্বের সংখ্যা ভুলে গিয়েছে। যার কোনো নির্ণায়ক নেই। আর যে শুধুমাত্র হায়েযের স্থায়িত্বের দিনগুলোর সংখ্যা ভুলে গিয়েছে, কিন্তু দিন-তারিখ ভুলেনি এবং যে নারীর অবস্থা এর বিপরীত, তাদেরকে আমাদের মাযহাবের আলেমগণ মুতাহায়্যিরাহ বলেন না। ভুলে যাওয়া বা বিস্মৃত হওয়ার বিষয়টি হয়ত অচেতনতা অথবা অবহেলা, অথবা অসুস্থতা, পাগলামি বা অন্য কোনো কারণে দীর্ঘদিন সমস্যায় জর্জরিত থাকার কারণে।

ভুলে যাওয়া নারী তখনি মুতাহায়্যিরাহ বিবেচিত হবে, যখন সে মুমায়্যিযাহ বা শনাক্তকারিণী না হবে। যদি সে শনাক্তকারিণী হয়, তাহলে এই বিষয়ের বিধান সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে যে, মাযহাবের নিয়মানুসারেঃ সে শনাক্তকরণের নিয়মানুসারে সিদ্ধান্ত নিবে। জেনে রাখো, দিশেহারা নারীর বিধান ভুলে যাওয়া নারীর সঙ্গেই নির্দিষ্ট নয়, বরং এটা প্রথম হায়েযা নারীর ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য হবে, যে তার রক্ত প্রবাহের শুরুর সময় সম্পর্কে জানে না।

প্রথম হায়েযা নারীর যদি ইস্তেহাযা হয় এবং সে যদি উভয়টির মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে না পারে

শায়েখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ আশ শারহুল মুমতি' গ্রন্থে (১/৪৯৩) বলেছেন: প্রাধান্যযোগ্য মত হলো: যেমনটি আমরা মুবতাদাআহ বা প্রথম হায়েযা নারীর ক্ষেত্রে বলেছিলাম: সে তার নিকটাত্মীয়দের স্মরণাপন্ন হবে। এবং চান্দ্র মাসের প্রথম তারিখ থেকে নারীদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রচলিত স্বভাব অনুসারে চলবে। আমরা এই ক্ষেত্রে তার হায়েয আসার প্রথম দিনকে বিবেচনায় নিব না, কারণ, সে তার স্বভাব মনে রাখেনি।

দুইবার রক্ত প্রবাহের মধ্যবর্তী বিরতিকালে বিদ্যমান 'পবিত্রতা'র বিধান

প্রথম মত: রক্ত প্রবাহের বিরতিকালের পবিত্রতার মেয়াদ - যদিও তা দীর্ঘ হয় - যখন সেই রক্ত প্রবাহ আবার হায়েযের মেয়াদ চলাকালে ফিরে আসে, তাহলে সেটা হায়েয বলেই বিবেচিত হবে। সে উক্ত সময়ে সালাত আদায় করবে না, সিয়ামও রাখবে না। এটা আবু হানীফা, তার মাযহাবের অনুসারীগণ, ছাওরী ও শাফেয়ীর দুইটি মতের একটি মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। এটাকে 'সাহ্ব' বলা হয়।

দ্বিতীয় মত: হায়েযের রক্ত প্রবাহ চলাকালে মধ্যবর্তী পবিত্রতার মেয়াদ একদিনের কম হবে না। এটা শাফেয়ী মাযহাবের একটি মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। এটাকে আহমাদের কিছু অনুসারী সহীহ বলেছেন। কারণ, হায়েযের রক্ত স্থায়ীভাবে প্রবাহিত হয় না। বরং সেটা একবার প্রবাহিত হয়, আবার সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এটার বিরতিকালের মেয়াদ যদি একদিন বা তার চাইতে বেশি হয়, তাহলে সেটা সহীহ পবিত্রতা। অন্যথায় সেটা হায়েযের অন্তর্ভুক্ত। আর এটাকে 'তালফিক' (জোড়া দেওয়া) বলা হয়। এটা কার্যকর করার নিয়ম হলো: রক্ত প্রবাহের দিনগুলোকে গণনা করে একটিকে অপরটির সাথে জোড়া দেওয়া, আর মধ্যবর্তী বিরতিকালীন পবিত্রতার দিনগুলোকে বাদ দেওয়া। আর যেই দিনেই সে পবিত্রতা লক্ষ্য করবে, সেই দিনেই গোসল করবে। অথবা প্রথম পবিত্রতা যেই দিন প্রথম লক্ষ্য করেছে, সেই দিনেই গোসল করবে। এরপরে সালাত আদায় করবে।

শায়েখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: বিশদিন অথবা চব্বিশদিন অথবা এই পরিমাণ সময় পর্যন্ত নারীর রক্ত প্রবাহ বন্ধ থাকা কালীন মেয়াদ পবিত্রতা বলে বিবেচিত হবে না। কারণ, এটা (পবিত্রতার মেয়াদ) নারীদের স্বভাবজাত বিষয়। যা স্বভাবের সাথে সম্পর্কিত। বিধায় পবিত্রতার মেয়াদ নির্ধারিত হবে তার পূর্ববর্তী (পবিত্রতা) স্বভাবের নিয়মানুসারে।

আমি বলব: যারা তালফিকের পক্ষে মত দিয়েছেন তাদের মাঝে মালেকী আলেমগণও আছে। কিন্তু তাদের মতে তালফিকের বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। কারণ, বিরতিকালীন পবিত্রতার মেয়াদ নির্দিষ্ট কোনো সময়ের সাথে নির্ধারণ করার পক্ষে কোনো দলীল নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার হায়েযের মেয়াদের মধ্যে থাকবে। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (২/২৫৬), আল হাবী (১/৪২৬), আল মুগনী (১/৩১৪), আল বিদায়াহ (১/১৩৮), আল মাজমূ' (২/৫১৭), ইবনু রজব (২/১৭৭), আশ শারহুল মুমতি' (১/৫০০)।

হায়েযের অভ্যাসে (নিয়মানুবর্তিতা) পরিবর্তন আসা অর্থাৎ হায়েযের দিনগুলো পূর্বের শুরুর তারিখের চাইতে আগে আসা অথবা পরে আসা অথবা হায়েযের দিনসমূহের মেয়াদ আগের তুলনায় বেশি বা কম হওয়া

প্রথম মত: যদি কোনো নারীর হায়েযের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্থায়ী কোনো অভ্যাস চলমান থাকে, এরপরে যদি সে তার প্রচলিত অভ্যাস বহির্ভূত সময়ে রক্ত দেখতে পায়, তাহলে তার এই অভ্যাস বহির্ভূত রক্ত হায়েয বলে গণ্য হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এমন রক্তপাত তিনবার না হবে। এটা আহমাদের একটি বর্ণনা এবং শাফেয়ী মাযহাবের একটি মত। আর আহমাদের দ্বিতীয় বর্ণনা ও শাফেয়ী মাযহাবের অন্য মতানুসারে যতক্ষণ পর্যন্ত দুইবার এমন রক্তপাত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটাকে হায়েয বলে গণ্য করা হবে না।

দ্বিতীয় মত: যদি সে প্রচলিত অভ্যাসের পূর্বেই রক্ত দেখে, তাহলে সেটা হায়েয বলে গণ্য হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা দুইবার না হবে। আর যেই রক্তপাত অভ্যাসের মেয়াদ শুরু হওয়ার পরে দেখা যাবে, সেটা হায়েয বলে গণ্য হবে। এটা আবু হানীফার মত।

তৃতীয় মত: অভ্যাসের পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সবগুলো রক্তপাতই হায়েয বলে বিবেচিত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত হায়েযের সর্বোচ্চ মেয়াদ অতিক্রম না করবে। এটা শাফেয়ীর মত। শাফেয়ী মাযহাব মতে, হায়েযের সর্বোচ্চ মেয়াদ পনের দিন। নববী বলেছেন: যদি কোনো নারীর পনের দিনের কম হায়েযের অভ্যাস থাকে, তার রক্তপাত যদি তার পনের দিনের অভ্যাসের চাইতে বেশি হয়, তাহলে তার জন্য ইমসাক ওয়াজিব। অর্থাৎ ইবাদত থেকে বিরত থাকবে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: তৃতীয় মত, যা ইমাম শাফেয়ীর মত। তবে পনের দিনের দ্বারা এর মেয়াদকে নির্দিষ্ট করা সঠিক নয়। পূর্বে এটা উল্লেখ করা হয়েছে: সহীহ মতানুসারে হায়েযের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মেয়াদ বলে কিছু নেই। এটা ইবনু কুদামা, ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু উসাইমীনের নিকট গ্রহণযোগ্য মত।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: শরীআত প্রণেতা হায়েযের সঙ্গে একাধিক বিধানকে সংযুক্ত করেছেন। কিন্তু হায়েযকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদ দ্বারা নির্ধারিত করেননি। ফলে এটা বুঝা গেল যে, তিনি হায়েযের ক্ষেত্রে মানুষকে তাদের অভ্যাস ও প্রচলন অনুসরণের দায়িত্ব দিয়েছেন। আর হায়েযের ক্ষেত্রে নারীদের সাধারণ প্রচলন হলো: কোনো নারী যদি এমন কোনো রক্ত দেখে, যা হায়েয হওয়ার উপযুক্ত, তাহলে সেটাকে হায়েয মনে করবে। আর

যদি উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে তারা হায়েযের মেয়াদ গণনা করত, সেটার বিবরণ আমাদের নিকট অবশ্যই আসত। এমন বর্ণনা সকলে মিলে গোপন করা অসম্ভব, যেহেতু এমন বিষয়ের সমাধান খুবই জরুরী। এরপরে তিনি দলীলসমূহ উল্লেখ করেছেন।

ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: একইভাবে যদি পরিবর্তনশীলা (যার হায়েযের মেয়াদ ঘন ঘন পরিবর্তন হয়) নারীর অভ্যাস কম বা বেশি হয় অথবা মেয়াদ শুরুর বা শেষ হওয়ার তারিখের পরিবর্তন ঘটে, তাহলে সেটা হায়েয বলে বিবেচিত হবে। যদি রক্তপাত অবিরত চলমান থাকে, তাহলে সেটা ইস্তেহাযা বলে গণ্য হবে। কারণ, সে প্রথম হায়েযা নারীর ন্যায়।

আমি বলব: অভ্যাসের আগে অথবা পরে, মেয়াদের পরিমাণ অভ্যাসের চাইতে বেশি বা কম হওয়ার উদাহরণগুলো নিম্নরূপ:

অভ্যাসের আগে হায়েয শুরু হওয়ার উদাহরণ: কোনো নারীর প্রথমে অভ্যাস ছিল মাসের শেষে হায়েয হওয়া। পরবর্তীতে মাসের শুরুতে হায়েয আসতে শুরু করল।

অভ্যাসের পরে হায়েয শুরু হওয়ার উদাহরণ: প্রথমে অভ্যাস ছিল মাসের শুরুতে হায়েয আসা, পরবর্তীতে হায়েয আরো দেরিতে মাসের শেষে আসতে শুরু করল।

মেয়াদের পরিমাণ পূর্বের অভ্যাসের চাইতে কম হওয়ার উদাহরণ: প্রথমে তার অভ্যাস ছিল সাত দিন পর্যন্ত হায়েয হওয়া। পরে তার হায়েয স্থায়ী হলো মাত্র পাঁচ দিন পর্যন্ত। এরপরে সে পবিত্র হয়ে গেল।

মেয়াদের পরিমাণ পূর্বের অভ্যাসের চাইতে বেশি হওয়ার উদাহরণ: প্রথমে তার অভ্যাস ছিল পাঁচ দিন পর্যন্ত হায়েয হওয়া। পরে তার হায়েয সাত দিন পর্যন্ত স্থায়ী হলো।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/৩৫১), আল মাজমূ' (২/৪৪০, ৪৪৩), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (১৯/২৩৯), আশ শারহুল মুমতি' (১/৪৯৫)।

গর্ভবতী মহিলার কি হায়েয হতে পারে?

প্রথম মত: গর্ভবতী মহিলার হায়েয হয় না। সে যদি রক্ত প্রবাহ দেখে, তাহলে সেটা ফাসিদ (রোগযুক্ত) রক্ত বলে বিবেচিত হবে। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "গর্ভবতী নারীদের মেয়াদ স্থায়ী হবে তাদের সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত"। (আত তালাক: ৪)। সুতরাং এই আয়াতটি থেকে বুঝা যায় যে, গর্ভবতী নারী হায়েযা হয় না। যদি তার হায়েয হতো, তাহলে তার 'ইদ্দত হত তিন হায়েয পর্যন্ত। আর এটা তালাকপ্রাপ্তা (গর্ভবতী) নারীর 'ইদ্দত। এছাড়াও: ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস: তিনি যখন স্বীয় স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলেন, তখন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বললেন:

"তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ দাও। সে যেনো স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার পরে তাকে পবিত্র অবস্থায় অথবা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেয়"। সুতরাং এখানে গর্ভ ধারণকে হায়েয না থাকার আলামত ধার্য করলেন। যেভাবে পবিত্রতাকে হায়েয না থাকার আলামত ধার্য করলেন। এই দলীলের উত্তর ইবনু কাইয়িম এভাবে দিয়েছেন: তালাকের বৈধতা দুইটি শর্ত দ্বারা যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়: পবিত্রতা ও স্ত্রীকে স্পর্শ না করা, তাহলে গর্ভবতী নারী গর্ভাবস্থায় যেই রক্ত দেখতে পাবে, সেটার বিধান কী হবে? অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় যেই রক্ত নির্গত হয়, সেটাও তো নাপাক রক্ত। তাহলে গর্ভাবস্থায় তালাক দেওয়া হলে পবিত্রতার শর্ত কীভাবে মানা হবে?

দ্বিতীয় মত: যদি গর্ভবতী নারী এমন রক্ত দেখে, যা হায়েয হওয়ার উপযুক্ত, তাহলে সেটা হায়েয বলেই গণ্য হবে। এটা কাতাদাহ, মালেক, লাইছ ও যুহরীর মত। এটা শাফেয়ী মাযহাবের সহীহ মত। এটা ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু কাইয়িম ও ইবনু উসাইমীনের মত।

তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তা নাপাক" (আল বাকারাহ: ২২২)। তারা বলেছেন: যখন এই নাপাকি পাওয়া যাবে, তখনি এটার বিধানও প্রযোজ্য হবে। এই বিষয়ে আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীস বিদ্যমান, যা সহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "এই বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা আদম কন্যা সন্তানদের উপরে ধার্য করে দিয়েছেন"। আর এই হাদীসটি: "তোমার হায়েয যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে আটকে রাখে (সালাত থেকে), ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি (সালাত থেকে) বিরত থাকো"। এই হাদীস দুইটি এই বিষয়ের দলীল যে, হায়েযের বিধান ও রক্তের বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে মহিলাদের অভ্যাস গ্রহণযোগ্য। তাদের আরো অনেকগুলো দলীল রয়েছে। এই মাসআলা সম্পর্কে ইবনু কাইয়িমের সুন্দর বিশ্লেষণ রয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: দ্বিতীয় মত। শায়েখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যদি গর্ভবতী নারী ঐ স্বাভাবিক রক্ত গর্ভাবস্থায় দেখতে পায়, যা অন্য সময়ে তার অভ্যাস অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে, মাসের নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট অবস্থায় আসে, তাহলে গর্ভাবস্থার এই রক্তকে (গর্ভাবস্থার রক্ত অন্য সময়ের রক্তের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে) হায়েযের রক্ত বলেই বিবেচনা করা হবে। এর কারণে সে সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদত পরিত্যাগ করবে। তবে গর্ভ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে এটাকে হায়েয বহির্ভূত রক্ত বলে বিবেচনা করা হবে। অর্থাৎ 'ইদ্দত গণনার ক্ষেত্রে এটা ধর্তব্য হবে না। কারণ, গর্ভধারণ অবস্থা হায়েযের চাইতে অধিক শক্তিশালী। আর গর্ভধারণকালে হায়েয হলে হায়েযের বিধান মেনে চলতে হবে। এর ব্যাখ্যা হলো: যদি কোনো মহিলার হায়েয গর্ভকালের পূর্বের অভ্যাস মাফিক হায়েযের ন্যায় স্থায়ী হয়, তাহলে আমরা সেটাকে হায়েয বলেই গণ্য করব। আর যদি তার রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়, এরপরে বিরতি নিয়ে আবার রক্তপাত শুরু হয়, তাহলে সেটা হায়েয নয়।

দ্রষ্টব্য: আল মুগনী (১/৩৬১), আল মাজমূ’ (২/৪১৪), আল ফাতাওয়া (১৯/২৩৯), আয যাদ (৫/৭৩৪), আশ শারহুল মুমতি’ (১/৪৬৯) ।

হায়েযা নারীর রক্তপাত বন্ধ হলে গোসলের পূর্বে তার সঙ্গে সহবাস করা জায়েয হবে?

প্রথম মত: গোসলের পূর্বে হায়েযা নারীর সাথে সহবাস করা হারাম। যদিও তার রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। ইবনু মুনযির বলেছেন: এটা আলেমগণের ইজমা’ এর ন্যায়। আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল মারওয়াযী বলেছেন: এই বিষয়ে আমি কোনো মতানৈক্য আছে বলে মনে করি না। তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা‘আলার বাণী: “তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তা নাপাক। বিধায়, তোমরা হায়েয কালে তাদের (সহবাস করা) থেকে দূরে থাকো। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না” (আল বাকারাহ: ২২২)। অর্থাৎ রক্তপাত বন্ধ হওয়া পর্যন্ত। “এরপরে যখন তারা পবিত্র হবে” অর্থাৎ যখন তারা গোসল করবে। “তখন তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস করো যেই স্থান থেকে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন” (আল বাকারাহ: ২২২) ।

জমহুর আলেমগণ এভাবেই تطهر– (পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা) কে গোসল দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণী: “যদি তোমরা জুনুবী হও, তাহলে পূর্ণাঙ্গরূপে পবিত্রতা অর্জন করো” (আল মায়িদাহ: ৬) । এই নিয়মের ভিত্তিতে: সহবাস বৈধ হওয়ার জন্য দুইটি শর্ত প্রযোজ্য: রক্তপাত বন্ধ হওয়া ও গোসল করা। বিধায়, সহবাস এই দুইটি শর্ত পূরণ করা ব্যতীত বৈধ হবে না।

দ্বিতীয় মত: যদি হায়েযের সর্বোচ্চ মেয়াদে রক্তপাত বন্ধ হয়, তাহলে উক্ত মহিলার সঙ্গে সহবাস করা জায়েয আছে। আর যদি সর্বোচ্চ মেয়াদের আগেই রক্তপাত বন্ধ হয়, তাহলে সে গোসল বা তায়াম্মুম করার আগে অথবা উক্ত অবস্থায়, এক ওয়াক্ত সালাতের সময় অতিবাহিত হতে হবে। তারপরে তার সঙ্গে সহবাস করা জায়েয হবে। তার আগে নয়। এটা আবু হানীফার মত। যেহেতু, জানাবাতের কারণে গোসল ওয়াজিব হবে। কিন্তু এই ওয়াজিব সহবাসের প্রতিবন্ধক নয়।

ইবনু হাযম বলেছেন: হায়েয থেকে মুক্ত হওয়ার পরে সে পানি দ্বারা গোসল করবে অথবা তায়াম্মুম করবে, যদি সে তায়াম্মুম করার উপযুক্ত হয়। যদি সেটাও না করে, তাহলে সালাতের ন্যায় ওযূ করবে অথবা তায়াম্মুম করবে, যদি সে তায়াম্মুমের উপযুক্ত হয়। যদি তাও না করে, তাহলে কমপক্ষে লজ্জাস্থান ধৌত করবে। কমপক্ষে এটা ধৌত করতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। অর্থাৎ এই চারটির যেকোনো একটি কাজ সম্পন্ন করার দ্বারাই তার জন্য সহবাস করা জায়েয হবে।

ইবনু হাযম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে" (আল বাকারাহ: ২২২)। এটা তাদের কাজের বিবরণ। আমরা যা কিছু বর্ণনা করলাম, সেগুলোকে শরীআতে এবং ভাষায়: تطهر– ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন, طهور– পবিত্রতা অর্জন ও طهور– পবিত্রতা বলা হয়। বিধায় সে যেটাই করবে, পবিত্র হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "সেখানে এমন সব লোক আছে, যারা উত্তরমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে" (আত তাওবাহ: ১০৮)। এই বিষয়ে নস (কুরআন হাদীসের দলীল) ও ইজমা' বিদ্যমান: উক্ত আয়াতে পবিত্রতা অর্জন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: লজ্জাস্থানের সামনের ও পেছনের অংশ পানি দ্বারা ধৌত করা। উক্ত মাসআলায় যারা আমাদের এই মত পোষণ করেছেন, তারা হলো: আতা, তাউস, মুজাহিদ। এটা আমাদের মাযহাবের আলেমদের মত।

ইবনু হাযমের এই দলীলের বিশ্লেষণের উত্তর দেওয়া হয়েছে। আর এখানে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: হাদাস (বড়) থেকে পবিত্র হওয়া। যা গোসল করা ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। এই দাবির পক্ষে দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "যদি তোমরা জুনুবী হও, তাহলে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করো" (আল মায়িদাহ: ৬), আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন: "কিন্তু তিনি তোমাদেরকে উত্তমরূপে পবিত্র করতে চান" (আল মায়িদাহ: ৬) ।

গ্রহণযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মুহাল্লা (১/৩৯১), আল মুগনী (১/৩৩৮), ইবনু রজব (২/৭), আশ শারহুল মুমতি' (১/৪৮২) ।

٤٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ؛ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ».

৪০. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, উম্মে হাবীবাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) দীর্ঘ সাত বছর ধরে ইস্তেহাযা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এজন্য তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গোসল করতে বলেন। এরপর তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করতেন। [সহীহ বুখারী হা/৩২৭ ও মুসলিম হা/৩৩৪]

ইস্তেহাযাগ্রস্থ নারী কি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করবে নাকি ওযূ করবে?

প্রথম মত: তার জন্য প্রত্যেক সালাতের আগে ওযূ করা ওয়াজিব। কোনো সালাতের জন্য গোসল করা তার উপরে ওয়াজিব নয়। তবে হায়েয বন্ধ হওয়ার পরে মাত্র একবার গোসল করা ওয়াজিব। এটা জমহুর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণের মত। যা আলী, ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস, আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ও অন্যান্য তাবেঈন ও তাবিউত তাবেঈনের মত।

দ্বিতীয় মত: প্রত্যেক দিনের জন্য একবার করে গোসল করবে। এটা আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার মত। ইবনু মুসাইয়্যিব বলেছেন: এক যুহর থেকে আরেক যুহর পর্যন্ত, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য একবার গোসল করবে। আর প্রত্যেক সালাতের জন্য একবার করে ওযূ করবে। একই কথা হাসান বাসরী বলেছেন। শা'বী বলেছেন: যদি সে প্রত্যেক দিন একবার করে গোসল করে, তাহলে সেটা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

তৃতীয় মত: প্রত্যেক সালাতের জন্য একবার করে গোসল করতে হবে। এই মতটি 'আলী, ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার, ইবনুয যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ও আতা বিন আবী রাবাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ মত: যুহর ও আসর এক গোসল দ্বারা আদায় করবে। আর মাগরিব ও 'ইশা এক গোসল দ্বারা আদায় করবে। আর ফজরের জন্য আরো একবার গোসল করবে। এই মতটি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটা তার থেকে বর্ণিত তৃতীয় মত।

পঞ্চম মত: প্রত্যেক সালাতের জন্য ইস্তেহাযাগ্রস্থ নারীকে ওযূ করতে হবে না। তবে যদি অন্য কোনো হাদাস সংঘটিত হয়, তাহলে পুনরায় তাকে ওযূ করতে হবে। যেমন: পেশাব, বায়ু নির্গমন ইত্যাদি। যেগুলো ওযূ ভঙ্গের কারণ। এই মতটি ইবনু রবীআহ থেকে বর্ণিত। যা মালেক, ইকরিমা ও আইয়ুব সাখতিয়ানী থেকে বর্ণিত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটি। আর ইস্তেহাযাগ্রস্থ নারীর জন্য ওয়াজিব হলো, হায়েয থেকে মুক্ত হওয়ার পরে গোসল করা। এরপরে সে প্রত্যেক সালাতের জন্য একবার করে ওযূ করবে। আর প্রত্যেক সালাতের জন্য একবার করে গোসল করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করার বিষয়ে কোনো সহীহ দলীল নেই। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (২/১৫৮), আল ইসতিযকার (৩/২২৬), আল বিদায়াহ (১/১৫৪), আল মাজমূ' (২/৫৫৩), আল ফাতহ (১/৪২৭)। মিসকুল খিতাম ১/২৫৭।

ইস্তেহাযাগ্রস্থ নারী পবিত্র ব্যক্তির ন্যায় সে সালাত আদায় করবে এবং সিয়াম রাখবে

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: দ্বিতীয় প্রকার হলো: এমন রক্ত, যা অভ্যাস, স্বভাব এবং জন্মগত নিয়ম বহির্ভূত। বরং এটা একটি শিরা থেকে নির্গত রক্ত, যে শিরার রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয় একমাত্র অসুস্থতা থেকে মুক্ত হওয়ার সময়। তার আগে নয়। এমন রক্তের বিধান হলো: মহিলা এই সময় পবিত্র থাকে। এই রক্ত সালাত ও সিয়ামের প্রতিবন্ধক নয়। এই বিষয়টি আলেমগণের ইজমা' দ্বারা সাব্যস্ত। এই বিষয়ে সকল মারফু' আসারগুলো একই রকম। যদি এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এটা শিরার রক্ত, হায়েযের নয়।

নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আর সালাত, সিয়াম, ইতিকাফ, কুরআন পাঠ, মুছহাফ স্পর্শ করা, মুছহাফ বহন করা, তেলাওয়াতের সিজদাহ, শুকরিয়ার সিজদাহ এবং যাবতীয় ইবাদত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে তার অবস্থা হুবহু পবিত্র মহিলার ন্যায়। এই বিষয়টি সর্বসম্মত। একইভাবে একাধিক আলেমগণ এই বিষয়ের ইজমা' বর্ণনা করেছেন।

দ্রষ্টব্য: আত তামহীদ (১৬/৬৮), শারহু মুসলিম (৩৩৩), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (২৬/২৩৪)।

ইস্তেহাযাগ্রস্থ নারীর সাথে সহবাস করা কি জায়েয আছে?

প্রথম মত: ইস্তেহাযাগ্রস্থ নারীর সাথে সহবাস করা জায়েয আছে, তবে ঐ সময়, যখন তাকে পবিত্র বলা যায় অর্থাৎ যখন সে হায়েয থেকে পবিত্র থাকে। এতে মাকরূহ হওয়ার কিছু নেই। যদিও রক্ত প্রবাহমান হয়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। তাদের দলীল হলো:

(১) আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তোমাদের নারীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে। সুতরাং তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে চাও, সেভাবে গমন করো" (আল বাকারাহ: ২২৩)।

(২) সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর মধ্যে যাদের স্ত্রীগণের ইস্তেহাযা হতো, তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় সতের এর কাছাকাছি। তাদেরকে কখনো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ স্বামী থেকে দূরে থাকতে আদেশ দিয়েছেন মর্মে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। যদি এটা আল্লাহ তা'আলার শরীআতে থাকত, তাহলে সেটা অবশ্যই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সাহাবীকে বর্ণনা করতেন, যার স্ত্রী ইস্তেহাযাগ্রস্থ হতো এবং শরীআত সংরক্ষণের স্বার্থে সেটাকে অবশ্যই বর্ণনা করা হতো। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই যেহেতু হয়নি, তাই বুঝা গেল যে, এটা হারাম নয়।

৩) শারঈ আদেশ-নিষেধ থেকে দায়মুক্তির মূলনীতি।

৪) হায়েযের রক্ত আকৃতি, প্রকৃতি ও বিধানগত দিক থেকে ইস্তিহযার রক্তের মত হয় না। এই জন্যই ইস্তেহাযাগ্রস্থ নারীর উপরে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। এই রক্ত সহকারে যদি

সালাত বৈধ হয়, তাহলে তার সঙ্গে সহবাস কেনো বৈধ হবে না। অথচ সালাতের নিষেধাজ্ঞা সহবাসের নিষেধাজ্ঞার চাইতে অধিক অধিক বড়।

(৫) হায়েযের মেয়াদ অল্প কয়েকদিন। বিধায়, উক্ত সময়ে সহবাস থেকে বিরত থাকাটা সহজ। পক্ষান্তরে ইস্তেহাযার মেয়াদ অনেক দীর্ঘ। বিধায়, উক্ত সময়ে সম্পূর্ণরূপে নিষেধাজ্ঞা দিলে, অথবা উক্ত সময়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকার কারণে কঠিন সমস্যা তৈরি হয়। যা শরীআতে প্রত্যাখ্যাত।

দ্বিতীয় মত: তার সঙ্গে সহবাস করা বৈধ নয়। যা হাসান, ইবনু সিরিন, শা'বী, নাখঈ, হাকাম, সুলায়মান বিন ইয়াসার, মানছুর ও যুহরীর মত। আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইস্তেহাযাগ্রস্থ নারীর সাথে তার স্বামীর সহবাস করাকে অপছন্দ করতেন।

ইমাম আহমাদের প্রসিদ্ধ মতানুসারে: স্বামীর জন্য সহবাসের অনুমতি রয়েছে, যদি সে নিজের ব্যাপারে ব্যভিচারের আশঙ্কা করে। তাদের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, এটা নাপাক। সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালে নারীদের (সহবাস করা) থেকে দূরে থাকো" (আল বাকারাহ: ২২২)। এখানে আল্লাহ তা'আলা নারীদের থেকে দূরে থাকার কারণ নির্ধারণ করেছেন এই কথা দ্বারা: হায়েযের রক্ত নাপাক। আর এটাও জানা বিষয় যে, ইস্তেহাযার রক্তও নাপাক। এই জন্যই এটা ঘৃণিত রক্ত। কিন্তু ইস্তেহাযাগ্রস্থ নারীর সাথে সহবাসের নিষেধাজ্ঞা হায়েযা নারীর সাথে সহবাসের নিষেধাজ্ঞার চাইতে একটু শিথিল। যেহেতু হায়েযা নারীর সাথে সহবাসের ব্যাপারে কুরআনের নস (দলীল) দ্বারা সরাসরি নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আর ইস্তেহাযাগ্রস্থ নারীর সাথে সহবাসের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি হয়ত কিয়াস, নতুবা দলীল এটাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে" মর্মে কৃত দাবি দ্বারা সাব্যস্ত হয়। আর যদি আহমাদের মতানুসারে, শারীরিক কষ্টের কারণে ইস্তেহাযাগ্রস্থ নারীর সাথে সহবাস করা জায়েয হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে কাফফারার কোনো বিধান নেই। পক্ষান্তরে, হায়েযা নারীর সাথে সহবাস করলে কাফফারা দিতে হবে। তাদের পক্ষে আরো অনেকগুলো দলীল আছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রথম মতটিই গ্রহণযোগ্য। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য: আল মাজমূ' (২/৫৬১), শারহু মুসলিম (৩৩৩), আল ফাতহ লি ইবনি রজব (২/১৭৯), আন নাইল (২/১৫৪), আশ শারহুল মুমতি' (১/৫০৩)।

٤١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلَانَا جُنُبٌ .فَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

৪১. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ে অপিবত্র থাকাবস্থায় একই সাথে একই পাত্র হতে নাপাকির গোসল করতাম। [সহীহ বুখারী হা/২৯৯ ও মুসলিম হা/৩২১]

আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি শরীরের নিচের দিকে ভালোভাবে কাপড় পরে নিতাম। তারপর আমার হায়েয অবস্থায় তিনি আমার সাথে মেলামেশা করতেন। [সহীহ বুখারী হা/৩০০ ও মুসলিম হা/২৯৩]

আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) আরো বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ করাকালীন সময়ে তার মাথা বের করে দিতেন আর ঋতুবতী থাকাবস্থায় আমি তার মাথা ধুয়ে দিতাম। [সহীহ বুখারী হা/৩০১ ও মুসলিম হা/২৯৭]

স্বামী স্ত্রীর একত্রে অথবা একে অপরের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার বিধান কী?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার এই হাদীসটি সহ আরো কয়েকটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন: আর একই পাত্রের পানি দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর একত্রে পবিত্রতা অর্জনের বিষয়টি মুসলিমদের ইজমা' দ্বারা জায়েয সাব্যস্ত হয়েছে। আর পুরুষের অবশিষ্ট পানি দ্বারা নারীর জন্য পবিত্রতা অর্জন করাও ইজমা' দ্বারা জায়েয। আর নারীর অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা আমাদের মতে, মালেক, আবু হানীফা ও অধিকাংশ আলেমের মতে জায়েয। চাই, উক্ত পানি ঐ নারী একান্তে ব্যবহার করুক অথবা না করুক। আমাদের মাযহাবের কিছু আলেম বলেছেন: এতে মাকরূহ হওয়ার কিছু নেই। যেহেতু এই বিষয়ে অনেকগুলো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও দাউদ বলেছেন: যদি সে উক্ত পানি একান্তে ব্যবহার করে, তাহলে পুরুষের জন্য তার অবশিষ্ট পানিটুকু ব্যবহার করা জায়েয নেই। এই মতটি বর্ণিত হয়েছে: আব্দুল্লাহ বিন সারজিস, হাসান বাসরী। আর আহমাদ রহিমাহুল্লাহ থেকে আমাদের মাযহাবের ন্যায় একটি মত বর্ণিত হয়েছে। আবার হাসান ও সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব থেকে নারীর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা সর্বক্ষেত্রে মাকরূহ মর্মে মত বর্ণিত হয়েছে।

তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো: জমহুল আলেমগণের মত। যা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে, একই পাত্রের পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন সম্বলিত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়। আর স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেই অপরের অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করবে। একাকী ব্যবহার করার দ্বারা বিধানে কোনো পরিবর্তন আসবে না।

হায়েযা নারীর শরীরে শরীর লাগিয়ে শয়ন করা এবং তার রান্না করা ও খামীর তৈরি করা এবং অন্যান্য কাজসমূহের বিধান কী?

লেখক কর্তৃক বর্ণিত আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীসের ব্যাখ্যায়, ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: একইভাবে আরো হাদীস এই বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো মুসলিমে (৩০০) বর্ণিত আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদীসটি। তিনি বলেছেন: "আমি হায়েয কালে পানি পান করতাম। এরপরে উক্ত পাত্র নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখে পাত্র ধরতাম। তিনি তার মুখ আমার মুখ রাখার স্থানে রাখতেন। এরপরে তিনি পান করতেন। হায়েয কালে আমি হাড্ডির উপরের গোশত খেতাম। এরপরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে সেটা তুলে ধরতাম, তিনি আমার কামড় দেওয়া স্থানে মুখ দিয়ে সেটা আহার করতেন"। নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই হাদীসে: হায়েযা নারীর সঙ্গে ঘুমানো, একই কম্বলে তার সঙ্গে দেহ লাগিয়ে শয়ন করা জায়েয আছে। যদি সেখানে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থানে আলিঙ্গনে প্রতিবন্ধক থাকে। অথবা শুধুমাত্র লজ্জাস্থানের সাথে আলিঙ্গনে প্রতিবন্ধক থাকে, তাদের মতানুসারে, যারা শুধুমাত্র লজ্জাস্থানের সঙ্গে আলিঙ্গনকে হারাম বলেছেন।

আলেমগণ বলেছেন: হায়েযা নারীর শরীরে শরীর লাগানো, তাকে চুমু দেওয়া, হাঁটুর নিচে এবং নাভীর উপরের অঙ্গে সম্ভোগ করা মাকরূহ নয়। কোনো তরল বস্তুতে তার হাত রাখা মাকরূহ নয়। তার জন্য নিজ স্বামী অথবা অন্য কোনো মাহরামের মাথা ধুয়ে দেওয়া, তাদের চুল আঁচড়ে দেওয়া মাকরূহ নয়। তার জন্য রান্না করা ও খামীর তৈরি করা ইত্যাদি জাতীয় কাজসমূহ মাকরূহ নয়। তার উচ্ছিষ্ট ও ঘাম পবিত্র। এই সকল মাসআলা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন জারীর তার গ্রন্থ 'মাযাহিবুল উলামা' - এ এই সকল মাসআলার উপরে মুসলিমদের ইজমা' বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয়ে সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত দলীলসমূহ স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী: "সুতরাং তোমরা হায়েযকালে নারীদের (সহবাস করা) দূরে থাকো। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটবর্তী হয়ো না"। (আল বাকারাহ: ২২২)। এখানে উদ্দেশ্য হলো: তাদের সঙ্গে সহবাস করা থেকে দূরে থাকো। তাদের সঙ্গে সহবাস করার উদ্দেশ্যে তাদের নিকটবর্তী হয়ো না।

দ্রষ্টব্য; আল ইশরাফ (১/৩৫৫), শারহু মুসলিম (৩০০), আন নাইল (২/১৫৩)।

হায়েযা নারীকে সঙ্গমের মাধ্যমে আলিঙ্গন করা হারাম

নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: জেনে রাখো, হায়েযা নারীর সঙ্গে আলিঙ্গনের কয়েকটি প্রকার আছে:

প্রথম প্রকার: হায়েযা নারীর লজ্জাস্থানে সঙ্গমের পদ্ধতিতে আলিঙ্গন করা। এটা মুসলিমদের ইজমা', কুরআনের দলীল ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা হারাম সাব্যস্ত। আমাদের মাযহাবের আলেমগণ বলেছেন: যদি কোনো মুসলিম হায়েযা নারীর লজ্জাস্থানে সহবাস করাকে হালাল বলে বিশ্বাস করে, তাহলে সে কাফের ও মুরতাদ বলে বিবেচিত হবে। আর যদি একই কাজকে হালাল মনে না করে কোনো মুসলিম পালন করে, আর সে যদি ভুলবশত সেটা করে অথবা হায়েযের ব্যাপারে না জেনে করে অথবা হায়েয অবস্থায় 'কাজটি হারাম' হওয়ার ব্যাপারে না জেনে করে অথবা যদি জোরপূর্বক তাকে দিয়ে এমন কাজ করানো হয়, তাহলে তার কোনো গুনাহ হবে না। তার উপরে কোনো কাফফারা ওয়াজিব হবে না। আর যদি সে তার হায়েয ও উক্ত অবস্থায় কাজটি নিষেধের ব্যাপারে জেনে বুঝেও ইচ্ছাকৃত তার সঙ্গে সহবাস করে, তাহলে সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলো। ইমাম শাফেয়ী উক্ত গুনাহকে স্পষ্টভাষায় কবীরা গুনাহ বলেছেন।

আমি বলব: হায়েয অবস্থায় পুরুষের জন্য তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম হওয়ার পক্ষে ইজমা' বর্ণনা করেছেন: ইবনু মুনযির, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু কুদামা ও অন্যান্য আলেমগণ।

দ্রষ্টব্য: আল আওসাত (২/২০৮), আল মুগনী (১/৩০৮), শারহু মুসলিম (২৯৩), আল ফাতাওয়া (২১/৬২৪) ।

হাঁটুর নিচে এবং নাভীর উপরে হায়েযা নারীর সাথে সঙ্গম করা জায়েয

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আর নাভীর উপরে, হাঁটুর নিচে সম্ভোগ করা জায়েয আছে। এই বিষয়ে অনেক আলেমগণ ইজমা' বর্ণনা করেছেন।

নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: দ্বিতীয় প্রকার: নাভীর উপরে এবং হাঁটুর নিচে পুরুষাঙ্গের দ্বারা সঙ্গম করা অথবা চুমু দেওয়া অথবা জড়িয়ে ধরা অথবা স্পর্শ করা অথবা অন্যান্য কাজ করা আলেমগণের ঐক্যমতে হালাল। শায়েখ আবু হামিদ আল ইসফিরায়িনী এবং আলেমদের একটি বিরাট দল উক্ত বিষয়ে ইজমা' বর্ণনা করেছেন।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (২৯৩), ইবনু রজব (২/৩৫) ।

নাভীর এবং হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানে হায়েযা নারীর সঙ্গে সঙ্গম করার বিধান?

প্রথম মত: উক্ত স্থানে একমাত্র নারীর লজ্জাস্থানে (যোনিমুখে) পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানো ব্যতীত আর কোনো কাজ হারাম নয়। অন্যান্য কাজ উক্ত স্থানে জায়েয আছে। এই মতটি জমহুর আলেমগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন: ইবনু আব্বাস, আয়িশা, উম্মে সালামহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ও তাদের পরবর্তী আলেমগণ।

দ্বিতীয় মত: নাভীর নিচে এবং হাঁটুর উপরের মধ্যবর্তী স্থানে একমাত্র ইযার তথা দেহের নিম্নাংশের পোশাকের ওপর থেকে সম্ভোগ করা জায়েয আছে। সরাসরি কোনো প্রকার সম্ভোগ জায়েয নেই। এটাই মালেক, শাফেয়ী ও আবু হানীফা থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ মত। আহমাদের একটি বর্ণনা। তবে এই বর্ণনা তার অধিকাংশ অনুসারীগণের মতে, তার থেকে সাব্যস্ত হয়নি।

তৃতীয় মত: যদি নিম্নাংশের পোশাকের ভেতর থেকে সঙ্গমকারী ব্যক্তির এতটুকু আত্মবিশ্বাস থাকে যে, ‘সে নিজেকে নারীর স্ত্রী লিঙ্গ থেকে দূরে রাখতে পারবে’, যা দুর্বল আকাঙ্খা অথবা অত্যধিক তাকওয়ার কারণে সম্ভব। তাহলে তার জন্য এটা জায়েয আছে। অন্যথায় তা জায়েয নেই। এটা শাফেয়ীদের একদল আলেমের মত। ইবনু রজব হাম্বলী এটাকে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন: এটা উত্তম মত। আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার বক্তব্যে এই মতের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন: তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের আকাঙ্খাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমনটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ন্ত্রণ করতেন? এই মতের পক্ষে আরেকটি প্রমাণ হলো: সিয়াম অবস্থায় নারীর সঙ্গে মিলন করার মাসআলা। সেখানে ‘নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে কি না’, এই বিষয়ে ‘আশঙ্কাকারী এবং আস্থাবান’ এই দুই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন: “নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সিয়াম অবস্থায়) চুমু দিতেন, জড়িয়ে ধরতেন। আর তিনি ছিলেন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আত্ম নিয়ন্ত্রয়ক” ।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (২৯৩), আল ফাতহ লি ইবনি রজব (২/৩৩), আল ফাতহ (১/৪০৪)।

٤٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنَا حَائِضٌ.

৪২. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঋতুবতী থাকাবস্থায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। [সহীহ বুখারী হা/২৯৭ ও মুসলিম হা/৩০১]

٤٣. عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».

৪৩. মুআ'যা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) কে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ঋতুবতী মহিলারা সিয়াম কাযা করে অথচ সালাত কাযা করে না, এটি কেমন কথা? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি কি হারুরিয়া? আমি বললাম, আমি হারুরীয়াহ নই। বরং আমি জিজ্ঞাসা করছি। তখন তিনি বললেন, আমাদেরও এরকম হায়েয হতো। তখন আমাদের কে সিয়াম কাযা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হতো। কিন্তু সালাত কাযা করার নির্দেশ দেয়া হতো না। [সহীহ বুখারী হা/৩২১ ও মুসলিম হা/৩৩৫]

হায়েয ও নেফাসগ্রস্থ নারী সালাতের কাযা আদায় করবে না

নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এই বিধানটি সর্বসম্মত। মুসলিমগণ এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছে: "হায়েয ও নেফাসগ্রস্থ নারীর উপরে তাৎক্ষণিক কোনো সালাত ও সিয়াম ওয়াজিব হবে না। আর তাদের উপরে সালাতের কাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়। তবে তাদের উপরে সিয়ামের কাযা আদায় করা ওয়াজিব"।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আতা ও ইকরিমা বলেছেন: হায়েযা নারীর জন্য সালাতের কাযা আদায় করা বিদআত। যুহরী বলেছেন: এই বিষয়ে মানুষ একমত পোষণ করেছে যে, হায়েযা নারী সিয়ামের কাযা আদায় করবে। সালাতের কাযা আদায় করবে না।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (৩৩৫), আল মাজমূ' (২/৩৮৩), ইবনু রজব (২/১৩৩), আল ফাতহ (১/৪২১)।

হায়েযা নারীর জন্য সিয়ামের কাযা আদায় করা আর সালাতের কাযা আদায় না করার হিকমাহ

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আমাদের মাযহাবের এবং শাফেয়ী মাযহাবের অনেক ফকীহ সালাত ও সিয়ামের কাযা আদায়ের মাঝে এভাবে পার্থক্য করেছেন: সালাত দৈনিক পাঁচবার আদায় করতে হয়। আর হায়েয - সাধারণত - প্রত্যেক মাসেই হয়ে থাকে। এমন অবস্থায় যদি হায়েযা নারীকে তার পবিত্রকালীন সালাতের পাশাপাশি হায়েযকালীন সালাতের কাযা আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়, তাহলে এটা পালন করা তার জন্য ভীষণ কষ্টকর হবে। পক্ষান্তরে সিয়ামের বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, এটা বছরে মাত্র একবার আসে। ফলে এটা কাযা করা কঠিন কিছু নয়। তাদের মধ্যে কিছু আলেম বলেছেন: পবিত্র অবস্থায় প্রত্যেক দিন

সালাতের মূল আদেশের (দায়বদ্ধতা) পুনরাবৃত্তি ঘটে। সুতরাং উক্ত পুনরাবৃত্তিটাই হায়েয কালে পরিত্যাগকৃত সালাতের কাযা আদায়ের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়। পক্ষান্তরে রমযান মাসের সিয়াম; কারণ, এটা বছরে একবার আসে। বারংবার আসে না। সুতরাং যখন হায়েযা নারী পবিত্র হবে, তখন তার উপরে পরিত্যাগকৃত সিয়াম কাযা করা আদেশ প্রযোজ্য হবে। যাতে করে সে বছরে একবার ফরয হওয়ার সিয়ামের সংখ্যা পূর্ণ করতে পারে। ঠিক যেভাবে একই আদেশ মুসাফির অথবা অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

দ্রষ্টব্য: শারহু মুসলিম (৩৩৫), ইবনু রজব (২/১৩৪)।

الكتاب الثاني كتاب الصلاة

দ্বিতীয় পর্বঃ সালাত।

সালাতের পরিচয়

সালাতের শাব্দিক অর্থ হলো: দুআ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ﴾

"তাদের জন্য (যাকাত প্রদানকারীদের) দুআ করুন। নিশ্চয় আপনার সালাতে (দুআতে) তাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করবে"। (আত-তাওবা, ৯:১০৩) অর্থাৎ তাদের জন্য দুআ করুন।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ

"তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন আসে। সে যদি সিয়াম রেখে থাকে তাহলে দুআ করবে। আর যদি না রেখে থাকে তাহলে যেন খাবার গ্রহণ করে"। (মুসলিম, হা/১৪৩১) এখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা 'সালাত' দুআ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সালাতের পারিভাষিক অর্থ হলো: নির্দিষ্ট কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা, যার সূচনা হবে তাকবীর দিয়ে ও সমাপ্তি হবে সালাম দিয়ে।

সালাত ইসলামের রুকন সমূহের মধ্য থেকে একটা রুকন

এ বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সুসাব্যস্ত।

কুরআন থেকে প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾

"তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো ও যাকাত প্রদান করো"। (আল-বাকারা, ২:৪৩)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ﴾

"তারা যদি তাওবা করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত প্রদান করে তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই"। (আত-তাওবা, ৯:১১)। এ বিষয়ে আরো বহু আয়াত রয়েছে।

সুন্নাহ থেকে প্রমাণ হচ্ছে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

" بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ".

"পাঁচটি বিষয়ের ওপর ইসলামের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। লা-ইলাহার সাক্ষ্য প্রদান করা। নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, হাজ্জ করা ও রমজানের সিয়াম রাখা"। (বুখারী, হা/৮, মুসলিম, হা/১৯)

ইজমা থেকে প্রমাণ হচ্ছে:

ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যে ফরয এ বিষয়ে উম্মতের মাঝে কারো দ্বিমত নেই। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করবে সে কাফের হয়ে যাবে। বহু বিদ্বান এ বিষয়ে ইজমা দাবি করেছেন।

দেখুন মুগনী ১/৩৬৯, মুহাল্লা ২/৪, মাজমূ ৩/৩, মুগনিল মুহতাজ ১/২০৩, শারহুল মুমতি ৫/২।

٨–بَابُ الْمَوَاقِيتِ

অধ্যায়: ৮- সালাতের ওয়াক্ত বা সময়সমূহ

المواقيت এটা **ميقات** এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে সালাত আদায়ের নির্দিষ্ট সময়। যে ব্যক্তি বিশেষ সময়ে সালাত একত্র করবে না তার জন্য সালাতের সময় হলো পাঁচটি। আর যে ব্যক্তি করবে তার জন্য সময় হলো তিনটি। এর কারণ হচ্ছে আসরের সময় যুহরের মাঝে ও ইশার সময় মাগরিবের মাঝে প্রবেশ করে। লেখক প্রথমে সালাতের সময়ের বর্ণনা দিয়ে শুরু করেছেন। এর কারণ হচ্ছে, সালাতের সময় হলো সালাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত। (আল ইলাম, ২/২১১, তানবীহুল আফহাম, ১/১৩৫)

٤٤. عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ وَاسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ إِيَاسٍ – قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي) .

৪৪. আবূ আমর আশ শায়বানী যার নাম সা'দ ইবনে ইয়াস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে এই বাড়ির মালিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘরের দিকে ইশারা করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম। আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো আমল অধিকতর প্রিয়? তিনি বললেন **সময়মত সালাত আদায় করা**। এরপর আমি বললাম, তারপর কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন: **পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা**। আমি আবার বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, **আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা**। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এগুলো বলেছেন। আমি যদি আরো বেশি বলতাম তিনি আমাকে আরো উত্তর দিতেন। [সহীহ বুখারী হা/৫২৭, ২৭৮২, ৭৫৩৪ ও মুসলিম হা/৮৫]

সালাতের জন্য সময় হওয়া ফরয

ইমাম ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ আবু যার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "হে আবু যার! তোমার কী হবে, যখন তোমাদের আমীররা সালাতকে নির্দিষ্ট সময় থেকে পিছিয়ে দিবে?!" তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এ বিষয়ে কী আদেশ করেন? তিনি বলেন, "তুমি সময় মতো সালাত পড়ে নিবে। তারপর তাদের সাথে সালাত পেলে পড়ে নিবে আর এটা তোমার জন্য নফল হিসেবে পরিগণিত হবে"। এ অর্থে আরো যত হাদীস রয়েছে এর অর্থ হচ্ছে, এই হাদীসটা একটা উৎকৃষ্ট প্রমাণ যে সালাতের সময় হওয়া হলো ফরয।

সালাতের সময় হওয়ার আগে সালাত পড়লে তা আদায় হবে না। এ বিষয়ে আবু মুসা আশয়ারী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ও কতিপয় তাবিঈ ব্যতীত কারো মাঝে দ্বিমত নেই। অধিকাংশ বিদ্বান এ বিষয়ে একমত পোষণ করার কারণে তাঁর এই মতভেদ উল্লেখ করাকে আমি সমীচীন মনে করছি না। সুতরাং অধিকাংশের একমত হওয়ার ভিত্তিতে এ কথাই যথার্থ যে সালাতের সময় হওয়া ফরয।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহর এ কথা উল্লেখ করার পর বলেন, এই মতভেদটা এ বিষয়ে নয় যে সালাতকে ইচ্ছাকৃতভাবে নির্দিষ্ট সময়ের আগে পড়া বৈধ। বরং মতভেদটা ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে ইজতিহাদ (গবেষণা) করে সালাত পড়েছে। তারপর তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, সে সময় হওয়ার আগে সালাত পড়েছে।

আমি (লেখক) বলছি, এ মতভেদপূর্ণ মাসআলার বিস্তর আলোচনা এরপর অচিরেই আসছে ইনশা আল্লাহ। (তামহীদ, ৮/৬৯, ইসতিযকার, ১/১৮৮, বিদায়া, ১/২৩১, ইবনু রজব, ৪/১৯০)

অজ্ঞতাবশত কেউ যদি সালাতের সময় হওয়ার আগেই সালাত পড়ে নেয় এরপর সে জানতে পারে যে, সে সালাতের সময় হওয়ার আগেই সালাত পড়েছে তাহলে তার সালাতের বিধান কী

প্রথম অভিমত: অজ্ঞতাবশত বা ভুলক্রমে কেউ সালাতের সময় হওয়ার আগেই সালাত পড়ে নিলে সময় বাকি থাকলে পুনরায় পড়তে হবে। আর যদি বাকি না থাকে তাহলে পড়তে হবে না। এটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর অভিমত।

দ্বিতীয় অভিমত: সালাত পুনরায় পড়তে হবে। সালাতের সময় বাকি থাক বা না থাক। এটাই অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত। এই মতটি বর্ণিত হয়েছে ইবনু উমার, আবু মুসা, জুহরী, আওযায়ী, শাফেয়ী, আহমাদ ও আহলুর রায় ও ইমাম মালেক থেকে একটা অভিমত।

তৃতীয় অভিমত: ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি সফরে সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বেই যুহরের সালাত পড়েছে তার সম্পর্কে তিনি বলেন, তার সালাত আদায় হয়ে যাবে। তিনি যুক্তি দিয়েছেন এভাবে, তোমাদের কারো যদি করজ থাকে আর সে সময় হওয়ার আগেই তা পরিশোধ করে তাহলে এটা কি পরিশোধ হবে না? এ রকম অভিমত ইমাম শাবী, হাসান বাসরী ও শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাধান্য অভিমত: প্রথম অভিমতটিই প্রাধান্যযোগ্য আল্লাহ ভালো জানেন। (আওসাত, ২/৩৮৩, মুগনী, ১/৩৯৫, ইবনু রজব, ৪/১৮৯)

সালাতের সময় হওয়ার ব্যাপারে যে ব্যক্তি সন্দিহান সে ওই সময় সালাত পড়লে তা আদায় হবে না

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত যে, সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বেই কোনো ব্যক্তি সন্দেহ করে যদি যুহরের চার রাকআত নফল সালাত পড়ে তাহলে তা যুহরের সালাত হিসেবে আদায় হবে না। তিনি রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, মুসলিমদের ইজমা রয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি ফজরের সালাত সন্দেহ করে পড়ে তাহলে তার সালাত আদায় হবে না। (তামহীদ, ১৪/৩৪৬, ইসতিযকার, ১/২৩৮)

٤٥. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ المُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسِ».

৪৫. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময়ে ফজরের সালাত পড়তেন। এ সময় মুমিনা মহিলাগণ নিজেদের চাদর মুড়ি দিয়ে মাসজিদে সালাতে উপস্থিত হতেন। এরপর সালাত শেষে তারা নিজেদের (ঘরে) ফিরে যেতেন। অন্ধকারের জন্য তাদেরকে কেউ চিনতে পারতো না। [সহীহ বুখারী হা/৩৭২ ও মুসলিম হা/৬৪৫]

٤٦. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا؛ إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ».

৪৬. জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে প্রচণ্ড গরমে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাত আদায় করতেন। আসরের সালাত আদায় করতেন যখন সূর্য দীপ্তমান থাকত। আর মাগরীব সালাত আদায় করতেন, যখন সূর্য অস্ত যেত। ইশার সালাত কখনো আগেই আদায় করতেন যখন দেখতেন যে, লোকজন জমা হয়েছে। আর যখন দেখতেন যে, লোকজন মাসজিদে একত্র হতে বিলম্ব করছে, তখন তিনি ইশার সালাত বিলম্ব করেই আদায় করতেন। আর ফজরের সালাত অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন। [সহীহ বুখারী হা/৫৬০ ও মুসলিম হা/৬৪৬]

٤٧. عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: «دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ – الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى – حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ – الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ».

৪৭. আবূল মিনহাল সাইয়্যার ইবনে সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার পিতা আবূ বারযাহ আল আসলামীর নিকট গেলাম। তাকে আমার আব্বা বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয সালাত কিরূপে পড়তেন? আল হাজিরা (যুহর) যাকে তোমরা প্রথম সালাত বল, এই সালাত আদায় করতেন যখন সূর্য ঢলে পড়ত এবং আসর সালাত এমন সময় আদায় করতেন যার পর আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার বাড়িতে ফিরত অথচ সূর্য তখনও পরিষ্কার থাকত। রাবী বলেন: মাগরীব সম্পর্কে কি বলেছেন, তা আমি ভুলে গিয়েছি। আর ইশা যাকে তোমরা আতামাহ বল, এই সালাত দেরী করে

আদায় করতে তিনি ভালোবাসতেন এবং ইশার সালাতের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া ও পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন। তিনি ফজরের সালাত এমন সময় শেষ করতেন যখন কেউ তার পাশে বসা ব্যক্তিকে চিনতে পারতো এবং এ সালাতে তিনি ষাট হতে একশত আয়াত পড়তেন। [সহীহ বুখারী হা/৫৪৭ ও মুসলিম হা/৬৪৭]

সূর্য ঢলে গেলে যুহরের প্রথম ওয়াক্ত শুরু হয়

ইবনু মুনযির, ইবনু আব্দিল বার, ইবনু কুদামা প্রমুখ বিদ্বান রহিমাহুমুল্লাহ ইজমা দাবি করেছেন যে যুহরের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য ঢলে গেলে।

ইজমার দলীলঃ আবু বারযা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, যেটা লেখক উল্লেখ করেছেন, সেখানে রয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের সালাত (যেটাকে তোমার প্রথম ওয়াক্ত বলে থাক) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আদায় করেছেন। অনুরূপভাবে মুসলিমে (৬১৪) বর্ণিত আবু মুসা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে রয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের সালাত সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আদায় করেছেন। এ বিষয়ে আরো অনেক দলীল রয়েছে। (আওসাত, ২/৩২৬, মুগনী, ১/৩৭১, ফাতহুল বারী, ২/২১, ইবনু আব্দিল বারের ইজমা, ১/৪১০)।

সূর্য ঢলে গেছে এটা কীভাবে জানা যাবে

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ যদি প্রত্যেক দেশে সূর্য কীভাবে ঢলে যায় এটা জানতে চায় তাহলে সে যেন মাটিতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে একটা কাঠি প্রতিস্থাপন করে। কেননা ছায়াটা কাঠির নিকটে চলে আসবে এবং হ্রাস পাবে। হ্রাস পেতে পেতে শেষ হয়ে যাবে তারপর আবার বৃদ্ধি পাবে। এটাই হচ্ছে সূর্য ঢলে যাওয়া। আর এটাই হচ্ছে যুহরের প্রথম সময়। এই অর্থটি ইবনু মোবারক, ইয়াহ ইয়া ইবনু আদাম, ইসহাক ইবনু রাহওয়াই প্রমুখ বিদ্বান রহিমাহুমুল্লাহ থেকে চয়নকৃত।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, সূর্য মধ্যগগন থেকে ঝুঁকে পড়া। আর এটা জানা যায় ব্যক্তির ছায়া হ্রাস হওয়ার পর দীর্ঘ হওয়া থেকে। কেউ এ বিষয়ে জানতে চাইলে সে যেন ব্যক্তির ছায়া পরিমাপ করে। এরপর অল্প সময় ধৈর্য ধারণ করে। তারপর দ্বিতীয়বার পরিমাপ করে। দ্বিতীয়বারেরটা যদি প্রথমবারের চেয়ে কম না হয় তাহলে ঢলেনি। আর যদি বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস না পায় তাহলে সূর্য ঢলেছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমেই এটা জানা যাবে। আর মাস ও দেশের ভিন্নতার কারণে তা ভিন্ন ভিন্ন হবে। যখনই দিন লম্বা হবে ছায়া হ্রাস পাবে। আর যখন দিন ছোট হবে, তখন ছায়া লম্বা হবে। প্রত্যেক দিনই কম বেশি হবে। (আওসাত, ২/৩২৮, মুগনী, ১/৩৭২, মাজমু, ৩/২৮)

সূর্য ঢলে গেছে এটা জানার আরো একটা পদ্ধতি:

শাইখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ শারহুল মুমতিতে (২/১০২) বলেন, ঘন্টা হিসেবে সূর্য ঢলে যাওয়ার আলামত হচ্ছে, তুমি সূর্য উঠা থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত সময়কে দুভাগে ভাগ করো। এটাই হচ্ছে সূর্য ঢলে যাওয়া। যদি আমরা ধরি সূর্য উঠে ছয়টায় এবং অস্ত যায় ছয়টায় তাহলে বারোটায় সূর্য ঢলে যাবে।

কখন যুহরের শেষ সময়

প্রথম অভিমত: যুহরের শেষ সময় হলো সূর্য ঢলে পড়ার সময় যে ছায়া ছিল ওই ছায়া ব্যতীত প্রত্যেকটা জিনিসের ছায়া যখন তার সমপরিমাণ হবে, তখন পর্যন্ত। এটা ইমাম মালেক, সাওরী, শাফেয়ী, আওযায়ী, লায়েছ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ইবনু হাসান, আহমাদ ও দাউদ রহিমাহুমুল্লাহ তাদের অভিমত।

এই মতের দলীল: এ বিষয়ে হাদীস হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম মুসলিম তার গ্রন্থে এনেছেন (৬১২)। (যুহরের সময় হয় সূর্য ঢলে গেলে এবং শেষ হয় ব্যক্তির ছায়া তার সমপরিমাণ হয়ে আসর পর্যন্ত)। অনুরূপভাবে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, যেটাতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইমামতি করেন তাতে রয়েছে, তারপর তিনি তাকে নিয়ে যুহরের সালাত পড়েন যখন ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। এটা আমাদের শাইখ মুকবিলের সহীহ মুসনাদে (১৩০৯) ও জাবের থেকে বর্ণিত, যা সহীহ মুসনাদে (২০৯) নাম্বার হাদীসে রয়েছে।

দ্বিতীয় অভিমত: যখন প্রত্যেকটা জিনিসের ছায়া অনুরূপ হবে, তখন আসরের সময় হবে। এরপর যুহর ও আসরের সময়। এর অর্থ হচ্ছে, যুহরের সময় সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণের আগ পর্যন্ত লম্বা হবে। এটা হলো আতা রহিমাহুল্লাহ এর অভিমত। তাউস রহিমাহুল্লাহ বলেন, যুহর ও আসরের সময় হলো রাত পর্যন্ত।

তৃতীয় অভিমত: প্রত্যেকটা জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়ার আগ পর্যন্ত যুহরের সময় বাকি থাকে। এর থেকে একটু বৃদ্ধি পেলে আসরের প্রথম সময় হয়। এটা হলো ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এর অভিমত। তিনি এমন দলীল দিয়েছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এই অভিমত দিয়ে হাদীসের ও বিদ্বানদের বিরোধিতা করেছেন। তার ছাত্ররা তার বিরোধিতা করেছেন।

প্রাধান্যযাগ্য মত: পূর্বের দলীলের আলোকে পথম অভিমতটি প্রাধান্যযোগ্য। আল্লাহ ভালো জানেন। (আওসাত, ২/৩২৮, মুগনী, ১/৩৭৪, বিদায়া, ১/২৩১, মাজমু, ৩/২৪)

যুহরের সময় শেষ হয়ে গেছে ও আসরের সময় শুরু হয়েছে এটা বুঝানোর জন্য কি সূর্য ঢলে পড়ার ছায়াকে প্রত্যেকটা জিনিসের ছায়ার সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে?

মুসলিমে (৬১২) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে এসেছে, নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া বলেন, "যুহরের সময় হচ্ছে সূর্য ঢলে পড়া থেকে নিয়ে ব্যক্তির ছায়া তার সমপরিমাণ হয়ে আসরের আগ পর্যন্ত"। এই হাদীসের অনুরূপ আরো হাদীস আবু হুরায়রা, জাবের ও ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সালাতের সময় শিক্ষা দিয়েছেন।

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আছে, তারপর তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন, যখন ছায়াকে তার সমপরিমাণ দেখলেন। তারপর সূর্য ডুবে গেলে যখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করে, তখন মাগরিবের সালাত পড়েন। তারপর লালিমা ডুবে গেলে ইশার সালাত পড়েন। তার পরের দিন এসে তিনি তাঁকে নিয়ে অল্প ফর্সা হলে ফজরের সালাত পড়েন। তারপর ছায়া তার সমপরিমাণ হলে যুহরের সালাত পড়েন। অনুরূপ আরো হাদীস জাবের ও ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীস কে শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ ইরওয়াউল গালীলে (২৪৯) সহীহ বলেছেন। অনুরূপভাবে আমাদের শাইখ মুকবিল জাবের ও আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে তার আস সহীহুল মুসনাদে (২০৯) (১৩০৯) হাদীস নিয়ে এসেছেন।

সুতরাং হাদীসের বাহ্যিকের প্রতি লক্ষ রেখে এটাই বলতে হচ্ছে যে, যুহরের শেষ সময় ও আসরের প্রথম সময় হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া। এখানে সূর্য ঢলে পড়ার ছায়া তার সমপরিমাণ ছায়ার সাথে সম্পৃক্ত হবে না। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে এসেছে, "যতক্ষণ না পর্যন্ত আসরের সালাতের সময় হয়"। সকল বিদ্বান আমি যেমন মনে করেছি তারাও এমন মনে করেন। অর্থাৎ সূর্য ঢলে পড়ার ছায়া তার সমপরিমাণ ছায়ার সাথে সম্পৃক্ত হবে। (আল্লাহ ভালো জানেন) তারা এটা হাদীস থেকে নিয়েছেন। নিশ্চয় ছায়া হচ্ছে যা হ্রাস পাওয়ার পর আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। আর যে ছায়া ফিরে আসে না তা অনুরূপ ছায়ার সাথে মিলাতে হবে। চাই কম হোক বা বেশি হোক।

ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা একমত পোষণ করেন যে, নিশ্চয় যুহরের সালাতের সময় হলো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে তার সমপরিমাণ ছায়া হওয়া পর্যন্ত।

ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি সে সূর্য ঢলে পড়ার পর ঢলে পড়ার ছায়া ব্যতীত প্রত্যেকটা জিনিসের ছায়ার সমপরিমাণ সময়ের মাঝে সালাত পড়ে তাহলে তার সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। (ইসতিযকার, ১/১৯১, মুহাল্লা ২/১৯৭, মারাতীব, (৪৯), মুগনী, ১/৩৭৪, মাজমু, ৩/২৪, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৩/২৬৭)

এখানে কি যুহরের শেষ সময়ের মাঝে ও আসরের প্রথম সময়ের মাঝে যৌথ কোনো পরিমাণ আছে?

প্রথম মত: যুহরের সময় শেষ হয়ে গেলে ধারাবাহিকভাবে আসরের সময় হবে। এই দুইয়ের মাঝে কোনো সংযুক্ততা নেই। এটা হলো অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

দ্বিতীয় মত: প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হলে এরপর চার রাকআত সালাত আদায়ের সমপরিমাণ সময় পর্যন্ত হচ্ছে যুহর ও আসরের সময়। এরপর আসরের সময় হয়ে যায়। এটা হলো ইসহাক ইবনু রাহওয়াই, আবু ছাওর, মুযানী ও ইবনু জারির রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। আতা ও তাউস রহিমাহুমার মত পূর্বে গত হয়েছে আর তা হলো যুহরের সময় সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার আগ পর্যন্ত। আর আবু হানিফার মত হচ্ছে প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়ার আগ পর্যন্ত।

প্রাধান্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন। এটাকে ইবনু মুনযির প্রাধান্য দিয়েছেন। (আওসাত, ২/৩২৭-৩২৯), মুগনী, ১/৩৭৪, মাজমু, ৩/২৪, ফাতহুল বারী, ২/২৩)

আসরের প্রথম সময় কখন?

প্রথম মত: আসরের প্রথম সময় হয়, যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। এটা অধিংকাশ বিদ্বানের মত।

দ্বিতীয় মত: আসরের প্রথম সময় হয়, যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ পরিমাণ হয়। এটা ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর মত। তবে তার ছাত্ররা এই মতের বিরোধিতা করেছেন।

তৃতীয় মত: সূর্য ঢলে গেলেই যুহর ও আসরের সময় হয়। এই মতটি ইমাম রাবীয়াহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাধান্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। এর কারণ হচ্ছে এ মতের পক্ষে জাবের, আবু হুরায়রা ও ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে সালাতের সময় শিক্ষা দিয়েছেন। জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস হচ্ছে, তারপর তিনি তাঁর কাছে ওই সময় আসেন, যখন ব্যক্তির ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। এরপর তিনি যেমন করেন, তিনিও অনুরূপ করেন। তারপর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সামনে অগ্রসর হন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম তার পেছনে থাকেন আর মানুষরা রাসূল আলাইহিস সালাম এর পেছনে ছিলেন। তারপর তিনি আসরের সালাত পড়েন। অনুরূপ আবু হুরায়রা ও ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে রয়েছে। ইরওয়াউল গালীলে (২৪৯) এ সকল হাদীস

কে শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ সহীহ বলেছেন। অনুরূপভাবে আমাদের শাইখ মুকবিল রহিমাহুল্লাহও জাবের ও আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসকে আস সহীহুল মুসনাদে (২০৯) (১৩০৯) নিয়ে এসেছেন। (আওসাত, ২/৩২৯, মুগনী, ১/৩৭৫, বিদায়া, ১/২৩৫, মাজমু, ৩/২৪)

আসরের শেষ সময় কখন?

প্রথম মত: সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার আগ পর্যন্ত আসরের শেষ সময়। এটা আবু ছাওর, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহিমাহুমুল্লাহর মত। এ মতের মতো অভিমত ইমাম আওযায়ী ও আহমাদ রহিমাহুমাল্লাহ থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে। এই মতের পক্ষের দলীল: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, যা মুসলিমে রয়েছে, ওই হাদীসে আছে, "সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার আগ পর্যন্ত আসরের সময়"।

দ্বিতীয় মত: আসরের শেষ সময় হচ্ছে, যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এটা ইমাম মালেক, ছাওরী, শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদের একমত। এই মতের পক্ষের দলীল: জিবরাঈল আলাইহিস সালামের ইমামতির ঘটনা, যা জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, ওই হাদীসে আছে, তারপর তিনি তাঁর কাছে দ্বিতীয় দিন আসেন, যখন ব্যক্তির ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। তারপর তিনি গতকাল যেমন করেছেন তিনিও অনুরূপ করেছেন। তারপর তিনি তাঁর কাছে আসেন, যখন ব্যক্তির ছায়া তার দ্বিগুণ পরিমাণ হয়। তারপর তিনি গতকাল যেমন করেছেন তিনিও অনুরূপ করেছেন।

তৃতীয় মত: আসরের শেষ সময় হচ্ছে সূর্য ডুবার আগে এক রাকআত পাওয়া পর্যন্ত। এটা আহলে যাহেরদের মত। তাদের মতের পক্ষের দলীল: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, "সূর্য ডুবার আগে যে ব্যক্তি এক রাকআত আসরের সালাত পাবে, সে মূলত আসরের সালাত পেল"। (বুখারী, হা/৫৭৯, মুসলিম, হা/৬০৮)

প্রাধান্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। দ্বিতীয় মত ও তাদের এই দলীল (ব্যক্তির ছায়া তার দ্বিগুণ পরিমাণ হওয়া) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে বর্ণিত বর্ধিত অংশকে নিষেধ করে না, "সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার আগ পর্যন্ত আসরের শেষ সময়"। (আওসাত, ২/৩৩০, মুগনী, ১/৩৬৭, বিদায়া, ১/৩২৬, মাজমু, ৩/৩১)

সূর্য ডুবে গেলেই মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা এ বিষয়ে একমত যে সূর্য ডুবে গেলেই মাগরিবের সালাত আবশ্যক হয়ে যায়। ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, সূর্য ডুবে গেলেই মাগরিবের সালাত আবশ্যক এ বিষয়ে তারা একমত হওয়ার পরও মাগরিবের শেষ সময় নিয়ে তারা মতভেদ করেছেন। আমি বলছি, অনুরূপভাবে ইজমা দাবি করেন তাহাবী, নববী, ইবনু কুদামা প্রমুখ বিদ্বান।

ইজমার দলীল: জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেন, সেখানে আছে, “সূর্য ডুবে গেলেই মাগরিবের সালাত আবশ্যক হয়ে যায়”। অনুরূপ সালামা ইবনু আকওয়া রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে আছে যে নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য ডুবে গেলে ও অন্ধকার হয়ে গেলে মাগরিবের সালাত পড়েন। (বুখারী, হা/৫৬১, মুসলিম, হা/৬৩৬)। (ইজমা, ৭, আওসাত, ২/৩৩৭, শারহু মাআনিল আসার, ১/১৫৫, ইসতিযকার, ১/১৯৭, তামহীদ, ৮/৭৯, মাজমু, ৩/৩৩)।

মাগরিবের শেষ সময় কখন?

প্রথম মত: মাগরিবের শেষ সময় হচ্ছে সূর্যের লালিমা ডুবে যাওয়া। এটা ইমাম আবু হানিফা, ছাওরী, আহমাদ, ইসহাক, আবু ছাওর, দাউদ, ইবনু মুনযির ও ইমাম শাফেয়ীর কতিপয় ছাত্রের মত। এ মতের পক্ষের দলীল: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আছে, লালিমা ডুবার আগ পর্যন্ত মাগরিবের সময়। (মুসলিম, হা/৬১২) অনুরূপভাবে মুসলিমে আরো আবু মুসা ও আবু বুরদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার অনুরূপ হাদীস রয়েছে। এ মতের প্রবক্তাদের আরো দলীল রয়েছে।

দ্বিতীয় মত: মাগরিবের শুধু একটা সময়ই রয়েছে আর তা হচ্ছে সূর্য ডুবে যাওয়া। এটা ইমাম মালেক, আওযায়ী, শাফেয়ী, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। এ মতের পক্ষের দলীল: জাবের, আবু হুরায়রা ও ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর হাদীস, যা জিবরাঈ আলাইহিস সালাম এর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ইমামতির ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় দিন সূর্য ডুবে গেলে একই সময়ে মাগরিবের সালাত পড়েন। কিন্তু বাকি সালাতে ভিন্নতা রয়েছে। এ বিষয়ে হাদীস পূর্বে গত হয়েছে।

তৃতীয় মত: ফজরের আগ পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের সময়। এটা তাউস ও আতা রহিমাহমার মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: অনেক দলীলের ভিত্তিতে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আর এ বিষয়ে কতিপয় হাদীস পূর্বে গত হয়েছে। দ্বিতীমতের প্রবক্তারা যে দলীল দিয়েছেন এ বিষয়ে ইমান নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এর দ্বারা তারা ওয়াক্তে ইখতিয়ার (উত্তম সময়)

বুঝিয়েছেন। জায়েয বুঝাননি। (আওসাত, ২/৩৩৪, মুগনী, ১/৩৮১, বিদায়া, ১/২৩৮, মাজমু, ৩/৩৫-৩৮)

লালিমা ডুবে গেলেই ইশার সালাতের প্রথম সময়

মুসলিমে আবু বুরদা (৬১৩) ও আবু মুসা (৬১৪) রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীসে এসেছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লালিমা ডুবে গেলে ইশার সালাত পড়েন। ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, লালিমা ডুবে গেলেই ইশার সালাতের সময় হয় এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। আমি বলছি, অনেক বিদ্বান এ বিষয়ে ইজমা দাবি করেছেন। (আওসাত, ২/৩৩৮, মুগনী, ১/৩৮২, মাজমু, ৩/৪১, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৩/২৬৭, ইজমা ইবনু আব্দিল বার, ১/৪২৪)

শাফাক (লালিমা) কী?

প্রথম মত: শাফাক হচ্ছে লালিমা। এটাই হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের মাঝে রয়েছেন, উমার ইবনু খাত্তাব, আলী ইবনু আবী তালেব, ইবনু আমর, ইবনু আব্বাস আবু হুরায়রা, উবাদা ইবনু সামিত, শাদ্দাদ ইবনু আউস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম। তাবেঈ ও তাবে তাবেঈনও রয়েছেন। এ মতের পক্ষের দলীল: ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ অনেক বিদ্বান থেকে উল্লেখ করেন, শাফাক হচ্ছে লালিমা। এ বিষয়ে অনেক হাদীস আছে। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীস থেকে আমাদের ইমামরা লালিমা সংক্রান্ত অনেক বিষয় দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন। আর কিয়াস এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কিছু স্পষ্ট করেনি।

দ্বিতীয় মত: শাফাক হচ্ছে লালিমা ডুবার পর যে সাদা রেখা উঠে সেটা। এটা আনাস, মুয়ায, আবু হুরায়রা. উমার ইবনু আব্দুল আজীজ, আওযায়ী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম তাদের মত। ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ এই মত পছন্দ করেছেন। এটা আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহরও মত। তাদের দলীল হলো নোমান ইবনু বাশীর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাত যখন তৃতীয়বার চাঁদ অস্তমিত হয়, তখন আদায় করেন। (আবু দাউদ, হা/৪৯১) এই হাদীসকে আলবানী রহিমাহুল্লাহ আবু দাউদে সহীহ বলেছেন।

প্রাধান্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন। শাইখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, তাঁর কথা, 'লালিমা ডুবার আগ পর্যন্ত' অর্থাৎ আকাশে লালিমা ডুবার আগ পর্যন্ত। যখন আকাশের লালিমা ডুবে যাবে, তখন মাগরিবের সময় শেষ হয়ে ইশার সময় শুরু হবে। আর এর পরিমাণটা ঋতুর পরিবর্তনের কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কখনো লম্বা হয় আবার কখনো ছোট হয়। কিন্তু সরাসরি দেখার মাধ্যমে এটা জানা যায়। যখন পশ্চিম দিগন্তে দেখবে এটা ডুবে গেছে, তখন মনে করবে মাগরিবের সময় শেষ হয়ে

গেছে। আর এই সময়টা মাগরিবের পর থেকে এক ঘন্টা পনেরো মিনিট থেকে এক ঘন্টা সাইত্রিশ মিনিটের মাঝে হয়ে থাকে। (আওসাত, ২/৩৩৯, মুগনী, ১/৩৮২, বিদায়া, ১/২৪০, মাজমু, ৩/৪৪, শারহুল মুমতি, ২/১১০)

ইশার শেষ সময়

প্রথম মত: ইশার শেষ সময় হচ্ছে অর্ধরাত পর্যন্ত। এটা উমার ইবনু খাত্তাব, ছাওরী, ইবনু মোবারক, ইসহাক, আবু ছাওর, আসহাবে রায় ও ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। এ মতের পক্ষের দলীল: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে রয়েছে, ইশার সালাতের সময় হচ্ছে অর্ধরাত পর্যন্ত। হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন।

দ্বিতীয় মত: ইশার সালাতের শেষ সময় হচ্ছে রাতের এক তৃতীয়াংশ গত হওয়া পর্যন্ত। এই মত উমার ইবনু খাত্তাব, আবু হুরায়রা, উমার ইবনু আব্দুল আজীজ, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ মতের পক্ষের দলীল: সুনান গ্রন্থে জাবের ও ইবনু আব্বাস এবং মুসলিমে আবু বুরদা ও আবু মুসা আশয়ারী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম তাদের হাদীসে জিবরাঈল আলাইহিস সালামের ইমামতির ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁকে নিয়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ গত হলে ইশার সালাত পড়েন। এই সকল হাদীসের আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে।

তৃতীয় মত: ফজর হওয়ার আগ পর্যন্ত ইশার সালাতের শেষ সময়। এই মত ইবনু আব্বাস ও আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে এটা তাউস, ইকরিমা ও দাউদ রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। আতা রহিমাহুল্লাহ বলেন, মাগরিব ও ইশার সালাত রাতে ছুটে যায় না: এমনকি দিনেও না। অর্থাৎ সব সময় পড়া যায়। এ মতের পক্ষের দলীল: আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, যা মুসলিমে (৬৮১) রয়েছে, ঘুমের মাঝে সীমালজ্ঘন নেই। সীমালজ্ঘন তো শুধু ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে সালাত পড়ে না, এমনকি আরেক সালাতের সময় হয়ে যায়।

চতুর্থ মত: রাতের এক চতুর্থাংশ গত হওয়া পর্যন্ত ইশার সালাতের শেষ সময়। এটা ইবরাহীম নাখাঈর মত। ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই মতের প্রবক্তার কোনো দলীল আছে কিনা আমাদের জানা নেই। ইসহাক রহিমাহুল্লাহ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

প্রাধান্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আর সেটা হচ্ছে অর্ধরাত পর্যন্ত ইশার সালাতের সময় থাকে। যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে এসেছে। ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীসটি আলী ও ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসেও এসেছে, সেখানে আছে, তিনি বলেন, এক রাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অর্ধরাত পর্যন্ত ইশার সালাতকে বিলম্ব করে পড়েন। (বুখারী, হা/৫৮৬৯, মুসলিম, হা/৬৪০)

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার হাদীসে আছে, তিনি বলেন, রাতের অনেক অংশ গত হলে এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাত পড়েন। এরপর বলেন, "এটাই হচ্ছে ইশার সালাতের উত্তম সময়। আমি যদি আমার উম্মতের ওপর এই সময়ের ভয় না করতাম"! (মুসলিম, হা/৬৩৮)

(আওসাত, ১/৩৮৪, মুগনী, ১/৩৮৪, বিদায়া, ১/২৪০, মাজমু, ৩/৪২, ইবনু রজব, ৪/৪০৯)

ব্যস্ততার কারণে কারো যদি অর্ধরাত গত হয়ে যায় তাহলে অর্ধরাতের পর কি সে ইশার সালাত পড়তে পারবে?

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ (৪/৪০৯) বলেন, যারা বলেন, ইশার সালাতের সময় রাতের এক তৃতীয়াংশ গত হলে ও অর্ধরাত গত হলে শেষ হয়ে যায়, তাদের এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তম সময় শেষ হয়ে যায়। তারা বলেন, ওয়াক্তে জরুরা (প্রয়োজনীয় সময়) ফজর উদয় হওয়া অবধি বাকি থাকে। সুতরাং অর্ধরাতের পর ঘুমন্ত ব্যক্তি যদি জাগ্রত হয় বা অজ্ঞান ব্যক্তির জ্ঞান ফিরে অথবা নারী ঋতু থেকে পবিত্র হয় বা শিশু বালেগ হয় অথবা কাফের ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের ওপর ইশার সালাত পড়া আবশ্যক। আর মাগরিবের সালাত আবশ্যক কিনা এ বিষয়ে বিদ্বানদের প্রসিদ্ধ দুটি মত আছে।

দ্বিতীয় ফজর (সুবহে সাদেক) উদয় হলে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় ফজর উদয় হলে। তিনি বলেন, বিদ্বানগণ একমত যে, কেউ যদি ফজর উদয় হওয়ার পর সূর্য উঠার আগে ফজরের সালাত পড়ে তাহলে সে ফজরের নির্ধারিত সময়েই সালাত পড়েছে। ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় দ্বিতীয় ফজর (সুবহে সাদেক) পরিপূর্ণভাবে উদয় হলে। আর এটা হচ্ছে পূর্ব দিগন্তে প্রসারিত সাদা রেখা, যার পর কোনো অন্ধকার নেই। আমি বলছি, অনুরূপভাবে এ মাসআলায় অধিকাংশ বিদ্বান একমত হয়েছেন। দলীল হচ্ছে: মুসলিমে (হা/৬১২) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে,

وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.

"ফজর উদয় হওয়া থেকে সূর্য উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত সময় হলো ফজরের সময়"। (আওসাত, ২/৩৪৭, ইজমা, (৪১), তামহীদ, ৩/২৭৫, মুহাল্লা, ২/২২৪, মাজমু, ৩/৪৬)

ফজর সালাত অন্ধকারে পড়া উত্তম নাকি ফর্সা করে?

প্রথম মত: অন্ধকারে ফজর সালাত পড়া উত্তম। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের মাঝে দশজন সাহাবী রয়েছেন। এ মতের পক্ষের দলীল: জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেন, সেখানে আছে, "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সালাত অন্ধকারে পড়েন"। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেন, সেখানে আছে, তারপর তারা তাদের বাড়িতে ফিরে আসতেন; কিন্তু অন্ধকারের কারণে তাদের চিনা যেত না। তাদের আরো দলীল আছে।

দ্বিতীয় মত: ফর্সা করে ফজরের সালাত পড়া উত্তম। এ মত উসমান, আলী, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম তাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে এটা তাউস, সুফিয়ান ছাওরী, হানাফী ও হাসান ইবনু হাই রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। এ মতের পক্ষের দলীল: রাফে ইবনু খাদিজ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, "তোমরা সকাল (ফর্সা) করে ফজরের সালাত পড়ো; কেননা এতে সওয়াব বেশি পাবে"। হাদীসটি শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ ইরওয়াউল গালীলে (২৫৮) সহীহ বলেছেন। অনুরূপভাবে আমাদের শাইখও আস সহীহুল মুসনাদে (৩২৯) নিয়ে এসেছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন। আর দ্বিতীয় মতের কয়েকভাবে উত্তর দেয়া যায়।

প্রথম জবাব: যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে তা সহীহ না। এ কথা কিছু হাম্বলীরা ও ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন। ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ এই হাদীসের মতভেদ উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় জবাব: ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক প্রমুখ বিদ্বান বলেন, হাদীসে বর্ণিত 'ইসফার' (ফর্সা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফজর পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হওয়া। সুতরাং এই হাদীসটা নিশ্চিতভাবে সময় হওয়ার আগে ফজরের সালাত পড়তে নিষেধ করছে।

তৃতীয় মত: সালাত চলমান থাকা অবস্থায় ইসফার (ফর্সা) থাকবে। ইসফার (ফর্সা) করে সালাত শুরু করবে না। সুতরাং সালাত শুরু হবে অন্ধকারে আর এমন লম্বা করবে যে, যেন ফর্সা হয়ে যায়। এ মত আতা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এ মত কিছু হাম্বলীরাও বলেন। ইমাম তাহাবী রহিমাহুল্লাহ এই মতকে প্রাধান্য দেন ও আলবানী রহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেন। ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, এমতকে আরো শক্তিশালী করে আবু বারযা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নিশ্চয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ফজর সালাত থেকে ফিরে যেতেন, যখন ব্যক্তি তার পাশের সাথীকে চিনতে পারতো। আর তিনি ফজরের সালাতে ষাট থেকে একশো আয়াত পড়তেন। (ইশরাফ, ১/৪০২, তামহীদ, ৪/৩৩৭, মুগনী, ১/৩৯৪, ইবনু রজব, ৪/৪৩২)

যুহরের সালাত তাড়াতাড়ি করে পড়া উত্তম নাকি বিলম্ব করে পড়া উত্তম?

প্রথম মত: প্রচণ্ড গরম না থাকলে যুহরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে পড়া উত্তম। এটা অধিকাংশ বিদ্বানদের মত। বরং ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, এতে কোনো মতভেদ নেই। তাদের দলীল: আবু বারযা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেন, সেখানে আছে, যুহরের সালাত যেটাকে তোমরা প্রথম সালাত বলে থাক, সেটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সূর্য ঢলে যাওয়ার পর পড়েন। অনুরূপভাবে মুসলিমে (৬১৮) জাবের ইবনু সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যুহরের সালাত পড়েন।

দ্বিতীয় মত: ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন, ছায়া এক হাত পরিমাণ হলে শীত ও গ্রীষ্মকালে যুহরের সালাত পড়া আমার নিকট উত্তম।

সঠিক মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত অর্থাৎ প্রচণ্ড গরম না থাকলে যুহরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে পড়া উত্তম। মুগনী, ১/৩৮৯, মাজমু, ৩/৫৬, ইবনু রজব, ৪/২৪৩)

আসরের সালাত তাড়াতাড়ি পড়ার বিধান কী?

প্রথম মত: আসরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে পড়া মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: লেখক জাবের ও আবু বারযা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীস উল্লেখ করেন। জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের সালাত পড়েন আর ওই সময় সূর্য আলোকময় ছিল।

আবু বারযা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের সালাত পড়েন। এরপর আমাদের কেউ তার বাড়িতে মদীনার শেষ প্রান্তে ফিরে আসে আর ওই সময় সূর্য আলোকময়ই ছিল। অনুরূপভাবে তারা আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস দিয়ে দলীল দিয়েছেন, নিশ্চয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের সালাত পড়েন আর ওই সময় সূর্য উপরে আলোকময় ছিল। তারপর কোনো ব্যক্তি মদীনার শেষ প্রান্ত থেকে ফিরে আসতো আর ওই সময় সূর্য উপরে থাকতো। (বুখারী, হা/৫৫০, মুসলিম, হা/৬২১,) তাদের আরো দলীল আছে।

দ্বিতীয় মত: আসরের শেষ সময় পর্যন্ত সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার আগে পড়া উত্তম। এটা ইবরাহীম নাখাঈ, ছাওরী, ইবনু শুবরুমা,আবু কিলাবা, আবু হানিফা ও তাঁর ছাত্রদের মত। এ মতটি আলী, ইবনু মাসউদ ও আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবু কিলাবা ও ইবনু শুবরুমা রহিমাহুমা বলেন, আসরকে আসর বলা হয় সময়কে নিংড়ানোর ফলে। অর্থাৎ বিলম্ব করে পড়া। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন, আসর সালাত একেবারে শেষ সময়ে উত্তম সময় পড়া উত্তম। তাদের দলীল:

আলী ইবনু শাইবান রহিমাহুল্লাহর হাদীস, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যাই। তিনি সূর্য পরিষ্কার থাকা পর্যন্ত আসরের সালাতকে বিলম্ব করে পড়েন। এই হাদীস সম্পর্কে ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীসটি বাতিল। কারণ এ হাদীস সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আমি বলছি, রাফে ইবনু খাদিজ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে আছে, নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আসরের সালাত বিলম্ব করে পড়ার আদেশ করেন। হাদীসটি দারাকুতনী ও বাইহাকী রহিমাহুমা নিয়ে এসে দুর্বল বলেন। (দারাকুতনী, ১/২৫১, বাইহাকী, ১/৪৪৩)

দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে এ বিষয়ে রাফে ইবনু খাদিজ ও অন্যান্য সাহাবী থেকে এর বিপরীত মত বর্ণিত হয়েছে। আর সেটা হচ্ছে আসরের সালাতকে তাড়াতাড়ি পড়া। তিনি আরো বলেন, আসরের সালাত বিলম্বে পড়ার হাদীস প্রমাণিত নয়। এই হাদীস যদি সঠিকও হয় তাহলে এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অনিচ্ছাকৃকভাবে কারো যদি বিলম্ব হয়ে যায়।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন। (ইশরাফ, ১/৩০৭, মুগনী, ১/২৯১, মাজমু, ৩/৫৭, ইবনু রজব, ৪/২৯১)

মাগরিবের সালাত প্রথম সময়ই পড়া মুস্তাহাব

ইবনু মুনযির, ইবনু আব্দিল বার, ইবনু কুদামা, নববী প্রমুখ বিদ্বান রহিমাহুমুল্লাহ ইজমা দাবি করেন, যে মাগরিবের সালাত দেরি না করে তাড়াতাড়ি করে পড়া উত্তম। (আওসাত, ২/৩৫৬, তামহীদ, ৪/৩৪২, মুগনী, ১/৩৯২, মাজমু, ৩/৫৮)

ইশার সালাত তার পছন্দনীয় শেষ সময় বিলম্ব করে পড়া উত্তম নাকি তাড়াতাড়ি পড়া উত্তম?

প্রথম মত: তাদের ওপর কষ্টকর না হলে বিলম্ব করে পড়া উত্তম। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: আবু বারযার হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন, সেখানে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাত, যেটাকে তোমরা আতামা বলে থাক, এটা বিলম্ব করে পড়াকে মুস্তাহাব মনে করতেন। অনুরূপভাবে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার হাদীসে তিনি বলেন, একরাতে অনেক রাত গত হলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাত পড়েন। এমনকি মাসজিদের মুসল্লীরা ঘুমিয়ে পড়লে তিনি বের হয়ে সালাত পড়েন। তারপর বলেন, “এটাই ইশার সালাতের সময়। আমি আমার উম্মতের ওপর কষ্টকর মনে না করলে এই সময়ই সালাতটা পড়তাম”। (বুখারী, হা/৫৬৬, মুসলিম, হা/৬৩৮)। অনুরূপ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস আছে, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। অচিরেই দুই হাদীসের পর আসছে। তাদের আরো দলীল রয়েছে।

দ্বিতীয় মত: তাড়াতাড়ি করে পড়া উত্তম। এটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর দু'মতের একমত ও ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর মত। ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে মাসজিদের মুসল্লীদের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে মানুষের কষ্ট না হলে এই সালাত প্রথম ওয়াক্তে তাড়াতাড়ি না পড়া। তার নিকট একটু বিলম্ব করে পড়া উত্তম। তাদের দলীল: ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে "প্রথম ওয়াক্তে সালাত পড়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে আর শেষ ওয়াক্তে সালাত পড়াতে আল্লাহর ক্ষমা রয়েছে"। (তিরমিযী, হা/১৭২) হাদীসটি জাল। দেখুন, (ইরওয়াউল গালীল, ২৫৯)

তৃতীয় মত: মুসল্লীদের অবস্থা দেখতে হবে। তাদের যেন কষ্ট না হয়। যদি তারা সকলেই প্রথম ওয়াক্তেই একত্রিত হয়ে যায় তাহলে তাদের নিয়ে সালাত আদায় করা উত্তম। আর তারা যদি আসতে বিলম্ব করে তাহলে সালাতকে বিলম্ব করে পড়া উত্তম, যাতে তারা একত্রিত হতে পারে। এটা তাউস, আবু হানিফা ও ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর একমত। এভাবেই ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ অধ্যায় রচনা করেন। তিনি বলেন, অধ্যায় হলো, 'মানুষরা একত্রিত হয়ে গেলে বা বিলম্ব করলে ইশার সালাতের সময়'। এই মতকেই ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের দলীল: জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, যা লেখক উল্লেখ করেছেন, সেখানে আছে, ইশার সালাতে মানুষ উপস্থিত হয়ে গেলে কখনো কখনো তিনি সালাত তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলতেন। আর যদি মানুষরা আসতে দেরি করতো তাহলে বিলম্ব করে পড়তেন।

সত্যের নিকটবর্তী মত: সত্যের নিকটবর্তী মত হচ্ছে তৃতীয় মত। আর সেটা হচ্ছে মুসল্লীদের প্রতি লক্ষ রাখা। তাদের যেন কষ্ট না হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদের দীনের মাঝে তিনি কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি"। (সূরা আল-হাজ্জ, ৭৮) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: "আমি আমার উম্মতের ওপর কষ্টকর মনে না করলে"। আল্লাহ ভালো জানেন। (মুগনী, ১/৩৯৩, মাজমু, ৩/৫৮, ইবনু রজব, ৪/৩৭০-৪০২)

ইশার পূর্বে ঘুমানোর বিধান কী?

প্রথম মত: সর্বাবস্থায় ইশার পূর্বে ঘুমানো মাকরূহ। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: আবু বারযা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, লেখক যা উল্লেখ করেছেন, সেখানে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাত, যেটাকে তোমরা আতামা বলে থাক, এটা বিলম্ব করে পড়াকে মুস্তাহাব মনে করতেন। তিনি ইশার পূর্বে ঘুমানো ও ইশার পর অহেতুক কথা বলাকে মাকরূহ মনে করতেন।

দ্বিতীয় মত: ইচ্ছা করে ইশার পূর্বে ঘুমানো জায়েয আছে। এই মতটি আলী, ইবনু মাসউদ ও খাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে এই মতটি আবু ওয়ায়েল,

উরওয়া, সাঈদ ইবনু যোবাইর ও ইবনু সিরীন রহিমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইশার পূর্বে ঘুমানো জায়েয আছে, তবে শর্ত হলো তাকে জাগানোর মত মানুষ থাকতে হবে। এই মতটি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাদের দলীল: ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো একরাতে ব্যস্ততার কারণে ইশার সালাত এতো বিলম্ব করেন যে, আমরা মাসজিদে শুয়ে পড়ি। তারপর আবার জাগ্রত হয়ে আবার শুয়ে পড়ি। তারপর আবার জাগ্রত হই। এরপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে বের হয়ে আসেন। তারপর বলেন, "পৃথিবীতে তোমরা ব্যতীত কেউ বর্তমানে এই সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে না"। (বুখারী, হা/৫৭০, মুসলিম, হা/৬৩৯)

একথার উত্তরে বলা হচ্ছে, ঘুম দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে তন্দ্রা, যা ঘুমের আগে আসে। আর ঘুম সাধারণত নারী ও শিশুদের বেশি হয়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে তারা দুর্বল এবং তারা নিজেদের খুব কমই নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। কিন্তু পুরুষরা এর বিপরীত। বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাত দেরি করে পড়েন। এমনকি উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ডাকতে লাগলেন, সালাতের জন্য এসো। নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে গেছে। (বুখারী, হা/৫৬৯, মুসলিম, হা/৬৪৮)

তারা আরো দলীল দিয়েছেন, যে ব্যক্তি ইশার সালাতের পূর্বে ঘুমিয়ে গেলে জামাআত ও ইশার পছন্দনীয় সময়ের আশংকা করবে তার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা। সময় ও জামাআতের সময় জাগ্রত করার জন্য কেউ থাকলে এই শংকা দূর হয়ে যাবে।

সত্যের নিকটবর্তী মত: সত্যের নিকটবর্তী মত হচ্ছে প্রথম মত। কারণ এ বিষয়ে আবু বারযা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস রয়েছে। (শারহে মুসলিম, (৬৪৭) ইবনু রজব, ৪/৩৭৮, নাইলুল আওতার, ২/২৬১)

ইশার সালাতের পর কথা বলার বিধান

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ লেখক যে আবু বারযা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস উল্লেখ করেছেন তার ব্যাখ্যায় বলেন, বিদ্বানরা বলেন, ইশার পর ওই সকল কথা বলা মাকরূহ, যাতে কোনো উপকার নেই। আর যে সকল কথায় উপকার ও কল্যাণ আছে এগুলো বললে মাকরূহ হবে না। যেমন: দীনী জ্ঞান চর্চা করা, নেক্কারদের ঘটনা আলোচনা করা, মেহমানের সাথে কথা বলা, বাসর রাতে ভালোবাসা সৃষ্টি করার জন্য স্ত্রীর সাথে কথা বলা, ব্যক্তি তার পরিবার ও সন্তানদের সাথে স্নেহপরায়ণ হয়ে কথা বলা, প্রয়োজনে কথা বলা, মুসাফির আসবাবপত্র বা নিজেকে সংরক্ষণের জন্য কথা বলা, মানুষের মাঝে সংশোধন করার কল্পে কথা বলা, ভালো কাজে সুপারিশ করার জন্য কথা বলা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য কথা বলা ও কল্যাণকর কোনো পথ বাতলে দেয়ার জন্য কথা বলা প্রভৃতি। এ সকল কথা

বলা মাকরূহ নয়। এ বিষয়ে কিছু সহীহ হাদীস আছে ও বাকীগুলো সহীহর মতোই। অবশ্য কিছু হাদীস গত হয়েছে। ইশার পর কথা বলা মাকরূহ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইশার সালাতের পর কথা বলা। ইশার সালাতের সময় হলে কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। বিদ্বানরা এ বিষয়ে একমত যে ইশার সালাতের পর কথা বলা মাকরূহ, তবে কল্যাণকর কথা বলা যাবে, যা আমরা এখন উল্লেখ করলাম। (শারহে মুসলিম, (৬৪৭) নাইলুল আওতার, ২/২৬৪)

٤٨. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَوْمَ الْخَنْدَقِ: «مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا؛ كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ»

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى – صَلَاةِ الْعَصْرِ – ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ».

وَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ اصْفَرَّتْ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَى – صَلَاةِ العَصْرِ؛ مَلَأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا – أَوْ حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا».

৪৮. আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের কবর ও বাড়ি ঘর আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। কারণ তারা আমাদেরকে সালাতু ল উস্তা অর্থাৎ আসরের সালাত আদায় করা থেকে বিরত রেখেছে। এমনকি এই অবস্থায় সূর্য অস্ত গিয়েছে। [সহীহ বুখারী হা/৬৩৯৬ ও মুসলিম হা/৬২৭]

সহীহ মুসলিমে রয়েছে আমাদের কে সালাতুল উস্তা অর্থাৎ আসরের সালাত আদায় করা হতে বিরত রেখেছে। এরপর সেই সালাত মাগরীব ও ইশার সালাতের মাঝামাঝি সময়ে আদায় করেন। [সহীহ মুসলিম হা/৬২৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুশরিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসরের সালাত আদায় করা হতে বাধা প্রদান করে। অবশেষে সূর্য রক্তিম আকার কিংবা হলুদ আকার ধারণ করে। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তারা আমাদের কে সালাতুল উস্তা অর্থাৎ আসরের সালাত আদায় করা হতে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের পেটসমূহ ও কবরসমূহকে আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। [সহীহ মুসলিম হা/৬২৮]

সালাতুল উস্তা এটা কোন সালাত?

আল্লাহ তাআলার বাণী থেকে সালাতুল উস্তা নির্ধারণ নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে বেশ মতভেদ আছে।

"তোমরা সালাত হেফাজত করো, বিশেষ করে সালাতুল উস্তা"। (সূরা আল-বাকারা, ২/২৩৮)

সাহাবী, তাবেঈ ও পরবর্তীদের থেকে অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, সালাতুল উস্তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সালাতুল আসর।

তাদের দলীল: লেখক আলী ও ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, এ দুটি হাদীস এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ। এখানে আরো কিছু মত রয়েছে, যা ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন। ইবনু মুলকান রহিমাহুল্লাহ সতেরটি মত উল্লেখ করেন। হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ বিশটি মত বর্ণনা করেছেন। এ সকল মত এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি না। কারণ এগুলোর দলীল দুর্বল ও সহীহ হাদীস বিরোধী। আল্লাহ ভালো জানেন।

(শারহে মুসলিম, (৬২৭) আল-ইলাম, ২/২৭১, ফাতহুল বারী, ৮/১৯৫)

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আসরের সালাত বিলম্ব করে পড়ার কারণ কী

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছরের সালাত বিলম্ব করে পড়েন, এমনকি সূর্য ডুবে যায়। এটা ছিল সালাতুল খাওফের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগের ঘটনা। কিছু বিদ্বান বলেন, হয়তো তিনি ভুলবশত বিলম্ব করে পড়েছেন, ইচ্ছা করে পড়েননি। আর ভুলবশত সালাত পড়ার কারণ হলো তিনি শত্রুদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এ-ও সম্ভবনা আছে যে, তিনি ব্যস্ততার কারণে ইচ্ছা করেই বিলম্ব করে পড়েছেন। সালাতুর খাওফের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে এটা একটা ওজর ছিল। কিন্তু এখন শত্রু ও যুদ্ধের কারণে সালাতের নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্ব করে পড়া যাবে না। বরং অবস্থানুযায়ী সালাতুল খাওফ পড়ে নিবে। ফিকহের কিতাবে এ সালাত পড়ার প্রসিদ্ধ বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আমি বলছি, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সালাতুল খাওফ আধ্যায়ে আসতেছে ইনশা আল্লাহ। (মুফহিম, ২/২৫৬, মুসলিম, (৬২৭))

٤٩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي – أَوْ عَلَى النَّاسِ – لَأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةِ».

৪৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার সালাত আদায় করতে দেরি করলেন। অতঃপর উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বের হয়ে বললেন। হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সালাতের সময় হয়েছে। নারীরা এবং শিশুরা ঘুমিয়ে গিয়েছে। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আসলেন। এমতাবস্থায় তাঁর মাথা হতে টপটপ করে পানি পড়ছিল। আর তিনি বলছিলেন: আমি যদি আমার উম্মতের ওপর কিংবা জনগণের ওপর কঠিন মনে না করতাম তাহলে আমি তাদেরকে ইশার সালাত এই সময় আদায় করার আদেশ করতাম। [সহীহ বুখারী হা/৭২৩৯ ও মুসলিম হা/৬৪২]

بَاب فِي شيء مِن مَكرُوهَات الصَّلاة

অধ্যায়: সালাতের মাকরূহ বিষয় সম্পর্কে

٥٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ" . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ :نَحْوُهُ.

৫০. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যখন সালাতের ইকামত হয় আর তখন রাতের খাবার উপস্থিত হয়, তখন তোমরা রাতের খাবার প্রথমে শুরু কর। [সহীহ বুখারী হা/৫৪৬৫ ও মুসলিম হা/৫৫৮]

ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে। [সহীহ বুখারী হা/৬৭৩ ও মুসলিম হা/৫৫৯]

٥١. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ».

৫১. সহীহ মুসলিমে, আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, খাবার উপস্থিত হলে আর কোনো সালাত নেই এবং পেশাব পায়খানার চাপ থাকালীন অবস্থাতেও কোনো সালাত নেই। [সহীহ মুসলিম হা/৫৬০]

খাবার উপস্থিত হলে আর এদিকে সালাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে কোনটা আগে করবে?

প্রথম মতঃ আগে খাবার গ্রহণ করবে। সালাত পড়লে মাকরূহ হবে, তবে সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এ মতটি আবু বকর, উমার, ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস ও আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম তাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে এটা সুফিয়ান ছাওরী, ইসহাক, ইবনু মুনযির, ইমাম আহমাদের প্রসিদ্ধ মত ও যাহিরীদের মত। তারা আরো অতিরিক্ত বলেন যে, এ অবস্থায় যদি সালাত পড়ে তাহলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় মতঃ খাওয়ার আগে সালাত পড়তে হবে। তবে অন্তরটা যদি খাবারের প্রতি বেশি ঝুঁকে যায় তাহলে আগে খাবার গ্রহণ করবে। এটা ইমাম শাফেয়ী ও ইবনু হাবীব মালেকী রহিমাহুমার মত।

তৃতীয় মতঃ ক্ষুধা নিবারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খাবে, তবে তৃপ্তিসহকারে খাবে না। ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা শাফেয়ী মাযহাবের কতিপয় বিদ্বান ও অন্যান্যদের মত। আমি বলছি, বুখারী (৬৭৪) ও মুসলিমে (৯৫৯) বর্ণিত ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস এই মতকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ খাবার খেতে থাকলে সে যেন প্রয়োজন পুরা করার আগে তাড়াহুড়া না করে; যদিও সালাতের ইকামত দিয়ে দেয়া হয়"।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। কারণ লেখক এ বিষয়ে আয়েশা ও ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীস দলীল হিসেবে নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ ভালো জানেন। অবশ্য এই মতকে ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেন। তিনি বলেন, সারকথা হচ্ছে খাবার উপস্থিত হলে এটা একটা জামাআত ছেড়ে দেয়ার ওজর। তাই আগে খাবার গ্রহণ করতে হবে। যদিও জামাআত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে। কারণ খাবার উপস্থিত থাকলে অল্প হলেও খাবারের প্রতি মন ঝুঁকে থাকে। এমতটিই আমাদের শাইখরা ও অন্যরা স্পষ্ট করেছেন। এটাকে ইবনু আব্বাস, হাসান প্রমুখ ব্যক্তিরা জামাআত বর্জনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। (ইকমালুল মুয়াল্লিম, ২/৪৯৪, মুগনী, ১/৬৩০, ইবনু রজব, ৬/৯৯, নাইলুল আওতার, ২/২৪৫)

খাবার উপস্থিত হলে বা পেশাব পায়খানার চাপ সৃষ্টি হলে এই অবস্থায় সালাতের বিধান কী?

এই মাসআলার চারটা অবস্থা রয়েছে।

প্রথম অবস্থা: কাজী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন, সকল বিদ্বান একমত, কারো যদি এমন অবস্থা হয় যে, সে সালাত অনুধাবন করতে পারছে না বা সালাতের সীমারেখা ঠিক রাখতে পারছে না তাহলে এই মুহূর্তে সে সালাত পড়লে তার সালাত যথেষ্ট হবে না এবং এই সময় সালাত শুরু করাও তার জন্য বৈধ হবে না। এই অবস্থায় থাকলে সে সালাত ছেড়ে দিবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, সকল বিদ্বান একমত, কেউ যদি খাবার উপস্থিত হলে সালাত পড়ে এবং পরিপূর্ণ করে নেয়, সে সালাতের কোনো ফরয না ছাড়ে তাহলে তার সালাত যথেষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি পেশাবের চাপ থাকাবস্থায় সালাত পড়ে তাহলে তারও সালাত হয়ে যাবে।

আমি বলছি, এ বিষয়ে যাহিরীরা তাদের বিপরীত বলেছেন। তারা বলেন, সালাত যথেষ্ট হবে না। এ বিষয়ে তারা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার হাদীস দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, লেখক যা উল্লেখ করেছেন। "খাবার উপস্থিত হয়ে গেলে আর সালাত হবে না এবং পেশাব পায়খানার চাপ সৃষ্টি হলে"। অবশ্য এই হাদীসের জবাব এইভাবে দেয়া হয়েছে, 'সালাত পরিপূর্ণ হবে না'। হাদীস দ্বারা প্রথম অবস্থার দলীল দেয়া হয়েছে। আর সেটা হচ্ছে কারো যদি এমন অবস্থা হয় যে, সে সালাত অনুধাবন করতে পারছে না বা সালাতের সীমারেখা ঠিক রাখতে পারছে না ।

দ্বিতীয় অবস্থা আর সেটা হচ্ছে এই অবস্থায় সে যদি সালাত পূর্ণ করে নেয় এবং কোনো ফরয বর্জন না করে তাহলে তার সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে দলীল হচ্ছে আমর ইবনু উমাইয়া আয-যামিরী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছাগলের বাহু ছুরি দিয়ে কেটে খেতে দেখেছি। তারপর তাকে সালাতের জন্য ডাকা হলে তিনি ছুরি ফেলে দিয়ে সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে যান, কিন্তু ওযূ করেননি। (বুখারী, হা/৬৭৫, মুসলিম, হা/৩৫৫)

তৃতীয় অবস্থা: পেশাব পায়খানার যদি চাপ সৃষ্টি হয় বা খাবার বর্জন করলে যদি সালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে এই মাসআলাটি সালাতে একাগ্রতার দিকে চলে যায়। এখন কথা হলো সালাতে একাগ্রতার বিধান কী? এই মাসআলায় মতভেদ আছে।

প্রথম মত: সালাতে একাগ্রতা মুস্তাহাব, আবশ্যক নয়। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত; বরং ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ ইজমা দাবি করেছেন যে সালাতে একাগ্রতা আবশ্যক নয়।

ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা এ বিষয়ে একমত যে, সালাতে দুনিয়াবী বিষয়ে চিন্তা আসলে এতে সালাত বিনষ্ট হয়ে যায় না। তাদের দলীর: বুখারীতে (৬০৮) ও মুসলিমে (৩৮৯) আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে আছে, "ইকামত শেষ হলে শয়তাস আবার

ফিরে আসে। এমনকি মুসল্লীর মাঝে ও তার মনের মাঝে কিছু উদয় করে দেয়। সে বলে এটা স্মরণ করো, ওটা স্মরণ করো; অথচ ইতোপূর্বে তার এটা স্মরণেই ছিল না। এরপর ব্যক্তি জানে না যে কত রাকআত সালাত পড়েছে"। তাদের আরো দলীল রয়েছে।

দ্বিতীয় মত: সালাতের মাঝে অন্তরের চিন্তভাবনা বেশি হলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে যেমন শরীর নিয়ে বেশি খেলা করলে সালাত বিনষ্ট হয়ে যায়। এই মতটি ইবনু হামেদ মালেকী, ইমাম শাফেয়ীর একটা মত ও ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে অনেক দলীল আছে। কেউ জানতে চাইলে সে যেন দেখে, (মাজমূ' ফাতাওয়া, ২২/৫৫৩)

সঠিক কথা হচ্ছে প্রথম মতটি। আর এটা হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন।

চতুর্থ অবস্থা: পেশাব পায়খানার এমন চাপ সৃষ্টি হয়েছে বা খাবার বর্জন করার ফলে সালাতের রুকুন আদায়ের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। ইবনু মুলকান রহিমাহুল্লাহ বলেন, এমন অবস্থা হলে তার বিধান হলো এই কারণ ছাড়া কারো সালাতে সংশয় হলে যে বিধান তার ওপর সেই বিধান বর্তাবে। আর সেটা হচ্ছে ইয়াকীনের ওপর আমল করবে। (তামহীদ, ২২/২০৯, ইস্তিযকার, ৬/২০৬, মুহাল্লা, ২/৩৬৬, মারাতিব, (৫৩), ইকমালুল ইলম, ২/৪৯৫, মুফহিম, ২/১৬৫, শারহে মুসলিম, (৫৫৮), মাজমূ' ফাতাওয়া, ২২/৫৫৩, ইবনু রজব, ৬/৩৬৯, ইলাম, ২/৩০৩, ফাতহুল বারী, ২/২২৬, তাহযীহ, ২/১০৩)

পেশাব পায়খানার যদি চাপ সৃষ্টি হয় বা রাতের খাবার উপস্থিত হয় আর এদিকে সালাতের সময় সংকীর্ণ তাহলে কী করবে?

প্রথম মত: সালাতের সময় এমন সংকীর্ণ যে, যদি খাবার খায় বা পবিত্রতা অর্জন করতে যায় তাহলে সালাতের সময় শেষ হয়ে যাবে তাহলে এ ক্ষেত্রে এই অবস্থায়ই সালাতের সময় রক্ষা করতে গিয়ে সালাত পড়ে নিবে, বিলম্ব করা জায়েয হবে না। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তারা বলেন, সালাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে একাগ্রতা। আর একাগ্রতা মুস্তাহাব। সুতরাং এই কারণে সালাত ছাড়া যাবে না।

দ্বিতীয় মত: এই অবস্থায় সালাত পড়বে না, বরং খাবে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে; যদিও সালাতের সময় শেষ হয়ে যায়। এটা ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব, ইবনু হাযমের মত ও শাওকানী রহিমাহুল্লাহ পছন্দনীয় মত।

এই মাসআলায় সারকথা হচ্ছে, খাবারের প্রতি যদি অধিক ঝোঁক থাকে বা পেশাব পায়খানার এমন চাপ থাকে, যার কারণে সালাতে কী বলছে জানে না এবং সালাতকে সংরক্ষণ করতে পারছে না তাহলে এই অবস্থায় খাবে, পেশাব পায়খানা করে ওযূ করবে; যদিও সালাতের সময় শেষ হয়ে যায়। এ বিষয়ে ইজমার কথা গত হয়েছে, যে ব্যক্তি সালাতে কী বলছে

জানে না এবং সালতের সীমারেখা সংরক্ষণ করতে পারছে না তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ক্ষুধা ও পেশাব পায়খানার চাপ কম থাকে তাহলে অধিকাংশ বিদ্বান যা বলেছেন তা হবে। অর্থাৎ সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে যদি পেশাব পায়খানার চাপের কারণে কোনো ক্ষতির শঙ্কা করে তাহলে তার জন্য জায়েয আছে আগে প্রয়োজন পুরা করে তারপর ওযূ করে সালাত পড়বে। যদিও সালাতের সময় শেষ হয়ে যায়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং কেউ ক্ষতি করলেও তার বদলায় ক্ষতি করা যাবে না"। এই হাদীসটা আটজন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তাদের মাঝে রয়েছেন উবাদা ইবনু সামেত, আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা ও জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম। সবগুলো হাদীস একত্রিত করে শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ ইরওয়াউল গালীলে (৮৯৬) সহীহ বলেছেন। (মুহাল্লা, ২/৩৬৭, শারহু মুসলিম, (৫৫৭), ইবনু রজব, ৬/১০৪, নাইলুল আওতার, ২/২৪৫, শারহুল মুমতি, ৩/২৩৭)

পরিতৃপ্ত থাকলে খাবার উপস্থিত হলেও এর প্রতি গুরুত্ব দেয়া যাবে না

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, খাবারের প্রতি যদি পরিপূর্ণ ঝোঁক না থাকে তাহলে সালাত আগে পড়াতে কোনো সমস্যা নেই।

শাইখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, খাবার যদি উপস্থিত হয়, কিন্তু ব্যক্তি পরিতৃপ্ত থাকে তাহলে খাবারের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে সালাত পড়ে নিবে। এতে অপছন্দের কিছু নেই। এমনিভাবে খাবার যদি উপস্থিত হয় আর তা গ্রহণ করা যদি শরীআত কর্তৃক বা পঞ্চইন্দ্রিয় কর্তৃক নিষিদ্ধ হয় তাহলেও সালাত পড়ে নিবে।

শরীআত কর্তৃক নিষিদ্ধ যেমন: সিয়াম পালনকারীর নিকট আসরের সালাতের সময় খাবার উপস্থিত হয়। আর ওই ব্যক্তি খুবই ক্ষুধার্ত হয় তাহলে আমরা তাকে বলবো না যে, আপনি সূর্য ডুবার পর তা গ্রহণ না করে আসরের সালাত পড়বেন না। কেননা এখন খাবার গ্রহণ করা শরীআত কর্তৃক নিষিদ্ধ। সুতরাং অপেক্ষা করাতে কোনো উপকার নেই। অনুরূপভাবে তার কাছে যদি অন্যের খাবার উপস্থিত হয় আর সে-ও খাবার গ্রহণের প্রতি আগ্রহী তাহলেও তার ওই সময় সালাত পড়া মাকরূহ নয়। কেননা এই খাবার গ্রহণ করা শরীআত কর্তৃক নিষিদ্ধ।

পঞ্চইন্দ্রিয় কর্তৃক নিষিদ্ধ যেমন: কোনো ব্যক্তির নিকট এমন গরম খাবার উপস্থিত করা হলো যে, সে তা খেতে পারছে না। এখন সে কি সালাত পড়বে নাকি খাবার ঠান্ডা হলে তারপর খেয়ে সালাত পড়বে? উত্তর হলো সালাত পড়বে। ওই মুহূর্তে সালাত পড়া মাকরূহ হবে না। কেননা তার অপেক্ষা করাতে কোনো উপকার নেই। অনুরূপভাবে তার নিকট যদি তার নিজের খাবার আনা হয়, কিন্তু তার কাছে কোনো জালেম থাকে, যে তাকে খাবার খেতে বাধা দিচ্ছে তাহলে এই মুহূর্তে সালাত পড়া তার জন্য মাকরূহ নয়। কেননা এখন ইন্দ্রিয়ভাবে

সালাত না পড়াতে কোনো উপকার নেই। কারণ এখন সে খাবার খেতে পারছে না। (ইবনু রজব, ৬/৯৯, শারহুল মুমতি, ২/২৩৮)

খাবার উপস্থিত হয়নি, কিন্তু হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে আর এর প্রতি তার ঝোঁকও রয়েছে তাহলে এই মুহূর্তে কী করবে?

ইবনু দাকীকুল ঈদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ বিষয়ে সঠিক কথা হচ্ছে খাবার যদি উপস্থিত না হয় তাহলে হয়তো একটু পরেই উপস্থিত হয়ে যাবে আর এমন হলে এটা খাবার উপস্থিত হওয়ারই মতো অথবা খাবার একটু পর উপস্থিত হবে না। যদি প্রথম অবস্থা হয় তাহলে এর বিধান খাবার উপস্থিত হওয়ার হুকুমের মতোই। আর যদি দ্বিতীয় অবস্থা হয় আর সেটা হচ্ছে খাবার উপস্থিত দেরিতে হবে তাহলে এটাকে খাবার উপস্থিত হওয়ার সাথে মিলানো যাবে না। কেননা খাবার উপস্থিত হলে আবশ্যকীয়ভাবেই এর প্রতি ঝোঁক চলে আসে। আর এই অতিরিক্ত ঝোঁকের প্রতি লক্ষ রেখেই শরীআত সালাত না পড়ে আগে খাবার গ্রহণ করতে বলেছে। সুতরাং এই হুকুমের সাথে দ্বিতীয় অবস্থা মিলানো যাবে না। কারণ এই বিষয়ে উসূলী কায়দা হচ্ছে কোনো নস (কুরআন ও হাদীসের দলীল) যদি শুধু একটা গুণকে অর্ন্তভুক্ত করে তাহলে এটাই এর সাথে মিলিত হবে। আমি বলছি, সঠিক কথা হচ্ছে খাবার যদি উপস্থিত না হয় তাহলে সালাত বিলম্ব করে পড়বে না। এর কারণ হচ্ছে লেখক আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার হাদীস প্রথম ও দ্বিতীয়তে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু উমার ও আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীসে খাবার উপস্থিত হওয়ার কথা এসেছে। শাইখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও যদি খাবার উপস্থিত না হয় তাহলে সালাত বিলম্ব করে পড়বে না। কেননা আমরা যদি এ কথা বলি তাহলে এ কথা বলা আবশ্যক হয়ে যায় যে ফকির কখনোই সালাত পড়বে না। কেননা ফকির অনেক সময় ক্ষুধার্ত থাকে ও খাবারের প্রতিও তার আগ্রহ থাকে। (ইহকাম, ১/১৪৮, ইলাম, ২/৩০৭, শারহুর মুমতি, ৩/২৩৮)

পেশাব পায়খানার চাপ সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তার কাছে ওযূ করার মতো পানি নেই

ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, পেশাবের চাপ সৃষ্টি হয়েছে এমন ব্যক্তির জন্য কোনটা করা উত্তম, পানি দিয়ে ওযূ করে সালাত পড়া, নাকি পানি দিয়ে পেশাব করে তারপর তায়াম্মুম করে সালাত পড়া?

এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তায়াম্মুম করে সালাত পড়া উত্তম, পানি দিয়ে ওযূ করে সালাত পড়ার চেয়ে। কেননা পেশাবের চাপ নিয়ে এই সালাত পড়া মাকরূহ ও নিষিদ্ধ এবং তা বিশুদ্ধ হওয়া নিয়ে দুটি মত রয়েছে। কিন্তু তায়াম্মুম করে সালাত পড়লে সালাত বিশুদ্ধ

হয়ে যাবে। করো নিকট এই সালাত মাকরূহ হবে না। (মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ২১/৪৭৩, হাশিয়াতর রাওযা, ২/৯৭, শারহুল মুমতি, ৩/২৩৬)।

পেশাব পায়খানার মতো যে সকল বিষয় তা কি এর সাথে সম্পৃক্ত হবে?

ইবনু মুলকান রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে সকল বিষয় পেশাব পায়খানার মতো অন্তরকে ব্যস্ত রাখে তাও এর অর্ন্তভুক্ত হবে। এর মাধ্যমে খুশুখুযু বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম —এর এ বাণীর সাথে সম্পৃক্ত করা, “রাগান্বিত অবস্থায় বিচারক বিচার করবে না”। এই বিষয়ের সাথে মিলবে, ‘ক্ষুধার্ত পিপাসিত, চিন্তা ও আনন্দ অবস্থায়ও বিচার করবে না।

শাইখ বাসসাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, পেশাব পায়খানার সাথে ওই সকল বিষয়ও সম্পৃক্ত হবে, যে সকল বিষয় অন্তরকে অন্য মনস্ক করে দেয়। যেমনঃ পেটের ভেতর বায়ু, খুব গরম বা তীব্র ঠান্ডা, ক্ষুধার্তাবস্থায়, পিপাসিত অবস্থায় প্রভৃতি অবস্থা যা দ্বারা খুশুখুযু চলে যায় এবং অন্তরের উপস্থিতি চলে যায়। সালাতের মগজ হলো অন্তর সালাতের প্রতি থাকা। যখন এটা পাওয়া যাবে না, তখন এটা শুধু কিছু কাজ ও নাড়াচাড়ার মতো থাকবে, তবে সালাত হয়ে যাবে। কিন্তু সফলকাম মুমিনদের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারবে না, যারা তাদের সালাতে বিনয়ী। (ইলাম, ২/৩০৬, শারহে মুসলিম, (৫৫৭), তাওযীহ, ২/১০৩)

بَاب أوقات النَّهي

অধ্যায়ঃ সালাতের নিষিদ্ধ সময়সমূহ

৫২. عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ».

৫২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার কয়েকজন আস্থাভাজন ব্যক্তি- যাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আস্থাভাজন হলেন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তারা আমাকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাতের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত এবং আসর সালাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত (সাধারণ নফল) সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। [সহীহ বুখারী হা/৫৮১ ও মুসলিম হা/৮২৬]

৫৩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ".

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِي البَابِ: عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَسَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَالصُّنَابِحِيِّ – وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدِيثُهُ مُرْسَلٌ.

৫৩. আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে, ফজরের পর হতে সূর্য উদয় হয়ে একটু ওপরে না ওঠা পর্যন্ত কোনো সালাত নেই। আর আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো সালাত নেই। [সহীহ বুখারী হা/৫৮৬ ও মুসলিম হা/৮২৭]

লেখক রহিমাহুল্লাহ বলেন: এই বিষয়ে আলী ইবনে আবূ তালিব [সহীহ: মুসনাদে আহমাদ ১/৮১, আবূ দাউদ হা/১২৭৪, নাসাঈ হা/৫৭৩], আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [আবূ ইয়ালা মাওছুলি হা/৪৯৭৭], আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে খাত্তাব [সহীহ বুখারী হা/৫৮২-৫৮৩ ও মুসলিম হা/৮২৭।], আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস [হাসান: মুসনাদে আহমাদ ২/১৭৯], আবূ হুরায়রা [সহীহ বুখারী হা/৫৮৪ ও মুসলিম হা/৮২৫।], সামূরাহ ইবনে জুন্দুব [হাসান: মুসনাদে আহমাদ ৫/১৫], সালমাহ ইবনে আকওয়াহ [সহীহ: মুসনাদে আহমাদ ৪/৫১], যায়েদ ইবনে সাবিত [সহীহ: মুসনাদে আহমাদ ৫/১৮৫], মুআয ইবনে আফরা [সহীহ: মুসনাদে আহমাদ ৪/২১৯, আবূ দাউদ ত্বয়ালিসী হা/১৩২২], কা'ব ইবনে মুর্‌রাহ [সহীহ: মুসনাদে আহমাদ ৪/২৩৫], আবূ উমামাহ আল বাহেলী [যঈফ: মুসনাদে আহমাদ ৫/২৬০], আমর ইবনে আবাসা আস-সুলামী [সহীহ মুসলিম হা/৮৩২।], আয়িশা সহীহ মুসলিম হা/৮৩৩।] (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং ছুনাবাহী [সহীহ (যদিও মুরসাল হাদীস): মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৪৮, ইবনে মাজাহ হা/১২৫৩] রহিমাহুল্লাহ হতেও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস শ্রবণ করেননি। সুতরাং হাদীসটি মুরসাল।

যে সময়ে সালাত পড়া নিষিদ্ধ এর সংখ্যা

প্রথম মত: আসরের সালাতের পর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত। এটা বিশুদ্ধ কথা। তবে এর মাঝে মতভেদ আছে যা অচিরেই আসছে।

দ্বিতীয় মত: ফজরের সালাতের পর। এটা সঠিক কথা। তবে এর মাঝে মতভেদ আছে যা অচিরেই একটা মাসআলা পর আসছে ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় মত: সূর্য উঠে এক তীর পরিমাণ উপরে উঠা পর্যন্ত।

ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই সময়টা সূর্য উঠার দশ থেকে পনেরো মিনিট পর্যন্ত। অর্থাৎ সময়টা বেশি দীর্ঘ নয়। তবে সতর্কতাবশত পনেরো মিনিট পর্যন্ত ।

চতুর্থ মত: সূর্য মাথা বরাবর থেকে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত সময়। অর্থাৎ সূর্য আসমানের মাঝ থেকে পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়া সময় পর্যন্ত। এটা হলো অধিকাংশ বিদ্বানের মত। ইমাম মালেক, তার ছাত্ররা, হাসান, তাউস, আওযায়ীর এক বর্ণনা অনুযায়ী ও খিরাকী তাদের মত হলো সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় সালাত জায়েয় আছে।

অধিকাংশ বিদ্বানের দলীল: যে হাদীসের আলোচনা একটু পর আসছে সেটা এ বিষয়ে স্পষ্ট দলীল। অনুরূপভাবে মুসলিমে (৮৩২) বর্ণিত আমর ইবনু আবাসার হাদীস, সেখানে আছে,

ثُمَّ صَلِّ. فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ. حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ. ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ. فَإِنَّ، حِينَئِذٍ، تُسْجَرُ جَهَنَّمُ. فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ. فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ. حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ. ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ. حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ. وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

“তারপর সালাত পড়ো, যতক্ষণ না ছায়া একতীর পরিমাণ হবে। কেননা ওই সময় সালাতকে উপস্থিত করা হয়। তারপর সালাত পড়বে না। কেননা ওই সময় জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হয়। আবার ছায়া দেখা দিলে আসর সালাত পড়া পর্যন্ত সালাত পড়ো। কেননা ওই সময় সালাতকে উপস্থিত করা হয়। তারপর সূর্য ডুবা অবধি সালাত পড়বে না। কেননা ওই সময় সূর্য শয়তানের দুই শিঙের মাঝে ডুবে যায় ও ওইসময় কাফেররা সালাত পড়ে”।

ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ ও তার সাথে যারা আছেন তাদের দলীল: জুমআর দিন সূর্য ঢলার সময় যখন ইমাম মিম্বারে আরোহন করে, তখন পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলিমরা নফল সালাত পড়াকে জায়েয মনে করেন। তারা উকবা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস ও যে সকল হাদীস তার হাদীসের মতো এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, এ সকল হাদীস মুসলিমদের

আমলের ইজমার মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফরয সালাত। এ বিষয়ে সঠিক কথা হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

পঞ্চম মত: সূর্য ডুবার জন্য যখন ঝুঁকে যায় তখন। শাইখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, সূর্য ডুবার সময় যখন সূর্যটা থালার মতো স্পষ্ট প্রকাশিত হয় তখন থেকে পরিপূর্ণভাবে সূর্য ডুবা পর্যন্ত হচ্ছে সালাত পড়ার নিষিদ্ধ সময়।

শেষের তিনটি মত যারা দিয়েছেন তাদের দলীল: মুসলিমে (৮৩১) বর্ণিত উকবা ইবনু আমের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, তিন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সালাত পড়তে ও আমাদের মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেন। সূর্য পরিপূর্ণভাবে উঠার আগ পর্যন্ত, সূর্য যখন মাথার উপরে থাকে ঢলার আগ পর্যন্ত ও সূর্য ঝুঁকা থেকে নিয়ে ডুবা পর্যন্ত। (আওসাত, ২/৩৮৮, মুগনী, ২/১১৪, মুফহিম, ২/৪৬২, মাজমু, ৪/৭৬, ইবনু রজব, ৫/৪৩-৫৯, ফাতহুল বারী, ২/৬২, শারহুল মুমতি, ৪/১১২)

মাকরূহ সময়ে ফরয সালাতের বিধান

প্রথম মত: মাকরূহ সময় ফরয সালাত পড়া জায়েয আছে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। বরং ইমাম নববী ও ইবনু মুলকান রহিমাহুমা বলেন, এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত যে, এই সময় ফরয সালাত পড়া জায়েয।

দ্বিতীয় মত: মাকরূহ সময় ফরয সালাত পড়া জায়েয নেই। হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই মতটা আবু বাকরা ও কাব ইবনু উজরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। লেখক ইবনু আব্বাস ও আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীস উল্লেখ করেছেন। আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের শব্দ হলো, "ফজর সালাতের পর আর কোনো সালাত নেই"। অর্থাৎ এর অর্থ হচ্ছে যখন তুমি ফজরের সালাত পড়ে ফেলবে, তখন আর কোনো নফল সালাত পড়বে না। তবে কারণের সালাত পড়তে পারবে। এ বিষয়ে বিস্তর বিবরণ অচিরেই আসছে ইনশাআল্লাহ। (শারহে মুসলিম, (৮২৭), ইলাম, ২/৩১০, ফাতহুল বারী, ২/৫৯)

ফজর ও আসর সালাতের পর অন্য সালাত পড়া নিষেধ এটা কি সালাত পড়ার সাথে সম্পৃক্ত নাকি সালাতের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত?

আসরের ব্যাপারে কথা হচ্ছে ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, আসরের পর সালাত পড়া নিষেধ এটা সালাতের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি আসরের সালাত পড়েনি তার জন্য অন্য নফল পড়া বৈধ আছে। আর যে ব্যক্তি আসরের সালাত পড়ে ফেলেছে তার জন্য নফল সালাত পড়া বৈধ নেই। তিনি বলেন, আমরা জানি না এ বিষয়ে তারা মতভেদ করেছেন কিনা যারা আসরের পর সালাত পড়তে নিষেধ করেন।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে আসরের পর মাকরূহ সময় শুধু সময় হয়ে গেলেই প্রবেশ করে না; বরং এটা প্রবেশ করে আসরের সালাত পড়ার পর।

ফজরের ব্যাপার হচ্ছে, এতে মতভেদ আছে।

প্রথম মত: ফজর উদয় হলেই অন্য কোনো সালাত পড়া যাবে না। যখন ফজর উদয় হবে, তখন ফজরের দু'রাকআত সালাত পড়বে। এরপর ফজরের ফরয সালাত পড়বে। এটাই সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈন ও পরবর্তীদের মাঝে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের মাঝে আছে তিন ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুমুল্লাহ। সাহাবীদের মাঝে আছেন, ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস, ইবনু আমর ও আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম। তাদের দলীল: লেখক ইবনু আব্বাস ও আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস যা মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে তার শব্দ হচ্ছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পর সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত অন্য সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন। তার কথা 'ফজরের পর সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন' এ বিষয়ে ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ছুবহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফজর। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "শপথ ফজরের, যখন তা উদিত হয়"। (সূরা আত-তাকউর, ১৮)

আল্লাহ আরো বলেন, "তোমাদের প্রতিশ্রুতির দিন হচ্ছে ফজরের সময়। ফজরের সময় কি খুবই নিকটবর্তী নয়?" (সূরা হুদ, ৮১)

তারা মুসলিমে (৭২৩) বর্ণিত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস দিয়ে আরো দলীল দিয়েছেন, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর উদিত হলে হালকা দু'রাকআত (ফজরের সুন্নাত) সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত পড়তেন না। বুখারীতে (৫৮৪) বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পর সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন। মুসলিমে (৮২৫) বর্ণিত হয়েছে, ফজরের পর সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, যা মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ফজরের পর দুই রাকআত সালাত ব্যতীত অন্য

কোনো সালাত নেই”। এই হাদীসটি শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বিভিন্ন সনদ ও শাহেদের কারণে ইরওয়াউল গালীলে (৪৭৮) সহীহ বলেছেন।

দ্বিতীয় মত: ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, কতিপয় বিদ্বান ফজর উদিত হওয়ার পর ফজর সালাত পড়ার আগে কিছু সালাত পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন: বিতর সালাত ও তাহাজ্জুতের সালাত। এই মতটি ইবনু উমার ও আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ মতের দিকে ঝুঁকেছেন ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ। তিনি বিতর ও রাতের সালাত কাযা আদায়ের ব্যাপারে এই মত দেন। ইমাম তাউস ও আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুমা থেকে বিতরের ক্ষেত্রে এই মতটি বর্ণিত হয়েছে। অন্য বিদ্বানরা বলেন, ফজরের সালাত পড়ার আগ পর্যন্ত সালাত পড়া নিষিদ্ধ নয়। ফজরের সালাত পড়ার পূর্বে অন্য সালাত পড়ার অনুমতি রয়েছে। এই মতটি হাসান, তাউস ও ইমাম শাফেয়ীর অধিকাংশ ছাত্রের মত। তারা ফজরের সালাত পড়ার আগে অন্য সালাত পড়ার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ থেকেও এমন মত বর্ণিত হয়েছে। তাদের দলীল: মুসলিমে বর্ণিত আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহর হাদীস, লেখক যা উল্লেখ করেছেন, “সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত ফজরের পর আর কোনো সালাত নেই”। অনুরূপভাবে মুসলিমে (৮৩২) বর্ণিত আমর ইবনু আবাসা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, “ফজরের সালাত পড়ো। এরপর সূর্য উঠে উপরের উঠার আগ পর্যন্ত সালাত থেকে বিরত থাক। কেননা তখন সূর্য শয়তানের দুই শিঙের মাঝে উদিত হয়”।

সঠিক মত: এ বিষয়ে সঠিক মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। কেননা এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো স্পষ্ট । আর প্রথম মতের দলীলগুলো যেমন: “ফজর সালাতের পর কোনো সালাত নেই”। হাফের ইবনু হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, অর্থাৎ ফজরের সালাতের পর আর কোনো সালাত নেই। এখানে বিধানটা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। বরং ফজরের সালাতের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। আর পূর্বে উল্লেখিত ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস দুর্বল। কারণ এর সনদ অপরিচিত। হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এই সনদের বিষয়ে তালখীসুল হাবীরে আলোচনা করেছেন। তারপর এই হাদীসের শাহেদ নিয়ে এসেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে এই শাহেদের দ্বারা হাদীসটি কি দলীলযোগ্য? অবশ্য শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাদীসটি যদি সহীহও মেনে নেয়া হয় তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়া হবে ওই সময় সালাত পড়া শরীআতসম্মত নয়। অর্থাৎ ফজর উদিত হওয়ার পর ফজরের দু’রাকআত সুন্নাত ব্যতীত আর কোনো সালাত পড়া কোনো মানুষের জন্য শরীআতসম্মত নয়। এই মতটাকে ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন, এখানে নিষেধটা হচ্ছে স্বয়ং ফজর সালাতের সাথে। আযান ও ইকামতের মাঝে যে সালাত রয়েছে এই সময় সালাত পড়া নিষেধ নয়। কিন্তু তথাপি ওই সময় ফজরের দু’রাকআত সুন্নাত সালাত ব্যতীত আর কোনো সালাত শরীআতসম্মত নয়। কেননা সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থে নিষেধকৃত বিষয়টি স্বয়ং ফজরের সালাতের সাথে “ফজর সালাতের পর সূর্য উঠার আগে অন্য কোনো সালাত নেই”। আসরের পর

সালাত পড়তে যে নিষেধ করা হয়েছে এটা আসরের সালাতের সাথে সম্পৃক্ত, সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। অনুরূপভাবে ফজর সালাতের পর সালাত নেই এই নিষেধাজ্ঞাটা স্বয়ং ফজর সালাতের সাথে। (মুগনী, ২/১১৬, মাজমু, ৪/৭৭, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৩/২০০, ইবনু রজব, ৫/২৯-৫৪, ফাতহুল বারী, ২/৫৯, শারহুল মুমতি, ৪/১১১)

মাকরূহ সময়ে কারণ মুক্ত নফল সালাতের বিধান কী?

প্রথম মত: আসর ও ফজরের পর এই সালাত পড়া যাবে। এই মতটি সাহাবীদের একদল থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাদের মাঝে আছেন, ইবনু উমার, বেলাল, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম। এই মতটি ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন। কেননা তার নিকট মাকরূহ সময় তিনটি: সূর্য উদিত হওয়ার সময়, সূর্য ডুবার সময় ও সূর্য ঢলার সময়। আসরের সালাতের পর সূর্য উপরে থাকলে এই সকল সালাত পড়ার অনুমোদন আলী, যুবায়ের, তামীম দারী, আবু আইউব আনসারী, আবু মুসা, যায়েদ ইবনু খালেদ, ইবনু যুবায়ের, নোমান ইবনু বাশীর ও উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে এটা আসওয়াদ, মাসরুক, শুরাই, আমর ইবনু মাইমুন, আব্দুর রহমান ইবনু আসওয়াদ, উবাইদা, আহনাফ ইবনু কায়েস, তাউস, আতা, ইবনু জুরাইজ ও আমর ইবনু দিনার রহিমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাদের দলীল: আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার হাদীস, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সূর্য উঠা ও ডুবার সময় সালাত পড়ার জন্য তোমরা এই সময়টাকে তালাশ করো না"। (মুসলিম, হা/৮৩৩)

বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, শুধু সূর্য উঠার সময় সালাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা ওই সময় সূর্য শয়তানের দুই শিঙের মাঝে উদিত হয়। হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের শাইখ আস সহীহুল মুসনাদে (১৮৪) উল্লেখ করেছেন।

ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার আসার, তিনি বলেন, এই সময় আমার সাথীরা যেমন সালাত পড়ে আমিও সালাত পড়ি। রাতে-দিনে যে কোনো সময় সালাত পড়তে আমি কাউকে নিষেধ করি না। তবে সূর্য উঠা ও ডুবার সময় সালাত পড়ার জন্য তোমরা এই সময়টাকে তালাশ করো না। (বুখারী, হা/৮৫৯) তাদের আরো দলীল আছে। অবশ্য কিছু দলীল বিশুদ্ধ নয়।

দ্বিতীয় মত: আসরের পর সূর্য ডুবার আগে ও ফজরের পর সূর্য উঠার আগে এই সালাত পড়া যাবে না। এটা উমার, খালেদ ইবনু ওয়ালিদ, ইবনু আব্বাস, মুয়াবিয়া ও ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম তাদের মত। এমনিভাবে এই মত গ্রহণ করেছেন চার ইমাম, আওযায়ী, ছাওরী, ইসহাক, আবু ছাওর রহিমাহুমুল্লাহ। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ ইজমা নকল করেছেন। তিনি বলেন, বিদ্বানরা একমত যে, এই সময় কারণ যুক্ত নয় এমন সালাত পড়া

মাহরূহ। কিন্তু তার ইজমা নকল করা বিশুদ্ধ নয়। এই মাসআলায় বিরুধীদের কথা পূর্বে গত হয়েছে।

তাদের দলীল: লেখক বহু সাহাবীদের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা আসরের পর সূর্য ডুবার আগে ও ফজরের পর সূর্য উঠার আগে সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন।

এই মতের প্রবক্তারা আবার এই নিসেধাজ্ঞার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন, এই নিসেধাজ্ঞা কি হারামের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে নাকি মাকরূহ এর জন্য? তাদের অধিকাংশের নিকট হারামের জন্য। কারো নিকট মাকরূহ এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনু সিরীন ও মুহাম্মদ ইবনু জারীর আত তাবারী রহিমাহুমার মত হচ্ছে প্রথম সময় ও শেষ সময়ে পার্থক্য আছে। আসর ও ফজর পর সালাত পড়া মাকরূহ। আর সূর্য উঠা ও ডুবার সময় সালাত পড়া হারাম। তারা যে এই পার্থক্য করেছেন তার দলীল: এই সময় সালাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে যেন কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য না হয়ে যায়। কেননা ওই সময় তারা সিজদা করে। আমাদের সালাত যেন তাদের সালাতের সাথে মিলে না যায় এই পথটা বন্ধ করার জন্য ওই সময় সালাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই বিষয়টি অনেক সাহাবী ও তাবেঈ থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

পুর্বের আলোচনার আলোকে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে এই সময় সালাত পড়া হারাম। অর্থাৎ আসর ও ফজর পর সালাত পড়া হারাম। কেননা এ বিষয়ের দলীল অনেক এবং এ বিষয়ে নাহি ব্যবহৃত হয়েছে। আর নাহির চাহিদা হচ্ছে তা হারাম বুঝায়। এই মতটি ইমাম নববী ও ইবনু রজব রহিমাহুমা পছন্দ করেছেন। প্রথম মতের দলীল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিষেশভাবে ওই সময় সালাত পড়ার জন্য ওই সময়টাকে নির্ধারণ করা আরো মারাত্মক হারাম। আল্লাহ ভালো জানেন। (আওসাত, ২/৩৯২, তামহীদ, ১৩/৪২, মুগনী, ২/১১৭, মাজমু, ৪/৮৩, ইবনু রজব, ৫/৪৬)

মাকরূহ সময়ে কারণ যুক্ত নফল সালাতের বিধান কী?

প্রথম মত: কারণ যুক্ত সালাত, যেমন: কারো ফরয সালাত ছুটে গেছে বা নফল রাতেবা সালাত ছুটে গেছে, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, মানতের সালাত, সিজদায়ে তিলাওয়াত, শুকরানা সিজদা, সূর্য গ্রহণের সালাত, তাওয়াফের সালাত এগুলো পড়া জায়েয আছে, মাকরূহ নয়।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের মাযহাব হচ্ছে এই সকল সালাত পড়া মাকরূহ নয়। এটাই হচ্ছে আলী ইবনু আবী তালেব, যুবায়ের ইবনু আওয়াম, তার ছেলে, আবু আইউব, নোমান ইবনু বাশীর, তামীম দারী ও আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর তাদের মত। তিনি বলেন, এই সময় কেউ যদি ওযূ করে তাহলে তার জন্য দুই রাকআত তাহিয়্যাতুর ওযূ পড়া জায়েয। আমি বলছি, এই মতের প্রবক্তাদের দলীল হচ্ছে, আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর

হাদীস, "কেউ সালাতের কথা ভুলে গেলে বা ওই সময় ঘুমিয়ে থাকলে তার কাফফারা হচ্ছে স্মরণ হয়ে গেলে সালাত পড়ে নেয়া"। (বুখারী, হা/৫৯৭, মুসলিম, হা/৬৮৪)

উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নিশ্চয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর দু'রাকআত সালাত পড়েন। সালাত পড়ে তিনি বলেন, "হে উমাইয়ার মেয়ে! তুমি আমাকে আসরের পর দু'রাকআত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ! আমার কাছে আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিরা ইসলাম সম্পর্কে জানতে আসছিল, যার দরুন যুহরের পরের দু'রাকআত সালাত পড়তে পারিনি, সেই দুই রাকআতই এই দুই রাকআত"।(বুখারী, হা/১২৩৩, মুসলিম, হা/৮৩৪) তিাদের আরো দলীল আছে।

দ্বিতীয় মতঃ কোনো সালাতই পড়া জায়েয নেই। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের মাঝে আছেন, ইমাম মালেক, আবু হানিফা, আহমাদ ও দাউদ যাহিরীর প্রসিদ্ধ মত ও ইমাম আহমাদের ছাত্রদের পছন্দনীয় মত। তাদের দলীলঃ আসরের পর সালাত পড়া নিষেধ সম্পর্কে লেখক যে সকল ব্যাপক দলীল উপস্থাপন করেছেন, ওই দলীলগুলোই তাদের দলীল।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আর হাদীসে নিষেধ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই সময় কারণমুক্ত নফল সালাত পড়া হারাম। এই মতটিকে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু উসাইমীন রহিমাহুমা পছন্দ করেছেন। এই মাসআলা সম্পর্কে তাদের চমৎকার চমৎকার কথা আছে। (তামহীদ, ১৩/৩৬, মুগনী, ২/১২১, মাজমু, ৪/৭৯, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৩/১৯১, ইবনু রজব, ৫/৫১, শারহুল মুমতি, ৪/১২৬)

মাকরূহ সময়ে জানাযার সালাতের বিধান কী?

অধিকাংশ বিদ্বানের মত হচ্ছে (অবশ্য ইবনু মুনযির ও কেউ কেউ ইজমা দাবি করেন) আসরের পর ও ফজরের পর এই সালাত পড়া জায়েয আছে। আর সূর্য উঠার সময়, ডুবার সময় ও সূর্য যখন মাথার উপরে থাকে তখন এই তিন সময় জানাযার সালাত পড়া জায়েয নেই। উকবা ইবনু আমের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে ওই সময় জানাযার সালাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, তিনি বলেন, তিন সময় আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার সালাত পড়তে ও আমাদের মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেন। সূর্য উদয় হয়ে উপরে উঠার আগ পর্যন্ত, সূর্য যখন মাথার উপরে থাকে সেখান থেকে ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ও সূর্য যখন ডুবে যায় তখন।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদের একমত হচ্ছে জানাযার সালাত সব মাকরূহ সময়ই পড়া জায়েয আছে। কেননা এই সালাত যেহেতু আসরের পর ও ফজরের পর জায়েয আছে, সেহেতু অন্যান্য সময়ও জায়েয আছে যেমন ফরয সালাত জায়েয আছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। কারণ এ সম্পর্কে উকবা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস আছে, যা পূর্বে গত হয়েছে। আর এটাই শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন। উকবা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস উল্লেখ করে ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসে দাফনের সাথে সালাতের উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে সালাত দ্বারা এখানে জানাযার সালাত উদ্দেশ্য। কেননা জানাযার সালাত পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মতন নয়। তাই সাধারণ নফলের মত এই সময় জানাযার সালাত পড়া জায়েয নয়। আর ফজর ও আসরের পর জানাযার সালাত জায়েয আছে। কেননা এই সময়টা খুব দীর্ঘ সময়, যার কারণে বিলম্ব করলে লাশের ক্ষতি হতে পারে। আর এই তিন সময় খুবই সংকীর্ণ সময়, তাই লাশের ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই। আর ফরয সালাতকে জানাযার সাথে কিয়াস করা যাবে না, কেননা ফরয সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। (মুগনী, ২/১১০, মাজমু, ৪/৭৯, ইবনু রজব, ৫/৫৫, আহমাকুল জানায়েয, পৃ; ১৬৫)

بَابُ قضَاء الفوائت وترتيبها

অধ্যায়: ছুটে যাওয়া সালাত কাযা আদায় করা ও এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা

٥٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا ". قَالَ: فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

৫৪. জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: উমার ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খন্দক যুদ্ধের দিনে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর এসে কুরাইশ কাফিরদের কে গালি দেওয়া শুরু করেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সূর্য ডুবে যাওয়ার উপক্রম না হওয়া পর্যন্ত আমি আসরের সালাত আদায় করতে সক্ষম হয়নি। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম, আমিও ঐ আসরের সালাত আদায় করিনি। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: এরপর আমরা মদীনার বুতহান নামক স্থানে গিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আমরা সালাতের জন্য ওযূ করলাম। অতঃপর সূর্য ডুবে যাওয়ার পর তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। এরপর মাগরীবের সালাত আদায় করলেন। [সহীহ বুখারী হা/৫৯৬ ও মুসলিম হা/৬৩১]

٩-بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَوُجُوبِهَا

অধ্যায়: ৯-জামাআতে সালাত আদায় করার ফযীলত ও তা ওয়াজিব হওয়ার বিবরণ

٥٥. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

৫৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। জামাআতে সালাত আদায়ে একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে সাতাইশ গুণ বেশি ফযীলত রয়েছে। [সহীহ বুখারী হা/৬৪৫ ও মুসলিম হা/৬৫০]

٥٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُخْرِجُهُ إِلذَا الصَّلاةُ. لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلا يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ ".

৫৬. আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো লোকের জামাআতে সালাত আদায় করা একাকী বাড়িতে বা বাজারে সালাত আদায় করার চেয়ে পঁচিশ গুণ সওয়াব বেশি হবে। আর এটা ঐ সময় হবে যখন সে সুন্দর করে ওযূ করল। অতঃপর মাসজিদের দিকে বের হয়ে গেল। একমাত্র সালাত আদায়ের জন্যই সে বাড়ি হতে বের হলো। এতে সে যতবার পা ফেলবে ততবার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার একটি করে মর্যাদা উন্নত হবে এবং একটি করে পাপ মোচন হয়ে যাবে। ফেরেশতাগণ সর্বদা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে যতক্ষণ সে সালাত আদায় করে মুছল্লাতে অবস্থান করে। তাঁরা এই বলে ইস্তেগফার করে, হে আল্লাহ তুমি তাঁর প্রতি রহম কর। আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করো। তাকে দয়া কর। আর যতক্ষণ সে সালাতের জন্য অপেক্ষা করে ততক্ষণ সে সালাতের মাঝেই অবস্থান করে বলে গণ্য করা হবে। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম সংকলন করেছেন। আর শব্দগুলি সহীহ বুখারীর। [সহীহ বুখারী হা/৬৪৭, ৬৫৯ ও মুসলিম হা/৬৪৯]

৫৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاةُ الْفَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.

৫৭. আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইশা ও ফাজরের সালাত আদায় করা মুনাফিকদের জন্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানত যে, এ দু'টি সালাতের পুরস্কার বা সওয়াব কত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বুক হেঁচড়ে হলেও তারা এ দু'ওয়াক্ত জামাআতে উপস্থিত হতো। আমি ইচ্ছা করেছি সালাত আদায় করার আদেশ দিয়ে কাউকে ইমামতি করতে বলি। আর আমি কিছু লোককে নিয়ে জ্বালানী কাঠের বোঝাসহ যারা সালাতের জামাআতে আসে না তাদের কাছে যাই অতঃপর আগুন দিয়ে তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেই। [সহীহ বুখারী হা/৬৪৪, ৬৫৭ ও মুসলিম হা/৬৫১]

জামাআতের সাথে সালাত পড়া শরীআতসম্মত

ইমাম ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের মুতাওয়াতির পর্যায়ের অনেক হাদীস আছে। বিদ্বানরা ওই সকল হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। আর এর মাধ্যমে খারেজিদের বিদআতও স্পষ্ট হয়ে গেছে। তারা মুসলিম জামাআতের বিরোধিতা করে বলে যে, জামাআতের সাথে সালাত পড়া যাবে না। তারা বলে, নাবী ও সিদ্দিক ছাড়া অন্য কারো পেছনে ইকতিদা করা যাবে না। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের এই ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করুন। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, জামাআতের সাথে সালাত পড়া এটা শরীআতের আদিষ্ট বিষয়। মুসলিমদের ইজমা ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা তা সুসাব্যস্ত। আমি বলছি, অধিকাংশ বিদ্বান এ বিষয়ে একমত হয়েছেন। (তামহীদ, ১৪/১৪০, শারহে মুসলিম, (৬৫১), মাজমু, ৪/৮৫, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৩/২২২)

পুরুষের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে পড়ার বিধান

প্রথম মত: পুরুষের জন্য জামাআতের সাথে সালাত পড়া ফরজে আইন। এটা আতা, আওযায়ী, আহমাদ, শাফেয়ী মাযহাবের একদল মুহাদ্দিস, যেমন: আবু ছাওর, ইবনু খুযাইমা, ইবনু মুনযির ও ইবনু হিব্বান রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। তাদের দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী, "তুমি তাদের মাঝে থাকলে তাদের নিয়ে সালাত পড়তে চাইলে তাদের মাঝে একদল যেন তোমার সাথে সালাতে দাঁড়ায়"। (সূরা আন নিসা, ৪:১০২)

তারা বলেন, জামাআতের সাথে সালাত যদি ওয়াজিব না হতো তাহলে অবশ্যই ভয়ের অবস্থায় জামাআতের সাথে সালাত না পড়ার অনুমোদন থাকতো। জামাআতের সাথে সালাত পড়া ওয়াজিব বিধায় এই অবস্থায়ও জামাআত বর্জন করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে লেখক যে তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন সেগুলো তাদের দলীল। অন্ধ ব্যক্তির ঘটনার হাদীসে আছে, "তুমি কি আযান শুনতে পাও"? তিনি বলেন, হ্যাঁ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তাহলে সালাতে আসতে হবে"। কিছু বর্ণনায় আছে, "তাহলে আমি তোমাকে অনুমতি দিতে পারছি না"। এই মতের প্রবক্তারা বলেন, ওজর ছাড়া কেউ যদি একাকি সালাত পড়ে তাহলে সালাত পুনরায় পড়া তার ওপর আবশ্যক নয়।

দ্বিতীয় মত: জামাআতের সাথে সালাত পড়া ফরয, কেউ যদি ওজর ছাড়া জামাআত বর্জন করে তাহলে তাকে পুনরায় ওই সালাত পড়তে হবে। এটা যাহিরী ও হাম্বলীদের কতিপয় বিদ্বানের মত। তাদের মাঝে আছেন, আবুল হাসান তামীমী ও ইবনু আকীল। এই মতের দলীল: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, যা পূর্বে গত হয়েছে সেখানে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংকল্প করেছেন, যারা জামাআতে আসবে না তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিবেন। ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, "যে ব্যক্তি আযান শুনেও সালাতের জন্য আসবে না তার সালাত হবে না। তবে ওজর থাকলে ভিন্ন কথা"।(ইবনু মাজাহ, হা/৭৯৩, হাদীসটি মাওকুফ হিসেবে সহীহ)

"মাসজিদের প্রতিবেশিদের মাসজিদ ছাড়া সালাত হবে না"। (ইরওয়াউল গালীর, হা/৪৯১, হাদীসটি দুর্বল) হাদীসটি যদি সহীহও ধরা হয় তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নাফিয়ে কামাল, সিহহা উদ্দেশ্য নয়।

তৃতীয় মত: জামাআতের সাথে সালাত ফরজে কিফায়াহ। এটা শাফেয়ী মাযহাবের বাহ্যিক মত। এ মতই ইমাম শাফেয়ীর পূর্বের অধিকাংশ ছাত্রের এবং এ মতই অধিকাংশ হানাফি ও মালেকিদের।

চতুর্থ মত: জামাআতের সাথে সালাত পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। জামাআত ছেড়ে দিলে গুনাহ হবে না। এই মতটি ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক রহিমাহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটা আরো বর্ণিত হয়েছে যায়েদ ইবনু ছাবিত ও হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে। তাদের দলীল হচ্ছে লেখক এই অধ্যায়ে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস বর্ণনা করেছেন, "জামাআতের সাথে সালাত একাকি আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ"। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, "জামাআতের সাথে সালাত পড়লে বাড়িতে ও বাজারে সালাত আদায়ের চেয়ে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়"। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীসে বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে তারা এর দশটা উত্তর দিয়েছেন। হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ ফাতহুর বারীতে তা উল্লেখ করেছেন। কেউ জানতে চাইলে ফাতহুল বারীতে চলে যাও।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। কারণ এর দলীলগুলো শক্তিশালী। আর সেই মতটি হচ্ছে কেউ যদি ওজর ছাড়া জামাআতে না আসে তাহলে তার সালাত হয়ে যাবে, তবে সে গুনাহগার হবে। আল্লাহ ভালো জানেন। (মুগনী, ২/১৭৬, মাজমু, ৪/৮৭, শারহে মুসলিম, (৬৫১), মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৩/২৩৯, ইবনু রজব, ৫/৪৫০, ফাতহুল বারী, ২/১২৬)। মিসকুল খিতাম ১/৩২৩।

দুই বা দুইয়ের অধিক লোক দ্বারাই জামাআত প্রতিষ্ঠিত হয়

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, দুই বা দুইয়ের অধিক লোক দ্বারাই জামাআত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এ বিষয়ে কারো মাঝে মতভেদ নেই।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের শাইখরা বলেন, জামাআতের সর্বনিম্ন সংখ্যা হচ্ছে ইমাম ও একজন মুক্তাদী হওয়া। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ব্যক্তির সাথে বা নারীর সাথে বা দাসীর সাথে বা মেয়ের সাথে বা দাসের সাথে বা মনিবের সাথে বা অন্য কারো সাথে সালাত পড়ে তাহলে জামাআতের সাথে সালাত পড়লে পঁচিশ বা সাতাশ গুণ যেই সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে তারা তা পাবে। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। শাইখ আবু হামেদ ও অন্যরা এ বিষয়ে ইজমা দাবি করেন।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, দুইজন দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি মিলে জামাআতের সাথে সালাত পড়ে তাহলে তাদের জামাআত হয়নি এ ব্যাপারে কারো মত আছে কিনা আমাদের জানা নেই। যদিও মুক্তাদী নারী হয়ে থাকে।

মুক্তাদী যদি শিশু হয় তাহলে কি জামাআত হবে? এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ থেকে ফরয সালাতের ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। আর নফল সালাত হয়ে যাবে। যেমন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু কে নিয়ে রাতে জামাআতের সাথে নফল সালাত পড়েন। আর অধিকাংশ বিদ্বানের মতে এ বিষয়ে ফরয ও নফল সালাতের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এটা আবু হানিফা ও শাফেয়ীদের মত। (মুগনী, ২/১৭৭, মাজমু, ৪/৯২, ইবনু রজব, ৬/৩৯)

দেশের মানুষ যদি সকল মাসজিদ বন্ধ করার জন্য একত্রিত হয় তাহলে তাদের সাথে লড়াই করতে হবে

ইমাম ইবনু আব্দির বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানদের ইজমা হচ্ছে মাসজিদ থেকে জামাআতের সাথে সালাত বন্ধ করে দেয়ার জন্য একত্রিত হওয়া জায়েয নেই।

ইবনু হুবাইরা রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা একমত যে, জামাআতের সাথে সালাত এটা শরীআতসম্মত। মানুষের জন্য আবশ্যক এটা প্রকাশ করা। দেশের মানুষ যদি জামাআতের সাথে সালাত আদায়ে বাধা দেয় তাহলে তাদের সাথে লড়াই করতে হবে।

কাযী সাফাদ আল উছমানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা একমত যে, জামাআতের সাথে সালাত এটা শরীআতসম্মত। মানুষের জন্য আবশ্যক এটা প্রকাশ করা। দেশের মানুষ যদি জামাআতের সাথে সালাত আদায়ে বাধা দেয় তাহলে তাদের সাথে লড়াই করতে হবে। (তামহীদ, ১৮/৩৩৩, ইজমা ইনবনু আব্দিল বার, ১/৫৯০)

সক্ষম ব্যক্তিকে কি মাসজিদেই জামাআতে সালাত আদায় করতে হবে?

প্রথম মত: মাসজিদেই জামাআতের সাথে সালাত পড়া তার ওপর ওয়াজিব। ওজর ছাড়া বাড়িতে জামাআত করতে পারবে না। এটা ইমাম আহমাদের একমত, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু কাইয়্যিম, বিন বায, ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ তাদের মত। তাদের দলীল: পূর্বে বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, যেখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা জামাআতে আসে না তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার যে সংকল্প করেছেন ও অন্ধ ব্যক্তির ঘটনার হাদীস।

দ্বিতীয় মত: বাড়িতে জামাআত পড়া তার জন্য জায়েয আছে। এটা হানাফি, মালেকি, শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদের একমত। তারা বলেন, মাসজিদে জামাআত করা ফরজে কিফায়াহ। তাদের দলীল: পূর্বে বর্ণিত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর (৪২) নম্বর হাদীস, সেখানে আছে, " গোটা পৃথিবী আমার জন্য মাসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে। আমার উম্মতের যে কোনো ব্যক্তি যেখানেই থাকে না কেন সালাত পড়ে নিবে"। দুই ব্যক্তির হাদীস, যারা বাড়িতে সালাত পড়েছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাসজিদে নফল সালাত হিসেবে আবার সালাত পড়তে বলেছিলেন, কিন্তু বাড়িতে সালাত পড়াকে তিনি অস্বীকার করেননি।

প্রাধান্যযোগ্য মত: পূর্বের দলীলের আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত প্রথম মত। আর দ্বিতীয় মতের প্রবক্তারা যে দলীল উপস্থাপন করেছেন, "গোটা পৃথিবী আমার জন্য মাসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছ"। এই হাদীস তাদের দলীল হতে পারে না। কারণ হাদীসের অর্থ হচ্ছে আমার উম্মত যে জায়গায়ই থাকুক না কেন, যেমন: মাসজিদ থেকে দূরে, যার কারণে বাড়িতে বা সফরে আযান শুনছে না অথবা অন্য কোনো ওজরের কারণে, তার জন্য যে

কোনো স্থানে সালাত পড়া জায়েয আছে। এটা শুধু এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য নাবীর উম্মতরা শুধু উপাসনালয়ে ও গিরজায় সালাত পড়তে পারতো। আর যে দুই ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এটা শুধু একটি নির্দিষ্ট ঘটনা। এটাকে এখানে দলীল হিসেবে নেয়া যাবে না। কারণ, হতে পারে তাদের বাড়ি অনেক দূরে ছিল। আল্লাহ ভালো জানেন। (মুগনী, ২/১৭৮, কিতাবুস সালাত লি ইবনু কাইয়্যিম, (১৩৪), ফাতাওয়া ইবনু বায, ২/১৯,২৮,৩২, শারহুল মুমতি, ৪/১৪৭)

যে মাসজিদে নিয়োগ প্রাপ্ত ইমাম আছে ও সেখানে জামাআত হয়েছে ওই মাসজিদে কি পুনরায় জামাআত করা যাবে?

প্রথম মতঃ ওই মাসজিদে পুনরায় জামাআত করা মাকরূহ না। এর অর্থ হচ্ছে মহল্লার ইমাম যদি মুসল্লীদের নিয়ে সালাত পড়ে ফেলে। এরপর একদল লোক উপস্থিত হয় তাহলে তাদের জন্য জামাআত করে সালাত পড়া মুস্তাহাব। এটা ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর মত এবং আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর আমল। এটা তাউস, কাতাদা, মাকহুল, ইসহাক, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, দাউদ প্রমুখ বিদ্বানদের মত।

তাদের দলীলঃ আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষ করে ফেললে এক ব্যক্তি মাসজিদে আসে। এরপর তিনি বলেন, "কে আছো যে তার সাথে সালাত পড়ে তাকে সাদাকা করবে"? (মুসনাদে আহমাদ, হা/৩/৬৪, আবু দাউদ, হা/৫৭৪, হাদীসের সনদ সহীহ)

জামাআতের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীস দিয়ে তারা আরো দলীল উপস্থাপন করেন।

দ্বিতীয় মতঃ যে মাসজিদে নিয়োগ প্রাপ্ত ইমাম আছে ওই মাসজিদে পুনরায় জামাআত করা মাকরূহ। কেউ পরে আসলে একা একা সালাত পড়বে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীলঃ এক মাসজিদে দ্বিতীয় জামাআত করলে মানুষের অন্তরে মতভেদ ও হিংসা বিদ্বেষ কাজ করবে। যেহেতু এই মাসজিদে নিয়োগ প্রাপ্ত ইমাম আছে, সেহেতু এই মাসজিদে পুনরায় জামাআত করা মাকরূহ। তাদের কিছু দলীল আছে, তবে এর সনদে সমস্যা আছে।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। যার জামাআত ছুটে গেছে তার জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে দ্বিতীয় জামাআত করে সালাত পড়া। কারণ জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার ফযীলত সংক্রান্ত অনেক দলীল আছে। শাইখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মনে করেন পুনরায় জামাআত করা ওয়াজিব, মুস্তাহাব নয়। তিনি বলেন, কারো ইমামের সাথে জামাআত ছুটে গেলে পুনরায় জামাআত করা তার জন্য ওয়াজিব। কেননা জামাআতের সাথে সালাত পড়া ওয়াজিব। আর ইমামের সাথে জামাআত পাইনি বলে তার থেকে ওয়াজিব ছুটে যাবে না। কিছু বিদ্বান পুনরায় জামাআত করাকে

মুস্তাহাব বলেছেন, ওয়াজিব বলেননি। (মুগনী, ২/১৮০, ইবনু রজব, ৬/৭, শারহুর মুমতি, ৪/১৬০)

বাজারের মাসজিদে বা যে মাসজিদে নিয়োগ প্রাপ্ত ইমাম নেই ওই মাসজিদে পুনরায় জামাআত করা মাকরূহ নয়

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে মাসজিদে নিয়োগ প্রাপ্ত ইমাম নেই ওই মাসজিদে পুনরায় জামাআত করা মাকরূহ এমন মত লায়েছ ইবনু সাদ ব্যতীত কারো কাছ থেকে বর্ণিত হয়নি। তিনি পুনরায় জামাআত করাকে মাকরূহ মনে করেন।

শাইখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, বাজারের মাসজিদ বা রাস্তার পাশে যে সকল মাসজিদ আছে, যেখানে দুজন, তিনজন, দশজন মানুষ অবিরত যাতায়াত করে ওই সকল মাসজিদে পুনরায় জামাআত করা মাকরূহ নয়। কিছু বিদ্বান বলেন, একটা কথা আছে, যাতে কোনো মতভেদ নেই আর সেটা হচ্ছে, যে মাসজিদে নিয়োগ প্রাপ্ত ইমাম নেই, ওই মাসজিদ বানানোই হয়েছে পৃথক পৃথক জামাআত করার জন্য।

(ইবনু রজব, ৬/৯, শারহুল মুমতি, ৪/১৬০)

দ্বিতীয় জামাআত শুরু করলে আগে কি ফরয পড়বে নাকি সুন্নাত?

প্রথম মত: যে এমন মাসজিদে প্রবেশ করেছে, যেখানে সালাত হয়ে গেছে, সময় থাকলে ফরয সালাতের পূর্বে নফল সালাত পড়া জায়েয আছে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের মাঝে আছেন ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ী রহিমাহুমুল্লাহ। এটা আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর কর্ম থেকে প্রমাণিত। আব্দুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফে জাদ আবু উসমান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের কাছে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু আসেন আর ওই সময় তার সাথে দশজন ছাত্র ছিল। আমরা ফজরের সালাত শেষ করে ফেলি। তিনি বলেন, তোমরা কি সালাত পড়ে ফেলেছ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, এরপর তিনি তার ছাত্রদের একজনকে আযান দিতে আদেশ করেন। তারপর তিনি দু'রাকআত সালাত পড়ে ইকামত দেয়ার আদেশ করেন। তারপর তিনি অগ্রসর হয়ে সালাত পড়েন।

দ্বিতীয় মত: ফরয সালাত দ্বারা শুরু করবে। এটা ইবনু উমার, আব্দুর রহমান ইবনু আব লাইলা, শাবী, নাখয়ী, আতা, ছাওরী, হাসান ইবনু ইয়াহ ইয়া ও লাইছ প্রমুখ বিদ্বানের মত। হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, ফজরের দু'রাকআত ব্যতীত বাকি সালাতে ফরয দ্বারা শুরু করবে। অনুরূপভাবে ইমাম ছাওরীও এ কথা বলেন। তাদের দলীল: ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু এর বিশুদ্ধ আসার। তারা আরো বলেন, ফরয সালাত আদায়ের নিয়্যাতে মাসজিদে প্রবেশ করা হচ্ছে ইকামত হয়ে যাওয়ার পর মাসজিদে প্রবেশ করার ন্যায়। সুতরাং

এর পূর্বে কোনো সালাত চলবে না। ওই ব্যক্তি শুধু নফল সালাত পড়তে পারবে, যে ইমামের অপেক্ষা করছে। কেননা ইমাম বের না হলে ওই সময় সালাত পড়া মুসল্লীদের জন্য নিষেধ নয়। আর যদি মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও হয় তাহলে তার জন্য ফরয সালাতের পূর্বে নফল সালাত পড়া জায়েয আছে। এটা আতা ও অন্যান্যদের মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। (ইবনু রজব, ৬/১১)

জুমআর সালাত ছুটে গেলে কি যুহরের সালাত জামাআত করে পড়বে?

প্রথম মত: জুমআর সালাত ছুটে গেলে যুহরের সালাত জামাআত করে আদায় করা মাকরূহ। এই মত হাসান, আবু কিলাবা, আবু হানিফা রহিমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হুযাইফা ও যায়েদ ইবনু ছাবেত রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, যার জুমআর সালাত ছুটে গেছে সে মানুষদের লজ্জা করে কোনো মাসজিদেই যুহরের সালাত আদায় করবে না। এই মতের দলীল: জুমআর দিন মাসজিদে যুহরের সালাত পড়া এটা ইমামদের ওপর স্বেচ্ছাচারিতা এবং বিদআতীরা জুমআর সালাত বর্জন করার কারণে লুকিয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় মত: জুমআর সালাত ছুটে গেলে যুহরের সালাত জামাআত করে আদায় করার অনুমতি রয়েছে। এই মত ইবনু মাসউদ ও ইয়াস ইবনু মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে এটা ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক রহিমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ থেকে আরো একটি মত বর্ণিত হয়েছে, সেটা হচ্ছে, মানুষ বেশি হলে যুহরের সালাত জামাআত করে আদায় করা মাকরূহ, আর যদি মানুষ কম হয় তাহলে মাকরূহ নয়। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনজন ব্যক্তি হলে জামাআত করে যুহরের সালাত পড়বে।

বিশুদ্ধ মত: বিশুদ্ধ মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। (ইবনু রজব, ৬/১০)

بَابُ حضُور النساء المسْجِد

অধ্যায়: মসজিদে নারীদের উপস্থিত হওয়া প্রসঙ্গে

৫৮. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمِ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا. " قَالَ: فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ! قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَن رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ: والله لَنَمْنَعُهُنَّ؟!. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ ": " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ ".

৫৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কারো স্ত্রী তোমাদের নিকট মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে চাইবে, তখন তাকে মাসজিদে গমন করতে বাঁধা দিবে না। বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর বিলাল ইবনে আব্দিল্লাহ বললেন: আল্লাহর কসম, আমরা তাদেরকে মাসজিদে যেতে বাঁধা প্রদান করব। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার দিকে ফিরিয়ে তাকালেন, আর তাকে অত্যন্ত মন্দ ভাষায় গালি দিলেন। এ রকম গালি আমি আর কখনো শ্রবণ করিনি। আর তিনি বললেন: আমি তোমাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি বলছ আল্লাহর কসম! আমরা তাদেরকে বাঁধা দিব? [সহীহ বুখারী হা/৫২৩৮ ও মুসলিম হা/৪৪২]

মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে: তোমরা আল্লাহর বাঁদীদেরকে মাসজিদে গমন করতে বাঁধা দিবে না। [সহীহ বুখারী হা/৯০০ ও মুসলিম হা/৪৪২]

নারীদের মাসজিদে যাওয়ার জন্য স্বামীর অনুমতি নেয়ার বিধান ও স্বামী কি তাকে মাসজিদে যেতে নিষেধ করতে পারবে?

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, নারীরা তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত মাসজিদে যেতে পারবে না এ বিষয়ে বিদ্বানদের মাঝে কোনো মতভেদ আছে কিনা আমার জানা নেই। তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে স্ত্রী তার স্বামীর কাছে অনুমতি চাইলে সে তাকে যেতে বাধা দিবে না। তবে শর্ত হচ্ছে ক্ষতি ও ফিতনার সম্ভাবনা থাকতে পারবে না। তারপর স্বামী তার স্ত্রীকে নিষেধ করতে পারবে কী পারবে না এ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে একটা মাসআলার পর বিস্তর আলোচনা আসছে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীসের উত্তর এভাবে দেয়া যায়, "তোমরা আল্লাহর বান্দীদের মাসজিদে যেতে বাধা দিও না"। এই হাদীস দ্বারা নাহিয়ে তানযিহী উদ্দেশ্য। কেননা স্ত্রীর দায়িত্ব হচ্ছে সব সময় বাড়িতে থাকা। তাই ফযীলতের জন্য বাড়িতে অবস্থান বর্জন করবে না।

নারীদের কি শুধু মাসজিদে যেতেই স্বামীর অনুমতি লাগবে নাকি সব জায়গায় যেতে অনুমতি লাগবে?

ইবনু দাকীক ঈদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, নারীদের যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া মাসজিদে যেতে নিষেধ করা হয় তাহলে এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে মাসজিদ ব্যতীত স্ত্রী অন্য জায়গায় যেতে চাইলে অবশ্যই স্বামী নিষেধ করতে পারবে। (মাজমু, ৪/৯৪, ইবনু রজব, ৮/৫৩, ইহকাম, ১/১৬৯, শারহুর মুমতি, ৪/২০০)

নারীদের মাসজিদে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার জন্য যাওয়ার বিধান কী?

প্রথম মত: ফেতনার আশঙ্কা না থাকলে সকল নারী মাসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করতে পারবে। এটা ইমাম মালেক ও কতিপয় হাম্বলীদের মত।

দ্বিতীয় মত: নারীদের সর্বক্ষেত্রে মাসজিদে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা মাকরূহ। এটা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার মত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর নারীরা যা করেছে তিনি যদি এ অবস্থা দেখতেন তাহলে বানী ইসরাঈলের নারীদের যেভাবে মাসজিদে যেতে নিষধ করা হয়েছে তিনি অনুরূপ নারীদের মাসজিদে যেতে নিষেধ করতেন। এটা ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর মত। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, দুই ঈদের সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাতের জন্য নারীরা মাসজিদে যেতে পারবে না।

তৃতীয় মত: বৃদ্ধারা যেতে পারবে, তবে তরুণীরা যেতে পারবে না। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

সারকথা: সারকথা হচ্ছে নারীরা সালাতের জন্য যেতে পারবে, তবে এর জন্য শর্ত হচ্ছে যদি ফেতনার আশঙ্কা না থাকে এবং তারা এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করবে ও পরকারের সাওয়াবের আশা রাখবে। সাজসজ্জা ও আতর মেখে যেতে পারবে না। স্ত্রী যদি ভালো ও সচ্চরিত্রের অধিকারিণী হয় তাহলে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে মাসজিদে যেতে বাধা দেয়া মাকরূহ। তবে একটা কথা মনে রাখা উচিত, নারীদের সর্বক্ষেত্রে বাড়িতে সালাত আদায় করা উত্তম। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মাসজিদে যেতে বাধা দিও না, তবে তাদের জন্য

বাড়িতে সালাত আদায় করা উত্তম"। মুসনাদে আহমাদ, হা/২/৭৭, আবু দাউদ, হা/৫৬৭, ইরওয়াউল গালীল, ৫১৫, শাহেদের ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ।

(মুগনী, ২/২০২, মাজমু, ৪/৯৪, ইবনু রজব, ৮/৪২)

নারীদের পরস্পর জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের বিধান কী?

প্রথম মতঃ নারীদের পরস্পর জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

এ মতের দলীলঃ উম্মু ওরাকার হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার পরিবার নিয়ে সালাত আদায় করতে আদেশ করেন। মুসনাদে আহমাদ, হা/৬/৪০৫, আবু দাউদ, হা/৫৯২, এই হাদীসের বর্ণনাকারী ওয়ালিদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু জুমাই। তিনি হাদীসে ইযতিরাব করেছেন। তবে শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ ইরওয়াউল গালীলে (৪৯৩) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

তারা আরো দলীল দিয়েছেন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার হাদীস দিয়ে, তিনি নারীদের নিয়ে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করতেন। তিনি কাতারে তাদের মাঝে দাঁড়াতেন।

অনুরূপ হাদীস উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার থেকেও বর্ণিত হয়েছে। উভয় হাদীসের সনদ হাসান। আমি দুটি হাদীসই আল জামে লি আহমামিল ঈদাইনে নিয়ে এসেছি। (পৃ:২২৮-২২৯)

দ্বিতীয় মতঃ নারীরা ফরয ও নফল কোনো সালাতই জামাআতের সাথে আদায় করতে পারবে না। এটা সোলাইমান ইবনু ইয়াসার, হাসান বাসরী ও ইমাম মালেক রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন, নারীর কারো ইমামতি চলবে না। কেননা তার জন্য আযান দেয়া মাকরূহ। আর আযান হচ্ছে সালাতের আহ্বান। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে আযান দেয়া হচ্ছে তা তার জন্য মাকরূহ। আহলে রায়েরা বলেন, নারীদের ইমামতি মাকরূহ, তবে করলে সালাত হয়ে যাবে।

তৃতীয় মতঃ নফল সালাত জামাআত করে পড়তে পারবে, তবে ফরয সালাত পারবে না। এটা ইমাম শাবী, নাখয়ী ও কাতাদা রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। তারা উম্মু ওরাকা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। পূর্বের দলীলের আলোকে নারীরা বাড়িতে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করতে পারবে। তবে এটা যেন অভ্যাসে পরিণত না হয়। কেননা সালাফে সালেহীন থেকে এমনটি বর্ণিত হয়নি। আল্লাহ ভালো জানেন। (মুগনী, ২/২০২, মাজমু, ৪/৯৪)

কোনো নারী যদি অন্যান্য নারীদের ইমামতি করে তাহলে সে কোথায় দাঁড়াবে?

উম্মুল হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহাকে দেখেছেন নারীদের ইমামতি করতে। তিনি তাদের কাতারের মাঝে (একই সারিতে) দাঁড়াতেন। অনুরূপ হাদীস আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। উভয়টির সনদ হাসান, যা পূর্বে গত হয়েছে।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন হাদীস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, অতএব নারীরা ইমামতি করলে মাঝে দাঁড়াবে। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত আছে কিনা আমার জানা নেই। আমি বলছি, ইবনু হাযম দ্বিমত করেছেন। তবে তার কথার কোনো ভিত্তি নেই। সঠিক কথা হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের কথা। কারণ এ বিষয়ে আয়েশা ও উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীস রয়েছে। আল্লাহ ভালো জানেন। (মুহাল্লা, ৩/১৩৭, মুগনী, ২/২০২)

بَابُ سنَن الراتبة وتاكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها

সুন্নাতে রাতেবা বা নিয়মিত সুন্নাতের বর্ণনা এবং ফজরের দুই রাক‘আত সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

৫৭. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. وَفِي لَفْظٍ: فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَالْجُمُعَةُ: فَفِي بَيْتِهِ. وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا.

৫৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুহরের পূর্বে দুই রাকআত ও পরে দুই রাকআত, জুমআর পরে দুই রাকআত, মাগরীবের পরে দুই রাকআত এবং ইশার পরে দুই রাকআত সালাত আদায় করেছি। [সহীহ বুখারী হা/১১৮০ ও মুসলিম হা/৭২৯]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: মাগরীব, ইশা, ফজর এবং জুমআর দুই রাকআত সুন্নাত সালাত তাঁর বাড়িতে আদায় করতেন। [সহীহ বুখারী হা/১১৭২ ও মুসলিম হা/৭২৯]

সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে: আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: আমাকে হাফছাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর উদয় হওয়ার পর হালকা দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। সে সময়টি এমন ছিল যে, তখন আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রবেশ করতাম না। [সহীহ বুখারী হা/১১৭৩]

٦٠. عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الفَجْرِ؛ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

৬০. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত সালাতের চেয়ে অন্য কোনো নফল সালাতের প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ ও হিফাযত করতেন না। [সহীহ বুখারী হা/১১৬৯ ও মুসলিম হা/৭২৪]

মুসলিম এর অন্য বর্ণনায় রয়েছে: ফজরের দুই রাকআত সালাত পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর থেকে উত্তম। [মুসলিম হা/৭২৫]

ফরয সালাতের সুন্নাতের সময় কখন শুরু হয় ও কখন শেষ হয়?

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, ফরয সালাতের পূর্বের সুন্নাত ফরয সালাতের সময় হলেই শুরু হয় এবং ফরয সালাতের পরের সুন্নাত ফরয সালাতের সময় শেষ হলে শেষ হয়ে যায়।

বায়ানের লেখক বলেন, ফরয সালাতের পূর্বের সুন্নাত ফরয সালাতের সময় শুরু হলে আরম্ভ হয়। আর এটা হলো ওয়াক্তে ইখতিয়ারী। ফরয সালাত আদায় করে ফেললে ওয়াক্তে ইখতিয়ারী চলে যায়, তবে ওয়াক্তে জাওয়ায বাকি থাকে। আমাদের সাথীদের মাঝে যারা বলেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ফজরের সুন্নাতের সময় থাকে এটা হলো বাহ্যিক দলীল। কিন্তু পূর্বের কথা হচ্ছে উত্তম কথা। ফরয সালাতের পর যেই সুন্নাত আদায় করা হয় এর সময় শুরু হয় ফরয সালাত শেষ করার পরই। কেননা সুন্নাত সালাত ফরয সালাতের পরই আদায় করা হয়। (বায়ান, ২/২৬৪, মুগনী, ২/১২৮, মাজমু, ৩/৫০৪)

ফরয সালাতের সাথে সুন্নাতে রাতেবার সংখ্যা

প্রথম মত: ফরয সালাতের সাথে সুন্নাতে রাতেবার সংখ্যা বিতর ছাড়া দশ রাকআত।

যুহরের পূর্বে দুই রাকআত ও পরে দুই রাকআত। মাগরিবের পর দুই রাকআত, ইশার পর দুই রাকআত ও ফজরের পূর্বে দুই রাকআত। এটা হলো হাম্বলী ও কতিপয় শাফেয়ীদের মত।

তাদের দলীলঃ বুখারীতে (১১৮০) ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দশ রাকআত সালাত মুখস্ত করেছি। যুহরের পূর্বে দুই রাকআত ও পরে দুই রাকআত। মাগরিবের পর বাড়িতে দুই রাকআত, ইশার পর বাড়িতে দুই রাকআত ও ফজরের পূর্বে দুই রাকআত।

দ্বিতীয় মতঃ বিতর ছাড়া আট রাকআত। প্রথম মতে যে দশ রাকআতের কথা বলা হয়েছে, সেখান থেকে ইশার দুই রাকআত বাদ যাবে। এটা কতিপয় শাফেয়ীদের মত।

তৃতীয় মতঃ বিতর ছাড়া বারো রাকআত। প্রথম মতে যে দশ রাকআতের কথা বলা হয়েছে, সেখানে যুহরের পূর্বে দুই রাকআত বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ যুহরের পূর্বে চার রাকআত। এটা কতিপয় শাফেয়ীদের মত। ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। আর এটাই সঠিক মত। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার হাদীস, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের পূর্বের চার রাকআত ও ফজরের পূর্বের দুই রাকআত সালাত ছাড়তেন না। (বুখারী, হা/১১৮২)

(বায়ান, ২/২৬২, মুগনী, ২/১২৫, মাজমু, ৩/৫০২, ইনসাফ, ২/১২৫, শারহুল মুমতি, ৪/৬৯)

সফরে রাতেবা সুন্নাতের বিধান

সালাতের আগে ও পরে যে সুন্নাতে রাতেবা আছে এগুলো বাদে সাধারণ নফল সালাত সফরে পড়া জায়েয আছে। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সাধারণ নফল সালাত ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু সফরে পড়তেন। নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনি সফরে সাধারণ নফল সালাত পড়তেন। সকল বিদ্বান একমত যে, সফরে সাধারণ নফল সালাত পড়া মুস্তাহাব। আমি বলছি, এর দলীল হচ্ছে লেখক কিবলামুখী হয়ে সালাত পড়তে হবে ওই অধ্যায়ে হাদীস নিয়ে এসেছেন। এর আলোচনা অচিরেই আসছে ইনশাআল্লাহ।

সালাতের আগে ও পরে যে সুন্নাতে রাতেবা আছে এগুলোর বিষয়ে মতভেদ আছে।

প্রথম মতঃ ফজরের ফরয সালাতের পূর্বের দুই রাকআত সুন্নাত ব্যতীত আর কোনো ফরয সালাতের আগের ও পরের সুন্নাত পড়া মুসাফিরের জন্য মাকরূহ। এটা ইবনু উমার, আলী ইবনু হুসাইন, সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব ও সাঈদ ইবনু যুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম তাদের মত এবং এটার ওপর ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন।

তাদের দলীল; ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ তার মুসলিমে (৬৮৯) হাফস ইবনু আছেম ইবনু উমার ইবনু খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার সাথে মক্কার পথে সফর সঙ্গী হই। তিনি বলেন, তারপর তিনি আমাদের নিয়ে যুহরের সালাত দুই রাকআত পড়েন। তারপর অগ্রসর হন এবং আমরাও

তার সাথে অগ্রসর হই; এমনকি সফর সঙ্গীরা চলে আসে। এরপর তিনি বসেন আর আমরাও তার সাথে বসে পড়ি। তারপর তিনি যেখানে সালাত পড়েছেন সেখানে তাকান। তিনি অনেক মানুষকে দেখতে পেলেন দাঁড়িয়ে আছে। তারপর তিনি বলেন, এরা কী করছে? আমি বললাম, সুন্নাত সালাত পড়ছে। তিনি বলেন, আমি যদি সুন্নাত সালাতই পড়ি তাহলে সালাত তো পরিপূর্ণ পড়তাম। হে ভাতিজা! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সফরে ছিলাম। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সফরে দুই রাকআতের অতিরিক্ত সালাত পড়েননি। আমি আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সফরে ছিলাম। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সফরে দুই রাকআতের অতিরিক্ত সালাত পড়েননি। আমি উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সফরে ছিলাম। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সফরে দুই রাকআতের অতিরিক্ত সালাত পড়েননি। আমি উসমান রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সফরে ছিলাম। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সফরে দুই রাকআতের অতিরিক্ত সালাত পড়েননি। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহর রাসূলের মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ"। (সূরা আহযাব, ৩৩:২১) (বুখারী, হা/১১০১, ১১০২)

দ্বিতীয় মতঃ ফরয সালাতের আগের ও পরের সুন্নাত পড়াতে কোনো সমস্যা নেই। এটা অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ ও তৎপরবর্তীদের মত। তাদের মাঝে আছেন চার ইমাম। সাহাবীদের মাঝে যারা আছেন তারা হলেন উমার, আলী, ইবনু মাসউদ, জাবের, আনাস, ইবনু আব্বাস ও আবু যার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম।

হাসান রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীরা সফর করতেন। তারা সফরে ফরয সালাতের আগের ও পরের সুন্নাত পড়তেন। এই মত ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন, একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে সুন্নাত সালাত পড়েছেন। আর ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সফরে ফরয সালাতের আগের ও পরের সুন্নাত সালাত পড়তে দেখিনি। যারা বলেন বা অস্বীকার করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে সুন্নাত সালাত পড়েননি তাদের কথা দলীলযোগ্য নয়; বরং দলীলযোগ্য হলো যারা বলেন তিনি পড়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনেক সাহাবী সফরে সুন্নাত সালাত পড়তেন। কল্যাণকর ও ভালো কাজ করতে নিষেধ করা জায়েয নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা ভালো কাজ করো, অবশ্যই সফল হবে"। (সূরা আল হাজ্জ, ২২:৭৭)

তাদের দলীল: নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে ফজরের সুন্নাত সালাত পড়েন এবং মক্কা বিজয়ের দিন আট রাকআত সালাতুয যুহার সালাত পড়েন। এমনিভাবে সাধারণ নফল সালাত পড়েন। অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা সফরে সুন্নাত সালাত পড়তেন। তাদের আরো অনেক দলীল আছে। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের জবাব তারা এভাবে দিয়েছেন, নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাতে রাতেবা সফরে পড়েছেন, কিন্তু ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু দেখেননি। কেননা নফল সালাত বাড়িতে পড়া

উত্তম। অথবা নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর অবস্থায় সুন্নাতে রাতেবা ছেড়ে দেয়া জায়েয আছে এটা জানানোর জন্য মাঝেমধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ পূর্বে বর্ণিত ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন। আর এই মতকেই ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু কাইয়্যিম রহিমাহুমা পছন্দ করেছেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, যুহরের আগের ও পরের সুন্নাত সালাত নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে পড়েছেন এ মর্মে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনাতে ফরয সালাত দু'রাকআত দু'রাকআত করে পড়েছেন। তার থেকে কেউ বর্ণনা করেননি যে, তিনি ওই ফরয সালাতের সাথে আর কোনো সুন্নাত পড়েছেন। আর ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত অধিক জানতে ও অনুসরণ করতেন। আমি বলছি, কেউ যদি পড়ে তাহলে কি তার সালাতকে অস্বীকার করা হবে?

ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা একমত যে, এখানে দুটি বিষয় জায়েয। সফরে কেউ চাইলে সুন্নাতে রাতেবা পড়তে পারে বা ছেড়ে দিতে পারে। এখানে সালাত পড়া ও ছাড়া দুটিই জায়েয আছে। কখনো কখনো সুন্নাতে রাতেবা পড়া উত্তম আবার কখনো ছেড়ে দেয়া উত্তম। এটা মানুষের অবস্থানুযায়ী হবে। কিন্তু নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো সফরে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত ও বিতর বাদে আর কোনো সুন্নাতে রাতেবা পড়েননি। ইবনু কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে ফরয সালাতের আগের ও পরের সুন্নাত পড়েননি। কিন্তু কেউ পড়তে চাইলে পড়তে পারবে এতে কোনো নিষেধ নেই। সাধারণ নফলের মতো এগুলো নফল হিসেবে পরিগণিত হবে, সুন্নাতে রাতেবা হিসেবে হবে না। যেমনঃ তাহিয়্যাতুল মাসজিদের সালাত। এ কথাকে আরো শক্তিশালী করে এই যুক্তি, মুসাফিরের সহজের জন্য চার রাকআত সালাতকে দুই রাকআত করা হয়েছে। সুতরাং তাকে কিভাবে সুন্নাতে রাতেবা পড়ার জন্য বাধ্য করা হবে! অথচ তার দিকে বিবেচনা করে চার রাকআত ফরয সালাতকে দুই রাকআত করা হয়েছে! মুসাফিরের ওপর যদি সহজ করা উদ্দেশ্য না থাকতো তাহলে তো সালাত পরিপূর্ণ করে পড়াই উত্তম হতো!

(আওসাত, ৫/২৪১, মুগনী, ২/২০৪, শারহে মুসলিম, (৬৮৯), মাজমূ' ফাতাওয়া, ২২/২৭৯, যাদুল মাআদ, ১/৪৭৩, ফাতহুল বারী, ২/৫৭৮)

দিনের ও রাতের নফল সালাতের প্রত্যেক দুই রাকআতে কি সালাম ফিরাতে হবে?

প্রথম মতঃ উত্তম হচ্ছে দিনের ও রাতের নফল সালাতের প্রত্যেক দুই রাকআতে সালাম ফিরানো। তবে দুইয়ের অধিক রাকআত সালাতও এক সালামে পড়া জায়েয আছে। এটা সাহাবী, তাবেঈ ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ বিদ্বানের মত। এটার ওপরই ইমাম বুখারী

রহিমাহুল্লাহ অধ্যায় বেঁধেছেন, 'নফল সালাত দুই দুই রাকআত করে পড়ার অধ্যায়'। তারপর তিনি বলেন, এই মতটা আম্মার, আবু যার, আনাস, জাবের ইবনু যায়েদ, ইকরিমা ও যুহরী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইয়াহ ইয়া ইবনু সাঈদ আল আনসারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের শহরে যত বিদ্বান পেয়েছি সবাইকে দেখেছি যে, তারা প্রত্যেক দুই রাকআতের পর সালাম ফিরাতেন। এরপর তিনি অনেকগুলো হাদীস নিয়ে এসেছেন। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো লেখক যা ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে নিয়ে এসেছেন। এমনিভাবে সালাতে ইস্তিখারায় জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেখানে আছে, "তোমাদের কেউ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংকল্প করলে সে যেন ফরয সালাত ব্যতীত দুই রাকআত সালাত পড়ে"। আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, "তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকআত সালাত না পড়ে বসবে না"। এই মতের প্রবক্তারা ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীস দিয়ে আরো দলীল দিয়েছেন, "রাতের সালাত দুই দুই রাকআত করে পড়তে হবে"। এই হাদছিটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্য হাদীসগ্রন্থে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, "রাতের ও দিনের সালাত দুই দুই রাকআত করে পড়তে হবে"। এই হাদীসে অতিরিক্ত 'দিন' শব্দটা সঠিক নয়, বিদ্বানরা এই শব্দটার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। যেমন: ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইমাম আহমাদ প্রমুখ বিদ্বানরা। (ইবনু রজব, ৯/৯৭, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২১/২৮৯)

দ্বিতীয় মত: আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন, দিনের নফল সালাতে প্রত্যেক দুই রাকআতে বা চার রাকআতে সালাম ফিরালে এই দুইটার একই ফযীলত। চারের অধিক এক সালামে একসাথে পড়া যাবে না। আর রাতে দুই রাকআত, চার রাকআত, ছয় রাকআত ও আট রাকআত একসাথে এক সালামে পড়া যাবে। আট রাকআতের অধিক একসাথে এক সালামে পড়া যাবে না। সুফিয়ান সাওরীর মত হচ্ছে দিনে বা রাতে চার ছয় বা তার অধিক সালাত একসাথে এক সালামে পড়া যাবে। তিনি বলেন, তবে রাতের সালাতের ক্ষেত্রে দুই রাকআত করে পড়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। এই মতের দলীল: আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার হাদীস, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতুয যুহা চার রাকআত বা ইচ্ছা করলে আরো অধিক পড়তেন। (মুসলিম, হা/৭২৯)

তার থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তেরো রাকআত সালাত পড়তেন। এর মাঝে পাঁচ রাকআত বিতর সালাত। তিনি শুধু শেষ রাকআতে বসতেন। এই হাদীসটা লেখক বিতর অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন। এমনিভাবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এক সালামে নয় রাকআত ও সাত রাকআত সালাত পড়েছেন।(মুসলিম, হা/৭৪৬)

ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে প্রমাণিত যে, তিনি দিনের বেলা চার রাকআত করে সালাত পড়েছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। রাতের ও দিনের নফল সালাত দু'রাকআত দু'রাকআত করে পড়া উত্তম। দিনের নফল সালাত যদি কখনো কখনো এক সালামে চার রাকআত করে পড়ে তাহলে এটা জায়েয আছে। এমনিভাবে রাতের সালাতেও এক সালামে কয়েক রাকআতকে একত্রিত করে পড়া জায়েয আছে। এ বিষয়ে বিতর অধ্যায়ের পর বিস্তর আলোচনা অচিরেই আসছে ইনশাআল্লাহ।

(আওসাত, ৫/২৩৫, তামহীদ, ১৩/২৪৩, মুগনী, ২/১২৩, মাজমু, ৩/৫৪৩, ইবনু রজব, ৯/৯৭, ফাতহুল বারী, ৩/৪৮)

জুমআর পর সুন্নাতে রাতেবা কয় রাকআত?

প্রথম মত: জুমআর পর দুই রাকআত সুন্নাত বাড়িতে পড়বে। এটা ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা, ইবরাহীম নাখাঈ ও ইমাম মালেক রহিমাহুমাল্লাহ তাদের মত।

তাদের দলীল: ইবনু রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু এর হাদীস, লেখক যা উল্লেখ করেছেন সেখানে আছে, "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমআর পর দু'রাকআত সালাত পড়তেন"। দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, "বাড়িতে পড়তেন"।

দ্বিতীয় মত: জুমআর পর চার রাকআত সালাত পড়বে। এটা ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু, ইবরাহীম নাখাঈ, আসহাবে রায় ও হাসান ইবনু হাই তাদের মত।

তাদের দলীল: মুসলিমে (৮৮১) বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের কেউ জুমআর সালাত পড়লে সে যেন চার রাকআত সালাত পড়ে"।

তৃতীয় মত: মাসজিদে পড়লে চার রাকআত পড়বে আর বাড়িতে পড়লে দুরাকআত পড়বে। এটা ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু কাইয়্যিম রহিমাহুমার মত।

তাদের দলীল: পূর্বে বর্ণিত ইবনু উমার ও আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীসদ্বয়কে তারা সমন্বয় করে এ কথা বলেছেন। অর্থাৎ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের আলোকে বাড়িতে পড়লে দু'রাকআত ও আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের আলোকে মাসজিদে পড়লে চার রাকআত।

চতুর্থ মত: জুমআর পর ছয় রাকআত সালাত পড়বে। প্রথমে দুই রাকআত তারপর চার রাকআত। এটা আলী, ইবনু উমার, আবু মুসা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম তাদের মত। অনুরূপভাবে এটা মজাহিদ, আতা, হুমাঈদ ইবনু আব্দুর রহমান, ছাওরী ও ইমাম আহমাদের একমত।

তাদের দলীল: ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি মক্কায় থাকলে জুমআর পর দু'রাকআত পড়তেন ও তারপর চার রাকআত পড়তেন। মদীনায় থাকলে জুমআর সালাত পড়ে বাড়িতে এসে দু'রাকআত সালাত পড়তেন। মাসজিদে কোনো সালাত পড়তেন না।

এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন করতেন। হাদীসটি আবু দাউদে ও আমাদের শাইখ সহীহুল মুসনাদে (৭৬৪) নিয়ে এসেছেন।

পঞ্চম মতঃ স্বাধীনতা রয়েছে। চাইলে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের দিকে লক্ষ্য করে দু'রাকআত পড়বে অথবা আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের দিকে লক্ষ্য করে চার রাকআত পড়বে। এটা ইমাম আহমাদের একমত। ইবনু মুনযির ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুমাল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস ও আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে পঞ্চম মত। সুতরাং বাড়িতে পড়লে দু'রাকআত পড়বে আর এটা উত্তম। আর মাসজিদেও দু'রাকআত পড়তে পারবে বা মাসজিদে চার রাকআত পড়বে। আর ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে আবু দাউদে যে ছয় রাকআতের কথা বর্ণিত হয়েছে, আসলে বুখারী ও মুসলিমে দু'রাকআতের কথা এসেছে। আর এদিকেই অন্তরটা ধাবিত হয়। তবে কেউ যদি কখনো কখনো ছয় রাকআত আবার কখনো দুই রাকআত পড়ে তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কেউ এমন করলে তার সালাত অস্বীকার করা যাবে না। আল্লাহ ভালো জানেন।

(ইশরাফ, ৪/১২৫, তামহীদ, ১৪/১৭১, মুগনী, ২/৩৬৪, যাতুল মাআদ, ১/৪৪০, নাইলল আওতার, ৪/৪০৪, শারহুল মুমতি)

জুমআর সালাতের আগে কি সুন্নাতে রাতেবা আছে?

প্রথম মতঃ জুমআর সালাতের পূর্বে কোনো সুন্নাতে রাতেবা সালাত নেই। এটা ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও তার অধিকাংশ ছাত্রের মাযহাব এবং এটা ইমাম আহমাদের প্রসিদ্ধ মাযহাব।

তাদের দলীলঃ জুমআর সালাতের পূর্বে সুন্নাত সালাত আছে এ বিষযে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি।

দ্বিতীয় মতঃ কিছু বিদ্বানের মত হচ্ছে জুমআর সালাতের পূর্বে সুন্নাত সালাত রয়েছে। কেউ দুই রাকআতের কথা বলেছেন, যেমনঃ ইমাম শাফেয়ীর কিছু ছাত্র ও ইমাম আহমাদ। আবার কেউ চার রাকআতের কথা বলেছেন। যেমনঃ ইমাম আবু হানিফার কিছু ছাত্র, ইমাম শাফেয়ীর কিছু ছাত্র ও ইমাম আহমাদের একমত। এ বিষয়ে তারা এমন দলীল দিয়েছেন যা গ্রহণযোগ্য নয়। আবার কেউ এটাকে যুহরের সুন্নাতের ন্যায় মনে করে চার রাকআতের কথা বলেছেন। এটা স্পষ্ট ভুল। কেননা যুহর ও জুমআর সালাতের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, জুমআর সালাতের এমন কিছু হুকুম আহকাম আছে যা যুহরের সালাতকে আলাদা করে দেয়। আমি বলছি, তারা এই হাদীস দিয়ে আরো দলীল

দিয়েছেন, "প্রত্যেক দুই আযানের মাঝে সালাত আছে"। এর উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে তিনি মিম্বারের ওপর আরোহণ করে বসলে বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু আযান দিতেন। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দুই খুতবা দিতেন। তারপর বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ইকামত দিতেন আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষদের নিয়ে জুমআর সালাত পড়াতেন। এখানে কোনোভাবেই সম্ভব নয় যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা মুসলিমদের কেউ আযানের পর সালাত পড়েছেন এবং তাঁর থেকে কেউ বর্ণনা করেননি যে, তিনি জুমআর দিন বের হওয়ার পূর্বে বাড়িতে সালাত পড়েছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আর এটাই ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু কাইয়্যিম রহিমাহুমা পছন্দ করেছেন। এ মাসআলায় তাদের সুন্দর আলোচনা রয়েছে। কেউ জানতে চাইলে তাদের কিতাবে ফিরে যাও। ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহও এই মতকে পছন্দ করেছেন।

এখন বাকি থেকে গেল কোনো ব্যক্তি যদি জুমআর দিন মাসজিদে প্রবেশ করে নফল সালাতের ইচ্ছা করে তাহলে সে কয় রাকআত পড়বে?

এ বিষয়ে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.

"যে ব্যক্তি গোসল করে জুমআর সালাতের জন্য আসলো, তারপর সাধ্যমত সালাত আদায় করলো, অতঃপর বসে চুপ করে ইমামের খুতবা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলো। অতঃপর ইমামের সাথে (জুমুআর) সালাত আদায় করলো। তাহলে তার এই জুমআ ও পরবর্তী জুমআর মধ্যকার এবং আরো তিনদিনের (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে"। (মুসলিম, হা/৮৫৭)

এই অর্থে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হাদীসের অর্থের আলোকে কথা হচ্ছে তার জন্য যত রাকআত ইচ্ছা পড়তে পারবে। সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো রাকআতের সীমারেখা নেই। আল্লাহ ভালো জানেন। (মুগনী, ২/৩৬৪, মাজমু, ৩/৫০৩, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৪/১৮৮, যাদুল মাআদ, ১/৪৩২, শারহুল মুমতি, ৫/৭৮)

নফল সালাত বাড়িতে পড়া উত্তম নাকি মাসজিদে পড়া উত্তম?

প্রথম মত: সুন্নাতে রাতেবা বাড়িতে পড়া উত্তম। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

তাদের দলীল: বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত যায়েদ ইবনু ছাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, "ফরয সালাত ছাড়া ব্যক্তির জন্য বাড়িতে সালাত পড়া উত্তম"। "তোমরা বাড়িতে সালাত পড়ো, বাড়িকে কবরে পরিণত করো না"। তাদের আরো দলীল হলো বাড়িতে সালাত পড়া এটা ইখলাসের নিকটবর্তী কাজ ও রিয়া থেকে দূরে থাকা যায়। বাড়িতে সালাত পড়া হলো গোপন আমল আর মাসজিদে সালাত পড়া হলো প্রকাশ্য আমল। গোপন আমল প্রকাশ্য আমল থেকে উত্তম।

দ্বিতীয় মত: দিনের সুন্নাতে রাতেবা মাসজিদে পড়া উত্তম আর রাতের সুন্নাতে রাতেবা বাড়িতে পড়া উত্তম। এ মতের দলীল: লেখক যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। মাগরিবের, ইশার ও জুমআর সুন্নাত বাড়িতে পড়বে। এ মতের জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর ও জুমআর সুন্নাত বাড়িতে পড়েছেন অথচ এদু'টিই দিনের সালাত।

তৃতীয় মত: ফরয ও সুন্নাত সকল সালাত মাসজিদে পড়বে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

মুফহিম, ২/৩৬৬, শারহে মুসলিম, ৭২৯, মুগনী, ২/১৪১)

নফল সালাত পড়ার হিকমত

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানগণ বলেন, নফল সালাত পড়ার হিকমত হচ্ছে, ফরয সালাতে যে ত্রুটি হয়েছে তা পরিপূর্ণ করা। যেমন আবু দাউদ ও অন্যান্য কিতাবে এ সম্পর্কে হাদীস আছে। ফরয সালাতের পূর্বে নফল সালাতের হিকমত হচ্ছে ফরয সালাতের জন্য অন্তরটা যেন প্রস্তুত হয়, অন্তরটা যেন প্রশান্তি লাভ করে। এজন্যই রাতের সালাত শুরু করার আগে দু'রাকআত সংক্ষিপ্ত সালাত দিয়ে শুরু করতে হয়। ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, নফল সালাতের উপকারিতা হচ্ছে ফরয সালাতে যে ত্রুটি হয়েছে তা এই নফল সালাত পরিপূর্ণ করে দিবে। (শারহে মুসলিম, ৭২৯, শারহুল মুমতি, ৪/৬৯)

ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের আলাদা বৈশিষ্ট্য

১. ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত সফর ও বাড়িতে অবস্থানকালে এই দুই অবস্থায়ই পড়তে হয়। বাড়িতে অবস্থানকালে যে পড়তে হয় তার অনেক দলীল রয়েছে। এর মাঝে লেখক উল্লেখ করেছেন। সফরের সময় পড়ার দলীল হচ্ছে মুসলিমে (৬৮০) বর্ণিত আবু হুরায়রা

রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস। তিনি বলেন, আমরা রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বিশ্রামের জন্য যাত্রা বিরতি করি। সূর্য উঠার পর আমরা সবাই জাগ্রত হই। এরপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আসবাবপত্র নিয়ে নেয়, কেননা এই স্থানে শয়তান উপস্থিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা তাই করলাম। তারপর তিনি পানি আনতে বলেন ও ওযূ করে দু'রাকআত সুন্নাত পড়েন। তারপর ইকামত দেয়া হলে ফজরের সালাত পড়েন।

২. ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের সওয়াব দুনিয়া ও তার মাঝে যা আছে এর চাইতে উত্তম। যেমনটি লেখক ইমাম মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন।

৩. এই দু'রাকআত সাধ্যানুযায়ী সংক্ষিপ্ত করে পড়া। যেমনটি লেখক হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা থেকে এ বিষয়ে হাদীস নিয়ে এসেছেন। তবে শর্ত হলো কোনো ওয়াজিব যেন ছুটে না যায়।

৪. এই সালাতে প্রথম রাকআতে ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন পড়বে ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়বে। এর দলীল মুসলিমে (৭২৬) বর্ণিত হাদীস। অথবা প্রথম রাকআতে ফাতিহার পর সূরা বাকারার ১৩৬ নম্বর আয়াত পড়বে ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নম্বর আয়াত পড়বে। এর দলীল মুসলিমে (৭২৭) বর্ণিত হাদীস।

৫. এই দু'রাকআত সুন্নাতের পর ডানকাত হয়ে একটু শয়ন করা সুন্নাত। অবশ্য এই শুয়ে থাকা সুন্নাত নাকি সুন্নাত না নাকি শর্ত এ নিয়ে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ ছয়টি মত উল্লেখ করেছেন। এ মাসআলায় দীর্ঘ কথা আছে।

সারকথা: সারকথা হচ্ছে এভাবে শয়ন করা সুন্নাত। কারণ এ বিষয়ে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সুন্নাত শেষ করে ডানকাত হয়ে শয়ন করতেন। (বুখারী, হা/১১৬০, মুসলিম, হা/৭৩৬)

(মুগনী, ২/১২৬, মাজমু, ৩/৫২৩, নাইলুল আওতার, ৩/৪৪৪, শারহুল মুমতি, ৪/৭০)

এভাবে কি বাড়িতে শয়ন করবে নাকি মাসজিদে?

হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী রহিমহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে (৩/৪৪) বলেন, কতিপয় সালাফের নিকট এভাবে বাড়িতে শয়ন করা মুস্তাহাব, মাসজিদে নয়। এটা ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের কিছু শাইখ এই মতটিকে এভাবে আরো শক্তিশালী করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি তিনি মাসজিদে এমন করেছেন। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কেউ মাসজিদে এভাবে শয়ন করলে তিনি পাথর নিক্ষেপ করতেন। এটা ইবনু আবি শাইবা বর্ণনা করেন।

ফজরের সুন্নাতের বিধান

প্রথম মত: ফজরের সুন্নাত হলো মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: লেখক আয়েশা ও হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা।

দ্বিতীয় মত: ফজর সুন্নাত হলো ওয়াজিব। এটা হাসান বাসরী রহিমাহুল্লাহর মত। মুরগিনানী আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ থেকে এই মত বর্ণনা করেন। ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেন। তাদের দলীল: পূর্বে গত হয়েছে। তাদের আরো দলীল হলো বুখারীতে (১১৫৯) বর্ণিত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার হাদীস, সেখানে আছে, "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সুন্নাত কখনো ছাড়তেন না"। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের ঘোড়া তাড়া করলেও ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ছাড়বে না"। এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও আবু দাউদ রহিমাহুমা তাদের কিতাবে নিয়ে এসেছেন। তবে এর সনদ দুর্বল। (ইরওয়াউল গালীল, ৪৩৮)

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আর দ্বিতীয় মতের ব্যাপারে কথা হচ্ছে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে যে আদেশ এসেছে এটা প্রমাণিত নয়। তথা দুর্বল হাদীস। আল্লাহ ভালো জানেন। (মাজমু, ৩/৫২২, ফাতহুল বারী, ৩/৪৩, নাইলুল আওতার, ৩/৪৪৫)

١٠-بَابُ الْأَذَانِ والإقامة

অধ্যায়: ১০-আযান ও ইকামতের বর্ণনা

আযান ও ইকামতের সংজ্ঞা:

আযানের শাব্দিক অর্থ: আযানের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'ঘোষণা করা'। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ ও তার রাসূল থেকে ঘোষণা"। (সূরা আত তাওবা, ৯:৩) অর্থাৎ ঘোষণা।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি তোমাদের সঠিক ঘোষণা করছি"। (সূরা আম্বিয়া, ২১:১০৯) অর্থাৎ আমি তোমাদের এলান (ঘোষণা) করছি।

আযানের পারিভাষিক অর্থ: আযানের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে 'নির্দিষ্ট শব্দে ও নির্দিষ্ট সিফাতে ফরয সালাতের সময়ের ঘোষণা করা'।

ইকামতের শাব্দিক অর্থ: ইকামতের শাব্দিক অর্থ অনেকগুলো। তার মাঝে রয়েছে, অনুসন্ধান করা, প্রকাশ করা, ডাকা ও সঙ্গী ঠিক করা।

ইকামতের পারিভাষিক অর্থ: ইকামতের পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে ‘নির্দিষ্ট শব্দে ও নির্দিষ্ট সিফাতে সালাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এর ঘোষণা দেয়া’। (লিসানুল আরব, মুগনী, ১/৪০১, ফাতহুল বারী, ২/৭৭, মাওসুয়া ফিকহিয়া, ২/৩৫৭)

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য আযান দেওয়া শরীআতসম্মত

এটা শরীআতসম্মত হওয়ার দলীল হচ্ছে কুরআন, হাদীস ও ইজমা।

কুরআনের দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী, “হে ঈমানদারগণ! জুমআর দিন সালাতের আযান দেয়া হলে”। (সূরা জুমআ, ৬২:৯)

আল্লাহ তাআলার বাণী, “তোমরা সালাতের দিকে ডাকলে তারা এটাকে খেলতামাশা মনে করে”। (সূরা মায়েদা, ৫:৫৮)

হাদীস থেকে দলীল: এ বিষয়ে অনেক হাদীস আছে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য হাদীস হলো লেখক যা উল্লেখ করেছেন।

ইজমা থেকে দলীল: বায়ানের লেখক, মুগনীর লেখক ও প্রমুখ বিদ্বান ইজমা নকল করেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য আযান শরীআতসম্মত।

(বায়ান, ২/৫৪, মুগনী, ২/৪০৪, মুগনী মুহতাজ, ১/২২৬)

٦١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

৬১. আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, বেলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে আযানের শব্দগুলো জোড়া জোড়া এবং ইকামতের শব্দসমূহ বেজোড় করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। [সহীহ বুখারী, হা/৬০৩, সহীহ মুসলিম,হা/৩৭৮]

শহর ও গ্রামবাসীদের জন্য আযানের বিধান

প্রথম মত: শহর ও গ্রামবাসীদের জন্য আযান দেয়া ফরজে কিফায়া। এটা আতা, মুজাহিদ, ইবনু আবী লাইলা, আওযায়ী, আহলে যাহের, ইমাম আহমাদের প্রকাশ্য মত। এমনিভাবে এটা আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর অধিকাংশ ছাত্র, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুমার মত।

দ্বিতীয় মত: আযান দেয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এটা ইমাম মালেক, আবু হানিফা ও শাফেয়ী রহিমাহুমুল্লাহ তাদের প্রকাশ্য মত এবং এটা ইমাম আহমাদ ও ইসহাক ইবনু রাহওয়াই রহিমাহুমারও মত। ইমাম সারাখসী অধিকাংশ বিদ্বান থেকে এই মত নকল করেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত । আর তা হলো আযান দেয়া ফরজে কিফায়া। লেখক আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে মুসলিমে (৩৮২) তার থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর উদয় হলে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করতেন। তিনি আযানের অপেক্ষা করতেন। আযান শুনলে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতেন। আর না শুনলে আক্রমণ করতেন। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলতে শুনেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সে ফিতরাতের ওপর আছে।" তারপর লোকটি আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেলে।" এরপর তারা (সাহাবীরা) তাকিয়ে দেখতে পেল লোকটি মা'যার (এক ব্যক্তি) রাখাল।

মালেক ইবনু হুয়াইরিছ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সালাতের সময় হলে তোমাদের একজন যেন আযান দেয় ও তোমাদের মাঝে যে বড় সে যেন ইমামতি করে।" (বুখারী, হা/৬২৮, মুসলিম, হা/৬৭৪)

(আওসাত, ৩/২৪, মুহাল্লা, ২/১৬৩, মুগনী, ১/৪১৭, বিদায়া, ১/২৬৩, মাজমু, ৩/৯০, ইবনু রজব, ৫/২৩৮, সাইলুল জাররার, ১/৪৩২)

আযান ও ইকামত ছাড়া যে ব্যক্তি সালাত পড়েছে তার সালাতের বিধান

প্রথম মত: আযান ও ইকামত ছাড়া যে ব্যক্তি সালাত পড়েছে তার সালাত হয়ে গেছে, পুনরায় পড়তে হবে না। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

দ্বিতীয় মত: আযান দেয়া হলো ফরয ও ইকামত দেয়া হলো সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। এটা আতা, মুজাহিদ, ইবনু আবী লাইলা, আওযায়ী, আহলে যাহের তাদের মত। তারা বলেন, কেউ ইকামত ছেড়ে দিলে পুনরায় সালাত পড়তে হবে। আর আওযায়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে, সময় থাকলে পুনরায় সালাত পড়বে। মালেকী মাযহাবের উসমান ইবনু কিনানা বলেন, কেউ ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে পুনরায় সালাত পড়বে।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, **মুসল্লী যদি আযান ও ইকামত ছাড়া সালাত পড়ে তাহলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার সালাত হয়ে যাবে।** আলকামা ও আসওয়াদ রহিমাহুমা থেকে বর্ণিত আছে, তারা বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গেলে তিনি আমাদের নিয়ে আযান ও ইকামত ছাড়া সালাত পড়েন। এটা আছরাম বর্ণনা করেন। আতা রহিমাহুল্লাহ ছাড়া কেউ তার বিরোধিতা করেছেন কিনা আমার জানা নেই। আতা রহিমাহুল্লাহ

বলেন, কেউ ইকামত দিতে ভুলে গেলে তাকে পুনরায় সালাত পড়তে হবে। আওযায়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সময় থাকলে সালাত পুনরায় পড়বে আর সময় শেষ হয়ে গেলে পুনরায় পড়তে হবে না। এটা বিরল মত।

বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যা অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন। ইকামত হলো দুই আযানের এক আযানের ন্যায়। সুতরাং তা ছেড়ে দিলে সালাত বিনষ্ট হবে না।

আমি বলছি, ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন তা সঠিক। দ্বিতীয় মতে তিনি যে বলেছেন আতা রহিমাহুল্লাহ ছাড়া কেউ তার বিরোধিতা করেননি এটা দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন এই মাসআলায় যে বিরোধিতা করেছে এটা।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ যে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে আসার নিয়ে এসেছেন এটা ইবনু মুনযির তার আওসাতে সহীহ সনদে নিয়ে এসেছেন।

(আওসাত, ৩/৫৮, মুগনী, ১/৪১৮, ইবনু রজব, ৫/২৩৮)

কোনো দেশের অধিবাসী যদি আযান বর্জনের জন্য একত্রিত হয় তাহলে তাদের সাথে কি যুদ্ধ করা হবে?

হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম খাত্তাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আযান হলো ইসলামের নিদর্শন। এটা বাদ দেয়া যাবে না। কোনো দেশের অধিবাসী আযান বর্জনের জন্য একত্রিত হলে রাষ্ট্রপ্রধান তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। এটা বিদ্বানদের মতসমূহের একটি মত। ইবনু আব্দিল বার অবশ্য এই ক্ষেত্রে বিরল মত বলেছেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত আছে কিনা আমি জানি না।

(ইবনু রজব, ৫/২৪০, ফাতহুল বারী, ২/৯০)

কোনো ব্যক্তি যদি এমন গ্রামে থাকে, যেখানে আযান হয়েছে। আর সে বাড়িতে সালাত পড়ে এক্ষেত্রে কি তাকে আযান ও ইকামত দিতে হবে?

প্রথম মত: আযান ও ইকামত ছাড়া সালাত পড়া তার জন্য জায়েয আছে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, সে শহরে থাকলে শহরের আযান তার জন্য যথেষ্ট। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ ও তার ছাত্ররা বলেন, শহরের অধিবাসী একা সালাত পড়লে আযান ও ইকামত দেয়া ভালো। যদি মানুষের আযান ও ইকামতের ওপর নির্ভর করে তাহলেও এটা যথেষ্ট হয়ে যাবে। আবু আছরামও এমন মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের দলীল: আসওয়াদ ও আলকামা রহিমাহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তারা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর বাড়িতে যান। এরপর তিনি তাদের বলেন, তোমরা দাঁড়িয়ে সালাত পড়ো। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু আমাদের আযান ও

ইকামতের আদেশ দেননি। এর সনদ সহীহ, মুজামুল আওসাতে আছে। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর আসার, তিনি বলেন, যে গ্রামে আযান ও ইকামত দেয়া হয়েছে তুমি এই গ্রামে থাকলে তাদের আযান ও ইকামত তোমার জন্য যথেষ্ট। এটাও সহীহ সনদে মুজামুল আওসাতে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মতঃ ইকামতই যথেষ্ট। এটা ইমাম মালেক ও মাইমুন ইবনু মিহরান রহিমাহুমার মত। সাঈদ ইবনু যুবায়ের ইকামত দিতেন, আযান দিতেন না। ইমাম আওযায়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসল্লী সালাতের ইকামত দিলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে, তবে আযান দেয়া উত্তম। হাসান ও ইবনু সিরীন রহিমাহুমা বলেন, কেউ একা সালাত পড়লে চাইলে ইকামত দিতে পারে।

তৃতীয় মতঃ ইকামতই যথেষ্ট, তবে ফজরের সালাতে আযান ও ইকামত উভয়টি দিবে। এটা ইবনু সিরীন ও নাখয়ী রহিমাহুমার মত।

চতুর্থ মতঃ কেউ আযান ও ইকামত ছাড়া সালাত পড়লে পুনরায় সালাত পড়তে হবে, তবে শুধু ইকামত দিলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। এটা আতা রহিমাহুল্লাহর মত।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন। তিনি বলেন, আযান ও ইকামত দিয়ে সালাত পড়া আমার নিকট উত্তম, তবে যদি শুধু ইকামত দেয়, আযান না দেয় তাহলেও যথেষ্ট হয়ে যাবে। কেউ যদি আযান ও ইকামত ছাড়াই সালাত পড়ে তাহলেও তাকে পুনরায় সালাত পড়তে হবে না। একা সালাত আদায়কারীর জন্য আযান ও ইকামত দেয়াকে আমি পছন্দ করি। এরপর তিনি মালেক ইবনু হুয়াইরিছ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস নিয়ে এসেছেন এবং জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর আসার নিয়ে এসেছেন যে তিনি আযান ও ইকামত দিতেন।

(আওসাত, ৩/৫৮, মুগনী, ১/৪১৮, ইবনু রজব, ৫/৩৭০)

যে মাসজিদের মুসল্লীরা সালাত আদায় করেছে, ওই মাসজিদে আযান ও ইকামত দেয়ার বিধান

প্রথম মতঃ আযান ও ইকামত দেয়া মুস্তাহাব। আনাস ও সালামা ইবনু আকওয়া রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা এমন করতেন। ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ তা উল্লেখ করেন। হাদীসের সনদ সহীহ। এই মতটি ইমাম যুহরী, ইবনু মুসাইয়্যিব, কাতাদা, আহমাদ ও ইমাম শাফেয়ীর একমত। কাতাদা রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দেয়া তোমার নিকট কল্যাণ বয়ে আনবে।

দ্বিতীয় মতঃ শুধু ইকামত দিবে। এটা তাউস, আতা, মুজাহিদ, মালেক ও আওযায়ী রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত।

তৃতীয় মত: আযান ও ইকামত কোনোটাই দিবে না। এটা হাসান, শাবী, ইকরিমা, আবু হানিফা ও তার ছাত্রদের মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন। তিনি বলেন, আযান ও ইকামত দিয়ে সালাত পড়া আমার নিকট উত্তম। আর যদি মাসজিদের আযানের ওপর নির্ভর করে সালাত পড়ে তাহলে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। তবে আমি পছন্দ করি না যে, সে আযানের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হোক।

ফায়েদা: ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসল্লী যদি কাযা সালাত পড়ে বা এমন সময় সালাত পড়ে যখন আযানের সময় না তাহলে আযান জোরে দিবে না।

(আওসাত, ২/৬০, মুগনী, ১/৪১৮, ইবনু রজব, ৫/৩৭২)

মুসাফিরের আযান ও ইকামত দেয়া কি ওয়াজিব?

প্রথম মত: সফরে আযান ও ইকামত দিবে। এটা সোলাইমান, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, ইবনু মুসাইয়্যিব, ইবনু সিরীন, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক, আবু ছাওর ও আবু হানিফা রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সফরে ইকামত দিলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে, তবে ফজরের সালাতে আযানও দিবে। এই মতের দলীল: উবাই ইবনু কাব রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, আমরা কোনো এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। মুয়াজ্জিন আযান দিতে চাইলে তিনি তাকে একটু বিলম্বে আযান দিতে বলেন। (বুখারী, হা/৬২৯)।

মালেক ইবনু হুয়াইরিছ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, দুজন লোক সফরের উদ্দেশ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা বের হলে আযান ও ইকামত দিয়ে সালাত পড়বে"। (বুখারী, হা/৬৩০)। বুখারী অন্য বর্ণনায় ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে, "সালাতের সময় হলে তোমাদের একজন যেন আযান দেয়"। (বুখারী, হা/৬৩১, মুসলিম, হা/৬৭৪)

দ্বিতীয় মত: সফরে ইকামত দিলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে, তবে ফজরের সালাতে আযান ও ইকামত দুটিই দিবে। এটা ইবনু মুনযির, ইবনু উমার ও ইবনু সিরীন রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম তাদের মত। হাসান ও কাসেম ইবনু মুহাম্মদ রহিমাহুমা বলেন, ইকামত দিলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে।

তৃতীয় মত: স্বাধীনতা আছে। চাইলে আযান ও ইকামত উভয়টি দিবে অথবা শুধু ইকামত দিবে। এটা আলী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ও ইবনু সিরীন রহিমাহুল্লাহর মত। মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, সফরে ইকামত দিতে ভুলে গেলে পুনরায় সালাত পড়তে হবে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে মুকিমের যেমন আযান ও ইকামত দেয়া ফরজে কিফায়া অনুরূপ মুসাফিরেরও আযান ও ইকামত দেয়া ফরজে কিফায়া। আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তারা সকলে সালাত না পড়ে ঘুমন্ত ছিল, ওই হাদীসে আছে, তারপর বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু সালাতের আযান দেন। মুসাফিররা দুই সালাতকে একত্রিত করলে একটি আযান ও দুটি ইকামত দিবে। এমনটিই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফায় ও মুযদালিফায় করেছেন। যারা মুসাফিরে জন্য আযান ও ইকামত দেয়াকে ওয়াজিব বলেছেন তাদের মাঝে আছেন ইবনু মুনযির, কিছু হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ও কিছু যাহিরী। ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ আরো স্পষ্ট করে বলেন, সালাতের শর্ত হলো আযান ও ইকামত অর্থাৎ তা ওয়াজিব। এই মতকেই পছন্দ করেছেন ইমাম শাওকানী ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুমাল্লাহ।

(আওসাত, ৩/৪৬, মুহাল্লা, ২/১৬৩, ইবনু রজব, ৫/৩৬৬, সাইলুল জাররার, শারহুল মুমতি, ১/৪৪)

জনমানবহীন এলাকায় একা থাকলে আযান দেয়ার বিধান

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাতের সময় জনমানবহীন এলাকায় একা থাকলে জোরে আযান দেয়া মুস্তাহাব। আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর কথা হচ্ছে, তুমি তোমার ছাগলের সাথে থাকলে বা জনমানবহীন এলাকায় থাকলে জোরে সালাতের জন্য আযান দিবে। কেননা মুয়াজ্জিনের আওয়াজ মানুষ, জিন বা যে কেউ শুনলে কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করবে। এরপর আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন, আমি এমনটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছি। আমি বলছি, হাদীসটি বুখারীতে আছে (বুখারী, হা/৬০৯)

আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু এর হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, একা ব্যক্তির আযান দেয়া মানদুব, যদিও সে নির্জন এলাকায় থাকে এবং কেউ উপস্থিত না হয়। কেননা সে মুসল্লীদের দুআ না পেলেও অন্য যারা তার আযান শুনছে তাদের সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে না।

(আওসাত, ৩/৬০, মুগনী, ১/৪১৮, ফাতহুল বারী, ২/৮৯)

ছুটে যাওয়া সালাতের জন্য আযান ইকামত দেয়ার বিধান

প্রথম মতঃ ছুটে যাওয়া সালাতের জন্য আযান ইকামত দেয়া মুস্তাহাব। কয়েক সালাত ছুটে গেলে প্রথম সালাতের জন্য আযান দেয়া মুস্তাহাব ও বাকি সালাতের জন্য ইকামত দিবে। আর যদি আযান না দেয় তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। এটা আবু ছাওর, হানাফি, হাম্বলী ও কিছু শাফেয়ীদের মত। হানাফিরা বলেন, কয়েক ওয়াক্ত সালাত এক সাথে পড়লে প্রথম সালাতের জন্য আযান দিবে ও পরের সকল সালাতের জন্য ইকামত দিবে। যদি একবার আযান দেয় তাহলে জায়েয আছে। এ মতের দলীলঃ আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তারা সকলে সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে ছিল ওই হাদীসে আছে, তারপর বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু সালাতের জন্য আযান দেন। (মুসলিম, হা/৬৮১)

দ্বিতীয় মতঃ ইকামত দিবে, আযান দিবে না। এটা ইমাম মালেক, আওযায়ী, ইসহাক রহিমাহুমুল্লাহ ও এটা ইমাম শাফেয়ীর একটি মত। তার আরেক মত হচ্ছে মানুষ জড়ো হওয়ার আশা থাকলে আযান দিবে আর না থাকলে ইকামত দিবে। কেননা আযান নির্ধারণ করা হয়েছে মানুষদের ডাকার জন্য। সুতরাং এর প্রয়োজন ছাড়া এটা শরীআতসম্মত নয়। তাদের দলীলঃ আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, মুশরিকরা খন্দক যুদ্ধের দিন আমাদের যুহরের সালাত থেকে দূরে রেখেছে, এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুকে আযান দিতে আদেশ করেন। তারপর তিনি যুহরের সালাত যুহরের সময় যেভাবে আদায় করেন, সেভাবে যুহরের সালাত আদায় করেন। তারপর আসরের সালাতের জন্য বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ইকামত দেন। এরপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের সালাত আসরের সময় যেভাবে আদায় করেন, সেভাবে আসরের সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি মাগরিবের সালাতের জন্য আযান দেন আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের সময় মাগরিবের সালাত যেভাবে আদায় করেন, সেভাবে মাগরিবের সালাত আদায় করেন। (নাসাঈ, হা/৬৬১, সহীহ মুসনাদ, হা/৩৮২)

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। শাইখুল ইসলাম বলেন, আমরা বলি বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ফজরের সালাত ছুটে যাওয়ার পর যেভাবে আযান দিয়েছেন, সেভাবে ছুটে যাওয়া সালাতের জন্য আযান দিতে হবে। কেননা ওই সময়ই আযান দেয়ার সময়। আযান দেয়া হয় সালাতের জন্য, শুধু ওই সময়ের জন্য নয়।

(আওসাত, ৩/৩১, মুগনী, ১/৪১৯, মাজমু, ৩/৯২, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২২/৭২)

নারীরা কি আযান ও ইকামত দিবে?

প্রথমত কথা হচ্ছে নারীদের ওপর আযান ও ইকামত দেয়া ওয়াজিব নয়, এ বিষয়ে বিদ্বানদের কোনো মতভেদ নেই। তাদের মাঝে মতভেদ হলো আযান ও ইকামত নারীদের দেয়া মুস্তাহাব নাকি মুস্তাহাব না?

প্রথম মত: আযান ও ইকামত নারীদের দেয়া মুস্তাহাব নয়। এটা অধিকাংশ বিদ্বানদের মত। তাদের দলীল: এ বিষয়ে কোনো দলীল নেই। আর দু'একটা যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা বিশুদ্ধ নয়।

দ্বিতীয় মত: তাদের ওপর ইকামত দেয়া ওয়াজিব। এটা আতা, মুজাহিদ ও আওযায়ীর মত এবং এটা শাফেয়ীদেরও একটা মাযহাব। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি ইকামত দেয় তাহলে ভালো।

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু কে জিজ্ঞেস করা হলো নারীরা কি ইকামত দিবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। হাদীসটি ইবনু মুনযির নিয়ে এসেছেন। কিন্তু হাজ্জাজ ইবনু আরতায়া, তিনি আবুয যুবায়ের, তিনি আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করেন। আর উভয় হচ্ছে মুদাল্লিস বর্ণনাকারী, দুজনের একজনও স্পষ্ট বর্ণনা করেনি। অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য সনদে কি এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে? বিষয়টা বিবেচনা করে দেখতে হবে।

তৃতীয় মত: আযান ও ইকামত দেয়া তাদের জন্য মুস্তাহাব। এটা ইসহাক, ইবনু মুনযির ও শাফেয়ীদের একটি মত। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি আযান ও ইকামত দিতেন। ইবনু মুনযির লায়েছ ইবনু আবী সোলাইমের সনদে হাদীসটি নিয়ে এসেছেন। কিন্তু সে দুর্বল বর্ণনাকারী।

ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো নারীদের ওপর আযান দেয়া কি ওয়াজিব? এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমি কি আল্লাহর যিকির থেকে নিষেধ করবো! ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ এই হাদীস নিয়ে এসেছেন। হাদীসের সনদের বাহ্যিক অবস্থা ভালো। আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা যদি এমন করে (আযান ইকামত দেয়) তাহলে কোনো সমস্যা নেই, কারণ এটা আল্লাহর যিকির।

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, আযান হলো আল্লাহর যিকির সমূহের মধ্য থেকে একটি যিকির। সুতরাং নারীদের আযান ও ইকামত দেয়াতে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, নারীরা আযান ও ইকামত দিলে কোনো সমস্যা নেই আর যদি না দেয় তাহলেও তা জায়েয আছে। ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন, নারীদের ওপর আযান ও ইকামত দেয়া ওয়াজিব নয়। তারা যদি আযান ও ইকামত দেয় তাহলে ভালো।

সারকথা: এ বিষয়ে সারকথা হচ্ছে নারীদের ওপর আযান ও ইকামত দেয়া ওয়াজিব নয়। কারণ এ সম্পর্কে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। কিন্তু তারা আল্লাহর যিকির হিসেবে যদি

আযান ও ইকামত দেয় যেমনটি ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেছেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই। তবে উঁচু স্বরে আযান ও ইকামত দিবে না। আল্লাহ ভালো জানেন।

(আওসাত, ৩/৫৩, মুহাল্লা, ২/১৬৯, মুগনী, ১/৪২২, মাজমু, ৩/১০৮)

আযানের শব্দের সংখ্যা

প্রথম মতঃ আযানের শব্দের সংখ্যা হচ্ছে পনেরটি। সেগুলো হচ্ছেঃ প্রথমে চারবার আল্লাহু আকবার, এখানে তারজি নেই। এটা হচ্ছে আবু হানিফা, সুফিয়ান ছাওরী, আহমাদ ও ইসহাক রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। তাদের দলীলঃ আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর আযান সম্পর্কে হাদীস, সেখানে আছে, প্রথমে চারবার আল্লাহু আকবার, এখানে তারজি নেই। (আবু দাউদ, হা/৪৯৯, তিরমিযী, হা/১৮৯, ইরওয়া, হা/২৪৬, সহীহুল মুসনাদ, ৫৭৫)

দ্বিতীয় মতঃ আযানের শব্দের সংখ্যা হচ্ছে উনিশটি। এটা শাফেয়ীদের মাযহাব। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হেজাজ ও অন্যান্য দেশের কিছু বিদ্বান এই মত ব্যক্ত করেন। তাদের দলীলঃ আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে অতিরিক্ত তারজি আযানের কথা আছে। এজন্যই উনিশটি শব্দ হয়েছে। আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস নিয়ে তৃতীয় মতে কথা আসতেছে।

তৃতীয় মতঃ আযানের শব্দের সংখ্যা হচ্ছে সতেরটি। প্রথমে দুবার আল্লাহু আকবার বাদ যাবে। এটা ইমাম মালেক ও আবু ইউসুফ রহিমাহুমার মত। মুসলিমে বর্ণিত আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে তারজির কথা এসেছে। কিন্তু তার প্রথমে শুধু দুবার আল্লাহু আকবারের কথা এসেছে।

কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন, ফারেসীর সনদে মুসলিমেই চারবার আল্লাহু আকবারের কথা এসেছে। আমি বলছি, হাদীসটি ইমাম আহমাদ (৩/৪০৯) আবু দাউদ (৪৯৬) তিরমিযী (১৯১) নাসাঈ (১৬০৬) ইবনু মাজাহ (৭০৮) বর্ণনা করেছেন। সকল সনদের আলোকে হাদীসটি হাসান। আর এ সকল গ্রন্থে তারজির কথা বর্ণিত হয়েছে ও চারবার আল্লাহু আকবারের কথা এসেছে।

সারকথাঃ আযানের শুরুতে চারবার তাকবীর হবে। এটাই আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ ও আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীসে এসেছে। আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর কিছু বর্ণনায় অবশ্য দুইবার তাকবীরের কথা এসেছে, তবে চারবারের হাদীস একাধিক। আর এটাই আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের অনুকুল হাদীস। সুতরাং এর ওপরই আমল করা হবে। আল্লাহ ভালো জানেন। আর তারজি আযানের হাদীস আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আর এর মাঝে কোনো মতানৈক্যও নেই। তাই এর ওপর আমল করা হবে। কখনো কখনো আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের ওপর আমল করবে আবার কখনো কখনো আব্দুল্লাহ ইবনু

যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের ওপর আমল করবে। ইবনু কুদামা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন, এ ধরনের মতভেদ বৈধ মতভেদ। যদি তারজি আযান দেয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ ও ইসহাক রহিমাহুমাল্লাহ দলীল নিয়ে এসেছেন। এই দুই পদ্ধতিই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। আমি বলছি, অচিরেই তারজি আযান সম্পর্কে কথা আসছে ইনশাআল্লাহ।

(আওসাত, ৩/১৫, মুফহিম, ২/৯, মুগনী, ১/৪০৪, মাজমু, ৩/১০২, নাইলুল আওতার, ২/৩১২)

তারজি আযানের বিধান

প্রথম মত: তারজি আযান শরীআতসম্মত। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

তারজি হচ্ছে, দুই সাক্ষ্য অর্থাৎ আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দুইবার উঁচু আওয়াজে দেয়া তারপর দুইবার আস্তে দেয়া। এটাই অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের মাঝে আছেন মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ রহিমাহুমুল্লাহ। তাদের দলীল: পূর্বে বর্ণিত আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস সেখানে তারজির কথা উল্লেখ আছে। তারা বলেন, এর ওপর মক্কা, মদীনা ও অন্যান্য দেশের লোকদের আমল রয়েছে।

দ্বিতীয় মত: তারজি আযান শরীআতসম্মত নয়। এটা আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ ও কুফীদের মত। তাদের দলীল: পূর্বে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস সেখানে তারজির কথা উল্লেখ নেই।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। আর তারজি আযান শরীআতসম্মত। কারণ এ বিষয়ে আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস বিশুদ্ধ। এ মতকেই ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু কাইয়্যিম, শাওকানী ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুমুল্লাহ পছন্দ করেছেন।

ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস সম্পর্কে বলেন, এই হাদীসটি বিশুদ্ধ হাদীস। এখানে অতিরিক্ত যা বর্ণিত হয়েছে তাতে কোনো সমস্যা নেই। তা গ্রহণ করা ওয়াজিব। এমনিভাবে এই হাদীসটা আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের পর বর্ণিত হাদীস। শারহে মুসলিমে বলা হয়েছে, আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসটা হচ্ছে অষ্টম হিজরীতে হুনাইন যুদ্ধের পরের আর আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস হচ্ছে প্রথম দিকের। এই হাদীসকে আরো শক্তিশালী করে মক্কা ও মদীনার লোকদের আমল।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, তারজি আযানের ব্যাপারে আমাদের বিদ্বানদের মাঝে মতভেদ আছে। এটা কি আযানের রুকন নাকি সুন্নাত, যা ছেড়ে দিলেও কি আযান বিশুদ্ধ

হবে? এ বিষয়ে দুটি কথা আছে। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এটা সুন্নাত। মুহাদ্দিসদের একটা দল ও আরো কিছু বিদ্বানের মত হচ্ছে তারজি আযান দেয়া ও না দেয়া দু'টিতেই স্বাধীনতা আছে। তবে সঠিক কথা হচ্ছে তারজি আযান প্রমাণিত। আল্লাহ ভালো জানেন।

আমি বলছি, তারজি আযান এটা সুন্নাহ। যদি কেউ বর্জন করে তাহলে আযান বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কখনো কখনো এটা দেয়া ও কখনো কখনো এটা ছেড়ে দেয়া উচিত।

শাইখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, যেহেতু তারজি আযান দেয়া ও না দেয়া দুটির কথাই হাদীসে এসেছে, সেহেতু কখনো কখনো তারজি আযান দেয়া ও কখনো কখনো তা ছেড়ে দেয়া উত্তম। মূলনীতি হচ্ছে কোনো ইবাদত বিভিন্নভাবে বর্ণিত হলে প্রত্যেকটার ওপর আমল করা উচিত। কখনো এটার ওপর আমল করবে কখনো ওইটার ওপর আমল করবে।

(মুফহিম, ২/৮, শারহে মুসলিম, ৩৭৯, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২২/৬৫, যাদুল মাআদ, ২/৩৮৯, ইবনু রজব, ৫/২০১, নাইলুল আওতার, ২/৩১৪, শারহুল মুমতি, ২/৫৬)

ইকামতের শব্দের সংখ্যা

প্রথম মত: ইকামতের শব্দ এগারটি। প্রত্যেকটাই একবার করে, তবে শুধু প্রথমে ও শেষে তাকবীর দুবার করে। আর 'কাদ কামাতিস সালাহ' দুইবার করে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

ইমাম খাত্তাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, অধিকাংশ বিদ্বানের মত ও যার ওপর আমল রয়েছে মক্কা, মদীনা, হিজাজ, শাম, ইয়ামান, মিশর ও পশ্চিমের ইসলামী দেশগুলোতে সেটা হচ্ছে ইকামত একবার করে বলতে হবে। তিনি আরো বলেন, অধিকাংশ বিদ্বানের মত হচ্ছে কাদ কামাতিস সালাহ দুবার বলবে।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর প্রসিদ্ধ মাযহাব হচ্ছে ইকামতের শব্দ হচ্ছে দশটি। তিনি কাদ কামাতিস সালাহ শব্দকে দুবার বলেননি। এটা ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহরও পুরাতন মত। এ বিষয়ে আমাদের একটা শায মত আছে আর তা হলো প্রথমে ও শেষে একবার করে আল্লাহু আকবার বলবে এবং একবার কাদ কামাতিস সালাহ বলবে। সুতরাং এই হিসেবে ইকামতের শব্দ হচ্ছে আটটি। সঠিক মত হচ্ছে প্রথমটি।

অধিকাংশ বিদ্বানের দলীল: লেখক আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস উল্লেখ করেছেন সেখানে ইকামতের শব্দ একবার করে বলা হয়েছে এবং আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে ইকামতের এগারটি শব্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে ও শেষে দুবার করে আল্লাহু আকবার বলবে এবং কাদ কামাতিস সালাহ দু'বার করে বলবে। এই হাদীসকে ইমাম আলবানী ও ওয়াদিয়ী হাসান বলেছেন। তারা ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস দিয়ে আরো দলীল দিয়েছেন, তিনি বলেন, রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আযানের শব্দ দুবার করে বলা হতো এবং ইকামতের শব্দ একবার করে বলা হতো, তবে কাদ কামাতিস সালাহ দুবার করে বলা হতো। (মুসনাদে আহমাদ, ২/৮৫, আবু দাউদ, হা/৫০৬, সহীহুল মুসনাদ, ৮৩১)।

ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীস ও পূর্বে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মতকে প্রত্যাখ্যান করে। তিনি কাদ কামাতিস সালাহকে দুবার বলতেন না অথচ হাদীসে দুবারের কথা আছে। লেখক আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, সেখানে ইকামতের শব্দ একবারের কথা এসেছে, তবে কাদ কামাতিস সালাহকে দু'বার করে বলতে হবে এসেছে। লেখক এই এসতিছনাকে উল্লেখ করেননি। কেননা কতিপয় বিদ্বান এই অংশকে মুদরাজ বলেছেন। কিন্তু ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে তাদের এ মতকে প্রত্যাখ্যাত প্রমাণ করে বলেন, হাদীসটি মুদরাজ নয়।

দ্বিতীয় মত: ইকামতের শব্দ হচ্ছে সতেরোটি। আযানের মতো প্রতিটি শব্দ দুবার করে বলবে এবং সাথে কাদ কামাতিস সালাহও দুবার করে বলবে। এটা হানাফি, ছাওরী, ইবনু মোবারক ও কুফাবাসীর মত। তাদের দলীল: আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাহ তাকে আযানের শব্দ উনিশটি ও ইকামতের শব্দ সতেরোটি শিখান। আবু দাউদ, হা/২৯৮, তিরমিযী, হা/১৯৩, ইবনু মাজাহ, হা/৭০৯, আহমাদ, ৩/৪০৯ । এ সকল মুহাদ্দিস প্রত্যেকেই আযান ও ইকামতের শব্দ উল্লেখ করেছেন, তবে ইমাম তিরমিযী বাদে। তিনি আযান ও ইকামতের কথা উল্লেখ করেননি। তাদের হাদীসের বাহ্যিক অবস্থা হাসান । কিন্তু প্রথম মতের বিদ্বানদের হাদীসের বিরোধী। এমনিভাবে মুসলিমে বর্ণিত আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে ইকামতের কথা উল্লেখ নেই। এই বিষয়টা এই হাদীসকে হাসান হওয়ার ব্যাপারে সংশয়ে ফেলে দেয়। তবে শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে আবু দাউদে ও তিরমিযীতে হাসান বলেন। তারা আরো দলীল দেন আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস দিয়ে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আযান ও ইকামতের শব্দ দুবার করে উল্লেখ করা হতো। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (১৯৪) ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেন। কিন্তু এর সনদ দুর্বল। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ তিরমিযীতে তা দুর্বল বলেছেন।

তৃতীয় মত: আযান ও ইকামতের শব্দ একবার করে ও দুবার করে উভয়টি বলা জায়েয আছে। এটা আহমাদ, ইসহাক, দাউদ যাহিরী, মুহাম্মদ ইবনু জারীর রহিমাহুল্লাহর মত। এটাকে ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু কাইয়্যিম ও শাওকানী রহিমাহুমুল্লাহ পছন্দ করেছেন। তাদের দলীল: আযান ও ইকামতের শব্দ হাদীসে একবার ও দুবার উভয় রকম করে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত আর তা হচ্ছে ইকামত একবার করে বলবে। কেননা এর দলীল অনেক ও বিশুদ্ধ। দ্বিতীয় মত যারা দিয়েছেন তাদের দলীল পূর্বে

বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসের বিরোধী। এমনিভাবে অধিকাংশ বিদ্বান তাদের হাদীসের অনেক জবাব দিয়েছেন। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো ইকামত একবার করে দেয়ার হাদীস বেশি শক্তিশালী। আরো জবাব হচ্ছে হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে এবং দুবার করে ইকামত বলা বিশুদ্ধ নয়।

(আওসাত, ৩/১৭, মুগনী, ১/৪০৬, শারহে মুসলিম, (৩৭৮) মাজমূ' ফাতাওয়া, ২২/৬৫, যাদুল মাআদ, ২/৩৮৯, নাইলুল আওতার, ২/৩২১)

আযানের শব্দ দুবার ও ইকামতের শব্দ একবার করে বলার হিকমাহ

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আযানের শব্দ দু'বার ও ইকামতের শব্দ একবার করে বলার হিকমাহ হচ্ছে আযান দেয়া হয় অনুপস্থিত ব্যক্তিদের জানানোর জন্য, তাই এটা বারবার বললে ঘোষণাটা ভালো হবে। আর ইকামত দেয়া হয় উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য, তাই এখানে বারবার বলার প্রয়োজন নেই। এজন্যই বিদ্বানরা বলেন, ইকামতের আওয়াজ আযানের আওয়াজের তুলনায় একটু নিচু স্বরে হবে। আর 'কাদ কামাতিস সালাহ' শব্দটা দুবার বলার কারণ হচ্ছে এটা ইকামতের উদ্দেশ্য। আল্লাহ ভালো জানেন।

একটা সমস্যা ও তার উত্তর

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি আপনি প্রশ্ন করেন অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট তো আযানের শব্দ হলো এগারোটি, এর মাঝে আযানের শুরুতে ও শেষে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার দুবার করে বলতে হয়?

উত্তরঃ এটা বাহ্যিকভাবে দুবার দেখা গেলেও আযানের তুলনায় একবার। এজন্যই আমাদের শাইখরা বলেন, মুয়াজ্জিনের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে দুই তাকবীরকে এক নিশ্বাসে দেয়া। আযানের শুরুতে এক নিশ্বাসে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলবে ও পরের নিশ্বাসে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলবে। আল্লাহ ভালো জানেন। (শারহে মুসলিম, (৩৭৮) ফাতহুল বারী, ২/৮৩)

দাঁড়িয়ে আযান দেয়ার বিধান

বুখারী ও মুসলিমে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে হাদীস এসেছে, সেখানে আছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "হে বেলাল! দাঁড়িয়ে আযান দাও"।

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা একমত যে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া সুন্নাহ, তবে কোনো কারণ থাকলে বসে আযান দেয়া জায়েয আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী আবু যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, আর তিনি জিহাদ করতে গিয়ে পায়ে আঘাত পান যার কারণে তিনি বসে আযান দিতেন। আমি বলছি, এই আসারটি শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ ইরওয়াউল গালীলে (২২৫) হাসান বলেছেন।

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, আতা ও আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুমা বলেন, কারণ ছাড়া বসে আযান দেয়া যাবে না। ইমাম মালেক, আওযায়ী ও আহলে রায়ের মত হচ্ছে বসে আযান দেয়া মাকরূহ। আবু ছাওর বলতেন কারণ থাক বা না থাক উভয় অবস্থায়ই বসে আযান দেয়া যাবে, তবে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, বসে বা শুয়ে অথবা কিবলা ব্যতীত অন্য দিকে ফিরে আযান দেয়া মাকরূহ, তবে আযান বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা আযানের উদ্দেশ্য হলো ঘোষণা করা আর তা হয়ে গেছে। তারপর তিনি বলেন, এটা অধিকাংশ শাফেয়ীদের মত।

(ইজমা, (৪১) আওসাত, ৩/৪৬, মুগনী, ১/৪২৩, মাজমু, ৩/১১৪)

কিবলামুখী হয়ে আযান দেয়া মুস্তাহাব

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা একমত আযান কিবলামুখী হয়ে দেয়া সুন্নাহ। ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, কিবলামুখী হয়ে আযান দেয়া মুস্তাহাব। এ বিষয়ে মতভেদ আছে কিনা আমার জানা নেই। তিনি বলেন, কিবলামুখী হয়ে যদি আযান না দেয় বা হেঁটে হেঁটে আযান দেয় তাহলে আযান বাতিল হবে না। কেননা আযান থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে খুতবা। অথচ অন্য দিকে ফিরে দিলে তা বাতিল হয় না।

(ইশরাফ, ৩/২৮, মুগনী, ১/৪২৬, মাজমু, ৩/১১৪, ইবনু রজব, ৫/৩৭৮)

সফরে আরোহী অবস্থায় আযান দেয়া

ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহর কাছে প্রমাণ আছে যে, তিনি উটের ওপর আযান দিতেন। তারপর নেমে ইকামত দিতেন। ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ অনেক বিদ্বানের নাম উল্লেখ করেন, যারা মনে করতেন আরোহী অবস্থায়ও আযান দিবে। তাদের মাঝে আছেন চার ইমাম। তারপর তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম আযান নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং আযান দিবে, চাই আরোহী অবস্থায় বা নেমে। আরোহী অবস্থায় মুয়াজ্জিন আযান দিতে পারবে না এমন কথা বিদ্বানদের থেকে আমি মুখস্ত করিনি। (আওসাত, ৩/৪৯)

বৃষ্টির দিনে বা তীব্র ঠান্ডা রাতে মুয়াজ্জিন বলবে, 'আস সালাতু ফির রিহাল'

এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে হাদীস আছে, তিনি বৃষ্টির দিনে মুয়াজ্জিনকে বলতেন, যখন তুমি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলবে, তখন হাইয়া আলাস সালাহ বলবে না। তুমি বলবে, 'সাললু ফি বো ইউতিকুম'। (তোমরা বাড়িতে সালাত পড়ো)

(বুখারী, হা/৬১৬, মুসলিম, হা/৬৯৯)

ছাকীফ গোত্রের অপরিচিত এক সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বৃষ্টির দিনে সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘোষককে ঘোষণা করতে শুনেন, 'হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, সাললু ফি রিহালিকুম'। (আল জামেউছ সহীহ, ২/৬৭)

ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি তীব্র ঠান্ডা, প্রবল বাতাস ও বৃষ্টি রজনীতে আযান দেন। আযানের শেষে তিনি বলেন, 'আলা সাললু ফির রিহাল'। তারপর তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুয়াজ্জিনকে আদেশ করেন তীব্র ঠান্ড ও বৃষ্টি রজনীতে বলতে, 'আলা সাললু ফি রিহালিকুম'। (বুখারী, হা/৬৬৬, মুসলিম, হা/৬৯৭)

٦٢. عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، قَالَ: فخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، يَقُولُ يَمِينًا وشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

৬২. আবূ জুহাইফা ওয়াহাব ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সুওয়াঈ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম এমতাবস্থায় তিনি চামড়ার তৈরি একটি লাল তাবুর ভিতরে ছিলেন। অতঃপর বিলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার ওযূর পানি নিয়ে বের হলেন। অতঃপর কেউ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওযূর অবশিষ্ট পানি পেল, আবার কেউ অন্যের নিকট হতে পানির ছিটা নিল। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল রঙের পোশাক পরে বের হলেন। আমি যেন এখনও তাঁর পায়ের গোছাদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। তিনি ওযূ করলেন এবং বিলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আযান দিলেন। আমি

দেখছিলাম তিনি حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ এবং حَيَّ عَلَى الفَلاحِ বলার সময় এদিকে ওদিকে অর্থাৎ ডানে ও বামে মুখ ফিরাচ্ছেন। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য (কিবলার দিকে) একটি বর্শা পুঁতে দেয়া হলো। তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং যুহরের দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। এরপর (সেই সফরে তিনি যতদিন ছিলেন) মদীনায় ফিরিয়ে না আসা পর্যন্ত দুই রাকআত করে সালাত আদায় করেছিলেন। [সহীহ বুখারী হা/১৮৭ ও মুসলিম হা/৫০৩]

আযানে ডানে-বামে মুখ ফিরানোর বিধান

প্রথম মতঃ হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় ডানে-বামে মুখ ফিরানো মুস্তাহাব, তবে একেবারে ঘুরানো যাবে না। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের মাঝে আছেন আবু হানিফা, ইসহাক ও আহমাদের একমত।

তাদের দলীলঃ আবু জুহাইফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, লেখক যা উল্লেখ করেছেন সেখানে আছে, 'আমি তার মুখকে ডানে-বামে ফিরিয়ে হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলতে দেখলাম'। হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় মুখকে একেবারে ঘুরানোর হাদীস প্রমাণিত নেই। এমনটিই ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় মতঃ ইবনু সিরীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, ডানে-বামে মুখ করা মাকরূহ। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুখ ঘুরাবে না ও অন্য দিকে তাকাবে না।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(মুগনী, ১/৪২৬, মাজমু, ৩/১১৬, ইবনু রজব, ৫/৩৭৮, ফাতহুল বারী, ২/১১৫)

হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় ডানে-বামে মুখ ঘুরাবে নাকি ঘাড় ঘুরাবে?

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, যারা বলেন, হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় ডানে-বামে ঘুরাবে তাদের অধিকাংশ বলেন, মুখ ঘুরাবে, ঘাড় ঘুরাবে না এবং পা সরাবে না। এটা ছাওরী, আওযায়ী, শাফেয়ী, আহমাদের প্রসিদ্ধ মত, আবু ছাওর, ইবনু মুনযির আবু হানিফা ও তার ছাত্রদের থেকে এই মত বর্ণনা করেন। তিনি এই মত আরো বর্ণনা করেন হাসান, নাখয়ী ও লাইছ ইবনু সাদ রহিমাহুমুল্লাহ থেকে।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের শাইখরা বলেন, হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় পা ও বুক কিবলা দিক থেকে সরবে না। শুধু মাথা ও ঘাড় ঘুরবে। আমি বলছি, আবু দাউদে (৫১৬) আবু জুহাইফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে যে হাদীস

এসেছে, 'তিনি তার ঘাড় ডানে-বামে ফিরান, কিন্তু ঘুরাননি'। এই হাদীসটি কায়েস ইবনু রাবীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর তিনি হলেন দুর্বল। সুতরাং এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে মুয়াজ্জিন ডানে-বামে ঘাড় ঘুরাবেন না, বরং মুখ ঘুরাবেন, যেমনটি অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন। আল্লাহ ভালো জানেন।

(শারহে মুসলিম, (৫০৩) ইবনু রজব, ৫/৩৭৯, ফাতহুল বারী, ২/১১৫)

হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় ডানে-বামে মুখ ফিরানোর পদ্ধতি

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ শারহে মুসলিমে (৫০৩) বলেন, বিদ্বানরা মুখ ফিরানোর ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ে আমাদের শাইখদের তিনটি মত আছে।

প্রথম মত: সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যা অধিকাংশ বিদ্বানরা বলেন, দুবার ডান দিকে হাইয়া আলাস সালাহ বলবে ও দুবার বাম দিকে হাইয়া আলাল ফালাহ বলবে।

দ্বিতীয় মত: ডান দিকে একবার হাইয়া আলাস সালাহ বলবে ও বাম দিকে একবার হাইয়া আলাস সালাহ বলবে। তারপর ডান দিকে একবার হাইয়া আলাল ফালাহ বলবে ও বাম দিকে একবার হাইয়া আলাল ফালাহ বলবে।

তৃতীয় মত: ডান দিকে হাইয়া আলাস সালাহ বলবে। তারপর কিবলা দিকে মুখ করবে। তারপর আবার ডান দিকে মুখ করে হাইয়া আলাস সালাহ বলবে। তারপর বাম দিকে মুখ করে হাইয়া আলাল ফালাহ বলবে। তারপর কিবলা দিকে মুখ করবে। তারপর আবার বাম দিকে মুখ করে হাইয়া আলাল ফালাহ বলবে।

আযানের সময় দুই কানে আঙ্গুল ঢুকানোর বিধান

প্রথম মত: দুই কানে আঙ্গুল ঢুকানো মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। আওযায়ী ও ইসহাক রহিমাহুমা বলেন, ইকামাতেও আঙ্গুল ঢুকানো মুস্তাহাব। তাদের দলীল: আবু জুহাইফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, আমি বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুকে আযান দিতে দেখেছি। তিনি তার মুখকে ডানে-বামে ঘুরাতেন আর তার আঙ্গুল তার কানের ভেতরে ছিল। হাদীসটি আহমাদ, তিরমিযী ও আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন। 'ইয়াদুরু' শব্দটা বাদে হাদীসটিকে শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ ইরওয়াউল গালীলে (২৩০) সহীহ বলেছেন। হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই শব্দটা মুদরাজ। আবু জুহাইফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস বুখারী ও মুসলিমে আছে, কিন্তু সেখানে 'তার আঙ্গুল তার কানের ভেতরে ছিল' এই কথাটা নেই।

দ্বিতীয় মত: আযান ও ইকামতের সময় চাইলে কানের ভেতর আঙ্গুল দিবে অথবা চাইলে না দিবে। এটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। কারণ এর হাদীস সহীহ। হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, কানে কোন আঙ্গুল রাখা মুস্তাহাব এ বিষয়ে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ দৃঢ়তার সাথে বলেন, কানে শাহাদাত আঙ্গুল রাখবে। আঙ্গুল দ্বারা আঙ্গুলের অগ্রভাগ উদ্দেশ্য।

(মুগনী, ১/৪২২, মাজমু, ৩/১১৭, ইবনু রজব, ৫/৩৮২, ফাতহুল বারী, ২/১১৫)

٦٣. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».

৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় বিলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাত থাকতেই আযান দেন, তখন তোমরা খাও। যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতুম আযান দেন। [সহীহ বুখারী হা/৬১৭, ৬২২, ৬২৩ ও মুসলিম হা/১০৯২]

সময় হওয়ার আগে সালাতের আযান দেয়ার বিধান কী?

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ ও অন্যরা ইজমা নকল করেন, চার ওয়াক্ত সালাতের জন্য সময় হওয়ার আগে আযান দেয়া জায়েয নেই। চার ওয়াক্ত হচ্ছে যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। ফজরের সালাতের ব্যাপারে মতভেদ আছে।

প্রথম মত: এককভাবে শুধু ফজরের সালাতের সময় হওয়ার আগে আযান দেয়া জায়েয আছে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানদের মত। তাদের মাঝে আছেন ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ ও তাদের ছাত্ররা। তারা বলেন, ফজরের দ্বিতীয় আযান না দিলে এই আযানই যথেষ্ট হয়ে যাবে। তাদের দলীল:

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নিশ্চয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বেলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সেহরি করতে বাধা না দেয়, কেননা সে রাতে আযান দেয় যেন যারা সারারাত সালাত পড়েছে তারা বাড়িতে যায় ও যারা ঘুমিয়ে ছিল তারা জাগ্রত হয়"। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, "নিশ্চয় বেলাল রাতে আযান দেয়"। এই হাদীসের উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে, বেলালের আযানের ওপর নির্ভর করবে না। হাদীসে আছে, "যতক্ষণ না ইবনু উম্মু মাকতুম আযান দেয়"।

দ্বিতীয় মতঃ কোনো সালাতের সময় হওয়ার আগে আযান দেয়া জায়েয নেই, এমনকি ফজরেরও না। এটা ছাওরী, আবু হানিফা, ইয়াকুব ও মুহাম্মদ রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। তাদের দলীলঃ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, "নিশ্চয় বেলাল ফজরের পূর্বে আযান দেয়"। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফিরে যেয়ে ঘোষণা করতে বলেন, "জেনে রাখো, বান্দারা ঘুমাচ্ছে"। হাদীসটি আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন। কিন্তু হাদীসে ত্রুটি আছে। হাদীসের ব্যাপারে অনেক বিদ্বান সমালোচনা করেন। ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাদের নাম ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেন। (ফাতুহুল বারী, ২/১০৩)

তৃতীয় মতঃ সময় হওয়ার আগে আযান দিলে সময় হওয়ার পর পুনরায় আযান দিতে হবে। ফজরের যেহেতু দুই আযান, সেহেতু সময় হওয়ার আগে আযান দিলে কোনো সমস্যা নেই। সময় হলে দ্বিতীয় আযান দিবে। এটা ইবনু মুনযির, ইবনু খুযাইমা ও ইমাম আহমাদের একমত রহিমাহুমুল্লাহ। ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা আহলে হাদীসের কিছু বিদ্বানের মত। এটাকে ইবনু হাযম, শাওকানী ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুমুল্লাহ পছন্দ করেছেন। তাদের দলীলঃ

লেখক ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেটা স্পষ্ট হাদীস। অনুরূপ হাদীস বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা ও মালেক ইবনু হুয়াইরিছ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আছে, "সালাতের সময় হলে তোমাদের কেউ যেন আযান দেয় ও তোমাদের মাঝে যে বড় সে যেন ইমামতি করে"। এই হাদীসটা আম (ব্যাপক অর্থবোধক) এখান থেকে কোনো কিছু খাস (নির্দিষ্ট) করা হয়নি। ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীসটা এই হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, "নিশ্চয় বেলাল রাতে আযান দেয়"। কেননা বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর আযান ফজরের জন্য ছিল না। তিনি আযান দিতেন ঘুমন্ত ব্যক্তিদের জাগ্রত করার জন্য ও যারা সারারাত সালাত পড়েছে তারা যেন বাড়ি ফিরে যায়। আমি বলছি, অনুরূপভাবে তারা অন্যান্য সালাতের সাথে কিয়াস করে দলীল দিয়েছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে তৃতীয় মত। কারণ পূর্বের দলীলের আলোকে এই মত থেকে অন্য দিকে ফিরা যাবে না। আল্লাহ ভালো জানেন।

(আওসাত, ৩/২৯, মুহাল্লা, ২/১৫৯, মুগনী, ১/৪০৯, মাজমু, ৩/৯৮, ইবনু রজব, ৫/৩৪০, ফাতহুল বারী, ২/১০৪, নাইলুল আওতার, ২/৩৩৯, শারহুল মুমতি, ২/৭৪)

ফজরের প্রথম আযান কখন দিবে?

প্রথম মত: রাতের অর্ধেক গত হলেই ফজরের আযান দেয়া জায়েয। কেননা এরপর ইশার সালাতের জায়েযী সময় সময় শেষ হয়ে যায়। এটা শাফেয়ী ও হাম্বলীদের প্রসিদ্ধ মাযহাব ও মালেকি মাযহাবের ইবনু হাবীবের মত। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। তাদের দলীল: লেখক ইনবু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, "নিশ্চয় বেলাল রাতে আযান দেয়"। হাদীস থেকে প্রমাণ হচ্ছে এখানে সাধারণভাবে রাতের কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: সেহরির সময় ফজর উদয় হওয়ার আগে আযান দিবে। এটা শাফেয়ী মাযহাবের এক মত ও মালেকি মাযহাবের ইবনু ওয়াহাবের মত। এই মতকে ইবনু হাযম ও শাওকানী রহিমাহুমা পছন্দ করেছেন। তাদের দলীল:

লেখক ইনবু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ হাদীস আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের শেষে আছে, তিনি বলেন, 'দুই আযানের মাঝে শুধু এতটুকু ব্যবধান ছিল যে, একজন নেমেছেন ও আরেকজন উঠেছেন'। (বুখারী, হা/১৯১৮, মুসলিম, হা/১০৯২)

শেষের শব্দের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, এটা বর্ণনাকারী কাসেম ইবনু মুহাম্মদ আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এটাকেই প্রাধান্য দেন যে, এই শেষের কথাটা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার। এরপর তিনি বলেন, "নিশ্চয় বেলাল রাতে আযান দেয়" এই মুতলাক হাদীসের তাকিদ করেছে শেষের কথা।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। এই মাসআলায় ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহর অনেক সুন্দর কথা আছে।

(মুহাল্লা ২/১৬১, মুগনী, ১/৪১১, মাজমু, ৩/৯৬, ইবনু রজব, ৫/৩৩৯, ফাতহুল বারী, ২/১০৫, নাইলুল আওতার, ২/৩৪০)

ফজরের প্রথম আযানে কি তাসবীব (আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম) নাকি দ্বিতীয় আযানে?

শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ তামামুল মিন্নাতে (১৪৬) বলেন, তাসবীব হবে ফজরের প্রথম আযানে, যা ফজরের সময় হওয়ার প্রায় পনেরো মিনিট পূর্বে দেয়া হয়। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হাইয়া আলাল ফালাহ এরপর প্রথম আযানে 'আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' দুবার বলা হতো। হাদীসটি বাইহাকী (১/৪২৩) ও তাহাবী শারহুল মায়ানীতে (১/৮২) বর্ণনা করেন। এর সনদ হাসান, যেমনটি ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন। আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস

মুতলাক, যা ফজরের দুই আযানকেই অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ দ্বিতীয় আযান উদ্দেশ্য নয়। কেননা অন্য বর্ণনায় হাদীসটি নির্দিষ্ট করে এভাবে এসেছে, "ফজরের প্রথম আযান দিলে এরপর বলবে, আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম, আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম'।" হাদীসটি আবু দাউদ, নাসাঈ, তাহাবী ও অন্যরা বর্ণনা করেন। আবু দাউদে (৫১০-৫১৬) আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসটি এসেছে। আর তা ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের সাথে মিলে গেছে। এজন্যই সানআনী সুবুলুস সালামে (১/১৬৭-১৬৮) নাসাঈর শব্দের পর বলেন, এই হাদীসটা কায়েদ (নির্দিষ্ট) করেছে অন্যান্য মুতলাক হাদীসকে। ইবনু রাসলান বলেন, এই বর্ণনাকে ইবনু খুযাইমা রহিমাহুল্লাহ বিশুদ্ধ বলেছেন। তিনি বলেন, সুতরাং ফজরের প্রথম আযানে তাসবীব শরীআতসম্মত। কেননা এটা দেয়া হয় ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করার জন্য। আর দ্বিতীয় আযান দেয়া হয় ফজরের সময় হয়েছে এ কথা বুঝানোর জন্য ও সালাতে আসার জন্য। অনুরূপ হাদীস বাইহাকী কুবরাতে আছে, সেখানে বলা হয়েছে আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে ফজরের প্রথম আযানে তাসবীব দিতেন।

আমি (আলবানী) বলছি, সুতরাং 'আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' এটা ফজরের সময় হওয়ার পর মানুষকে ডাকার জন্য যে আযান দেয়া হয় ওই আযানে হবে না, বরং এটা ফজরের প্রথম আযানে দিতে হবে ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে জাগ্রত করার জন্য। আমি (আলবানী) বলছি, এই মাসআলা নিয়ে এতা বেশি কথা না থাকার প্রথম কারণ হচ্ছে অধিকাংশ মুসলিম দেশের মুয়াজ্জিনরা সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করে না। দ্বিতীয়ত যারা কিতাবাদি লেখেছেন তারা এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে খুব কমই কথা বলেছেন। কেননা তাদের অধিকাংশই (তাদের মাঝে আছেন সাইদ সাবেক) এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত করে আলোচনা করেছেন। হাদীসে যেভাবে স্পষ্ট করে এসেছে যে তাসবীব ফজরের প্রথম আযানে হবে তারা এমন স্পষ্ট করে বর্ণনা করেননি। তবে ইবনু রাসলান ও সানআনী স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম বদলা দান করুন। সুতরাং পূর্বের আলোচনার আলোকে কথা হচ্ছে ফজরের দ্বিতীয় আযানে তাসবীব দেয়া বিদআত, সুন্নাহ পরিপন্থি। এ বিষয়টা আরো মারাত্মক পর্যায়ে চলে যায় ফজরের প্রথম আযানে তাসবীব না দিয়ে দ্বিতীয় আযানে তাসবীব দেয়ার ক্ষেত্রে লেগে থাকা। তারা আল্লাহ তাআলার এই আয়াতের ব্যাপারে কী বলবেন, "তোমরা কি ভালোটার পরিবর্তে মন্দটা গ্রহণ করছো? (সূরা আল বাকারা, ২:৬১)

ফায়েদাঃ পূর্বে বর্ণিত ইবনু উমার ও আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার স্পষ্ট হাদীসের আলোকে ইমাম তাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সুতরাং ফজরের প্রথম আযানে তাসবীব হবে। আর এটাই আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত।

আমি বলছি, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ যে কথা বলেছেন তাসবীব ফজরের প্রথম আযানে হবে এ কথা আমাদের শাইখ মুকবিল রহিমাহুল্লাহও বলেছেন। তবে শাইখ বিন বায ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুমা বলেন, ফজরের দ্বিতীয় আযানে তাসবীব হবে। আমি মনে করি আলবানী রহিমাহুল্লাহর মত সঠিক। আল্লাহ ভালো জানেন।

তাসবীব (আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম) এর বিধান কী ও এটা কখন বলা হবে?

প্রথম মত: ফজরের আযানে হাইয়া আলাল ফালাহ বলার পর 'আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' দুবার বলা মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: পূর্বে বর্ণিত ইবনু উমার ও আবু মাহযুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীস।

দ্বিতীয় মত: তাসবীব মাকরূহ। এটা আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ ও ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর নতুন মত। ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন, ফজরের আযান ও ইকামতের মাঝে দুবার হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ এটাই তাসবীব।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে প্রথম মত। অর্থাৎ অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

(মুগনী, ১/৪০৭, মাজমু, ৩/১০১, নাইলুল আওতার, ২/৩১৬)

অন্ধ ব্যক্তির আযান দেয়ার বিধান

প্রতম মত: আযানের সময় কেউ যদি বলে দেয় তাহলে অন্ধ ব্যক্তির আযান দেয়া মাকরূহ নয়। চাই যে তাকে বলে দিচ্ছে সে তার সাথে মুয়াজ্জিন হোক যেমন: বেলাল ও উম্মু মাকতুম রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা ছিলেন চাই যে তাকে বলে দিচ্ছে সে সময় বলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হোক। এটা অধিকাংশ বিদ্বানদের মত। তাদের মাঝে আছেন নাখয়ী, ছাওরী, মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক ও আবু ছাওর রহিমাহুমুল্লাহ। তাদের দলীল: ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, লেখক যা উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় মত: অন্ধ ব্যক্তির আযান দেয়া মাকরূহ। এটা ইবনু মাসউদ, ইবনু যুবায়ের ও ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম তাদের মত। এমনিভাবে এটা হাসান, দাউদ যাহিরী, আবু হানিফা ও তার ছাত্রদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। কারণ এ বিষয়ে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে স্পষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে, লেখক যা উল্লেখ করেছেন।

(ইশরাফ, ৩/৪২, ইবনু রজব, ৫/৩০৯, ফাতহুল বারী, ২/৯৯)

ছোট বাচ্চার আযান দেয়ার বিধান

বাচ্চা যদি এমন ছোট হয়, যে ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না তাহলে সকলের নিকট তার আযান বিশুদ্ধ হবে না। কারণ সে ইবাদত পালনের উপযুক্ত নয়। আর যদি ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে তাহলে তার আযানের ব্যাপারে মতভেদ আছে।

প্রথম মত: তার আযান বিশুদ্ধ হবে ও এটাকে আযান হিসেবে গণ্য করা হবে। এটা আতা, শাবী, ইবনু আবী লাইলা, শাফেয়ী, আবু ছাওর ও ইমাম আহমাদের একটি মত। ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, বালেগ হওয়ার আগে আযান দেয়া আমি পছন্দ করি না। যদি বালেগ হওয়ার আগে আযান দেয় তাহলে আযান যথেষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, বালেগের কাছাকাছি বয়সে থাকলে আযান দিবে।

ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, সাত বছর অতিক্রম করলে আযান দিতে পারবে। তাদের দলীল: তার সালাত যেহেতু পড়লে বিশুদ্ধ হয় অনুরূপ বালেগ মানুষের মত সে আযান দিলেও বিশুদ্ধ হবে।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনু আবী বকর ইবনু আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার চাচারা আমাকে আযান দিতে বলতেন। আর ওই সময় আমি নাবালেগ ছিলাম। আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু তা প্রত্যক্ষ করেও কিছু বলেননি। এই বিষযটা যেহেতু স্পষ্ট ছিল ও কেউ বাধা দেয়নি, সুতরাং এটা ইজমার মতই।

দ্বিতীয় মত: তার আযান বিশুদ্ধ হবে না ও এটাকে গণ্যও করা হবে না। এটা আবু হানিফা, দাউদ ও ইমাম আহমাদের একমত। তারা বলেন, আযান হলো ঘোষণা করার নাম। আর তার ঘোষণা বিশুদ্ধ নয়। কেননা তার খবর ও বর্ণনা গ্রহণ করা হয় না।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে এমন বাচ্চার আযান বিশুদ্ধ ও তা আযান হিসেবে গণ্য করা হবে যখন সে আযানের শব্দ ভালো করে উচ্চারণ করতে পারবে ও সে আযানের সময় নিজ থেকেই সংরক্ষণ করতে পারবে বা কেউ তাকে বলে দিবে। আমরা বলছি, তার আযান বিশুদ্ধ হবে। কারণ তার ইমামতি বিশুদ্ধ আছে। আমর ইবনু আবী সালামা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বুখারীতে (৪৩০২) হাদীস এসেছে, তিনি বলেন, আমার বাবা বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলেন, "সালাতের সময় হলে তোমাদের কেউ যেন আযান দেয় ও তোমাদের মাঝে যার বেশি কুরআন মুখস্ত আছে সে যেন ইমামতি করে"। তারপর তারা দেখলো আমার থেকে বেশি কারো কুরআন মুখস্ত নেই। পরে আমাকেই সামনে বাড়িয়ে দিল। ওই সময় আমার বয়স ছয় কিংবা সাত ছিল।

(ইশরাফ, ৩/৪০, মুগনী, ১/৪১৩, মাজমু, ৩/১০৮, মুগনীউল মুহতাজ, ১/২৩৪)

শুধুমাত্র জ্ঞানসম্পন্ন, মুসলিম পুরুষ আযান দিলে তা বিশুদ্ধ হবে

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, শুধুমাত্র আযান বিশুদ্ধ হবে জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম পুরুষ আযান দিলে। কাফের ও পাগল আযান দিলে বিশুদ্ধ হবে না। কেননা তারা ইবাদতের উপযুক্ত নয়। নারীর আযান গণ্য করা হবে না। কেননা আযান তাদের জন্য শরীআতসম্মত

নয়। এই হিসেবে সে পাগলের মত। হিজড়ার আযানও গণ্য করা হবে না। কেননা সে পুরুষ কিনা এটা জানা যাচ্ছে না। এগুলো শাফেয়ী মাযহাবের মত। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত আছে কিনা আমাদের জানা নেই।

আমি বলছি, মুতাওয়াল্লী শাফেয়ীদের থেকে একটা দুর্বল মত নিয়ে এসেছে তা হচ্ছে নারীর আযান বিশুদ্ধ, যেমন তার খবর বিশুদ্ধ।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। এ বিষয়ে মতভেদ করা উচিত নয়।

(মুগনী, ১/৪১৩, মাজমু, ৩/১০৬-১০৮)

যার ওযূ নেই তার আযান দেয়ার বিধান কী?

যার ওযূ নেই তার আযান দেয়া বিশুদ্ধ, এ বিষয়ে বিদ্বানদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। তাদের মাঝে মতভেদ হলো তার আযান মাকরূহ কি মাকরূহ নয়?

প্রথম মত: তার আযান দেয়া মাকরূহ। এটা আতা, মুজাহিদ, আওযায়ী, মালেকী মাযহাব, শাফেয়ী মাযহাব ও কতিপয় হাম্বলীদের মত। তাদের দলীল: মুহাজির ইবনু কুনফুজ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তিনি পেশাব করা অবস্থায় এসে সালাম দেয়। তিনি ওযূ করে তার সালামের উত্তর দেন। তারপর তিনি তার কাছে ওজর উল্লেখ করে বলেন, "আমি ওযূ ছাড়া আল্লাহর নাম নিতে অপছন্দ করি"। (আবু দাউদ, হা/১৭, নাসাঈ, ৩৮, ইবনু মাজাহ, ৩৫০, সহীহুল মুসনাদ, হা/১১৪৫)

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "ওযূ ছাড়া কেউ আযান দিবে না"। হাদীসটি তিরমিযী মারফু ও মাওকুফ বর্ণনা করেন। তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে এটা মাওকুফ, তথাপি এর সনদ বিচ্ছিন্ন। হাদীসটি ইমাম যুহরী আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করেন। আর তিনি আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। (ইরওয়াউল গালীল, ২২২)

দ্বিতীয় মত: তার আযান দেয়া মাকরূহ নয়। এটা হাসান, নাখয়ী, কাতাদা, হাম্মাদ ইবনু আবী সোলাইমান, ছাওরী, ইবনু মোবারক, মালেক রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। এমনিভাবে এটা হাম্বলী ও হানাফিদের প্রাধান্যযোগ্য মত। তাদের দলীল: আযান হলো একটা যিকির। আর যিকির ওযূ ছাড়া করা জায়েয আছে। এমনিভাবে মুসলিমে (৩৭৩) আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করতেন।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

আর মুহাজির ইবনু কুনফুজ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের বিষয়ে কথা হচ্ছে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেশাব করা অবস্থায় সালাম দেন। আর অধিকাংশ

বিদ্বানের নিকট পেশাব করা অবস্থায় সালামের উত্তর দেয়া মাকরূহ। এ বিষয়ে তাহারাত অধ্যায়ে আলোচনা গত হয়েছে।

গোসল ফরয এমন ব্যক্তির আযান দেয়ার বিধান কী?

প্রথম মত: গোসল ফরয এমন ব্যক্তির আযান দেয়া মাকরূহ। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

দ্বিতীয় মত: তার আযান গণ্য করা হবে না। যদি আযান দেয় তাহলে পুনরায় আযান দিতে হবে। এটা ইমাম ইসহাকের মত ও ইমাম আহমাদের একটি মত।

তৃতীয় মত: সুফিয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, অপবিত্র ব্যক্তি (জুনুবী-যার গোসল ফরয হয়েছে) আযান দিলে কোনো সমস্যা নেই। আর এটাই হলো সঠিক কথা। কেননা এমন কোনো দলীল নেই যে, আযান দেয়ার জন্য পবিত্রতা শর্ত এবং পবিত্রতা ছাড়া আযান দিলে মাকরূহ হবে।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সুবহানাল্লাহ, নিশ্চয় মুমিন অপবিত্র হয় না।" নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহাকে বলেন, "হাজীরা যা করে তুমিও তাই করো, তবে পবিত্র না হয়ে তুমি তাওয়াফ করবে না।" আর এ কথা সবার জানা যে, হাজী আল্লাহর যিকির করে। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করতেন।

(আওসাত, ৩/৩৭, ইজমা, ৩১, বায়ান, ২/৭১, মুগনী, ১/৪১৩, মাজমু, ৩/১১৩, আহকামুল আযান, ১৯০)

٦٤. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْل مَا يَقُولُ ".

৬৪. আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা মুয়াযি্যনকে আযান বলতে শুনবে তখন তোমরাও অনুরূপ বলো। [সহীহ বুখারী হা/৬১১ ও মুসলিম হা/৩৮৩]

মুয়াজ্জিনের অনুসরণের বিধান

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুয়াজ্জিনের অনুসরণ করা মুস্তাহাব, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত আছে কিনা আমি জানি না। ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট মুয়াজ্জিনের আযানের উত্তর দেয়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। হাসান বাসরী রহিমাহুল্লাহ অনেক সময় কথা বলা অবস্থায় মুয়াজ্জিনের আযান শুনতেন, কিন্তু তিনি কথা বন্ধও করতেন না এবং আযানের উত্তরও দিতেন না। অনুরূপভাবে ইসহাক রহিমাহুল্লাহও এমন করতেন। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আযানের উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয়। ইমাম তাহাবী রহিমাহুল্লাহ কতিপয় বিদ্বান থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা আযানের উত্তর দেয়াকে ওয়াজিব মনে করতেন। আসল কথা হচ্ছে এটা কতিপয় যাহিরীদের মত ও কতিপয় হানাফিদের মত। আমি বলছি, ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ দৃঢ়তার সাথে বলেন, হানাফিরা, যাহিরীরা ও ইবনু ওয়াহাব আযানের উত্তর দেয়াকে ওয়াজিব মনে করে।

সঠিক মতঃ সঠিক মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত আর তা হচ্ছে মুস্তাহাব। আল্লাহ ভালো জানেন।

(মুগনী, ১/৪২৬, ইবনু রজব, ৫/২৫০, ফাতহুল বারী, ২/৯৩)

মুয়াজ্জিন যা বলে তাই বলবে, এমনকি দুই হাইয়া আলাহও?

প্রথম মতঃ মুয়াজ্জিন আযানে যা বলে হুবহু তাই বলবে। আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের বাহ্যিক অবস্থা থেকে তাই বুঝা যায়। এই মত নাখয়ী ও ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মতঃ মুয়াজ্জিন যা বলে তাই বলবে, তবে হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় 'লা হাওলা ওয়ালা কুও ওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ' বলবে। এই মত হাসান বাসরী, আহমাদ, শাফেয়ী প্রমুখ বিদ্বান রহিমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় মতঃ স্বাধীনতা আছে।

চতুর্থ মতঃ মুয়াজ্জিন যা বলে তা-ও বলবে এবং 'লা হাওলা ওয়ালা কুও ওয়াতা ইল্লাবিল্লাহও বলবে। ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা আমাদের কতিপয় শাইখের মত। তবে এই মত দুর্বল। কেননা এভাবে বলার বিষয়ে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। আর তা হচ্ছে মুয়াজ্জিন যা বলে তাই বলবে, তবে শুধু হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় 'লা হাওলা ওয়ালা কুও ওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ' বলবে। কেননা মুসলিমে (৩৮৫) বর্ণিত উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় 'লা হাওলা

ওয়ালা কুও ওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ’ বলতে বলা হয়েছে। আর এই হাদীস আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর আম (ব্যাপক) হাদীসকে খাস করেছে। আল্লাহ ভালো জানেন।

(মুগনী, ১/৪২৬, মাজমু, ৩/১২৩, ইবনু রজব, ৫/২৫১)

মুয়াজ্জিন যা বলে তা কেউ শুনলে তার অনুসরণ করে অনুরূপ বলা মুস্তাহাব, চাই পবিত্র অবস্থায় থাক বা অপবিত্র অবস্থায় থাক

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের শাইখরা বলেন, মুয়াজ্জিন যা বলে তা কেউ শুনলে তার অনুসরণ করে অনুরূপ বলা মুস্তাহাব, চাই পবিত্র অবস্থায় থাক বা অপবিত্র অবস্থায় থাক, হায়েয অবস্থায় থাক, ছোট নাপাকি হোক বা বড় নাপাকি। কেননা তা হলো যিকির। আর এরা সবাই যিকির করার উপযুক্ত। তবে সালাতে রত ব্যক্তি, যে ব্যক্তি পায়খানায় আছে ও সহবাস করছে তারা আযানের উত্তর দিবে না। পায়খানা থেকে বের হয়ে ও সহবাসের পরে উত্তর দিবে। এ কথাটা হাউই এর লেখক ও অন্যরা স্পষ্ট করেন। সুতরাং কেউ কুরআন পড়া অবস্থায় বা যিকির করা অবস্থায় বা জ্ঞান চর্চায় থাকলে মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পেলে এগুলো বাদ দিয়ে মুয়াজ্জিনের অনুসরণ করবে। তারপর চাইলে যা করছিল তা করবে। আর যদি ফরয বা নফল সালাতে থাকে তাহলে ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ ও তার ছাত্ররা বলেন, মুয়াজ্জিনের আযানের অনুসরণ করবে না। সালাত শেষ করে উত্তর দিবে।

(মাজমু, ৩/১২৫, ইবনু রজব, ৫/২৫৫, ফাতহুল বারী, ২/৯২)

মুয়াজ্জিনের অনুসরণের পদ্ধতি

নববী রহিমাহুল্লাহ শারহে মুসলিমে (৩৮৩) বলেন, মুয়াজ্জিনের প্রত্যেকটা বাক্য বলার পর শ্রোতার জন্য অনুরূপ বলা মুস্তাহাব। সম্পূর্ণ আযান শেষ করার অপেক্ষা করবে না। অনুরূপভাবে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলার পর রাদিতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়া বি মুহাম্মাদিন রাসূলান ওয়া বিল ইসলামি দীনান বলা মুস্তাহাব।

আমি বলছি, মুসলিমে (৩৮৬) সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস এসেছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিন থেকে আযান শুনে এই দুআ পড়বে, ‘আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু রাদিতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়া বি মুহাম্মাদিন রাসূলান ওয়া বিল ইসলামি দীনান’ তার অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে”।

মুয়াজ্জিনের অনুসরণ না করে কেউ অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে পরে যা ছুটে গেছে তা কি ধরতে পারবে?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ মাজমুতে (৩/১২৭) বলেন, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আযানের বাক্য শুনে তার অনুসরণ করেনি এমনকি মুয়াজ্জিন আযান শেষ করে ফেলেছে এ বিষয়ে আমি আমার শাইখদের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে দেখিনি। তবে সঠিক কথা হচ্ছে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত না হলে অনুসরণ করবে। আর যদি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে অনুসরণ করবে না।

ইমামুল হারামাইন বলেন, সালাত অবস্থায় আযান শুনতে পেলে অনুসরণ করবে না। তার উচিত সালাতের যে যিকির আছে তা পড়া। যদি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে তার অনুসরণের প্রয়োজন নেই। কেননা সে ওই সময় সিজদায়ে সাহু বর্জনকারীর মত।

দুই মুয়াজ্জিন আযান দিলে কারটা অনুসরণ করবে?

হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে (২/৯২) বলেন, এক মুয়াজ্জিনের পর আরেক মুয়াজ্জিন আযান দিলে প্রথম মুয়াজ্জিনের আযানের উত্তর দেয়ার পর পরের মুয়াজ্জিনের আযানের উত্তর দিতে হবে কিনা?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ বিষয়ে আমি আমার শাইখদের থেকে কোনো কিছু শ্রবণ করিনি। ইবনু আব্দিস সালাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, কারণ পাওয়া যাওয়ার কারণে প্রত্যেকটারই উত্তর দিতে হবে। প্রথম আযানের উত্তর দেয়া উত্তম, তবে ফজর ও জুমআ বাদে, কেননা এখানে দুই আযানই সমান। কারণ দু'টিই শরীআতসম্মত।

আমি বলছি, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে জুমআর এক আযান ছিল। এমনিভাবে আবু বকর ও উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার যুগেও এক আযান প্রচলিত ছিল। উসমান রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু খলীফা হয়ে দুটি আযানের প্রচলন ঘটিয়েছেন। আলী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু এসে পুনরায় আবার এক আযানের প্রচলন ঘটান। সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে কথা হচ্ছে জুমআর প্রথম আযান শরীআতসম্মত নয়। উত্তম পথ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ অনুসরণ করা। আল্লাহ ভালো জানেন।

١١-بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

অধ্যায়: ১১-সালাতে কিবলাকে সামনে করা

٦٥. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ».

وَلِمُسْلِمٍ: «غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ». وَلِلْبُخَارِيِّ: «إِلَّا الْفَرَائِضَ»

৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তিনি তার বাহনের ওপর থাকতেন তখন নফল ও সুন্নাত সালাতগুলো বাহনের ওপর আদায় করতেন। তাঁর চিহারা যে দিকেই ফিরে যাক, তিনি শুধু মাথা দিয়ে ইশারা করতেন। আর ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এমনটি করতেন। [সহীহ বুখারী হা/১১০৫ ও মুসলিম হা/৭০০]

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি উটের ওপর থাকা অবস্থায় বিতর সালাতও আদায় করতেন। [সহীহ বুখারী হা/৯৯৯ ও মুসলিম হা/৭০০, নাসাঈ ৩/২৩২, ইবনে মাজাহ হা/১২০০]

আর সহীহ মুসলিমে রয়েছে, তবে তিনি বাহনের ওপর ফরয সালাত ব্যতীত অন্যান্য সালাত আদায় করতেন। [সহীহ বুখারী হা/১০৯৭ ও মুসলিম হা/৭০০] আর বুখারীতে রয়েছে " إِلَّا الْفَرَائِضَ " অর্থাৎ ফরয ব্যতীত। [সহীহ বুখারী হা/১০০০]

বাহনের ওপর ফরয সালাত পড়া জায়েয নেই

এটা প্রমাণ করার জন্য লেখক যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেটাই যথেষ্ট, “তবে তিনি ফরয সালাত বাহনের ওপর পড়তেন না”। অন্য শব্দে আছে, ‘মাকতুবার’ পরিবর্তে ‘ফরয’ শব্দ। এর ওপরই ইজমা প্রতিষ্ঠিত। ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ বিষয়ের ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত যে, কারো জন্য বাহনের ওপর কোনো ফরয সালাত পড়া জায়েয নেই। তবে যদি ভীষণ শত্রুর ভয় থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সকল বিদ্বান একমত কোনো সুস্থ ব্যক্তির জন্য জমিন ছাড়া ফরয সালাত বাহনে পড়া জায়েয নেই। তবে যদি ভীষণ শত্রুর ভয় থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, ফরয সালাত কিবলার দিক ব্যতীত অন্য কোনো দিকে পড়া জায়েয

নেই। অনুরূপ বাহনের ওপর পড়াও জায়েয নেই। এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত। তবে যদি ভীষণ শত্রুর ভয় থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

(ইস্তিযকার, ৫/২৭২, জামেউল আহকামুল ফিকহিয়া, ১/১৭০, শারহে মুসলিম, ৭০০, ইলাম, ২/৪৭৮, ফাতহুল বারী, ২/৫৭৯, তাওযীহ, ২/২০)

মুসাফিরের জন্য বাহনের ওপর নফল সালাত পড়া জায়েয আছে

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, সকল বিদ্বান এ বিষয়ে একমত যে, কোনো ব্যক্তি কসর করার দূরত্ব পর্যন্ত সফর করলে তার জন্য বাহনের ওপর নফল সালাত পড়া জায়েয আছে। তার বাহন যে দিকে যাক কোনো সমস্যা নেই। সে ইশারা করে সালাত পড়বে। সিজদায় রুকুর তুলনায় একটু মাথা বেশি ঝুঁকাবে, তাশাহুদ পড়ে বসাবস্থায়ই বাহনের ওপর সালাম ফিরাবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে বাহনের ওপর নফল সালাত পড়েছেন আর তার বাহন যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে যাচ্ছিল। এ বিষয় জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত। আমি বলছি, অনেক বিদ্বান বিষয়টাতে ইজমা আছে বলে দাবি করেছেন। ইজমার দলীল হলো লেখক ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস নিয়ে এসেছেন তা।

(তিরমিযী, হা/৩৫১, তামহীদ, (১৭-৭২) মুগনী, ১/৪৩৪, শারহে মুসলিম, ৭০০, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২১/২৮৫)

যে সফরে বাহনের ওপর নফল সালাত পড়া জায়েয আছে সে সফরটা কতটুকু পরিমাণ?

প্রথম মত: প্রত্যেক সফরে শহরের বাহিরে বাহনের ওপর নফল সালাত পড়া জায়েয আছে। চাই সফরটা কসর করার সমপরিমাণ হোক বা না হোক। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। এ বিষয়ে তারা দলীল হিসেবে অনেক হাদীস নিয়ে এসেছেন তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো লেখক ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে যে হাদীসটা বর্ণনা করেছেন সেটা। এমনিভাবে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস সামনে (৭২) আসছে। তারা বলেন, সেই হাদীসে সফরের দূরত্ব ও সীমা বর্ণনা করা হয়নি। সুতরাং আম (ব্যাপক) হাদীসের ওপরই আমল করতে হবে।

দ্বিতীয় মত: কসর সমপরিমাণ সফর করতে হবে তাহলে বাহনের ওপর নফল সালাত পড়া জায়েয হবে। এটা ইমাম মালেক, তার ছাত্র ও সুফিয়ান ছাওরীর মত। তাদের দলীল: যে সফরে নফল সালাত বাহনের ওপর পড়া জায়েয আছে বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, ওই সফরটা ছিল কসর করার সমপরিমাণ দূরত্বে।

তৃতীয় মত: বাড়িতে থাকলেও বাহনের ওপর নফল সালাত পড়া জায়েয আছে। এটা আবু ইউসুফ, ইস্তিখারী, তাবারী ও ইবনু হাযম রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। এটা আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আর এই মতকেই ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ প্রাধান্য দিয়েছেন। আর বাড়িতে থাকাবস্থায়ও বাহনের ওপর নফল সালাত পড়া জায়েয আছে এ মর্মে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, সফরে বাহনের ওপর সালাত পড়ার হাদীস আমরা শুনেছি, কিন্তু বাড়িতে থাকাবস্থায় পড়ার হাদীস শুনিনি। আল্লাহ ভালো জানেন।

(ইস্তিযকার, ৬/১২৭, মুহাল্লা, ২/১০০, মুগনী, ১/৪৩৪, তাফসীরে কুরতুবী, ২/৭১, মুফহিম, ২/৩৪০, শারহে মুসলিম, ৭০০, মাজমু, ৩/২১৪, ফাতহুল বারী, ২/৫৭৫)

নফল সালাত বাহনের ওপর পড়লে প্রথমে কি কিবলামুখী হয়ে সালাত শুরু করতে হবে?

প্রথম মত: সম্ভব হলে প্রথমে কিবলামুখী হয়ে সালাত শুরু করা আবশ্যক। এটা হলো ইমাম শাফেয়ী, আবু ছাওর ও ইমাম আহমাদের একমত। তাদের দলীল: আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে নফল সালাত পড়ার ইচ্ছা করলে তার উটকে কিবলামুখী করে তাকবীর দিতেন। তারপর তার বাহন যে দিকে যেত সেদিকে ফিরে তিনি সালাত পড়তেন। (আবু দাউদ, হা/১২২৫ হাসান সনদ, সহীহুল মুসনাদ, হা/৬৭)

দ্বিতীয় মত: কিবলামুখী হয়ে সালাত শুরু করা আবশ্যক নয়। এটা ইমাম মালেক, তার ছাত্রদের ও আহমাদের একমত। তাদের দলীল: লেখক এই অধ্যায়ে ইবনু উমার ও আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা ও অন্যান্য হাদীস। তারা বলেন, যেহেতু তার জন্য পুরা সালাতই কিবলা ব্যতীত অন্য দিকে ফিরে সালাত পড়া বৈধ, সেহেতু সালাতের শুরুতেও কিবলা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করে সালাত শুরু করা বৈধ।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। আর তা হচ্ছে প্রথমে কিবলামুখী হয়ে সালাত শুরু করা আবশ্যক নয়। আর প্রথম মতে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে প্রথমে কিবলামুখী হয়ে সালাত শুরু করা উত্তম বা মুস্তাহাব।

(ইস্তিযকার, ৬/১২৬, বায়ান, ২/১৫৩, মুফহিম, ২/৩৪০, মুগনী, ১/৪৩৬, মাজমু, ৩/২১৩)

সফরে হেঁটে হেঁটে নফল সালাত পড়া কি জায়েয আছে?

প্রথম মত: যে ব্যক্তি হেঁটে হেঁটে সফর করছে তার জন্য হেঁটে সালাত পড়া বৈধ আছে। সালাতের শুরুতে কিবলামুখী হয়ে সালাত শুরু করবে। তারপর যেদিকে চলছে ওই দিকে মুখ করে সালাত পড়বে। হাঁটাবস্থায়ই কিরাত পড়বে ও রুকু করবে তারপর জমিনে সিজদা করবে। এটা আতা, আওযায়ী, শাফেয়ী, দাউদ ও ইমাম আহমাদের একমত। ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। তাদের দলীল: আরোহী ব্যক্তির জন্য সালাত বৈধ করা হয়েছে যাতে সে সফরে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। আর এই অর্থটা যে ব্যক্তি হাঁটছে তার মাঝে বিদ্যমান আছে। কেননা হাঁটাও মুসাফিরের একটা অবস্থা। সুতরাং এই অবস্থায় তার জন্য হেঁটে সালাত বৈধ আছে।

দ্বিতীয় মত: হেঁটে সালাত পড়া জায়েয নেই। এটা আবু হানিফা, মালেক, ইবনু হাযম ও আহমাদের একমত। ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। তাদের দলীল: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ বিষয়ে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। সালাতের মাঝে হাঁটলে সালাত বাতিল হয়ে যায়। কারণ এখানে আমলে কাছির (অতিরিক্ত কাজ) আছে। কিন্তু আরোহী অবস্থায় সালাত পড়লে এর মাঝে হাঁটা অবস্থা পাওয়া যায় না। তাই আরোহী অবস্থার সাথে হাঁটা অবস্থাকে একত্রিত করা যাবে না।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(মুহাল্লা, ২/১০২, বায়ান, ২/১৫৪, মুগনী, ১/৪৩৭, মাজমু, ৩/২১৮, নাইলুল আওতার, ২/৫৪৭, শারহুল মুমতি, ২/২৬৮)

যে ব্যক্তি বাহনের ওপর সালাত পড়ছে তার কিবলা হলো যেদিকে যাত্রা করছে

হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এই কথা দ্বারা দলীল পেশ করেন, “যেদিকে যায় সেদিকে সালাত পড়বে” রাস্তার দিকটাই হলো কিবলার পরিবর্তে। সুতরাং প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো দিকে ফিরবে না।

(মুগনী, ১/৪৩৬, ফাতহুল বারী, ২/৫৭৬)

বাহনের ওপর সালাত পড়লে রুকুর তুলনায় সিজদায় একটু বেশি মাথা ঝুঁকাতে হবে

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, বাহনের ওপর সালাতের বিধান সালাতে খাওফ এর মতো ইশারা করে রুকু সিজদা করবে। রুকুর তুলনায় সিজদায় একটু মাথা বেশি ঝুঁকাতে হবে। জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ বলেন, কোনো এক প্রয়োজনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেন। আমি ফিরে এসে দেখি তিনি বাহনের ওপর পূর্ব দিকে মুখ করে

সালাত পড়ছেন। তিনি রুকুর তুলনায় সিজদায় একটু মাথা বেশি ঝুঁকান। (আবু দাউদ, হা/১২১৫)

আমি বলছি, হাদীসটি আবু দাউদ, (১২১৫) তিরমিযী, (৩৫১) ও আহমাদ, (৩/৩৩২) আবুয যুবায়ের থেকে আন আনা বর্ণনা করেন। আর তিনি হলেন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। তিনি এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেননি। কিন্তু আলবানী রহিমাহুল্লাহ মিশকাতে (১৩৪) বাইহাকী থেকে স্পষ্ট শুনার বর্ণনা নিয়ে আসেন। আমি বলছি, মুসনাদে আহমাদে (৩/২৯৬) হাদীসটা এভাবে এসেছে, আমাদের আব্দুর রাজ্জাক হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, আমাদের ইবনু জুরাইজ হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, আমাকে আবুয যুবায়ের হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুকে বলতে শুনেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাহনের ওপর যেদিকে তার বাহন যাচ্ছে সেদিকে ফিরে সালাত পড়তে দেখেছি। কিন্তু তিনি রুকুতে সিজদার তুলনায় মাথা একটু বেশি ঝুঁকাতেন। আর তিনি ইশারা করে সালাত পড়েন। এই সনদটা হাসান।

(তামহীদ, ১৭/৭২, মুগনী, ১/৪৩৫)

সফরে বাহনের ওপর বিতর সালাত পড়ার বিধান

প্রথম মতঃ সফরে বাহনের ওপর বাহন যেদিকে যায় সেদিকে ফিরে বিতর সালাত পড়া জায়েয আছে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীলঃ লেখক ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেখানে আছে, “নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটের ওপর বিতর সালাত পড়তেন”। অনুরূপভাবে লেখক আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেই হাদীসও তাদের দলীল।

দ্বিতীয় মতঃ সফরে বাহনের ওপর বিতর সালাত পড়া জায়েয নেই। এটা আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর মত। কারণ তার নিকট বিতর সালাত পড়া ওয়াজিব। ইবরাহীম নাখয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, তারা (বিদ্বানরা) ফরয ও বিতর সালাত জমিনে পড়তেন। সুফিয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, বাহনের ওপর বিতর সালাত পড়াতে কোনো সমস্যা নেই। তবে জমিনে পড়া আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(ইশরাফ, ২/২৮১, শারহে মুসলিম, ৭০০)

٦٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُم آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

৬৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা লোকজন কুবা নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় একজন আগন্তক আগমন করে বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর আজ রাতে কুরআনের আয়াত নাযিল করে এই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, মক্কার কা'বাকে এখন থেকে যেন কিবলা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা কা'বাকে কিবলা করে নেন। তখন তাদের চেহারা ছিল শামের দিকে। অতঃপর তারা কা'বা অভিমুখী হয়ে যান। [সহীহ বুখারী হা/৪০৩ ও মুসলিম হা/৫২৬]

কিবলামুখী হওয়ার বিধান কী

কিবলামুখী হওয়া সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। কেউ যদি ছেড়ে দেয় তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তবে দুই অবস্থায় বাতিল হবে না।

এক অবস্থা হচ্ছে ভীষণ ভয় থাকলে আর এর বিস্তর আলোচনা অচিরেই সালাতুল খাওফে আসছে ইন শা আল্লাহ।

আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে সফরে বাহনের ওপর নফল সালাত পড়া অবস্থায়। ইতিপূর্বে এ সংক্রান্ত আলোচনা গত হয়েছে। এ বিষয়ে দলীল হচ্ছে কুরআন, হাদীস ও ইজমা।

কুরআন থেকে দলীল: হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ﴾

তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকেই তোমাদের চেহারা ফিরাও। (সূরা আল-বাকারা, ২:১৪৪)

হাদীস থেকে দলীল: হচ্ছে লেখক ইবনু রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা এবং বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ.

"সালাতে দাঁড়ালে ভালো করে ওযূ করে নিবে তারপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর দিবে"। সহীহ বুখারী হা/৬৬৬৭, সহীহ মুসলিম হা/৩৯৭।

ইজমা থেকে দলীল: ইবনু আব্দিল বার, ইবনু রুশদ, নববী, ইবনু হাজার প্রমুখ বিদ্বান রহিমাহুমুল্লাহ এ বিষয়ে ইজমা নকল করেন। ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা

একমত যে কিবলামুখী হয়ে সালাত পড়তে আল্লাহ তাঁর নাবী ও বান্দাদের আদেশ করেছেন তা হচ্ছে কাবা, সম্মানিত ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত। যে ব্যক্তি কিবলাকে দেখবে তার জন্য সরাসরি কিবলামুখী হয়ে সালাত পড়া ফরয। কেউ জেনে শুনে ইচ্ছকৃতভাবে কিবলা বর্জন করলে তার সালাত হবে না। তাকে পুনরায় আবার সকল সালাত পড়তে হবে।

(তামহীদ, ১৭/৫৪, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১/২৭৪, মুগনী, ১/৪৩১, মাজমু, ৩/১৯৩, ফাতহুল বারী, ১/৫০৩, ইজমা ইবনু আব্দিল বার, ১/৪৭০)

মুসল্লী কিবলা প্রত্যক্ষ করলে সরাসরি কিবলার দিকে ফিরে সালাত পড়া শর্ত

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ কিবলা প্রত্যক্ষ করলে তার জন্য সরাসরি কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। কিবলা দেখা সত্ত্বেও তা বর্জন করলে সালাত হবে না। ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, কিবলা প্রত্যক্ষ করলে সরাসরি কিবলার দিকে ফিরে সালাত পড়া তার জন্য ফরয। এ বিষয়ে কারো মতভেদ আছে কিনা আমাদের জানা নেই। আমি বলছি, আরো অনেক বিদ্বান এ বিষয়ে ইজমা নকল করেছেন।

(তামহীদ, ১৭/৫৪, মারাতিবুল ইজমা, ৪৮, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১/২৭৪, মুগনী, ১/৪৩৭, ইকনা, ১/৩৪৮, ইজমা ইবনু আব্দিল বার, ১/৪৭৩)

মুসল্লী দূরে থাকার কারণে কিবলা প্রত্যক্ষ না করলে তার জন্য কিবলার দিকে ফিরে সালাত পড়া ওয়াজিব

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা একমত কেউ কিবলা প্রত্যক্ষ না করলে সে কিবলার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে। ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই মতটি ভুল, যা কুরআন. সুন্নাহ ও ইজমা বিরোধী। কেননা উম্মত একমত যে, দীর্ঘ কাতারের সালাত বিশুদ্ধ, যা কাবার পথ থেকে অনেক দূরে। আমি বলছি, এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ব্যক্তি কিবলা থেকে দূরে অবস্থান করছে সে কিবলার দিকে মুখ করে সালাত পড়বে, কিবলা সরাসরি দেখে নয়। কেননা কাতার দীর্ঘ হওয়ার কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি সরাসরি কাবা দেখবে না। এই মাসআলায় আরো অনেক বিদ্বান ইজমা নকল করেন।

(তামহীদ, ১৭/৫৪, ইকনা, ১/৩৪৯, ফাতাওয়া, ২২/২০৯, ইজমা ইবনু আব্দিল বার, ১/৪৭৫)

কিবলা নির্ণয় করার জন্য ইজতিহাদ (চেষ্টা করা) করা ওয়াজিব। কেউ ইজতিহাদ না করে অন্য দিকে মুখ করে সালাত পড়লে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা একমত কেউ যদি কিবলা অন্বেষণ না করে সালাত পড়ে, তারপর দেখা যায় সে যেদিক করে সালাত পড়েছে তা কিবলার দিক না তাহলে তার সালাত বিনষ্ট হয়ে যাবে।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ মক্কায় থাকলে তার মাঝে ও কাবার মাঝে অন্তরায় থাকলে যেমন পাহাড় তাহলে সে কিবলার জন্য ইজতিহাদ করবে, এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা একমত কেউ যদি কিবলার দিক না জানে তাহলে তা জানার জন্য তার সাধ্যানুযায়ী তারকা, বাতাস ও পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, যাতে কিবলা অভিমুখী হয়ে সালাত পড়তে পারে।

(ইস্তিযকার, ৭/২১৫, ইকনা, ১/৩৫০, জামেউল আহকামুল ফিকহিয়া, ১/১৬৭, মাজমু, ১/২৪৫, ইজমা ইবনু আব্দিল বার, ১/৪৮২)

মুসল্লী কিবলা অন্বেষণ করার পর তার ভুল হলে করণীয় কী?

প্রথম মত: সময় থাকলে ওই সালাত পুনরায় পড়তে হবে আর সময় শেষ হয়ে গেলে পুনরায় পড়তে হবে না। এটা ইমাম যুহরী, মালেক ও আওযায়ী রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এমনটা করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এ মতের প্রবক্তাদের দলীল: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, "সূর্য উঠার আগে কেউ ফজরের সালাতের এক রাকআত পেলে সে ফজর সালাত পেল"। তাদের আরো হাদীস হলো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সাথে প্রথম দিন প্রথম ওয়াক্তে সালাত পড়েন ও দ্বিতীয় দিন শেষ ওয়াক্তে সালাত পড়েন।

দ্বিতীয় মত: সালাত পুনরায় আর পড়তে হবে না। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ﴾

"পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। যেদিকে ফিরবে সেদিকেই আল্লাহর চেহারা"। (সূরা আল-বাকারা, ২:১১৫)

তাদের অনেক দলীল আছে তার মাঝে লেখক ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে কুবাবাসীর ঘটনায় যে হাদীস নিয়ে এসেছেন তা। তারা বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে

সালাত পড়ছিল। তাদের সংবাদ দেয়া হলে সালাতের মাঝেই সাথে সাথে কিবলামুখী হয়ে যায়। কিন্তু তারা গত হয়ে যাওয়া সালাত পুনরায় পড়েননি।

তৃতীয় মত: মুতলাকভাবেই (সাধারণভাবে) তাকে পুনরায় সালাত পড়তে হবে। এটা ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর নতুন মত। এটার ওপরই রয়েছে তার অনেক ছাত্র। এটা মালেকী মাযহাবের মুগীরা আল মাখযুমীর মত। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। তাদের দলীল: আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, "কেউ সালাতের কথা ভুলে গেলে বা সালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে ওই সালাত পড়ে নিবে। এটাই হলো সালাতের কাফফারা"। বুখারী, হা/৫৯৭, মুসলিম, হা/৬৮৪, এটা মুসলিমের শব্দ। বুখারীতে (১৮৫২) হাদীসটি ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর সূত্রে এভাবে এসেছে, "আল্লাহর জন্য তা আদায় করবে। কারণ আল্লাহর হক আদায় করা উচিত"।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত, যা অধিকাংশ বিদ্বান ব্যক্ত করেছেন। এই মতটিকে পছন্দ করেছেন ইবনু আব্দিল বার, ইবনু কুদামা, ইবনু রজব ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুমুল্লাহ। ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইজতিহাদ করে সালাত পড়লে পুনরায় সালাত পড়তে হবে না। চাই কিবলার দিকে ফিরে সালাত পড়ুক বা অন্য দিকে ফিরে পড়ুক। কেননা সে তার ওপর অর্পিত ওয়াজিব কাজ সম্পাদন করেছে। আর যে ব্যক্তি তার ওপর অর্পিত ওয়াজিব কাজ সম্পাদন করেছে সে সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করেছে। আর যে ব্যক্তি সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করে তার ওপর দুইবার সালাত পড়া ওয়াজিব নয়। কেননা আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর দুইবার সালাত পড়া ওয়াজিব করেননি।

(তামহীদ, ১৭/৫৭, মুহাল্লা, ২/২৫৮, তাফসীরে কুরতুবী, ২/৭০, মাজমু, ৩/২০৬, ইবনু রজব, ৩/১০০, ফাতহুল বারী, ১/৫০৫, শারহুল মুমতি, ২/২৮৬)

কিবলার দিক থেকে সামান্য অন্য দিকে ফিরলে সালাত পুনরায় পড়তে হবে না।

ইমাম বাগাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, কিবলার দিক থেকে সামান্য ডান বা বাম দিকে মুখ করে থাকলে দিক এক হলে সকল বিদ্বানের নিকট পুনরায় সালাত পড়তে হবে না।

٦٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ- يَعْنِي عَن يَسَارِ الْقِبْلَةِ-، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ مَا فَعَلْتُهُ.

৬৭. আনাস ইবনে সীরীন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন শাম থেকে আগমন করলেন, আমরা তাকে স্বাগতম জানানোর জন্য অগ্রসর হলাম। অতঃপর

আমরা তার সাথে 'আইনুত তামার' নামক স্থানে সাক্ষাৎ করলাম। তাকে আমরা গাধার পিঠের ওপর কিবলার বাম দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে দেখলাম। অতঃপর আমি তাকে বললাম, আমি আপনাকে কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে দেখলাম? উত্তরে তিনি বললেন, আমি যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে সালাত আদায় করতে না দেখতাম তাহলে আমিও এভাবে সালাত আদায় করতাম না। [সহীহ বুখারী হা/১১০০ ও মুসলিম হা/৭০২]

١٢- بَابُ الصُّفُوفِ

অধ্যায়: ১২- সালাতের কাতারসমূহ

٦٨. عَن أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ ".

৬৮. আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সালাতে কাতার সোজা করো। কেননা, সালাতে কাতার সোজা করা সালাত পূর্ণ করার অন্তর্ভুক্ত। [সহীহ বুখারী হা/৭২৩ ও মুসলিম হা/৪৩৩]

٦٩. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ الله بَيْنَ وُجُوهِكُم ".

وَلِمُسْلِمٍ: "كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّى بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ، حَتَى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ، فَقَالَ: " عِبَادَ الله! لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ الله بَينَ وُجُوهِكُمْ ".

৬৯. নু'মান বাশীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন: অবশ্যই তোমরা সালাতে কাঁতার সোজা করে দাঁড়াবে। নতুবা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে মতভেদ, শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে দিবেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা কছেন। [সহীহ বুখারী হা/৭১৭ ও মুসলিম হা/৪৩৬]

সহীহ মুসলিমে রয়েছে: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সালাতের কাতার এমন ভাবে সোজা করতেন, যেন তিনি তীর সোজা করছেন। তিনি এরূপ করতেন যতক্ষণ

না বুঝতে পারতেন যে, আমরা বিষয়টি তাঁর নিকট হতে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি। অতঃপর একদা তিনি ঘর হতে বের হলেন এবং সালাতে দাঁড়ালেন, এমনকি তাকবীরে তাহরীমা বলার উপক্রম হলেন, এমন সময় দেখলেন এক ব্যক্তি সারি হতে সম্মুখে বক্ষ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা তোমাদের সারি সোজা করবে নতুবা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে মতভেদ, শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে দিবেন। [সহীহ মুসলিম হা/৪৩৩]

কাতার সোজা করার বিধান

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ অধ্যায় বেঁধেছেন, 'যে কাতার পুরা করে না তার পাপ সম্পর্কীত অধ্যায়'।

ইবনু দাকীকিল ঈদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, "কাতার সোজা করা সালাত পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত" এটা প্রমাণ করে কাতার সোজা করতে হবে।"কাতার সোজা করা সালাত পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত" হাদীস থেকে এটাও বুঝা যাচ্ছে যে কাতার সোজা করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, কাতার সোজা করা ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও কেউ এর ব্যতিক্রম করলে তার সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এ কথাটা আরো শক্তিশালী করে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর এই কাজ। কাতার সোজা না করলে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ লোকদের ধমক দিতেন, কিন্তু পুনরায় সালাত পড়তে বলতেন না। এ বিষয়ে ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ সীমালঙ্ঘন করেছেন। তিনি বলেন, সালাত বাতিল হয়ে যাবে। যারা ইজমা দাবি করে বলেন, কাতার সোজা করা ওয়াজিব নয় তিনি তাদের সাথে বিতর্ক করেন। এর কারণ হচ্ছে উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আবু উসমান আল হিন্দী রহিমাহুল্লাহুর পায়ে কাতার সোজা না করার কারণে আঘাত করেন এবং সোয়াইদ ইবনু গাফলা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু আমাদের কাতার সোজা করে দিতেন ও কাতার বাঁকা হলে পায়ে আঘাত করতেন। তিনি বলেন, উমার ও বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা কাউকে ওয়াজিব বিষয় বর্জন করা ছাড়া মারতেন না। কিন্তু তার এই আলোচনায় কথা আছে। কারণ এ দুজন সাহাবী মনে করতেন কেউ সুন্নাহ ছেড়ে দিলে মারা জায়েয আছে।

আমি বলছি, প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে কাতার সোজা করা ওয়াজিব যেমনটি ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন। এই মতকেই ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু রজব রহিমাহুমাল্লাহ পছন্দ করেছেন। ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই শাস্তি দেয়ার বাহ্যিক অবস্থা প্রমাণ করে এই বিষয়টা বর্জন করা হারাম।

(মুহাল্লা, ২/৩৭৫, ইস্তিযকার, ৬/১৮৭, মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ২৩/৩৯৪, ইহকামুল আহকাম, ১/১৯৫, ইবনু রজব, ৬/২৭৬, ফাতহুল বারী, ১০/২০৯-২১০)

ইমামের অনুসরণের জন্য মুক্তাদীর কী শর্ত?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, অনুসরণ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, মুক্তাদী ইমামের স্থানান্তর হওয়ার বিষয়টা জানতে হবে। চাই দুজনই মাসজিদে সালাত পড়ুক বা অন্য কোথাও অথবা একজন মাসজিদে আরেকজন মাসজিদের বাহিরে। এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত। আমাদের শাইখরা বলেন, মুক্তাদী ইমামের স্থানান্তরের বিষয়টা জানতে পারবে ইমামের আওয়াজ শুনে বা তার পেছনে যারা আছে তাদের দেখে বা তার কাজ দেখে অথবা যারা তার সাথে সালাত পড়ছে তাদের কাজ দেখে। তারা ইজমা নকল করে বলেন, এ সকল বিষয়গুলো থেকে যে কোনো একটা বিষয়ের ওপর নির্ভর করা জায়েয আছে। মুক্তাদী অন্ধ হলে সে সুস্থ্য ব্যক্তির পাশে সালাত পড়বে, যাবে তার অনুযায়ী সালাত পড়তে পারে।

(মাজমু, ৪/২০১, নাইলুল মাআরেব, ১/২৩৩)

কাতার যদি দূরে হয় আর ইমাম মুক্তাদী মাসজিদে থাকলে মুক্তাদীর ইমামের অনুসরণ করা কি বিশুদ্ধ হবে?

প্রথমতঃ ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, কাতারের ক্ষেত্রে সুন্নাহ হচ্ছে প্রথমে আগের কাতার পুরা করা এরপর পরের কাতার। কাতারে একেবারে লেগে লেগে দাঁড়াবে। কেউ ইমামের কাছাকাছি কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পেছনের কাতারে দাঁড়ালে তার সালাত মাকরূহ হবে। আল্লাহ ভালো জানেন। তিনি বলেন, মুসল্লীরা যদি কাতারে দাঁড়ানোর বিধান লঙ্ঘন করে যেমনঃ সকল মুসল্লী বা কিছু মুসল্লী ইমামের আগে চলে গেছে বা ওজর ছাড়া তারা ইমাম থেকে অনেক পেছনে অবস্থান করছে তাহলে এই কাজ সকল ইমামদের নিকট নিষেধ। এমনিভাবে মুসল্লীরা একত্রিত না দাঁড়িয়ে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়ায় যেমনঃ একজন এক কাতারে আরেকজন আরেক কাতারে তাহলে এটা আরো মারাত্মক অপছন্দনীয় বিষয়। বরং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাতার সোজা করা, লেগে লেগে দাঁড়ানো, ফাঁকা বন্ধ করা ও এক কাতার পুরা হওয়ার পর আরেক কাতার পুরা করার জন্য আদেশ করেছেন। এ বিষয়গুলো প্রমাণ করে সুন্দর করে কাতারে একত্রিত হয়ে দাঁড়াতে হবে। আমি বলছি, এ বিষয়ে অনেক দলীল আছে। এর মাঝে মুসলিমে (৪৩৮) আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের কাতারের পেছনে দেখে বলেন, “সামনে আসো, আগের কাতার পুরা করো। তোমাদের পরে যারা আসবে তারা তাদের কাতার ঠিক করবে। কোনো সম্প্রদায় পেছনে থাকলে আল্লাহ তাদের পেছনে করে দেন”। মুসলিমে (৪৩০) জাবের ইবনু সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে

হাদীস বীর্ণত হয়েছে, তিনি বলেন, আমাদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে বলেন, "ফেরেশতারা যেভাবে তাদের রবের কাছে কাতারবন্ধি হয় তোমরা কি এমনভাবে কাতারবন্ধি হবে না"? আমরা বললা, হে আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতারা তাদের রবের কাছে কীভাবে কাতারবন্ধি হয়? তিনি বলেন, "প্রথম কাতার আগে পুরা করে ও কাতারে লেগে লেগে দাঁড়ায়"।

সুতরাং মাসআলার বিধান হচ্ছেঃ ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম ও মুক্তাদীর স্থানে তিনটা অবস্থা রয়েছে। একটা হচ্ছে, দুজনই একটা মাসজিদে আছে তাহলে এখানে অনুসরণ বিশুদ্ধ হবে। চাই মাসজিদ বড় হওয়ার কারণে দুজনের মাঝে দূরত্ব কম হোক বা বেশি হোক চাই দালান ঘর একটা হোক বা ভিন্ন হোক। যেমনঃ মাসজিদের প্রাঙ্গনে, সুড়ঙ্গে, ছাদওয়ালা কূপ, মাসজিদের মিনারে এ সকল সুরতে সালাত বিশুদ্ধ হবে যদি ইমামের সালাতের অবস্থা জানা যায় ও ইমামের আগে না যায়। চাই উপরে সালাত পড়ুক বা নিচে। এ বিষয়ে কোনো বিদ্বানের মাঝে মতভেদ নেই। আমাদের শাইখরা এ বিষয়ে ইজমা নকল করেছেন।

(মাজমু, ৪/১৯৪, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৩/৩৯৪-৪০৮, হাশিয়া রাওজা, ২/৩৪৭, নাইলুল মাআরেব, ১/২৩৩, শারহুল মুমতি, ৪/২৯৬)

বাড়িতে থেকে মাসজিদে অবস্থানকারী ইমামের অনুসরণ করা যাবে কি?

প্রথমত কথা হচ্ছে, মাসজিদের বাহিরে থেকে মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করলে সালাত বিশুদ্ধ হবে, তবে কাতার মিলিত হতে হবে। এ বিষয়ে আরো দ্বিমত নেই। **মাসআলার বিধানঃ**

প্রথম মতঃ বাড়িতে থেকে মাসজিদে অবস্থানকারী ইমামের অনুসরণ করে সালাত পড়লে ওই সালাত বিশুদ্ধ হবে না। এটা শাফেয়ীদের মত, ইমাম আহমাদের একমত ও ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুমুল্লাহর বাহ্যিক মত।

দ্বিতীয় মতঃ সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা আবু হানিফা ও ইমাম আহমাদের একমত। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাত বিশুদ্ধ হবে, তবে জুমআ হবে না।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। এটাই ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন, এই মাসআলায় বিশুদ্ধ মত হচ্ছে মাসজিদের বাহির থেকে ইমামের অনুসরণ করলে কাতার মিলিত হতে হবে। যদি মিলিত না হয় তাহলে সালাত বিশুদ্ধ হবে না।

এর উদাহরণঃ হারামের আশপাশে অনেক বিল্ডিং আছে। সেখানে অনেক মানুষ ইমামকে বা মুক্তাদীদের দেখে সালাত পড়ে। লেখকের কথানুসারে এই সালাত বিশুদ্ধ হবে। আমরা তাদের বলবো, তোমরা ইকামত শুনলে তোমাদের জায়গায় থাকো ও ইমামের সাথে সালাত

পড়ো। মাসজিদে হারামে আসতে হবে না। দ্বিতীয় মতানুসারে এখানে সালাত হবে না। কারণ কাতার মিলিত নেই। আর এ কথাটাই বিশুদ্ধ। এ মত দ্বারাই বর্তমানে যে সকল আলেম রেডিও এর অনুসরণ করে সালাত বিশুদ্ধ হবে এই ফতোয়া দিয়েছেন তাদের মত বাতিল হয়ে যায়। এ বিষয়ে একটা রিসালা লেখা হয়েছে, যার নাম হলো, 'আল ইকনা বি ছিহহাতি সালাতিল মামুম খালফাল মিযেইয়া'। এই মত গ্রহণ করলে আমাদের জন্য আবশ্যক হয় যে, আমরা জুমআর সালাতের জন্য জামে মাসজিদে যেতে হবে না। বরং হারামের মাসজিদের ইমামের অনুসরণ করবো। কেননা সেখানে জামাআতে অনেক মানুষ আছে। আর অনেক মানুষের সাথে সালাত পড়া উত্তম। অথচ যে রেডিও এর পেছনে সালাত পড়ছে সে ইমাম মুক্তাদী কাউকে দেখছে না। এ মত বাতিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা এতে করে জামাআতের সাথে সালাত ও জুমআর সালাত বাতিল হয়ে যায়। কারণ এখানে কাতার মিলিত নেই। আর এটা শরীআত প্রণেতার জুমআর ও জামাআতের দ্বারা যে উদ্দেশ্য তা বাতিল করে দেয়।

(মাজমু, ৪/২০০, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৩/৪০৭-৪১২, ইবনু রজব, ৬/৩০১, হাশিয়া রওজা, ২/৩৪৮, শারহুল মুমতি, ৪/২৯৮)

ইমাম মাঠে সালাত পড়লে মুক্তাদী ও ইমামের মাঝে দূরত্ব থাকলে

প্রথম মত: ইমাম ও মুক্তাদীদের মাঝে বেশি দূরত্ব হওয়া যাবে না, যখন তারা মাসজিদের বাহিরে সালাত পড়বে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ দূরত্বের পরিমাণ বলেন, তিনশো গজের কাছাকাছি হতে হবে।

দ্বিতীয় মত: সাধারণভাবেই সালাত বিশুদ্ধ হবে, যদিও দূরত্ব এক মাইল বা তার চেয়েও বেশি হয়। তবে ইমামের সালাতের অবস্থা জানা যেতে হবে। এটা আতা রহিমাহুল্লাহর মত।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে প্রথম মত। আর তিনশো গজের পরিমাণ দূরত্ব হওয়ার কথা সম্পর্কে কোনো দলীল নেই। ইবনু কাসেম রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসল্লী যদি এমন মাঠে থাকে, যার মাঝ দিয়ে রাস্তা যায়নি এবং তারা ইমাম থেকে দূরে থাকে বা তার কাতার দূরে হয় তাহলে তাকবীর শুনলে বা প্রত্যক্ষ করলে সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

(মাজমু, ৪/২০০, হাশিয়া রাওজা, ২/৩৪৭)

ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে নদী বা রাস্তা অন্তরায় থাকলে

প্রথম মত: যদি ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে রাস্তা বা এমন নদী থাকে, যেখানে নৌকা চলাচল করে অথবা দুজন দুনৌকায় আছে তাহলে এ ক্ষেত্রে সালাত বিশুদ্ধ হবে না। এটা আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর মত। ইমাম আহমাদের এক মত ও তার অধিকাংশ ছাত্রের মত। তারা

বলেন, রাস্তা সালাতের স্থান না। তাই এটা কাতার মিলিত না হওয়ার সাথে সাদৃশ্য রাখে। আর সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কাতার পরস্পর মিলিত হতে হয়।

দ্বিতীয় মত: ইমামকে দেখলে বা ইমামের তাকবীর শুনলে সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা হাসান, আবু মুজলিয, আওযায়ী, আবু ছাওর, মালেক, শাফেয়ী, বুখারীর বাহ্যিক বাব বাঁধার অবস্থাও এমন। এটা ইমাম আহমাদের এক মত। এই মতকে পছন্দ করেছেন ইবনু কুদামা, ইবনু তাইমিয়্যাহ ও আব্দুর রহমান আস সাদী রহিমাহুমুল্লাহ। ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাত হবে না এ মর্মে কোনো দলীল ও ইজমাও বর্ণিত হয়নি। এখানে ইমামের অনুসরণের অন্তরায় কিছু নেই। কারণ মুক্তাদী ইমামকে দেখছে বা তার তাকবীর শুনছে। আর তাদের কথা 'রাস্তা সালাতের স্থান না'। তাই এটা কাতার মিলিত না হওয়ার সাথে সাদৃশ্য রাখে। আর সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কাতার পরস্পর মিলিত হতে হয়, যার কারণে সালাত হবে না। আমরা যদি মেনে নেই রাস্তায় সালাত বিশুদ্ধ নয় তাহলে নদীতেও বিশুদ্ধ নয়। কিন্তু নদীতে নৌকার ওপর সালাত বিশুদ্ধ আছে। আর রাস্তার মাঝে ঈদের সালাত, জানাযার সালাত ও জুমআর সালাত বিশুদ্ধ আছে অনুরূপ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও বিশুদ্ধ আছে। আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হুমাঈদ ইবনু আব্দির রহমানের জানাযার সালাত ইমামের পেছনে পড়েছেন। আর দুজনের মাঝে রাস্তা ছিল।

(আওসাত, ৪/১২১, মুগনী, ২/২০৯, মাজমু, ৪/২০০, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৩/৪০৭, ইবনু রজব, ৬/২৯৭, নাইলুল মাআরেব, ১/২২৩)

ইমামের সামনে মুক্তাদীর সালাতের বিধান কী?

প্রথম মত: সালাত বাতিল হয়ে যাবে। এটা আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর মত, শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর প্রসিদ্ধ মত ও ইমাম আহমাদের মত। তাদের দলীল: বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, "ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং তার ব্যতিক্রম করবে না"। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমাম হিসেবে সামনে দাঁড়াতেন আর তিনি বলেন, "আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছ, সেভাবে সালাত পড়বে"। ইমামের পেছনে মুক্তাদীরা তার অনুসরণ করছে কিনা এটা দেখার জন্য তাকে পেছনে তাকাতে হয়।

দ্বিতীয় মত: মাকরূহ হওয়ার সাথে সালাত বিশুদ্ধ। এটা ইমাম মালেক, ইসহাক, আবু ছাওর, দাউদ ও হাসান থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। তারা বলেন, এতে ইমামের অনুসরণের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না। তাই এটা যেন প্রকারান্তরে তারা ইমামের পেছনেই আছে।

তৃতীয় মত: কোনো ওজর থাকলে সালাত বিশুদ্ধ হবে, নচেৎ হবে না। যেমন: জুমআ বা জানাযার সালাতে ভিড়ের কারণে জায়গা না থাকলে ওই মুহূর্তে ইমামের সামনে দাঁড়িয়ে সালাত পড়া, না পড়ার চেয়ে উত্তম। এটা কতিপয় বিদ্বানের মত। এমনিভাবে এটা ইমাম

আহমাদের মত। ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ ইমাম মালেকের বরাতে এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন, ভিড়ের কারণে জায়গা সংকীর্ণ হলে সালাত বিশুদ্ধ হবে। ইসহাক, আবু ছাওর ও হাসান থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে তৃতীয় মত। আর এই মতকেই পছন্দ করেছেন ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুমা। ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ যদি ইমামের সামনে দাঁড়ায় তাহলে সে জামাআতের ওয়াজিব সমূহ থেকে একটা ওয়াজিব ছেড়ে দিল। আর ওজরবশত ওয়াজিব ছাড়া যায়, যদিও ওই ওয়াজিবটা সালাতের মূল বিষয় হয়। সুতরাং জামাআতের ওয়াজিব তো ওজরের কারণে আরো আগে ছাড়া যাবে। এ জন্য প্রয়োজনবশত মুসল্লী দাঁড়াতে না পারলে, কুরআন পড়তে না পাড়লে, কাপড় না পেলে ও পবিত্রতা অর্জন করতে না পারলে ওজরের কারণে এগুলো তার থেকে রহিত হয়ে যায়।

(আওসাত, ৪/২৩৪, মুগনী, ২/২১৩, মাজমু, ৪/১৯১, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৩/৪০৪, শারহুল মুমতি, ৪/২৬৪)

٧٠. عن أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: "قُومُوا فَلْأُصَلِّ بِكُم " قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتينِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ، فَأَقَامَنِي عَن يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا.

اليَتِيمُ: هُوَ: ضُمَيْرَةُ؛ جَدُّ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ.

৭০. আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তাঁর দাদী মুলাইকা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদা খাদ্যগ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দিলেন যেটি তিনি নিজেই রসূলের জন্যে তৈরি করেছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে খাবার খেলেন। অতঃপর বললেন: তোমরা উঠো! আমি তোমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করবো। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: তখন আমি আমাদের একটি পাটি/মাদুর নিয়ে আসার জন্য গমন করলাম। যা দীর্ঘ দিন থাকার করার কারণে কালো হয়ে গেছে। অতঃপর সেই পাটিটির ওপর আমি পানি ছিটিয়ে দেই। সেই পাটিটির ওপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। আর আমি ও এক ইয়াতীম ছেলে (যুমাইরাহ) আমরা দু'জন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে দাঁড়ালাম। আর বৃদ্ধা মহিলাটি (আনাসের দাদী) আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে দুই রাকআত সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি চলে গেলেন। [সহীহ বুখারী হা/৩৮০ ও মুসলিম হা/৬৫৮]

সহীহ মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর মাকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে আর মহিলাটিকে আমাদের পিছনে দাঁড় করিয়ে দেন। [সহীহ মুসলিম হা/৬৬০, সহীহ বুখারী হা/৭২৭] ইয়াতীম ছেলেটির ছিলেন হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুমায়রাহ এর দাদা যুমায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।

٧١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَن يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

৭১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী মাইমূনাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে একদা রাত্রি যাপন করি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর আমি তার বাম পাশে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার মাথা ধরে তার ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দেন। [সহীহ বুখারী হা/৬৯৯ ও মুসলিম হা/৭৬৩]

মহিলা পুরুষদের কাতারের পেছনে দাঁড়ালে তার সাথে অন্য কোনো মহিলা না থাকলে সে কাতারে একাকী দাঁড়াবে

ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু রজব রহিমাহুমা ইজমা নকল করে বলেন, সকল বিদ্বান একমত কোনো মহিলা পুরুষদের পেছনে কাতারে দাঁড়ারে তার সাথে অন্য কোনো মহিলা না থাকলে সে একাই পুরুষদের কাতারের পেছনে দাঁড়াবে, পুরুষদের সাথে দাঁড়াতে পারবে না। কেননা পুরুষদের সাথে নারীদের কাতারে দাঁড়ানো নিষেধ। ইজমার দলীল হলো লেখক আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে যে দলীল পেশ করেছেন সেটা। তবে তাদের মাঝে মতভেদ আছে ওই মহিলার সাথে অন্য কোনো মহিলা দাঁড়ালে পরে ওই মহিলা কোনো কারণে কাতারে একা হয়ে গেলে তার সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে?

প্রথম মত: তার সালাত বিশুদ্ধ হবে না। এটা হাম্বলীদের একমত। আবু বকর আল আছরাম, কাযী আবু ইয়ালা ও মুহাররারের লেখকও এই মত পোষণ করেন। কারণ এখানে মহিলা পুরুষদের কাতারের সাথে মিলিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

দ্বিতীয় মত: সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা হাম্বলীদের দ্বিতীয় মত। কাফীর লেখক আবু মুহাম্মদ আল মাকদেসীও এই মত পোষণ করেন। এটার ওপর ইমাম বুখারীর বাব বাঁধার বাহ্যিক অবস্থা বুঝা যাচ্ছে। কেননা মহিলা একাকী দাঁড়ালে কাতার হয়, তার সাথে অন্য কারো দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। হারবের বর্ণনায় ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ অনুরূপ বলেন, মহিলা একাই একটি কাতার।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত আল্লাহ ভালো জানেন।

(মুফহিম, ২/২৮৬, মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ২৩/৩৯৫, ইবনু রজব, ৬/২৮৭)

মহিলা কাতারে দুলোকের পাশে বা তাদের সামনে দাঁড়ালে তার সালাতের বিধান কী?

প্রথম মত: মহিলা সালাতে পুরুষের সামনে বা তার পাশে দাঁড়ালে তার সালাত মাকরূহ হবে, তবে সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে এবং যে সকল পুরুষ তাদের সামনে বা বরাবর আছে তাদের সালাতও বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

দ্বিতীয় মত: তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। এটা আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আর এটাই ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন, সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। বিশেষ করে প্রয়োজনের সময়। যেমন হজের মৌসুমে মাসজিদে হারাম ও মাসজিদে নববীতে এমন হয়ে থাকে। এই অবস্থায় তুমি কোনো মহিলার টের পেলে তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কেননা কিছু মানুষের অপরিচিত নারী তার পাশে দাঁড়ালে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। বিশেষ করে মহিলা যুবতী হলে। তাই এই অবস্থায় ফিতনা থেকে বাঁচতে অন্য জায়গা তলব করবে।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ একটা মাসআলা বলেন, মহিলা পুরুষের সামনে থাকলে, যেমন পুরুষের কাতার মহিলাদের কাতারের পেছনে তাহলে তার সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এ জন্যই ফকীহরা বলেন, কাতারে মহিলারা পরিপূর্ণ হয়ে গেলে তাদের পেছনে পুরুষদের ইকতিদা করা নিষেধ নয়।

(মুগনী, ২/২০৪, মাজমু, ৪/১৯০, শারহুল মুমতি, ৪/২৮২)

মুক্তাদী একজন থাকলে কোথায় দাঁড়াবে?

প্রথম মত: ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: লেখক ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে যে হাদীস নিয়ে এসেছেন তা। অনুরূপ মুসলিমে (৩০১০) বর্ণিত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাম পাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে ধরে ঘুরিয়ে তার ডান পাশে নিয়ে আসেন। তারপর জাব্বার ইবনু সাখর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ওযূ করে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাম পাশে দাঁড়ালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দুজনের হাত ধরে আমাদের তার পেছনে দাঁড় করান।

দ্বিতীয় মত: ইমামের বাম পাশে দাঁড়াবে। এটা সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব রহিমাহুল্লাহর মত। নাখয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমামের পেছনে দাঁড়াবে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। অর্থাৎ ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবে।

(আওসাত, ৪/১৭১, মাজমু, ৪/১৮৬, ইবনু রজব, ৬/১৯৭-২০৩)

ইমামের সাথে দুজন থাকলে তারা কোথায় দাঁড়াবে?

প্রথম মত: ইমাম ও দুজন মুসল্লী উপস্থিত হলে ইমাম সামনে থাকবে ও দুজন মুসল্লী পেছনে থাকবে। চাই দুজন মুসল্লীই পুরুষ হোক বা দুজন বালক হোক বা একজন পুরুষ ও অন্যজন বালক। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: লেখক আনাস, ইবনু আব্বাস ও জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম তাদের যে হাদীস পূর্বে উল্লেখ করেছেন তা।

দ্বিতীয় মত: একজন ইমামের ডানে ও আরেকজন ইমামের বামে দাঁড়াবে। এটা ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ও তার দুই ছাত্র আলকামা ও আসওয়াদ এবং নাখয়ী রহিমাহমুল্লাহ তাদের মত।

সঠিক মত: পূর্বের দলীলের আলোকে সঠিক মত হচ্ছে প্রথম মত।

(আওসাত, ৪/১৭২, মুগনী, ২/২১৪, মাজমু, ৪/১৮৫)

মুসল্লী ইমামের বাম পাশে দাঁড়িয়ে সালাত পড়লে তার সালাতের বিধান কী?

প্রথম মত: ইমামের বাম পাশে দাঁড়ালে মুসল্লীর সালাত বিশুদ্ধ হবে না। তবে শর্ত হলো তার ডান পাশ খালি থাকতে হবে। এটা ইমাম আহমাদের প্রসিদ্ধ মাযহাব।

দ্বিতীয় মত: তার সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের মাঝে আছেন তিন ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ী রহিমাহুমুল্লাহ। ইমাম আহমাদ থেকেও এ মতের পক্ষে একটা মত আছে। ইমাম আহমাদের কিছু ছাত্র এই মতকে পছন্দ করেছেন। ইবনু হুবায়রা বলেন, বিদ্বানরা একমত ইমামের ডান পাশে কেউ না থাকলে মুসল্লী বাম পাশে দাঁড়ালে তার সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আমি বলছি, তাদের দলীল হলো লেখক ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা ও জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, যা পূর্বে গত হয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই দুই সাহাবীর সালাত বাতিল করেননি। বরং তিনি তাদের উত্তম জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। এই মতকে পছন্দ করেছেন ইবনু সাদী ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুমা। ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমামের বাম পাশে দাঁড়ালে ব্যক্তি গুনাহগার হবে বা তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে এ মতে অন্তর প্রশান্তি লাভ

করে না। এতে চিন্তাভাবনার বিষয় আছে। কেননা দলীল ছাড়া ইবাদতকে বাতিল বলা দলীল ছাড়া ইবাদতকে বিশুদ্ধ বলার মতো।

(ইজমা ইবনু হুবায়রা, ৪৪, মাজমু, ৪/১৮৫, নাইলুল মাআরেব, ১/২২৯, শারহুল মুমতি, ৪/২৬৬)

জামাআতের সাথে নফল সালাত পড়ার বিধান কী?

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ মাজমূ‘ ফাতাওয়াতে (২৩/৪১৩) বলেন, জামাআতের সাথে নফল সালাত দুই ধরনের।

এক. যে সকল নফল সালাত জামাআতের সাথে পড়া সুন্নাহ। যেমনঃ সালাতে কুসূফ, ইস্তিসকা ও রমজানের তারাবীর সালাত। এগুলো সর্বদা জামাআতের সাথে পড়বে।

দ্বিতীয়. যে সকল নফল জামাআতের সাথে পড়া সুন্নাহ নয়। যেমনঃ তাহাজ্জুদের সালাত, সুন্নাতে রাতেবা, সালাতুয যুহা ও তাহিয়্যাতুল মাসজিদ। এ সকল নফল কখনো কখনো জামাআতের সাথে পড়া জায়েয আছে, তবে সর্বদা জামাআতের সাথে পড়া শরীআতসম্মত নয়। বরং বিদআত ও অপছন্দনীয় কাজ। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবীরা ও তাবেঈনরা এ সকল সালাত জামাআতের সাথে পড়েননি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফল সালাত জামাআতের সাথে খুব কম পড়েছেন। তিনি এগুলো একা একা পড়েছেন। তারপর তিনি এ বিষয়ে কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন তার মাঝে লেখক আনাস ও ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার যে দু’টি হাদীস উল্লেখ করেছেন সে দু’টি আছে।

١٣-بَابُ الْإِمَامَةِ

অধ্যায়: ১৩-ইমামতি করা

٧٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟! ".

৭২. আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ইমামের আগেই মাথা উঠায় তার কি ভয় হয় না যে, আল্লাহ তা‘আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন? অথবা আল্লাহ তা‘আলা তার চেহারাকে গাধার আকৃতিতে পরিণত করে দিবেন? [সহীহ বুখারী হা/৬৯১ ও মুসলিম হা/৪২৭]

٧٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ".

৭৩. আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে কেবলমাত্র তাঁর অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং অনুসরণের ব্যাপারে তার বিরোধিতা করো না। অতএব যখন ইমাম তাকবীর দিবে তখন তোমরাও তাকবীর দিবে। আর যখন রুকূ করবে তখন তোমরাও রুকূ করবে। আর ইমাম যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে তখন তোমরা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (সকল প্রশংসা তোমার জন্য হে আমাদের রব) বলবে। আর যখন ইমাম সিজদা করবে তখন তোমরাও সিজদা করবে। যখন ইমাম বসে সালাত করবে, তখন তোমরাও সবাই বসে সালাত আদায় করবে। [সহীহ বুখারী হা/৭২২, ৭৩৪ ও মুসলিম হা/৪১৪]

٧٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ: "صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنِ اجْلِسُوا، فلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ ".

৭৪. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা অসুস্থ থাকা অবস্থায় বাড়িতে বসে বসে সালাত আদায় করলেন। আর জনগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে শুরু করে। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করে তাদের সবাইকে বসে সালাত আদায় করতে বললেন। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে বললেন, ইমামকে নিযুক্ত করা হয়েছে একমাত্র তার অনুসরণ করার জন্য। অতএব যখন সে রুকূ করবে, তার পরে পরে তোমরাও রুকূ করবে। আর যখন সে রুকূ হতে মাথা উঠাবে, তার পরে পরে তোমরাও মাথা উঠাবে। আর যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে তারপর তোমরাও رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে। আর যখন ইমাম বসে বসে সালাত আদায় করবে তখন তোমরাও সবাই বসেই সালাত আদায় করবে।[সহীহ বুখারী হা/৬৮৮ ও মুসলিম হা/৪১২]

٧٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَثَنِي الْبَراءُ بْنُ عَازِبٍ، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: " سمِعَ اللهُ لمَنْ حَمِدَهُ "، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ".

৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল খাতমী আল আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারা ইবনে আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন আর তিনি মিথ্যাবাদী নন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলতেন, **سمِعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ** তখন আমাদের মধ্যকার কেউ তার পিঠকে সিজদার জন্য ঝুকিয়ে দিতেন না, যতক্ষণ না রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গমন করতেন। তার সিজদার পর আমরা সিজদায় যেতাম। [সহীহ বুখারী হা/৬৯০ ও মুসলিম হা/৪৭৪]

ইমামের পূর্বে যে মাথা উঠাবে তার মাথা পরিবর্তন হয়ে যাবে (গাধার মাথার মতো হয়ে যাবে) এর অর্থ কী?

প্রথম মত: এই শব্দকে তার বাহ্যিক অবস্থায় রাখতে হবে। বাস্তবেই তার মাথা গাধার মাথায় রূপান্তরিত হবে। হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, শক্তিশালী কথা হচ্ছে এই শব্দকে বাহ্যিক অবস্থার ওপরই নিতে হবে। কেননা হাদীসটি ইবনু হিব্বান মুহাম্মদ ইবনু যিয়াদের সনদে এভাবে নিয়ে আসেন, "আল্লাহ তার মাথাকে কুকুরের মাথায় রূপান্তরিত করবেন"।

দ্বিতীয় মত: হাদীসে রূপান্তরিত করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বোকামি। কেননা গাধা বোকামির গুনে গুণান্বিত। এজন্যই মূর্খ মানুষ, যারা সালাতের ফরয ও ইমামের অনুসরণ বলতে কী বুঝায় তা জানে না তাদের গাধার সাথে তুলনা করে বোকা বলা হয়েছে। ইবনু দাকীকিল ঈদ রহিমাহল্লাহ বলেন, মাজায (রূপক) অর্থটাই এখানে প্রাধান্য পাবে। কারণ অধিকাংশ মুসল্লী ইমামের আগে মাথা তোলা সত্ত্বেও তাদের মাথা গাধার মতো হয় না। সুতরাং এখানে রূপক অর্থেই এটা নেয়া হবে।

তৃতীয় মত: হাদীসে রূপান্তরিত করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে চেহারা বা অবস্থার বিকৃতি উদ্দেশ্য বা চেহারার বিকৃতি ও রূপক অর্থ বোকামি দুটিই উদ্দেশ্য।

(ইহকাম, ১/২০২, ইলাম, ২/৫৪৬, ফাতহুল বারী, ২/১৮৩)

ইমামের পূর্বে উঠার বিধান

লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন এর ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসের বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে ইমামের পূর্বে উঠা হারাম। কেননা হাদীসে চেহারা বিকৃতি করে দেয়ার হুঁশিয়ারী দেয় হয়েছে। আর এটা হচ্ছে খুবই জঘন্য একটা শাস্তি। শারহে মুসলিমে ইমাম নববী রহিমাহল্লাহ এ কথাটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম নববী রহিমাহল্লাহ বলেন, এই কঠোর হুঁশিয়ারী এটাই প্রমাণ করে যে, এই কাজ করা হারাম।

ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, নাহির মূল হচ্ছে এটা হারাম বুঝাবে। বরং কেউ যদি বলে এটা কবীরা গুনাহ তাহলেও এই অর্থটা দূরবর্তী অর্থ নয়। এরপর তিনি বলেন, হাদীসে বর্ণিত হুঁশিয়ারী প্রমাণ করে এ কাজ করা কবীরা গুনাহ। সুতরাং আমরা বলবো, এই লোক কবীরা গুনাহ করেছে, তাই শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তার চেহারাকে বা তার মাথাকে গাধার মাথার মতো করে দিবেন।

(শারহে মুসলিম, ৪২৭, ফাতহুল বারী, ২/৩১৮, শারহুল মুমতি, ৪/১৮১)

ইমামের সাথে মুসল্লীর অবস্থাসমূহ

ইমামের সাথে মুসল্লীর চারটি অবস্থা রয়েছেঃ

১. অনুসরণ করা, ২. সাথে সাথে করা, ৩. আগে করা ও ৪. বিলম্বে করা।

প্রথম অবস্থাঃ অনুসরণ করা।

এর অর্থ হচ্ছে মুসল্লী ইমামের অনুসরণ করবে। যে সকল কাজ দেখা যায় ওই কাজ ইমামের আগে করা যাবে না। যেমন তাকবীর বলা, দাঁড়ানো, বসা, রুকু করা ও সিজদা করা। আর যে কাজ ও কথা দেখা যায় না ওই কাজ ইমামের সাথে বা তার আগে করাতে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ ও অন্যরা বলেন, যে কাজ বাহ্যিকভাবে দেখা যায় ওই কাজে ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। আমি বলছি, ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব এর দলীল হলো এই অধ্যায়ে লেখক আবু হুরায়রা, আয়েশা ও বারা ইবনু আযেব রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম থেকে যে হাদীস নিয়ে এসেছেন তা। মুস্তাহাব হচ্ছে মুসল্লীরা ইমাম সালাতের কোনো কাজ থেকে উঠলে তারা শুরু করবে আর ইমাম ওই কাজ শেষ করলে তারা করবে। এর দলীল লেখক বারা ইবনু আযেব রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সামি আল্লাহু লি মান হামিদা বলতেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় যাওয়ার আগে আমাদের কেউ সিজদায় যাওয়ার জন্য তার পিঠ নোয়াতো না। তিনি সিজদায় যাওয়ার পর আমরা সিজদায় যেতাম।

ইমাম যদি তাড়াতাড়ি করে সালাত পড়ে আর এই সম্ভবনা থাকে যে, তার পরে রুকু বা সিজদায় গেলে তিনি রুকু বা সিজদা থেকে উঠে যাবেন তাহলে ইমামের পরে না গিয়ে সাথে সাথে যাবে। আল্লাহ ভালো জানেন।

(মুগনী, ১/৫২৫, শারহে মুসলিম, ৪১২, মাজমু, ৪/১৩০, শারহুল মুমতি, ৪/১৮৫)

দ্বিতীয় অবস্থাঃ ইমামের সাথে সাথে করা।

এর অর্থ হচ্ছে রুকু সিজদা ও রুকু সিজদা থেকে উঠা এগুলো সব ইমামের সাথে সাথে করা। এমন করার ব্যাপারে বিদ্বানদের মতভেদ আছে।

প্রথম মতঃ এমন করা মাকরূহ। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ থেকে একটি বর্ণনা এমন পাওয়া যায়। তার থেকে আরেকটা বর্ণনায় রয়েছে, সব কাজ ইমামের সাথে সাথে করতে হবে। তবে তাকবীরে তাহরীমা ও সালামে এমন করা যাবে না। এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা অচিরেই আসছে ইনশা আল্লাহ।

দ্বিতীয় মতঃ সালাত বাতিল হয়ে যাবে। এটা কতিপয় হাম্বলীদের মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। কেননা এ বিষয়ে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেখানে ইমামের আগে যেতে নিষেধ করা হয়েছে, ইমামের সাথে সাথে যেতে নিষেধ করা হয়নি। সুতরাং ইমামের সাথে সাথে যাওয়া মাকরূহ, হারাম নয়। আল্লাহ ভালো জানেন।

মুসল্লী তাকবীরে তাহরীমা ইমামের সাথে সাথে বা আগে করলে

প্রথম মতঃ মুসল্লীর সালাত সংঘটিত হবে না। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। তাদের দলীলঃ মুসল্লী ইমাম সালাত শুরু করার আগেই সালাত শুরু করেছে, তাই সালাত বিশুদ্ধ হবে না।

দ্বিতীয় মতঃ আবু হানিফা, ছাওরী, আনবারী, মুহাম্মদ ইবনু হাসান ও যুফার রহিমাহুমুল্লাহ বলেন, সালাত সংঘটিত হয়ে যাবে। যেমন রুকুতে ইমামের সাথে সাথে যাওয়া।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত আল্লাহ ভালো জানেন।

মুসল্লী ইমামের সাথে সাথে সালাম ফিরালে

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের শাইখদের নিকট ও কতিপয় শাফেয়ীদের নিকট মাকরূহ হওয়ার ভিত্তিতে জায়েয আছে। শাফেয়ীদের আরেক মত হচ্ছে জায়েয নেই। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমাদের কতিপয় শাইখ বলেন,

সালাত থেকে বের হওয়ার জন্য নিয়্যাত শর্ত এই কথার ভিত্তিতে এই মতটিই শক্তিশালী। আমি বলছি, সঠিক মত হচ্ছে মাকরূহ হওয়ার ভিত্তিতে জায়েয আছে।

ইমামের আগে মুসল্লীর সালাম ফিরালে তার সালাত কি বাতিল হয়ে যাবে?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসল্লী ইমাম সালাম ফিরানোর পর সালাম ফিরাবে। যদি ইমাম সালাম ফিরানোর আগে সালাম ফিরায় তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তবে যদি সালাত থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার নিয়্যাত থাকে তাহলে এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ মতভেদ রয়েছে। মারদাবী বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে মুসল্লী ইমামের আগে সালাম ফিরালে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর ভুলবশত সালাম ফিরালে সালাত বাতিল হবে না। তার সালামকে গণ্য করা হবে না।

(ইশরাফ, ২/১৫২, মুগনী, ১/৫২৫, মাজমু, ৪/১৩০, শারহে মুসলিম, ৪১২, ইবনু রজব, ৬/১৬৪, শারহুল মুমতি, ৪/১৮৮, ইনসাফ, ২/১৬৮)

তৃতীয় অবস্থা: হচ্ছে ইমামের আগে আগে কাজ করা

এর অর্থ হচ্ছে মুসল্লী রুকু সিজদা ও অন্যান্য কাজ ইমামের আগে আগে করা। লেখক যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেই হাদীসের আলোকে এমন করা হারাম। কিছু বিদ্বান বলেন, এমন করলে কবীরা গুনাহ হবে।

মুসল্লী ইচ্ছাকৃতভাবে ইমামের আগে আগে রুকু সিজদা থেকে মাথা উঠালে তার সালাত কি বাতিল হয়ে যাবে?

প্রথম মত: তার সালাত হয়ে যাবে, তবে গুনাহগার হবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

দ্বিতীয় মত: তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। এটা কতিপয় হাম্বলীদের মত, যাহিরীদের মত ও এটা ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাদের এ মতের ভিত্তি হচ্ছে নাহির চাহিদা হচ্ছে কাজটা ফাসাদ (বাতিল) হওয়া। ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত, যা অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন। আর ইমামের আগে যাওয়া নিষেধ সম্পর্কে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব এ কথা বুঝিয়েছে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে গুনাহগার হয়, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী আমল বাতিল হয় না।

ইমামের উঠার পরে রুকু ও সিজদায় পুনরায় যাওয়ার জন্য কি মুসল্লীকে আদেশ করা হবে?

হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ আলেম ও অন্যান্যরা বলেন, ইমামের উঠার পর মুসল্লীর পুনরায় রুকু ও সিজদায় যাওয়া আবশ্যক। কতিপয় শাফেয়ী মাযহাবের আলেম ও পরবর্তী কিছু হাম্বলী মাযহাবের আলেম বলেন, পুনরায় যাওয়ার জন্য তাকে আদেশ করা হবে না। পুনরায় রুকু ও সিজদায় ফিরে আসলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে সালাতে ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরিক্ত একটা রুকন বৃদ্ধি করেছে।

সঠিক মতঃ সঠিক মত হচ্ছে প্রথম মত আল্লাহ ভালো জানেন।

(মুগনী, ১/৫২৬, মাজমু, ৪/১৩২, ইবনু রজব, ৬/১৪৩, ফাতহুল বারী, ২/১৮৩, শারহুল মুমতি, ৪/১৮৬)

মুসল্লী ভুলবশত ইমামের আগে চলে গেলে

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসল্লী যদি ভুলবশত ইমামের আগে চলে যায় আর সে ইমামকে ওই অবস্থায় পায় তাহলে আমাদের শাইখদের নিকট ও অন্যান্যদের নিকট এটাকে গণ্য করা হবে। তবে ইমাম যুফার রহিমাহুল্লাহ বলেন, গণ্য করা হবে না। মারদাবী বলেন, ভুলবশত বা অজ্ঞতাবশত এমন করলে তার সালাত বাতিল হবে না, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। এখন কথা হলো ওই রাকআত কি বাতিল হবে? এখানে দুইটা মত আছে, তারপর তিনি বলেন, এই মাসআলায় মতভেদের স্থানটা হলো ওই কাজটা ইমামের সাথে না করলে। সুতরাং যদি ইমামের সাথে কাজটা করে ফেলে তাহলে তার রাকআত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। ইবনু তামীম এ কথাটাকে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। ইবনু হামদান বলেন, কাজটা ছুটে গেলে ইমামের সাথে পুনরায় এটা করবে।

(ইবনু রজব, ৬/১৪৩, ইনসাফ, ২/১৬৭)

চতুর্থ অবস্থাঃ ইমামের বিলম্বে করা

আর এটা হচ্ছে মুসল্লী প্রতিটি কাজ ইমামের অনেক পরে করার ফলে মুসল্লীর ইমামের সাথে সালাতের কিছু অংশ ছুটে যায়। এটা দুই ধরনের। ওজরের কারণে ও ওজর ছাড়া। এই ধরনের বিলম্ব যদি ওজরের কারণে হয়। যেমন ঘুমিয়ে গেছে, ভুলে গেছে, ভিড়ের কারণে বা ইমামের তাড়াহুড়োর কারণে। ওই যুগে যেহেতু বিদ্যুৎ ছিল না এজন্য এই মাসআলার তিনটা অবস্থা।

প্রথম অবস্থাঃ ইমাম পরিপূর্ণ একটা রুকুনে মুসল্লীর আগে চলে গেছে। যেমন ইমাম রুকু করে মুসল্লী রুকুতে যাওয়ার আগেই রুকু থেকে উঠে গেছেন এই ক্ষেত্রে মুসল্লীর যা ছুটে

গেছে সে তা করে ইমাম যে অবস্থায় আছে সেখানে আসবে। তার ওপর কোনো কিছুই আবশ্যক নয়। ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই।

দ্বিতীয় অবস্থা: ইমাম পরিপূর্ণ একটা রাকআতে মুসল্লীর আগে চলে গেছেন। ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসল্লী এই ক্ষেত্রেও ইমামের অনুসরণ করবে ও ইমাম যা আগে করে ফেলেছেন তা কাযা করবে। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলেন, যে ইমামের পেছনে ঘুমিয়ে ছিল আর এদিকে ইমাম দু'রাকআত সালাত পড়ে ফেলেছেন, তিনি বলেন, এই ব্যক্তি ওই ব্যক্তির মতো যে ইমামের সাথে দুই রাকআত পেয়েছে। সুতরাং ইমাম সালাম ফিরালে সে আরো দুই রাকআত পড়ে নিবে।

তৃতীয় অবস্থা: ইমাম মুসল্লী থেকে এক রুকুনের চেয়ে বেশি আর এক রাকআতের চেয়ে কম আগে চলে গেছেন তারপর তার ওজর শেষ হয়ে গেছে এই ক্ষেত্রে মত হচ্ছে,

প্রথম মত: মুসল্লী ইমামের অনুসরণ করবে আর ওই রাকআতকে গণ্য করবে না। এটা ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ থেকে একটা মত বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: ইমামকে যদি প্রথম সিজদায় পায় তাহলে অন্যান্য মুসল্লীদের সাথে সিজদা করবে ও এটাকে গণ্য করবে। আর যদি জানে রুকু করতে পারবে না এবং সিজদায় তাদের পাওয়ার আগেই তারা দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠে যাবে তাহলে যা বাকি আছে তাতেই তাদের অনুসরণ করবে। সালামের পর ওই রাকআত কাযা করবে ও সাহু সিজদা দিবে। এটা ইমাম মালেক ও আওযায়ী রহিমাহুমার মত। তবে ইওযায়ী বলেন, সাহু সিজদা দিতে হবে না।

তৃতীয় মত: ইমামের সাথে যা ছুটে গেছে তা করে নিবে, যদিও তা এক রুকন থেকে বেশি হয়। তারপর ইমামের অনুসরণ করবে যতক্ষণ না ইমাম দ্বিতীয় রাকআতের রুকুতে চলে না যায়। রুকুতে চলে গেলে ওই রাকআত বাতিল হয়ে যাবে। তারপর ইমামের সালামের পর তা কাযা করতে হবে। এটা ইমাম শাফেয়ী ও কতিপয় হাম্বলীদের মত। এ মতের দলীল: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভয়ের সালাতের সময় সাহাবীদের নিয়ে এমন করেন। ভয়ের সালাতের এক পদ্ধতিতে আছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পেছনে দুই কাতার দাঁড় করান। এক কাতার সিজদা করে আর দ্বিতীয় কাতার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠার আগ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর তিনি উঠলে দ্বিতীয় কাতার সিজদা করে। প্রয়োজনের সময় এমন করা জায়েয আছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে তৃতীয় মত। এই মতকে ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন, এই ক্ষেত্রে উত্তম মত হচ্ছে (আল্লাহ ভালো জানেন) এটাকে ভয়ের সালাতের সাথে কিয়াস করা। কেননা যে বিষয়ে দলীল নেই ওই বিষয়ে দলীলের নিকটবর্তী কোনো বিষয়ের ওপর আমল করা উত্তম।

(মুগনী, ১/৫২৭, ইবনু রজব, ৬/১৪৪, শারহুল মুমতি, ৪/১৮৬)

মুসল্লী ওজর ছাড়া ইমাম থেকে বিলম্ব করলে কয়েকটি অবস্থাঃ

প্রথম অবস্থাঃ ওজর ছাড়া এক রুকন পরিমাণ বিলম্ব করলে তার সালাত বাতিল হবে না। এটা শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত, হাম্বলীদের একমত। শাফেয়ী ও হাম্বলীদের বিশুদ্ধ মত হচ্ছে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ দুই রুকন পরিমাণ সময় ইমাম থেকে বিলম্ব করেছে। এই ক্ষেত্রে শাফেয়ী ও হাম্বলীরা বলেন, সালাত বাতিল হয়ে যাবে। এ অবস্থায় ও প্রথম অবস্থার ক্ষেত্রে সঠিক মত হচ্ছে সালাত বাতিল হবে না। বরং মুসল্লী গুনাহগার হবে। কেননা এক রুকন ও দুই রুকনের মাঝে পার্থক্যকারী কোনোর দলীল নেই। সুতরাং যা ছুটে গেছে তা পরে পড়ে নিবে। আল্লাহ ভালো জানেন।

তৃতীয় অবস্থাঃ অনুসরণের ক্ষেত্রে বিলম্ব করে। কিন্তু অন্য রুকনে যাওয়ার আগে ইমামকে ওই রুকনের মাঝে পায়। যেমনঃ ইমাম রুকু করছেন আর মুসল্লীর সূরা ফাতিহার কিছু বাকি আছে তাই দাঁড়িয়ে তা পূর্ণ করছে। তারপর রুকু অবস্থায়ই ইমামকে পেয়েছে। এই ক্ষেত্রে সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কাজটা সুন্নাহ বিরোধী হয়েছে। কেননা শরীআতসম্মত হচ্ছে ইমাম রুকুতে গেলে সাথে সাথে রুকুতে যাওয়া, বিলম্ব না করা। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ইমাম রুকু করলে রুকু করো"। অনুরূপ ইমাম সিজদা থেকে উঠে গেছেন আর মুসল্লী সিজদায় দুআ করে জালসায়ে ইস্তিরাহে ইমামকে পেয়ে যায়।

(মুগনী, ১/৫২৮, মাজমু, ৪/১৩০, ইনসাফ, ২/১৬৮, শারহুল মুমতি, ৪/১৮৭)

ইমাম কোনো সুন্নাত ছেড়ে দিলে মুসল্লীও কি ইমামের অনুসরণ করে ওই সুন্নাত ছেড়ে দিবে?

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, কতিপয় বিদ্বান বলেন, ইমাম কোনো সুন্নাত ছেড়ে দিলে মুসল্লীও তার অনুসরণ করে সুন্নাত ছেড়ে দিবে। যেমন রাফউল ইয়াদাইন। তিনি বলেন, ইমাম রাফউল ইয়াদাইন করলে মুসল্লী করবে, আর না করলে করবে না। এটা আবু বকর ইবনু আবী শাইবা রহিমাহুল্লাহর মত।

কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বান তার বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেন, ইমাম ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশত কোনো সুন্নাত ছেড়ে দিলে মুসল্লী তা আদায় করবে। যেমন রাফউল ইয়াদাইন, ছানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ইত্যাদি। কিছু ইমাম মনে করেন এগুলো করা যাবে না, তাই করেন না। এগুলো মুসল্লী করবে, এ ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করবে না।

যে ইমাম সালাতে ত্রুটি করে তার পেছনে মুসল্লীদের সালাত পড়ার বিধান কী?

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম তার সালাতে কোনো ত্রুটি করলে মুসল্লীর সালাতের কোনো সমস্যা হবে না।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ এমন ব্যক্তির পেছনে সালাত পড়ে, যে রুকু ও সিজদা ভালো করে আদায় করে না, কিন্তু মুসল্লী ভালো করে আদায় করে তাহলে তার সালাত হয়ে যাবে। আলকামা ও আওযায়ী রহিমাহুমা এমনটিই বলেছেন।

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয় কোনো ব্যক্তি এমন ইমামের অনুসরণ করছে, যে ইমাম সে প্রথম তাশাহুদ শেষ করার আগেই দাঁড়িয়ে যায় এ ক্ষেত্রে সে কী করবে? উত্তরে তিনি আলকামা রহিমাহুল্লাহর মত নিয়ে এসে বলেন, সে তাশাহুদ পূর্ণ করে তারপর দাঁড়াবে।

সুফিয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়, যে ইমাম রুকু ও সিজদা তাড়াতাড়ি করে আদায় করে তার পেছনে সালাত আদায় করার বিধান কী? তিনি বলেন, তুমি পরিপূর্ণভাবে আদায় করে তার সাথে গিয়ে মিলিত হবে।

ইয়াহইয়া ইবনু আদম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি এক ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় করে পুনরায় ওই সালাত আদায় করি। কারণ সে ভালো করে সালাত পড়েনি।

ইমাম আহমাদ বলেন, যে ইমাম রুকু ও সিজদা ভালো করে আদায় করে না তার সালাত হবে না এবং যারা তার পেছনে সালাত পড়ে তাদেরও হবে না। আবু তালেব এই মত তার থেকে বর্ণনা করেন। ইবনু কাসেম তার থেকে বর্ণনা করেন, পেছনের যারা আছে তারা যদি রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে তাহলে তাদের পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না।

হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ইমামের ভুলের কারণে মুসল্লীদের সালাতে কোনো প্রভাব পড়ে না। যদি তারা ভালো করে তা আদায় করে।

আমি বলছি, হাদীসটি বুখারীতে (৬৯৪) আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তারা তোমাদের সালাত পড়াবে। যদি ভালো করে পড়ায় তাহলে তোমাদের সালাত হয়ে যাবে। আর যদি সালাতে ভুল করে তাহলে তোমাদের সালাত হয়ে যাবে, কিন্তু তাদের সালাত হবে না”।

(আওসাত, ৪/১৬৪, ইবনু রজব, ৬/১৮৩, ফাতহুল বারী, ২/১৮৮)

রুকু থেকে উঠার সময় মুসল্লী যে যিকির বলবে

প্রথম মত: মুসল্লী রুকু থেকে উঠাবস্থায় 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলবে, 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' শেষ পর্যন্ত। এই দুইটা যিকির ইমাম, মুক্তাদী ও একা সালাত আদায়কারী সবার জন্য বলা মুস্তাহাব। এই মত আতা, আবু বুরদা, মুহাম্মদ ইবনু সিরীন, ইসহাক ও দাউদ রহিমাহুমুল্লাহ বলেছেন।

দ্বিতীয় মত: ইমাম ও একা সালাত আদায়কারী শুধু বলবে, 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ' আর মুক্তাদী শুধু 'রব্বানা লাকাল হামদ' বলবে। এটা ইবনু মাসউদ, ইবনু উমার, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম, ইমাম শাবী, মালেক ও আহমাদ রহিমাহুমুল্লাহদের মত।

তৃতীয় মত: ইমাম 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ' ও রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' উভয়টিই বলবে। আর মুক্তাদী শুধু 'রব্বানা লাকাল হামদ' বলবে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' ইমাম, মুক্তাদী ও একা সালাত আদায়কারী সবাই বলবে। আর 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ' শুধু ইমাম ও একা সালাত আদায়কারী বলবে, মুক্তাদী বলবে না। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, "ইমাম 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললে, তোমরা 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলবে"।

(আওসাত, ৩/১৬১, ইস্তিযকার, ৫/৪০৫, মুগনী, ৫০৮-৫১০, মাজমু, ৩/৩৯২, ইবনু রজব, ৭/১৯২), মিসকুল খিতাম ১/৪২২।

বি.দ্র. আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ প্রথম মতকে অগ্রগণ্য বলেছেন। জামিউ তুরাসিল আল্লামা আলবানী ফিল ফিকহ ৫/৩৬৫।

ইমাম দাঁড়াতে অক্ষম হওয়ার কারণে বসে সালাত পড়লে মুক্তাদী কি বসে সালাত পড়বে নাকি দাঁড়িয়ে?

প্রথম মত: দাঁড়াতে সক্ষম মুক্তাদী বসে সালাত পড়ছে এমন ইমামের অনুসরণ করলে বসে সালাত আদায় করবে। এটা উসাইদ ইবনু হুযাইর, জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম, কায়েস ইবনু কাহাদ, মুহাম্মদ ইবনু লাবীদ রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। ইবনু মুনযির ও ইবনু রজব রহিমাহুমা তাদের নাম উল্লেখ করেন। সনদের বাহ্যিক অবস্থা বিশুদ্ধ।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, কোনো সাহাবী এর বিপরীত কথা বলেছেন তা জানা যায়নি। আমি বলছি, এটা অনেক বিদ্বানের মত। ইবনু হিব্বান পূর্বের সালাফদের থেকে ইজমা নকল করে তার সহীহ ইবনু হিব্বানে বলেন, দাঁড়াতে সক্ষম মুক্তাদী বসে সালাত পড়ছে এমন ইমামের অনুসরণ করলে বসে সালাত আদায় করবে এ উম্মতের মাঝে এ মতকে সর্বপ্রথম

বাতিল বলেন, মুগীরা ইবনু মুকসিম। তার থেকেই আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এই মত গ্রহণ করেছেন। এই মতের প্রবক্তাদের দলীল: লেখক আবু হুরায়রা ও আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা।

দ্বিতীয় মত: ওই ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত পড়বে। এটা মুগীরা, হাম্মাদ, আবু হানিফা, ছাওরী, ইবনু মোবারক, মালেক, শাফেয়ী, আবু ছাওর, হুমাইদী ও ইমাম বুখারী রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। এই মতের প্রবক্তাদের দলীল:

বুখারী (৭১৩) ও মুসলিমে (৪১৮) বর্ণিত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা থেকে হাদীস, সেখানে আছে, যে রোগে নাবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেন, সে রোগে থাকাবস্থায় তিনি মানুষদের নিয়ে বসে সালাত পড়ান। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু দাঁড়িয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাতের অনুসরণ করছিলেন। আর মানুষরা আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর সালাতের অনুসরণ করছিল।

অনুরূপভাবে বুখারীতে (১১১৭) বর্ণিত ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, "তুমি দাঁড়িয়ে সালাত পড়বে। দাঁড়িয়ে পড়তে না পারলে বসে পড়বে"। তাদের আরো অনেক দলীল আছে। তারা বলেন, বসে সালাত পড়ছে এমন ইমামের পেছনে বসে সালাত পড়ার আদেশ সংক্রান্ত হাদীস রহিত হয়ে গেছে। অবশ্য ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ এই দাবিকে রদ (খণ্ডন) করেছেন।

সঠিক মত: এ বিষয়ে সঠিক মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। কারণ এ বিষয়ে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর সেখানে আছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রোগে মারা যান ওই রোগের সময় তিনি এভাবে সালাত পড়েন। সুতরাং এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে এটা তাঁর শেষ কাজ ছিল। কিন্তু ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, রোগের কারণে বা অন্য কোনো সমস্যা থাকার কারণে ইমাম দাঁড়াতে না পারলে অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করবে। কেননা মানুষরা তার ইমামতির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মতভেদ করেছে। তাই মতভেদ থেকে বিরত থাকাই উচিত।

(আওসাত, ৪/২০৫, মুগনী, ২/২২০, মাজমু, ৪/১৬১, ইবনু রজব, ৬/১৫৩)

٧٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৭৬. আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন ইমাম আমীন বলবে তার পরেই তোমরাও আমীন বলবে। কারণ যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে। তার পূর্বের যাবতীয় গুনাহকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। [সহীহ বুখারী হা/৭৮০ ও মুসলিম হা/৪১০]

যে সকল ফেরেশতা আমীন বলেন তারা কারা?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, কারা এই ফেরেশতা এই বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, তারা হচ্ছেন সে সকল ফেরেশতা, যারা মানুষের সাথে সব সময় থাকেন। কেউ বলেন, অন্য ফেরেশতা।

হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসের বাহ্যিক অবস্থা দেখে বুঝা যায় সকল ফেরেশতা উদ্দেশ্য। ইবনু বাযীযাহ এই কথাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আরো বলা হয়েছে, এখানে ফেরেশতা দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল ফেরেশতা, যারা সব সময় মানুষের সাথে থাকেন। আর কেউ বলেন, তারা হচ্ছেন যে সকল ফেরেশতা সকাল ও ফজরের সময় আসেন ওই ফেরেশতা।

সঠিক কথা হচ্ছে ফেরেশতা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে আসমান ও জমিনে যে সকল ফেরেশতা ওই সালাতে উপস্থিত থাকেন তারা।

(শারহে মুসলিম, ৪১০, ফাতহুল বারী, ২/২৬৫)

আমীন বলার বিধান

প্রথম মত: ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য আমীন বলা মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: তাদের অনেক দলীল আছে এর মাঝে লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা।

দ্বিতীয় মত: ইমাম আমীন বলবেন না, তার পেছনের মুক্তাদীরা আমীন বলবে। এটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর একটি মত। তার ছাত্রদের কেউ কেউ এই মত গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, 'ইমাম গাইরিল মাগযূবি আলাইহীম ওয়া লাযযাল্লীন' বললে তোমরা আমীন বলবে"। (বুখারী, হা/৭৮২, মুসলিম, হা/৪১৫)।

"ইমাম আমীন বললে তোমরা আমীন বলো" তারা বলেন, এই হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য ফাতিহা শেষ করে যে দুআ করা হয় সেই দুআ উদ্দেশ্য। আরো অন্যান্য কথাও বলেছেন, যা হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় মত: আমীন বলা মুক্তাদীর ওপর ওয়াজিব। হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু বাযীযাহ কতিপয় বিদ্বান থেকে এই মত উল্লেখ করেন। আর মুক্তাদীদের যেহেতু ইমামকে অনুসরণ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে, সেহেতু তাদের ওপর আমীন বলা ওয়াজিব। তিনি বলেন, যাহিরীরা বলেন, প্রত্যেক মুসল্লীর জন্য আমীন বলা ওয়াজিব।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে তৃতীয় মত। কারণ হাদীসে আমীন বলার জন্য আদেশ করা হয়েছে। যেমন লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে হাদীস নিয়ে

এসেছেন। হাদীসটি অন্য শব্দে এভাবে এসেছে, 'ইমাম ওয়া লাযযাল্লীন' বললে, তোমরা আমীন বলবে"। অনুরূপভাবে একাকী সালাত আদায়কারীর ওপরও আমীন বলা ওয়াজিব।

ইমামের ওপর আমীন বলা কি ওয়াজিব?

ইমামের ওপর আমীন বলা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। যেমনটি অধিকাংশ বিদ্বান বলেন। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস দিয়ে দ্বিতীয় মতের পক্ষে যে সকল বিদ্বান মত ব্যক্ত করেছেন ওই হাদীসে তাদের দলীল নেই। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে আমীন বলার স্থান অবগত করানো। আর এটা হচ্ছে ইমাম 'ওয়া লাযযাল্লীন' বলার পর আমীন বলা।

(আওসাত, ৩/১৩১, মুহাল্লা, ২/২৮৬, মুগনী, ১/৪৮৯, মাজমু, ৩/৩৩৪, ইবনু রজব, ৭/৯৫, ফাতহুল বারী, ২/২৬২-২৬৪)

ইমাম আমীন না বললে মুক্তাদী কি আমীন বলবে?

ইমাম আমীন না বললেও মুক্তাদী আমীন বলবে। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ইমাম যখন 'গাইরিল মাগযুবি আলাইহীম ওয়া লাযযাল্লীন' বলবে, তখন তোমরা আমীন বলবে"। (বুখারী, হা/৭৮২, মুসলিম, হা/৪১৫)

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম আমীন না বললে মুক্তাদীর জন্য জোরে আমীন বলা মুস্তাহাব। এতে কোনো মতভেদ নেই। ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ তার 'উম' নামক কিতাবে এ কথা নিয়ে আসেন। বিদ্বানরা আরো একমত হয়েছেন, ইমামকে শুনিয়ে আমীন বলবে, যেন তিনিও আমীন বলেন। আমাদের শাইখরা বলেন, চাই ইমাম ইচ্ছা করে বা ভুল করে আমীন ছেড়ে দিক মুক্তাদীরা তা বলবে।

(মাজমু, ৩/৩৩২, ফাতহুল বারী, ২/২৬৬)

আমীন জোরে বলার বিধান

প্রথম মত: ইমাম ও তার পেছনে যারা আছে সবাই আমীন জোরে বলবে। এটা আতা, আওযায়ী, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক, ইবনু আবী শাইবা ও অধিকাংশ আহলে হাদীসের মত। তাদের দলীল: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, "ইমাম আমীন বললে, তোমরা আমীন বলো"। এই হাদীস প্রমাণ করে ইমামের আমীন মুক্তাদী শুনবে। ওয়ায়েল ইবনু হুজর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম কে 'ওয়া লাযযাল্লীন' আমীন বলতে শুনেছি। আর তিনি আওয়াজ লম্বা করেন। (সহীহুল মুসনাদ, হা/১১৮৮)

আতা রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি দুশো সাহাবী পেয়েছি, যারা ইমাম আমীন বলার পর জোরে আমীন বলতেন।

দ্বিতীয় মতঃ ইমাম ও তার পেছনে যারা আছে সবাই আমীন আস্তে বলবে। এটা হাসান, নাখয়ী, ছাওরী, মালেক, আবু হানিফা ও তার ছাত্রদের মত।

প্রাধাণ্যযোগ্য মতঃ পূর্বের দলীলের আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(মুগনী, ১/৪৯০, মাজমু, ৩/৩৩৪, ইবনু রজব, ৭/৯৬)

মুক্তাদীরা কখন আমীন বলবে?

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুক্তাদীরা ইমামের সাথে সাথে আমীন বলবে, আগেও বলবে না ও পরেও বলবে না, এটাই আমাদের শাইখরা ও ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর ছাত্ররা বলেছেন। তারা বলেন, আমীন ব্যতীত আর কিছু মুক্তাদী ইমামের সাথে সাথে বলবে না বা করবে না। সূরা ফাতিহার পরের এই দুআতে সকলেই শামিল থাকবে। ফেরেশতারাও এই দুআতে আমীন বলে।

সুতরাং ইমাম ও মুক্তাদী সবাই এক সাথে আমীন বলবে, যেন আসমানে ফেরেশতাদের আমীনের সাথে আমীন মিলে যায়। এর দলীল হলো মামার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, "ফেরেশতারা আমীন বলেন আর ইমামও আমীন বলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীসে ইমামের আমীনের সাথে ফেরেশতাদের আমীনকে একত্রিত করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীসের অর্থ হলো, "ইমাম আমীন বললে, তোমরা আমীন বলো" অর্থাৎ ইমাম আমীন বলা শুরু করলে তোমরাও শুরু করো।

আমীনের শব্দ সম্পর্কে আলোচনা

(১) আমীন মদের (লম্বা করে) সাথে পড়া ও মীমকে টেনে না পড়া।

(২) আমীনকে লম্বা না করে পড়া ও মীমকে না টেনে পড়া। ছালাবী ও অন্যরা এই মত দেন। তবে অনেকেই আবার ছালাবীর বিরোধিতা করেন।

(৩) আমীন মদের (লম্বা করে) সাথে পড়া ও মীমকে হালকা করে পড়া। ওয়াহেদী ও হামযা কিসায়ী থেকে এই মত বর্ণনা করেন।

(৪) আমীন মদের (লম্বা করে) সাথে পড়া ও মীমকে তাশদীদ দিয়ে পড়া। ওয়াহেদী বলেন, এটা হাসান বাসারী ও হুসাইন ইবনু আবীল ফযল থেকে বর্ণিত হয়েছে।

কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই মতটি বিরল মত ও প্রত্যাখ্যাত মত। ইবনু সাকান ও সকল ভাষাবিদ বলেন, সাধারণ মানুষ এভাবে পড়ে।

সারকথা হচ্ছে প্রথম মতটিই বেশি গ্রহণযোগ্য। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আলেমদের নিকট প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে আমীন মদের (লম্বা করে) সাথে পড়া ও মীমকে টেনে না পড়া। আর এভাবেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

(মাজমু, ৩/৩২৯, ইবনু রজব, ৭/৯৩)

٧٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –: أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

৭৭. আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যখন তোমাদের কেউ লোকদের সালাত পড়িয়ে দিবে তথা ইমামতি করবে, সে যেন হালকা করে সালাত আদায় করে। কারণ সালাতের জামাআতে দুর্বল, অসুস্থ এবং কর্মব্যস্ত লোক রয়েছে। আর যখন তোমাদের কেউ একাকী নিজে নিজে সালাত আদায় করবে সে যেন ইচ্ছামত সালাত দীর্ঘ করে আদায় করে। [সহীহ বুখারী হা/৭০৩ ও মুসলিম হা/৪৬৭]

٧٨. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ! فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ.

৭৮. আবূ মাসউদ আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের সালাতের জামাআতে উপস্থিত হই না। কারণ সে ফজরের সালাতে দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করে। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলোচনায় এতো কঠিনভাবে রাগান্বিত হতে দেখি, সে দিনের রাগের মত আলোচনার মাঝে আর আমি কোনোদিন ততটা রাগান্বিত হতে দেখিনি। অতঃপর তিনি বললেন: হে মানব মণ্ডলী, তোমাদের মধ্যে কতক এমন লোক রয়েছ যে লোকদেরকে (জামাআতের প্রতি) ভীতশ্রদ্ধ

করে ফেলে। অতএব, তোমাদের কেউ লোকদের ইমামতি করলে সে যেন সালাত সংক্ষেপ করে। কেননা, তার পিছনে মুক্তাদীদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কর্ম ব্যস্ত লোকও আছে। [সহীহ বুখারী হা/৭০৪ ও মুসলিম হা/৪৬৬]

١٤-بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অধ্যায়: ১৪-নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাতের বিবরণ

٧٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: "اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ".

৭৯. আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে যখন তাকবীর তাহরীমা প্রদান করতেন, তখন কিরাআত পাঠ করার পূর্বে সামান্য সময় নীরব থাকতেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার বাবা মা আপনার জন্য কুরবান হোক। তাকবীর ও কির'আতের মাঝে নীরব থাকা সময়ে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন: আমি (নিম্নোক্ত) দু'আ (ছানা) বলি:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে গোনাহ সমূহ হতে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন করুন যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোনাহ সমূহ কে ধুয়ে সাফ করে দিন পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা, ও শিশির দ্বারা। [সহীহ বুখারী হা/৭৪৪ ও মুসলিম হা/৫৯৮]

সালাতের শুরুতে ছানা পড়ার বিধান

প্রথম মত: সালাতের শুরুতে ছানা পড়া মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈন ও তৎপরবর্তী বিদ্বানদের মত। তাদের দলীল: এ বিষয়ে বহু মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীস রয়েছে যে, সালাতের শুরুতে ছানা পড়বে।

দ্বিতীয় মত: সালাতের শুরুতে ছানা পড়া শরীআতসম্মত নয়। এটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মত। তার দলীল, সালাতে ভুলকারীর হাদীস, সেখানে ছানার কথা উল্লেখ নেই ও বুখারী মুসলিমে বর্ণিত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর ও উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা তারা 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বীল আলামীন' দিয়ে সালাত শুরু করতেন।

তৃতীয় মত: সালাতের শুরুতে ছানা পড়া ওয়াজিব। কেউ ছেড়ে দিলে পুনরায় সালাত পড়তে হবে। এটা ইবনু বাত্তা ও অন্যান্যদের মত।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম আহমাদ থেকে একটি বর্ণনা আছে ও হাকাম বলেন, সালাতের শুরুতে 'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ' বললে এটাই ছানার জন্য যথেষ্ট। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে ছানা পড়া ওয়াজিব। ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ ইচ্ছা করে ছানা ছেড়ে দিলে সে ভুল কাজ করলো, তবে সালাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব নয়।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত আর তা হচ্ছে সালাতের শুরুতে ছানা পড়া মুস্তাহাব। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছানা পড়ার জন্য আদেশ সূচক কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে কথা হচ্ছে কেউ ইচ্ছা করে বা ভুল করে সালাতের শুরুতে ছানা না পড়লে তার ওপর কোনো কিছু আবশ্যক নয়। আল্লাহ ভালো জানেন। আর দ্বিতীয় মত যেটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন এটার উত্তর ইবনু কুদামা ও ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ দিয়েছেন।

(আওসাত, ৩/৮১, মুগনী, ১/৪৭৩, মাজমু, ৩/২৮৭, ইবনু রজব, ৬/৩৬৮)

ফরয ও নফল সকল সালাতে প্রত্যেক মুসল্লীর জন্য ছানা পড়া মুস্তাহাব

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ মাজমুতে (৩/২৭৫) বলেন, সকল সালাতে ইমাম, মুক্তাদী, একাকী সালাত আদায়কারী, নারী, বালক, মুসাফির, ফরয সালাত ও নফল সালাত আদায়কারী, বসে সালাত আদায়কারী ও শুয়ে সালাত আদায়কারী সকলের জন্য তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া মুস্তাহাব। কেউ ইচ্ছা করে বা ভুল করে ছানা না পড়ে আউযুবিল্লাহ শুরু করে দিলে তাকে পুনরায় ছানা পড়তে হবে না। কারণ ছানা পড়ার স্থান চলে গেছে এবং বাকি রাকআতেও আর ছানা পড়তে হবে না। শাইখ আবু হামেদ তার তালিকে বলেন, ছানা না পড়ে আউযুবিল্লাহ শুরু করলে আউযুবিল্লাহ পড়ার পর পুনরায় ছানা পড়বে। কিন্তু সঠিক মত

হচ্ছে প্রথমটি । এ মতকেই লেখক সাহু সিজদা অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন। অধিকাংশ বিদ্বানের মতও এটাই। ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ তার আল 'উম নামক কিতাবে এই কথাই নিয়ে এসেছেন।

ইমামকে দাঁড়ানো অবস্থায় পেলে ও ইমামের কী পরিমাণ কিরাত বাকি আছে এটা না জানার কারণে ইমাম রুকুতে চলে গেলে করণীয় কী

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ মাজমুতে (৩/২৭৬) বলেন, ইমামকে দাঁড়ানো অবস্থায় পেলে আর সে মনে করছে ছানা, আউযুবিল্লাহ ও ফাতিহা পড়তে পারবে তাহলে এগুলো পড়বে। ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ তার আল 'উম নামক কিতাবে এই কথাই বলেছেন ও তার ছাত্ররাও এ কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আর সে যদি মনে করে এগুলো পড়তে পারবে না বা তার সন্দেহ হচ্ছে তাহলে এ ক্ষেত্রে ছানা পড়বে না। সে যদি এগুলো পড়ে, যার ফলে তার ফাতিহা শেষ করার আগে ইমাম রুকুতে চলে যায় তাহলে সে কি ইমামের সাথে রুকু করবে? ফাতিহা ছেড়ে দিবে নাকি ফাতিহা পড়ে ইমামের পরে রুকুতে যাবে?

এ বিষয়ে অনেক প্রসিদ্ধ মতভেদ আছে। আমি বলছি, সঠিক কথা হচ্ছে সে ইমামের সাথে রুকু করবে। কারণ হাদীস হচ্ছে, "ইমাম রুকু করলে রুকু করো"। তিনি রহিমাহুল্লাহ বলেন, সে যদি মনে করে ছানা, আউযুবিল্লাহ ও ফাতিহার কিছু পড়তে পারবে, পরিপূর্ণ পারবে না তাহলে সাধ্যানুযায়ী যতটুকু পারে ততটুকু পড়বে। ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ তার আল 'উম নামক কিতাবে এই কথাই বলেছেন।

তাকবীরে তাহরীমার পর ও আউযুবিল্লাহ শুরু করার আগে ছানা পড়া

ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ সাইলুল জাররার (১/৪৭৯) কিতাবে বলেন, আমি বলছি, যার হাদীসের জ্ঞান আছে ও যার ইনসাফ আছে সে অবশ্যই জানে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছানার পর আউযুবিল্লাহ বলতেন। কোনো জ্ঞানী এতে কোনো সন্দেহ করবে না যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়তেন ও কিরাত শুরু করার আগে আউযুবিল্লাহ বলতেন।

٨٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِـ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ

الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ.

৮০. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে সালাত আরম্ভ করতেন। আর কিরাআত শুরু করতেন { الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ } দিয়ে। যখন তিনি রুকূ করতেন তখন মাথা বেশি উঁচুও করতেন না আবার বেশি নিচুও করতেন না বরং এর মাঝামাঝি রাখতেন। যখন রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করতেন সোজা হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সিজদায় যেতেন না। আর সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত পুনরায় সিজদায় যেতেন না। আর তিনি প্রতি দুই রাকআ'তে একবার আত্তাহিয়াতু পড়তেন। আর বসার সময় তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। তিনি শয়তানের বসার মত বসতে নিষেধ করতেন এবং কোনো ব্যক্তিকে তার সালাতে দুই হাত হিংস্র জন্তুর মত বিছিয়ে দিতে নিষেধ করতেন এবং সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করতেন। [সহীহ মুসলিম হা/৪৯৮]

٨١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ:" سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

৮১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন, তখন তার দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। যখন রুকূর জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ হাত উঠাতেন এবং সামিআল্লাহু লিমান হামীদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদ বলতেন। কিন্তু তিনি সিজদায় এরূপ করতেন না। [সহীহ বুখারী হা/৭৩৫, মুসলিম হা/৩৯০]

তাকবীরে তাহরীমার সময় দুহাত উঠানোর বিধান

প্রথম মত: তাকবীরে তাহরীমার সময় দুহাত উঠানো ওয়াজিব। এটা আওযায়ী, হুমাইদী, আলী ইবনু মাদীনী, আবু বকর ইবনু আবী শাইবা, জাওযানী, দাউদ, ইবনু হাযম ও শাফেয়ী মাযহাবের আহমাদ ইবনু সিয়ার রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। তাদের মাঝে কেউ কেউ বলেন, হাত না উঠালে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তারা দলীল দিয়েছেন লেখক ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেটা এবং এই হাদীস, "তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ, সেভাবে সালাত আদায় করবে"। তাদের

আরো দলীল হলো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠিয়েছেন।

দ্বিতীয় মত: তাকবীরে তাহরীমার সময় দুহাত উঠানো সুন্নাহ, এটা সালাতের রুকন ও ফরয নয়। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: লেখক ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেটা। তারা বলেন, হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত উঠানোর জন্য আদেশ করেননি, বরং এটা তাঁর শুধুমাত্র কাজ।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে হাত উঠানো ওয়াজিব। আর কেউ হাত না উঠালে তার সালাত বাতিল হবে না। আল্লাহ ভালো জানেন।

(আওসাত, ৩/২৬২, মুহাল্লা, ২/২৪৬, মুগনী, ১/৪৬৯, শারহে মুসলিম, ৩৯০, ইবনু রজব, ৬/৩২১, ফাতহুল বারী, ২/২১৮)

বি.দ্র. তাকবীরে তাহরীমার সময় দুহাত উঠানো সুন্নাহ। আল লুবাব পৃ. ১৪৮, আল ওয়াজিজ পৃ. ৯৭, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৪৩।

রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠে দুহাত উঠানোর বিধান

প্রথম মত: রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠে দুহাত উঠানো মুস্তাহাব। এটা সাহাবী, তাবেঈ ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: লেখক ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেই হাদীস। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ বিষয়ে সতেরজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠে দুহাত উঠানো ওয়াজিব। এই মত আওযায়ী, কিছু যাহিরী ও আলী ইবনু মাদীনী রহিমাহুল্লাহুর বাহ্যিক মত। তিনি বলেন, ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের কারণে মুসলিমদের ওপর হক হচ্ছে রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠে দুহাত উঠানো।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠে দুহাত উঠানো ওয়াজিব নয় ও হাত না উঠালে সালাতও বাতিল হবে না। তবে দাউদ যাহিরী ও কিছু বিদ্বানের বিরল মত আছে যে, সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

তৃতীয় মত: তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সালাতের আর কোনো স্থানে হাত উঠাবে না। এটা আবু হানিফা, ছাওরী, ইবনু আবী লাইলা, সকল আহলে রায় তাদের মত এবং ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ থেকে এমন একটা মত বর্ণিত হয়েছে। কিছু হানাফী বলেন, হাত উঠালে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। পশ্চিমের কিছু হানাফী বলেন, হাত উঠানো বিদআত। তারা এ বিষয়ে এমন দলীল দিয়েছেন যা সুসাব্যস্ত নয়।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠে দুহাত উঠানো ওয়াজিব। কিন্তু কেউ যদি হাত না উঠায় তাহলে তার সালাত বাতিল হবে না। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের কারণে ও এই হাদীসের কারণে, "তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ, সেভাবে সালাত আদায় করবে"। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীরা সব সময় হাত উঠাতেন। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, কোনো সাহাবী থেকে প্রমাণিত হয়নি যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বর্জন করেছেন।

(মুগনী, ১/৪৯৭, মাজমু, ৩/৩৬৭, ইবনু রজব, ৬/৩২৮, ফাতহুল বারী, ২/২১৯)

বি.দ্র. রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠে দুহাত উঠানো মুস্তাহাব। আল লুবাব পৃ. ১৪৮, আল ওয়াজিজ পৃ. ৯৭, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৪৩।

প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠে দুহাত উঠানোর বিধান

প্রথম মত: প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠে দুহাত উঠানো মুস্তাহাব। এটা ইমাম বুখারী ও নাসাঈ রহিমাহুমার মত। এই মত তারা তাদের কিতাবে উল্লেখ করেন। এমনিভাবে এটা ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা, তাউস, নাফে, আতা, আবু বকর ইবনু ইসহাক, ইবনু মুনযির, ইবনু খুযাইমা, আবু আলী তাবারানী, বাইহাকী, বাগাবী, আহমাদ ও শাফেয়ীর একমত রহিমাহুমুল্লাহ।

ইমাম খাত্তাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা অধিকাংশ আহলে হাদীসের মত। তাদের দলীল: বুখারীতে (৭৩৯) বর্ণিত ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'রাকআত পড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত উঠাতেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'রাকআত পড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত উঠাতেন মর্মে আবু হুমাইদ, আলী ইবনু আবী তালেব ও আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা আবু দাউদ ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় মত: দু'রাকআত পড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত উঠানো মুস্তাহাব নয়। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। এমনকি আবু হামেদ ইসফারানী এ বিষয়ে ইজমা দাবি করেছেন। তিনি বলেন, হাত উঠানোর কথা যে সকল হাদীসে এসেছে তা রহিত হয়ে গেছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। কারণ এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারীতে বর্ণিত ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস মারফু নাকি মাওকুফ এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু এ ছাড়াও অন্যান্য হাদীস আছে। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসকে অনেক বিদ্বান মারফু বলেছেন। তাদের মাঝে ইমাম বুখারী একজন।

সিজদায় যাওয়ার সময় ও সিজদা থেকে উঠে দুহাত উঠানোর বিধান

প্রথম মত: সিজদায় যাওয়ার সময় ও সিজদা থেকে উঠে দুহাত উঠানো শরীআতসম্মত নয়। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: লেখক ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেখানে তিন স্থানে হাত উঠানোর কথা বলা হয়েছে। তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকুর সময় ও রুকু থেকে উঠে। তারপর তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় যাওয়ার সময় হাত উঠাতেন না। বুখারীর শব্দে এভাবে বলা হয়েছে, "সিজদায় যাওয়ার সময় ও সিজদা থেকে উঠে তিনি হাত উঠাতেন না"। মুসলিমের শব্দ হচ্ছে, "তিনি দুই সিজদার মাঝে হাত উঠাতেন না"।

দ্বিতীয় মত: সিজদায় যাওয়ার সময় ও সিজদা থেকে উঠে দুহাত উঠানো মুস্তাহাব। এটা ইবনু মুনযির ও আবু আলী তাবারানী রহিমাহুমার মত। তাদের দলীল: নাসাঈতে (১০৮৫) মালেক ইবনু হুয়াইরিছ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে উঠার পর, সিজদায় যাওয়ার সময় ও সিজদা থেকে উঠে কান বরাবর হাত উঠাতে দেখেছেন। (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫৬০০)

হাদীসটি এই শব্দে উল্লেখ করার পর ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা বিশুদ্ধ হাদীস। তবে সাঈদ ইবনু আরুবার ব্যাপারে মতভেদ আছে। কারণ মুসলিমে (৩৯১) ও নাসাঈতে (১০২৪) হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে 'সিজদায় যাওয়ার সময় ও সিজদা থেকে উঠে হাত উঠাতেন' কথা নেই। হাদীসটি অন্য সনদে মুসলিমে ও নাসাঈতে (৮৮০) বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেখানে 'সিজদায় যাওয়ার সময় ও সিজদা থেকে উঠে হাত উঠাতেন' কথা নেই। হাদীসটি ইমাম বুখারী (৭৩৭) ও মুসলিম (৩৯১) আবু কিলাবা, তিনি মালেক ইবনু হুয়াইরিছ থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সেখানেও এই অতিরিক্ত অংশটুকু নেই। সুতরাং এই অতিরিক্ত অংশ অর্থাৎ 'সিজদায় যাওয়ার সময় ও সিজদা থেকে উঠে হাত উঠাতেন' শায। আল্লাহ ভালো জানেন। এ মতের প্রবক্তাদের আরো দলীল আছে। কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন, কিছু আহলে হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে 'সিজদায় যাওয়ার সময় ও সিজদা থেকে উঠে হাত উঠাতে হবে। এ বিষয়ে অনেক আসার বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(ইকমালুল মুয়াল্লিম, ২/২৬১, ইবনু রজব, ৬/৩৫০, ফাতহুল বারী, ২/২২৩)

প্রত্যেক উঠা নামার সময় দুহাত উঠানোর বিধান

প্রথম মত: প্রত্যেক উঠা নামার সময় দুহাত উঠানো মুস্তাহাব নয়। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: লেখক ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা।

দ্বিতীয় মত: প্রত্যেক উঠা নামার সময় দুহাত উঠানো মুস্তাহাব। এটা ইবনু হাযম ও আহমাদের একটি মত। ইমাম আহমাদের কিছু ছাত্র বলেছেন, হাত উঠানো জায়েয আছে। তাদের দলীল: এ বিষয়ে আনাস, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক উঠা নামার সময় দু'হাত উঠাতেন। জাবের ও ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে হাদীস এসেছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক তাকবীরের সময় হাত উঠাতেন। তবে এই হাদীসগুলো বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয় এবং সবগুলো মিলেও প্রমাণযোগ্য নয়। সব হাদীসগুলো ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করে প্রত্যেকটার দুর্বল হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। তারা পূর্বে বর্ণিত মালেক ইবনু হুয়াইরিছ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস দিয়ে দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এই মাসআলায় তা প্রমাণিত নয়।

সারকথা: সারকথা হচ্ছে চার স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে হাত উঠানো যাবে না। তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে উঠে ও প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠে।

(মুহাল্লা, ৩/৩, ইবনু রজব, ৬/৩৫৫)

তাকবীরের সাথে হাত উঠানোর অবস্থাসমূহ

প্রথম মত: তাকবীরে তাহরীমার সাথে সাথে হাত উঠাবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। এর ওপরই ইমাম বুখারী অধ্যায় বেঁধেছেন। তাদের দলীল: লেখক ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। বুখারীতে (৭৩৮) হাদীস এসেছে, "তাকবীর দেয়ার সময় তিনি হাত উঠান"।

দ্বিতীয় মত: আগে হাত উঠাবে তারপর তাকবীর দিবে। এটা ইসহাক রহিমাহুল্লাহু ও হানাফিদের বিশুদ্ধ মত, শাফেয়ীদের মত ও ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর একমত। তাদের দলীল: লেখক ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা মুসলিমের বর্ণনায় এভাবে এসেছে, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাঁড়ালে কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলে তারপর তাকবীর দিতেন"।

তৃতীয় মত: আগে তাকবীর দিবে তারপর হাত উঠাবে। হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, যারা বলেন, আগে তাকবীর ও পরে হাত উঠাবে তাদের আমি কিছু মনে করি না।

শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হ্যাঁ, এটা হানাফী মাযহাবের একটি মত। আমি বলছি, এ মতের দলীল: মুসলিমে (৩৯১) বর্ণিত মালেক ইবনু হুয়াইরিছ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত পড়লে তাকবীর দিতেন তারপর হাত উঠাতেন।

সারকথা: সারকথা হচ্ছে উপরে বর্ণিত প্রত্যেকভাবেই হাত উঠানো জায়েয আছে। কারণ প্রত্যেকটা হাদীসই প্রমাণিত। এজন্যই আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হক কথা হচ্ছে এই সকল পদ্ধতিতেই হাত উঠাবে। কখনো এক সাথে কখনো আগে ও কখনো পরে। এভাবে আমল করলে সব হাদীসের ওপর আমল হবে।

(মুগনী, ১/৪৭১-৪৯৭, মাজমু, ৩/২৬৪, ইবনু রজব, ৬/৩২৩, ফাতহুল বারী, ২/২১৮, তামামুল মিন্নাহ, ১৭৩)

সালাতে কোন পর্যন্ত হাত উঠাবে?

প্রথম মত: কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: লেখক ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। এমনিভাবে বুখারীতে (৮২৮) বর্ণিত আবু হুমাইদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাতে কাঁধ বরাবর হাত উঠাতে দেখেছি।

দ্বিতীয় মত: কান পর্যন্ত উঠাবে। এটা নাখয়ী, আবু হানিফা, ছাওরী ও ইমাম আহমাদের একমত রহিমাহুমুল্লাহ। তাদের দলীল: মুসলিমে (৩৯১) বর্ণিত মালেক ইবনু হুয়াইরিছ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর দিলে কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন। অন্য বর্ণনায় আছে, কানের লতি বরাবর হাত উঠাতেন।

তৃতীয় মত: মুসল্লীর ইচ্ছা, চাইলে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে বা কান পর্যন্ত উঠাবে। এটা ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর একটি মত ও তার কিছু ছাত্র এই মতকে পছন্দ করেছেন। ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা কতিপয় আহলে হাদীসের মত। আর এই মতটি সুন্দর।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে তৃতীয় মত। উভয় পক্ষের দলীল প্রমাণিত বিধায় এ বিষয়ে স্বাধীনতা আছে। ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, কিছু বিদ্বান বলেন, এ বিষয়ে প্রশস্ততা রয়েছে। আর এই মতটা বিশুদ্ধ। ইমাম তাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসে মতভেদ আছে বিধায় অবস্থার ক্ষেত্রে মতভেদ নেই। তবে কথা হচ্ছে প্রথম মতানুযায়ী আমল করা উত্তম। কারণ তাদের দলীলগুলো একটু বেশি বিশুদ্ধ। এজন্যই ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস অনুযায়ী আমল করাকে বেশি পছন্দ করি।

(ইশরাফ, ২/৬, মুফহিম, ২/২০, ইবনু রজব, ৬/৩৩৯)

সালাতে হাত কীভাবে উঠাবে?

প্রথম মত: হাত উঠানোর সময় আঙ্গুলগুলোকে সোজা করবে ও একটা আরেকটার সাথে মিলানো মুস্তাহাব। এটা হাম্বলীদের মত। তাদের দলীল: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাঁড়িয়ে হাত উঠালে সম্প্রসারণ করতেন।(তিরমিযী, হা/২৪০, আহমাদ, ২/৪৩৪, এর সনদ বিশুদ্ধ)

দ্বিতীয় মত: আঙ্গুলগুলোকে ছড়িয়ে রাখা সুন্নাহ। এটা ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর মত। তার দলীল: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের জন্য যখন তাকবীর দিতেন, তখন আঙ্গুলগুলোকে ছড়িয়ে রাখতেন। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২৩৯) বর্ণনা করেন। হাদীসের সনদ দুর্বল। কেননা হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামানের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আর তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। আবু হাতেম বলেন, এখানে ইয়াহইয়ার ভুল হয়ে গেছে। তিনি মূলত উদ্দেশ্য নিয়েছেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন হাত প্রসারিত করে উঠাতেন। এমনটিই ইবনু আবী যিব এর নির্ভরযোগ্য ছাত্ররা বর্ণনা করেছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(ইকমালুল মুয়াল্লিম, ২/২৬৩, মুফহিম, ২/২০, মুগনী, ১/৪৭০, নাইলুল আওতার, ৩/২৯)

৮২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ – وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.

৮২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি সাতটি অঙ্গ প্রতঙ্গের ওপর সাজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি: কপালের ওপর, তিনি স্বীয় হাত দ্বারা নিজের কপালের দিকে ইশারা করে দেখালেন, দুই হাতের ওপর, দুই হাঁটুর ওপর এবং দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহের ওপর। [সহীহ বুখারী হা/৮১২, মুসলিম হা/৪৯০]

সাত অঙ্গের ওপর সিজদা করার বিধান

সাত অঙ্গের ওপর সিজদা করা এটা পরিপূর্ণ সিজদা এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। বিদ্বানদের মতভেদ হলো কয় অঙ্গের ওপর সিজদা করা ওয়াজিব এ নিয়ে।

প্রথম মত: সাত অঙ্গের ওপর সিজদা করা ওয়াজিব। এটা ইমাম শাফেয়ীর দুই মতের একটি মত। এই মতকে তার ছাত্র কাছীর প্রাধান্য দিয়েছেন। এটা আহমাদের বিশুদ্ধ প্রসিদ্ধ মত ও

এটা তার অনেক ছাত্রের মত। এমনিভাবে এটা ইমাম মালেক, ইসহাক, যুফার ও তাউস থেকে বর্ণিত হয়েছে রহিমাহুমুল্লাহ। তাদের দলীল: লেখক ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। সেখানে সাত অঙ্গের ওপর সিজদা করার জন্য আমর (আদেশ) এসেছে। আর আমরের চাহিদা হলো এটা ওয়াজিব বুঝায়।

দ্বিতীয় মত: শুধু কপালের ওপর সিজদা করা ওয়াজিব। এটা আবু হানিফা, তার দুই ছাত্র, শাফেয়ীর দ্বিতীয় মত ও আহমাদের একটি মত। ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা অধিকাংশ ফকীহর মত। তাদের দলীল: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী, "আমার চেহারা সিজদা করেছে"। তারা বলেন, এই হাদীস প্রমাণ করে সিজদা শুধু চোরায় হবে। আর চেহারার ওপর সিজদাকারীকে সিজদাকারী বলা হয়। অন্য অঙ্গ এর ওপর সিজদাকারীকে সিজদাকারী বলা হয় না।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত প্রথম মত আর তা হচ্ছে সাত অঙ্গের ওপর সিজদা করা ওয়াজিব। মিসকুল খিতাম ১/৪৪৬।

সাত অঙ্গের ওপর সিজদা না করলে সালাত কি বিশুদ্ধ হবে?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম শাফেয়ীর দ্বিতীয় মত অর্থাৎ 'সাত অঙ্গের ওপর সিজদা করা ওয়াজিব' এর ওপর ভিত্তি করে কথা হলো কোনো অঙ্গের ওপর যদি সিজদা করা না হয় তাহলে সালাত বিশুদ্ধ হবে না।

আমি বলছি, এ বিষয়ে শাইখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহর আলোচনা অচিরেই আসছে ইনশাআল্লাহ। আমি মনে করি কিছু অঙ্গের ওপর সিজদা করলে সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যক্তি গুনাহগার হবে। আর যারা বলেছেন, সালাত বাতিল হয়ে যাবে তাদের এই মতের ব্যাপারে কথা আছে। আল্লাহ ভালো জানেন।

(আওসাত, ৩/১৮০, মুগনী, ১/৫১৫, শারহে মুসলিম, ৪৯০, মাজমু, ৩/৪০২, ইবনু রজব, ৭/২৫২, নাইলুল আওতার, ৩/২০৪, শারহুল মুমতি, ৩/১১৬)

নাক ও কপালের ওপর সিজদা করার বিধান

প্রথম মত: নাক ও কপালের ওপর সিজদা করা ওয়াজিব। এটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মত, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর একমত, ইসহাক, আবু খাইছামা, ইবনু আবী শাইবা, ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহুর একমত, তার পরবর্তী কিছু ছাত্র এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে তিনি যিকির করাবস্থার সাথে এই বিষয়টাকে খাস করেছেন। এই মত তাউস, নাখয়ী, সাঈদ ইবনু যুবায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নাকের ও কপালের ওপর সিজদা করাই হলো প্রকৃত সিজদা।

তাউসকে জিজ্ঞেস করা হয়, নাক কি কপালের অন্তর্ভুক্ত? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, নাক কপালের উত্তম অঙ্গ। তাদের দলীল: লেখক ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। কেননা হাদীসে দুটিকে একটি অঙ্গ ধরা হয়েছে; যদিও দুটি আলাদা অঙ্গ। কারণ যদি হাদীসে এই দুটিকে দুই অঙ্গ ধরা হতো তাহলে আট অঙ্গ হয়ে যেত। মুসলিমের বর্ণনায় আছে, "আমাকে সাত অঙ্গের ওপর সিজদা করতে আদেশ করা হয়েছে, কপাল, নাক"।

দ্বিতীয় মত: কপালের ওপর সিজদা করা ওয়াজিব। নাকের ওপর যথেষ্ট নয়। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: লেখক ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে কপালের কথা বলেছেন, কেননা তা হলো আসল। আর নাক হলো কপালের অনুগামী।

তৃতীয় মত: স্বাধীনতা আছে। চাইলে শুধু কপালের ওপর করবে অথবা শুধু নাকের ওপর করবে। এটা আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহুর মত। ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ ব্যতীত এই মত কারো কাছ থেকে বর্ণিত হয়নি।

অগ্রগণ্য মত: প্রথম মত। আল্লাহই ভালো জানেন।

(আওসাত, ৩/১৭৪, মাজমু, ৩/৩৯৯, শারহে মুসলিম, ৪৯০, ইবনু রজব, ৭/২৫৬, নাইলুল আওতার, ৩/২০৭)

কিছু অঙ্গের ওপর সিজদা করলে কি যথেষ্ট হবে?

প্রথম মত: হাতের ওপর ও কপালের কিছু অংশের ওপর সিজদা করলে যথেষ্ট হবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। বরং কতিপয় হাম্বলী মাযহাবের ইমাম এর ওপর ইজমা দাবি করেন।

দ্বিতীয় মত: দুই হাতের তালুর ওপর সিজদা করা ওয়াজিব। এটা যুহাইর ইবনু হারব ও হাম্বলী মাযহাবের ইবনু হামেদের মত। দাউদ ইবনু সোলাইমা আল হাশেমী বলেন, হাতের অধিকাংশ তালু মাটিতে রাখলে যথেষ্ট হবে। ইমাম শাফেয়ী ও তার অধিকাংশ ছাত্রের মত হচ্ছে কপালের কিছু অংশের ওপর সিজদা করলে মাকরূহ হবে, তবে যথেষ্ট হয়ে যাবে। তার কিছু ছাত্রের আরেকটা মত হচ্ছে সম্পূর্ণ কপালের ওপর সিজদা না করলে যথেষ্ট হবে না।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসের বাহ্যিক অবস্থা থেকে বুঝা যাচ্ছে কিছু অঙ্গের ওপর সিজদা করলে যথেষ্ট হবে। কেননা হাতের ওপর সিজদা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে আর এর ওপর সিজদা করা হয়েছে। এমনিভাবে কেউ যদি পায়ের পিঠের ওপর সিজদা করে তাহলে তার সিজদা হয়ে যাবে। কেননা সে পায়ের ওপর সিজদা করেছে।

কারণ পায়ের কিছু অঙ্গ এমনিতেই জমিনে লেগে গেছে। সুতরাং পায়ের অন্যান্য অঙ্গও সিজদা করেছে। কিন্তু কেউ যদি শুধু কিছু অঙ্গের ওপর সিজদা করে তাহলে সে উত্তম কাজ ছেড়ে দিয়েছে। (মুগনী, ১/৫২০, ইবনু রজব, ৭/২৫৩)

সাত অঙ্গের ওপর সিজদা করেছে, কিন্তু সিজদার মাঝে কোনো অঙ্গ উঠিয়ে ফেললে তার বিধান কী?

ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ শারহুল মুমতিতে (৩/১১৬) বলেন, কেউ যদি সিজদার মাঝে কোনো অঙ্গ উঠিয়ে ফেলে; যেমনঃ এক পা চুলকাচ্ছে আরেক পা উঠিয়ে, তাহলে এ ক্ষেত্রে কথা আছে। বলা হয়েছে, তার সালাত বিশুদ্ধ হবে না, কেননা সে সিজদা করার ক্ষেত্রে রুকন ছেড়ে দিয়েছে।

আবার কেউ বলেছেন, সালাত যথেষ্ট হয়ে যাবে। কেননা সাধারণত বিধান বর্তায় অধিকাংশের প্রতি লক্ষ্য করে। আর সে যেহেতু অধিকাংশ সময় সাত অঙ্গের ওপর সিজদা করেছে, সেহেতু তার সালাত হয়ে যাবে। সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে কথা হচ্ছে সতর্কতাবশত অঙ্গ উঠাবে না, যদিও অঙ্গ চুলকায়। এ ক্ষেত্রে হাত, পা বা উরুতে চুলকাতে চাইলে না চুলকিয়ে ধৈর্যধারণ করবে। সিজদা থেকে উঠে তারপর চুলকাবে।

সিজদাকারীর সরাসরি সাত অঙ্গ দ্বারা জমিনে সিজদা করার বিধান

প্রথম মতঃ জামার হাতা, কাপড়ের আঁচল, হাতের ওপর ও পাগড়ির প্যাঁচের ওপর যদি সিজদা করে আর এগুলো গায়ের সাথে লেগে থাকে তাহলে সিজদা বিশুদ্ধ হবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীলঃ লেখক আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। সেখানে আছে, "তিনি কাপড় বিছিয়ে তার ওপর সিজদা করেন"। তাদের আরো দলীল আছে।

দ্বিতীয় মতঃ এগুলোর ওপর সিজদা বিশুদ্ধ হবে না। এটা শাফেয়ীদের মত। এমনিভাবে এটা দাউদ ও ইমাম আহমাদের একমত।

সারকথাঃ এ বিষয়ে সারকথা হচ্ছে ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ যা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, কতিপয় বিদ্বান বলেন, সকল বিদ্বান একমত হাঁটু কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকলে, পা মোজা বা জুতা দ্বারা ঢাকা থাকলে এর ওপর সিজদা করলে সিজদা হয়ে যাবে। এই দুটি অঙ্গ হচ্ছে ওই সাত অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত, যে সাত অঙ্গের ওপর সিজদা করার জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন, "আমাকে সাত অঙ্গের ওপর সিজদা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে"।

সুতরাং বাকি তিন অঙ্গের মাঝে ও জমিনের মাঝে যদি কাপড়, চাটাই ইত্যাদি কঠিন গরম ও ঠান্ডার কারণে, অন্তরায় থাকে আর এই অবস্থায় সিজদা করে তাহলে সিজদা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, যদি পাগড়ির প্যাঁচের উপরে বা কপাল ও জমিনের মাঝে কোন অন্তরায় এর কারণে সিজদা দেওয়া জায়েয না হয় তাহলে চাটাইয়ের উপরে বা কোন অস্তিনের উপরেও জায়েজ হবে না।

(আওসাত, ৩/১৮১, মুগনী, ১/৫১৭, মাজমু, ৩/৪০০, নাইলুল আওতার, ৩/২০৮)

٨٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ.

৮৩. আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতেন। অতঃপর রুকূ করার সময়ও আল্লাহু আকবার বলতেন। রুকূ হতে পিঠ সোজা করে উঠবার সময় সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন। তারপর দাঁড়িয়ে বলতেন, রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। অতঃপর যখন নিচের দিকে ঝুঁকতেন অর্থাৎ সাজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। আবার সাজদাহ হতে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলতেন। অতঃপর (পুনরায়) তাকবীর বলে সাজদায় যেতেন এবং মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলতেন। এভাবে তিনি সালাত সমাপ্ত না করা পর্যন্ত পুরো সালাতেই এরূপ করতেন। আর দুই রাকআত সালাত পড়ে বৈঠক শেষে যখন দাঁড়াতেন তখনও আল্লাহু আকবার বলতেন। [সহীহ বুখারী হা/৭৮৯, মুসলিম হা/৩৯২]

٨٤. عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: (صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَوْ قَالَ: صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .

৮৪. মুতার্‌রিফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্‌খির হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আলী ইবনে আবূ তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন সাজদাহ করলেন তখন তিনি আল্লাহু আকবার বললেন। আর যখন সাজদাহ হতে মাথা উঠালেন তখন তিনি আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন। আবার যখন দুই রাকআত সালাত আদায় করে উঠে দাঁড়ালেন, তখন আল্লাহু আকবার বললেন। অতঃপর তিনি যখন সালাত সম্পন্ন করলেন, তখন ইমরান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমার হাত ধরলেন, আর বললেন, এই আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাতের কথা স্মরণ করে দিলেন। অথবা বললেন: ইনি আমাদেরকে নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের মতো সালাত আদায় করালেন। [সহীহ বুখারী হা/৭৮৬, মুসলিম হা/৩৯৩]

তাকবীরে তাহরীমার বিধান

প্রথম মত: তাকবীরে তাহরীমা হচ্ছে সালাতের রুকন, এটা ব্যতীত সালাত বিশুদ্ধ হবে না। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা এবং আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস। সেখানে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর দিয়ে সালাত শুরু করতেন। সালাতে ভুলকারীর হাদীসে আছে, "তুমি সালাতে দাঁড়ালে তাকবীর দিবে"। এই হাদীসটি লেখক (৮৯) নাম্বার হাদীসে নিয়ে এসেছেন। এর আলোচনা অচিরেই আসছে ইনশাআল্লাহ। আলী ইবনু আবী তালেব রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, "সালাতের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন করা। তাকবীর দেয়ার মাধ্যমে সালাতের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সবকিছু হারাম হয়ে যায় ও সালাম বলার মাধ্যমে আবার সবকিছু হালাল হয়ে যায়"। (আবু দাউদ, হা/৬১, তিরমিযী, হা/৩, ইরওয়াউল গালীল, হা/৩০১)

দ্বিতীয় মত: তাকবীরে তাহরীমা দিতে কেউ ভুলে গেলে রুকুর তাকবীর তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এটা সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব, হাসান, যুহরী, কাতাদা, হাকাম ও আওযায়ী রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। এই মতকেই ইবনু মুনযির, ইবনু কুদামা ও ইমাম নববী রহিমাহুমুল্লাহ প্রাধান্য দিয়েছেন। দ্বিতীয় মত যে সকল বিদ্বান দিয়েছেন তাদের ব্যাপারে ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা শুধু মুক্তাদীদের জন্য খাস। এজন্যই তাদের পক্ষ থেকে ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা শুধু মুক্তাদীদের জন্য খাস।

(আওসাত, ৩/৭৮, মুগনী, ১/৪৬১, মাজমু, ২৫০-২৫২, ইবনু রজব, ৬/৩১৩)

'তাকবীর' শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ দ্বারা সালাত শুরু করা যাবে কি?

প্রথমত: সকল বিদ্বান একমত 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত শুরু করলে সালাত সংঘটিত হবে। তারপর তারা মতভেদ করেছেন আল্লাহু আকবার ব্যতীত অন্য শব্দ দ্বারা সালাত সংঘটিত হবে কিনা?

প্রথম মত: 'আল্লাহু আকবার' শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ দ্বারা সালাত সংঘটিত হবে না। এটা মালেকী, হাম্বলীদের মাযহাব, দাউদ ও ইমাম শাফেয়ীর পুরাতন মত। তাদের দলীল: ইতোপূর্বে এই মাসআলার আলোচনা হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: 'আল্লাহুল আকবার' শব্দ দ্বারা সালাত সংঘটিত হবে। কেননা আলিফ ও লামের কোনো পরিবর্তন নেই। বরং এটা নির্দিষ্ট করার জন্য আসে। এটা ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহুর মত। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ এই মতকে অধিকাংশ বিদ্বানের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

তৃতীয় মত: আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশক এমন প্রত্যেক নাম দিয়ে সালাত শুরু করলে সালাত সংঘটিত হবে। যেমন এভাবে বলা, আল্লাহু আযীম, আল্লাহু কাবীর, জালীল, সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাহ। এটা হাকাম, আবু হানিফা ও তার অনেক ছাত্রের মত। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ কুরআনের এই আয়াত দিলে দলীল দিয়েছেন, "সে তার রবের নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করে"। (সূরা আল আলা: ১৫)

তার এই দলীলের জবাবে বলা হয়েছে, কোনো মুফাসসির একথা বলেননি যে, এই আয়াতটি তাকবীরে তাহরীমার জন্য বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এটাকে এর সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। তারা আরো দলীল দিয়েছেন বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস দিয়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর ও উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বীল আলামীন' দিয়ে সালাত শুরু করতেন। তাদের এই দলীলের জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে, হাদীসটি অন্য শব্দে এভাবে এসেছে, তারা কিরাত শুরু করতেন 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বীল আলামীন' দিয়ে। তারা বলেন, আয়াতে বড়ত্ব প্রকাশক শব্দ থাকায় এটা তাকবীরের মত যথেষ্ট হবে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। এই মতকেই ইবনু কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন, পাঁচটি দলীলের কারণে শুধু 'আল্লাহু আকবার' শব্দটাই সালাত সংঘটিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট। কেউ এ বিষয়ে জানতে চাইলে তার কিতাব দেখুন।

(মুগনী, ১/৪৬০, মাজমু, ৩/২৬০, ইবনু রজব, ৬/৩১১, জামেউল ফিকহ, ২/৩৯)

স্থানান্তরের তাকবীরের (এক রুকন থেকে আরেক রুকনে যাওয়ার জন্য তাকবীর) বিধান

প্রথম মতঃ স্থানান্তরের তাকবীর ওয়াজিব। এটা ইমাম আহমাদ, ইসহাক, দাউদ ও ইবনু হাযম রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। এই মতের দলীলঃ লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা এবং ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস। এমনিভাবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় যে, তিনি এই তাকবীর কখনো ছেড়ে দিয়েছেন। আর তিনি বলেছেন, "তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছ, সেভাবে সালাত আদায় করো"।

দ্বিতীয় মতঃ স্থানান্তরের তাকবীর মুস্তাহাব। এটা সাহাবী, তাবেঈন ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ বিদ্বানের মত। এই মতের দলীলঃ

(১) সালাতে ভুলকারীর হাদীসে স্থানান্তরের তাকবীরের কথা আলোচনা করা হয়নি।

(২) এ বিষয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো আদেশ আসেনি। যা এসেছে তা হলো তাঁর কর্ম। আর তাঁর কর্ম ওয়াজিব প্রমাণ করে না।

তৃতীয় মতঃ তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোনো তাকবীর শরীআতসম্মত নয়। এই মত উসমান, মুয়াবীয়া ইবনু আবী সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা, ইবনু সিরীন, সাঈদ ইবনু যুবায়ের, উমার ইবনু আব্দুল আজীজ, হাসান বাসারী, কাসেম ইবনু মুহাম্মদ, সালেম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু উমার রহিমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। লেখক ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেখানে তাকবীরের কথা বলে তারপর বলেন, আমাকে বলেছে, এটা হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত। হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীসে ইঙ্গিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর ছেড়ে দিয়েছেন। তারপর রহিমাহুল্লাহ বলেন, কিন্তু বিদ্বানদের মাঝে বড় একটা দল এই হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন, তিনি আস্তে বা গোপনে তাকবীর দিয়েছেন।

ফাতহুল বারীর টীকায় বিন বায রহিমাহুল্লাহ বলেন, উসমান ও মুয়াবীয়া রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে যে বর্ণিত হয়েছে, তারা তাকবীর দিতেন না এর অর্থ হচ্ছে তারা জোরে তাকবীর দিতেন না। এর অর্থ এই নয় যে, তারা তাকবীর ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ তাদের ওপর এমন ধারণা করা যায় না। আর যদি মেনে নেয়া হয় যে, তারা এই তাকবীর ছেড়ে দিয়েছেন তাহলে তাদের দুজনের মতামতের চেয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল সাহাবীর কথা প্রাধান্যযোগ্য। আল্লাহ ভালো জানেন।

সঠিক মতঃ সঠিক মত হচ্ছে প্রথম মত। আর এই মতকেই বিন বায রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীর টীকায় প্রাধান্য দিয়ে তিনি বলেন, দলীলের ভিত্তিতে এই মতই শক্তিশালী। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তাকবীরকে সংরক্ষণ করেছেন ও তা দেয়ার জন্য আদেশ করেছেন। আর আদেশের চাহিদা হলো তা ওয়াজিব বুঝাবে। নাবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছ, সেভাবে সালাত পড়বে”।

(আওসাত, ৩/১৩৪, মুহাল্লা, ২/২৮৬, মুগনী, ১/৫০২, মাজমু, ৩/৩৬৪, শারহে মুসলিম, ৩৯২, ইবনু রজব, ৭/১৪১, ফাতহুল বারী, ২/২৭০, নাইলুল আওতার, ৩/১৭৪)

স্থানান্তরের তাকবীরের স্থান

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর বাণী, “সিজদায় যাওয়ার সময় তিনি তাকবীর দিতেন। তারপর সিজদা হতে উঠার সময় তাকবীর দিতেন ও দ্বিতীয় রাকআত থেকে উঠার সময় তাকবীর দিতেন”। এই হাদীসটা প্রমাণ বহন করে যে, এই কর্মগুলো করার সময় তাকবীরটা সাথে সাথে হবে ও একটু বিস্তৃত হবে। সুতরাং রুকুর দিতে ঝুঁকার সময় তাকবীর দেয়া শুরু হবে ও রুকুতে গিয়ে শেষ হবে। তারপর রুকুর তাসবীহ পড়ে তাকবীর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর শুরু করবে এবং জমিনে মাথা রাখার সাথে সাথে তাকবীর শেষ করবে। তারপর সিজদার তাকবীর শুরু করবে। আর ‘সামি আল্লাহু লিমান হামিদা’ শুরু করবে রুকু থেকে উঠার সময়। আর এটা শেষ হবে দাঁড়িয়ে গেলে। তারপর ‘রাব্বানা লাকাল হামদ’ শুরু করবে। প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠার সময় তাকবীর বলা শুরু করবে আর দাঁড়ানোর সাথে সাথে তা শেষ হয়ে যাবে। এটাই আমাদের মাযহাব ও অনেক বিদ্বানের মাযহাব। তবে উমার ইবনু আব্দিল আজীজ থেকে এর ব্যতিক্রম মত বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ তার এই বিস্তৃত আলোচনার পর বলেন, সঠিক কথা হচ্ছে রুকুতে যাওয়ার সময় যদি তাকবীর বলা শুরু করে ও রুকুতে পৌঁছেও তাকবীর বলে তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু উত্তম হচ্ছে তাকবীরটা দুই রুকনের মাঝামাঝি হওয়া। অনুরূপভাবে ‘সামি আল্লাহু লিমান হামিদা’ এর ক্ষেত্রে একই নিয়ম হবে। কেউ যদি কোনো রুকনে পৌঁছে তাকবীর বলা শুরু করে তাহলে এই তাকবীর গ্রহণযোগ্য নয়।

আমি বলছি, ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহর কথা, “তাকবীরটা পরবর্তী রুকনে পৌঁছা পর্যন্ত হবে” এই মতের পক্ষে কোনো দলীল আমার জানা নেই। বরং এটা হচ্ছে শুধুমাত্র ইস্তিহসান (ভালো)।

(মাজমু, ৩/৩৬৪, শারহে মুসলিম, ৩৯২, আযকার, ৪২, ফাতহুল বারী, ২/২৭৩, শারহুল মুমতি, ৩/৮৮)

সালাতে স্থানান্তরের তাকবীরের সংখ্যা

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ শারহে মুসলিমে (৩৯২) আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক দুই রাকআতে এগারোটি তাকবীর আছে। আর তা হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা ও প্রত্যেক রাকআতে পাঁচটি তাকবীর। আর তিন রাকআতে সতেরোটি তাকবীর আছে আর তা হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা, প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠার সময় তাকবীর ও প্রত্যেক রাকআতে পাঁচ তাকবীর। চার রাকআতে বাইশটি তাকবীর। সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের তাকবীর সংখ্যা হচ্ছে চুরানব্বইটি।

মুক্তাদী ইমামকে রুকু বা সিজদাবস্থায় পেলে এক তাকবীর দিবে নাকি দুই তাকবীর?

প্রথম মত: এক তাকবীরই যথেষ্ট ও সালাত সংঘটিত হয়ে যাবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

দ্বিতীয় মত: দুই তাকবীর না দিলে সালাত বিশুদ্ধ হবে না। একটা হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা ও আরেকটা হচ্ছে রুকুর তাকবীর। এটা ইবনু সিরীন ও হাম্মাল ইবনু সালামা রহিমাহুমার মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। সালাত শুরু করার জন্য ও রুকুতে যাওয়ার জন্য একটি তাকবীরই যথেষ্ট। আল্লাহ ভালো জানেন। তারপর অধিকাংশ বিদ্বানের মতের ওপর ভিত্তি করে কথা হচ্ছে তাকবীর দিলে এর কিছু অবস্থা রয়েছে।

প্রথম অবস্থা: তাকবীর দেয়ার সময় তাকবীরে তাহরীমার নিয়্যাত করবে। এমন করলে সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে বিদ্বানদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই।

দ্বিতীয় অবস্থা: শুধু রুকুর তাকবীরের নিয়্যাত করবে। এমন করলে অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট সালাত বিশুদ্ধ হবে না। আর এটাই হচ্ছে সঠিক কথা। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “সালাতে সবকিছু হারাম করে দেয় তাকবীর”। আর রুকুর তাকবীর এটা না।

তৃতীয় অবস্থা: এক সাথে দুই তাকবীরের নিয়্যাত করবে। এক সাথে দুই তাকবীরে নিয়্যাত করলে এ বিষয়ে দুটি মত আছে।

প্রথম মত: সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এই মতটি আবু হানিফা, মালেক, আবু ছাওর ও ইমাম আহমাদ এর একমত রহিমাহুমুল্লাহ।

দ্বিতীয় মত: সালাত বিশুদ্ধ হবে না। এটা শাফেয়ী, ইসহাক ও হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত। সঠিক মত হচ্ছে প্রথম মত।

চতুর্থ অবস্থা: তাকবীর দেয়ার সময় কোনো নিয়্যাতই করবে না, বরং সাধারণভাবে তাকবীর দিবে। এ বিষয়ে দুইটি মত আছে।

প্রথম মত: তাকবীরে তাহরীমার নিয়্যাত না করলে সালাত বিশুদ্ধ হবে না। কেননা এই স্থানে দুটি তাকবীর একত্রিত হয়েছে। একটা হচ্ছে ফরয তাকবীর। আর নিয়্যাতের মাধ্যমে ফরয তাকবীরকে পার্থক্য করতে হবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

দ্বিতীয় মত: সাধারণভাবে নিয়্যাত করলেই সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর মত।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে (তাকবীরে তাহরীমার নিয়্যাত না করলে) সালাত বিশুদ্ধ হবে না। এটাই হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(আওসাত, ৩/৭৯, ইবনু রজব, ৬/৩১৭)

বি.দ্র. ইমামের রুকু করা অবস্থাতে কেউ মসজিদে আসলে সে দুটি তাকবীর দিবে একটি হলো তাকবীরে তাহরীমার জন্য। আরেকটি তাকবীর রুকুর জন্য। আল মুলাখখাস আল ফিকহীয়া-ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ পৃ.৬৪।

ইমামের সালাতের তাকবীর জোরে বলার বিধান কী?

অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, ইমামের জন্য সুন্নাহ হলো সকল তাকবীর জোরে বলা। ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ শারহুল মুমতিতে বলেন, ইমামের জন্য ওয়াজিব হলো সকল তাকবীর জোরে বলা, যেন পেছনের মুক্তাদীরা তা শুনতে পায়, যদিও তারা কম থাকে। তবে মুক্তাদীদের অবস্থার চাহিদানুযায়ী যদি তাকবীরের আওয়াজ একটু আস্তে বলে তাহলে তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। তিনি বলেন, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে ইমাম জোরে তাকবীর বলবেন, যেন তার পেছনের মুক্তাদীরা তা শুনতে পায়।

প্রথমত: এর কারণ হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন করেছেন। কেননা বিষয়টা যদি এমন না হতো তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে মানুষদের তাকবীর শুনানোর জন্য আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু নিযুক্ত হতেন না।

দ্বিতীয়ত: তাকবীর শুনার দ্বারাই তো মুক্তাদীরা ইমামের অনুসরণ করে। আর মূলনীতি হচ্ছে, যা ছাড়া ওয়াজিব বাস্তবায়িত হয় না তাও ওয়াজিব।

মুগনী, ১/৪৬২, মাজমু, ৩/৩৬৬, শারহুল মুমতি, ৩/৩৩।

মুক্তাদীদের তাকবীর জোরে বলা মুস্তাহাব নয়

বায়ানের লেখক বলেন, তাকবীর জোরে বলতে হবে, তবে মুক্তাদী হলে জোরে বলা মুস্তাহাব নয়। কেননা কেউ তার অনুসরণ করে না। তার উচিত যতটুকু ওয়াজিব ততটুকু বলা। এর সর্বনিম্ন আওয়াজ হচ্ছে নিজে নিজে শুনতে পাওয়া। যদি এর চেয়েও নিচু স্বরে তাকবীর দেয় তাহলে এই তাকবীর ধর্তব্য নয়। কেননা এটা তাকবীর নয়, বরং মনের কথা মাত্র। মারদাবী ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহর বরাতে বলেন, তিনি পছন্দ করেন, তাকবীরের হরফসহ বলার মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখা, যদিও সে শুনতে না পায়। মারদাবী বলেন, অন্তর এই দিকেই ধাবিত হয়। আমি বলছি, এটা সঠিক মত। এমনিভাবে যে সালাতের কিরাত আস্তে পড়া হয় ওই কিরাতও এভাবে পড়বে। হাম্বলী মাযহাবের ইবনু আবী মুসা বলেন, যে সালাতে কিরাত আস্তে পড়া হয় ওই সালাতে কুরআন পড়ার সময় মুখ ও ঠোঁট নড়াচড়া করবে। এতটুকু জোরে পড়বে যেন নিজে ও সাথের ব্যক্তি শুনতে পায়।

(বায়ান, ২/১৬৯, ইবনু রজব, ৭/১৭, ইনসাফ, ২/৩৪)

ইমামের পেছন থেকে তাকবীর পৌঁছানোর (মুকাব্বির হওয়া) বিধান কী?

ইমাম দূরে থাকার কারণে বা তার স্বর নিচু হওয়ার কারণে ইমামের পেছন থেকে যদি তাকবীর পৌঁছানোর প্রয়োজন হয় তাহলে অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট এটা জায়েয আছে। কতিপয় মালেকী মাযহাবের ইমাম বলেন, জায়েয নেই। সঠিক মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। আর যদি প্রয়োজনবশত না হয় এ ক্ষেত্রে ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রয়োজন ছাড়া তাকবীর পৌঁছানো মুস্তাহাব নয়। এ বিষয়ে বিদ্বানদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। বরং কিছু বিদ্বান বলেন, প্রয়োজন ছাড়া এমন করা মাকরূহ। আবার তাদের মধ্যে অনেকে বলেন, যে ব্যক্তি এমন করবে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, প্রয়োজন ছাড়া তাকবীর পৌঁছানো সকল ইমামের নিকট বিদআত, মুস্তাহাব নয়। বরং ইমাম তাকবীর জোরে বলবেন, যেমনটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর খলীফারা করেছেন। কোনো সাহাবী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পেছনে তাকবীর পৌঁছাননি। কিন্তু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে গেলে তাঁর স্বর নিচু হয়ে গেলে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু মানুষদের তাকবীর শুনিয়েছেন। প্রয়োজন ছাড়া তাকবীর পৌঁছালে মুকাব্বিরের সালাত বাতিল হবে কিনা এ বিষয়ে বিদ্বানদের মাঝে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে ইমাম মালেক, আহমাদ রহিমাহুমার ও অন্যদের দুটি মত আছে।

(মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ২৩/৪০০, ইবনু রজব, ৬/২৪৮, ইলাম, ২/৫৬২, নাইলুল আওতার, ৩/১৭৪, শারহুল মুমতি, ৩/৩২)

রুকু ও সিজদার যিকির (দুআ) এর বিধান

প্রথম মত: রুকু ও সিজদার যিকির মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: সালাতে ভুলকারীর হাদীসে তা বলা হয়নি, বরং এ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম, আদেশ নয়। আর তাঁর কর্ম ওয়াজিব বুঝায় না।

দ্বিতীয় মত: রুকু ও সিজদার যিকির ওয়াজিব। ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুলবশত ছেড়ে দেয় তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে শেষে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। এটা ইসহাক ও ইমাম আহমাদের একটি মত। তাদের দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী, "তোমার সুমহান রবের নাম দ্বারা তাসবীহ পাঠ করো"। (সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬:৭৪)

উকবা ইবনু আমের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, "তোমার সুমহান রবের নাম দ্বারা তাসবীহ পাঠ করো"। (সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬:৭৪)

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এটা তোমরা রুকুতে পড়বে"। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, "তোমার উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন রবের নাম দ্বারা তাসবীহ পাঠ করো" তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এটা তোমরা সিজদায় পড়বে"। (আবু দাউদ, হা/৮৬৯, ইবনু মাজাহ, হা/৮৮৭, এই হাদীসটি দুর্বল, ইরওয়াউল গালীল, হা/৩৩৪)

ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, "রুকুতে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করো এবং সিজদায় বেশি বেশি দুআ করো। কারণ সিজদায় দুআ বেশি কবুল হয়"। (মুসলিম, হা/৪৭৯)

হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর বড় হাদীসে আছে, "তারপর তিনি সিজদায় গিয়ে 'সুবহানা রাব্বি ইয়াল আলা' বলেন"। (মুসলিম, হা/৭৭২)

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা এই যিকির করেন। আর তিনি বলেন, "আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছ, সেভাবে সালাত পড়বে"।

তৃতীয় মত: রুকু ও সিজদার যিকির ফরয। ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত ছেড়ে দিলে তা রহিত হয়ে যাবে না। এটা দাউদ ও ইমাম আহমাদের একটি মত। ইমাম খাত্তাবী রহিমাহুল্লাহ এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এটা ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ও আলী ইবনু দিনার রহিমাহুমার মত। তাদের দলীল: মুয়াবিয়া ইবনু হাকাম আস সুলামী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, এই সালাতে মানুষের কোনো কথা বলা উচিত নয়, বরং তাতে তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়া করতে হয়"। (মুসলিম, হা/৫৩৭)

প্রাধান্যযোগ্য মত: পূর্বের দলীলের আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। আর তৃতীয় মতের ব্যাপারে কথা হচ্ছে তা অগ্রহণযোগ্য মত। কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি প্রথম তাশাহুদ ছেড়ে দেন। তারপর ক্ষতিপূরণ হিসেবে শেষে সিজদায়ে সাহু দেন। মিসকুল খিতাম ১/৪৬০।

অবশিষ্ঠ কথা : রুকু ও সিজদার যিকির কেউ ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে তার সালাত কি বাতিল হবে?

যা স্পষ্ট : সালাত বাতিল হবে না, তবে সে পাপী হবে। ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়াতে সালাত বাতিল হয় না, কিন্তু পাপী হবে। এটিই হলো সহীহ (আল্লাহই ভাল জানেন)।

রুকু ও সিজদায় কতবার যিকির করলে তা যথেষ্ট?

ইমাম খিরাকী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সুবহানা রাব্বি ইয়াল আযীম' তিনবার বলা উত্তমের সর্বনিম্ন পর্যায়। আর যদি একবার বলে তাহলে যথেষ্ট হবে। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, কাযী হুসাইন বলেন, ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সুবহানা রাব্বি ইয়াল আযীম' তিনবার বলা উত্তমের সর্বনিম্ন পর্যায়। কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি যে, তিনবারের চেয়ে কম বললে যথেষ্ট হবে না। কেননা যে ব্যক্তি একবার তাসবীহ পাঠ করেছে, সে সুন্নাতী তাসবীহ পাঠ করেছে। বরং তিনবার পাঠ করা হলো উত্তমের সর্বনিম্ন পর্যায়। তিনি বলেন, কেউ যদি পাঁচবার বা সাতবার বা নয়বার অথবা এগারবার পাঠ করে তাহলে এটা বেশি উত্তম। তবে ইমাম হলে তিনবারের বেশি পাঠ করা মুস্তাহাব নয়।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, অধিকাংশ বিদ্বানের মত হচ্ছে তিনবার তাসবীহ পাঠ করা হলো উত্তমের সর্বনিম্ন পর্যায়। একবার পাঠ করলে যথেষ্ট হয়ে যাবে। কিছু বিদ্বান বলেন, ইমামের সাতবার পাঠ করা মুস্তাহাব, যেন তার পেছনের মুক্তাদীরা তিনবার পাঠ করতে পারে। একথাই বলেছেন, ইবনু মোবারক, সুফিয়ান ছাওরী, ইসহাক রহিমাহুমুল্লাহ ও আমাদের কিছু শাইখ। কিছু বিদ্বান বলেন, পাঁচ থেকে দশবার পর্যন্ত তাসবীহ পাঠ করবে। আমাদের কিছু শাইখ বলেন, ইমামের জন্য তিনবারের কম রুকুতে ও সিজদায় তাসবীহ পাঠ করা মাকরূহ। একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য মাকরূহ নয়, যাতে করে মুক্তাদীরা অনুসরণ করতে পারে।

পূর্বে বর্ণিত দলীলের আলোকে আমি বলছি, হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে আছে, তিনি রুকুতে গিয়ে বলেন, 'সুবহানা রাব্বি ইয়াল আযীম' তারপর সিজদায় গিয়ে বলেন, 'সুবহানা রাব্বি ইয়াল আলা'। (মুসলিম, হা/৭৭২)

ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, "তোমাদের কেউ রুকু করলে সে যেন তাতে গিয়ে তিনবার বলে, 'সুবহানা রাব্বি ইয়াল আযীম' আর এটা হচ্ছে উত্তমের সর্বনিম্ন পর্যায়। আর সিজদা করলে যেন তিনবার বলে, 'সুবহানা রাব্বি ইয়াল আলা' আর এটা হচ্ছে উত্তমের সর্বনিম্ন পর্যায় "। হাদীসটি আবু দাউদ (৮৮৬) ও তিরমিযী (২৬১) বর্ণনা করেন। কিন্তু হাদীসটির সনদ বিচ্ছিন্ন। আউন ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে হাদীস শুনেননি।

(মুগনী, ১/৫০১, মাজমু, ৩/৩৮৩, ইবনু রজব, ৭/১৭৭-১৭৮)

ফায়েদা (উপকারিতা): রুকুতে 'সুবহানা রাব্বি ইয়াল আযীম' ও সিজদায় 'সুবহানা রাব্বি ইয়াল আলা' বলার পর 'ওয়াবি হামদিহি' অতিরিক্ত বলার বিষয়ে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন: উকবা ইবনু আমের, ইবনু মাসউদ, হুযাইফা,আবু মালেক ও আবু জুহাইফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম তাদের হাদীস। কিন্তু সবগুলো হাদীসই দুর্বল। কিছু হাদীস তো মারাত্মক দুর্বল। বিস্তারিত দেখতে চাইলে তালখীসে (১/২৪২) দেখুন।

তথাপি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার হাদীসের ভিত্তিতে হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এই হাদীসকে শক্তিশালী হাদীস বলেছেন। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসটি হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু সিজদায় বলতেন, 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ ফিরলি'। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে 'ওয়াবি হামদিহি' অতিরিক্ত অংশটুকু সহীহ নয়।

দুই সিজদার মাঝে কোন যিকির (দুআ) বলতে হয়?

হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই সিজদার মাঝে এই দুআ পড়তেন, 'রাব্বিগ ফিরলি, রাব্বিগ ফিরলি'। (আবু দাউদ, হা/৮৭৪, দারেমী, হা/১৩৬৩, ইবনু মাজাহ, হা/৮৯৭, আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ইরওয়াউল গালীল, হা/৩৩৫)

ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই সিজদার মাঝে এই দুআ পড়তেন, 'আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ার হামনি ওয়াফিনি ওয়াহদিনি ওয়ারযুকনি'। আবু দাউদ, হা/৮৫০, তিরমিযী, হা/২৮৪, আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, দুই সিজদার মাঝে রাব্বিগ ফিরলি, রাব্বিগ ফিরলি' কয়েকবার বলা আবু আব্দিল্লাহর নিকট মুস্তাহাব। আর একবার বলা ওয়াজিব ও তিনবার বলা উত্তমের সর্বনিম্ন স্তর।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাব্বিগ ফিরলি' রাব্বিগ ফিরলি' তিনবার বা যতবার ইচ্ছা বলা মুস্তাহাব। কেননা তার নিকট হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ। তার ছাত্রদের মাঝে কেউ বলেন, দুইবার বলবে। তার ছাত্রদের মাঝে আবার কেউ বলেন, রুকু ও সিজদার তাসবীর মতো তিনবার বলবে। হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের আলোকে তারা বলেছেন, তিনি এই দুআ কয়েকবার বলেছেন। কেননা তার হাদীসে আছে, তাঁর দুই সিজদার মাঝের বসার পরিমাণটা ছিল সিজদা করা পরিমাণ। আর অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, সিজদায় 'আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ার

হামনি ওয়াফিনি ওয়াহদিনি ওয়ারযুকনি’ এই দুআ বলা মুস্তাহাব। তাদের মাঝে আছেন, মাকহুল, ছাওরী ও ইমাম শাফেয়ীর ছাত্ররা।

ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ার হামনি ওয়াফিনি ওয়াহদিনি ওয়ারযুকনি’ ও রাব্বিগফিরলি’ উভয়টি বলা জায়েয আছে। তার মত হচ্ছে ‘আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ার হামনি ওয়াফিনি ওয়াহদিনি ওয়ারযুকনি’ বললে একবার বলবে আর রাব্বিগফিরলি বললে, তিনবার বলবে।

(কামেল, ৬/৮২, মুগনী, ১/৫২৫, মাজমু, ৩/৪২৫, ইবনু রজব, ৭/২৭৫)

দুই সিজদার মাঝের যিকিরের (দুআ) বিধান

প্রথম মত: দুই সিজদার মাঝের যিকির (দুআ) মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: এ বিষয়ে পূর্বে ইবনু আব্বাস ও হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীস গত হয়েছে এবং মুসলিমে (২৬৯৭) তারেক ইবনু উশাইমের হাদীস, তিনি বলেন, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাত শিখাতেন। তারপর তাকে তিনি এই কালিমাগুলো দ্বারা দুআ করতে আদেশ করতে, ‘আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ার হামনি ওয়াফিনি ওয়াহদিনি ওয়ারযুকনি’।

দ্বিতীয় মত: দুই সিজদার মাঝের যিকির (দুআ) ওয়াজিব। ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর ভুলবশত ছেড়ে দিলে শেষে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। এটা ইসহাক, দাউদ ও ইমাম আহমাদের একটি মত এবং এই মত গ্রহণ করেছে তার অধিকাংশ ছাত্র। তাদের দলীল: প্রথম মতে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা। আরো দলীল হচ্ছে নাবী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা এই দুআ পড়েছেন। তিনি এই দুআ ছেড়ে দিয়েছেন এমন কোনো প্রমাণ নেই। আর তিনি বলেন, “আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছ, সেভাবে সালাত আদায় করবে”।

তৃতীয় মত: দুই সিজদার মাঝে কোনো যিকির নেই। এটা আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এই দুআ ছেড়ে দিলে গুনাহগার হবে, কিন্তু সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

(মুগনী, ১/৫০২, মাজমু, ৩/৪১৫, ইবনু রজব, ৭/২৭৭, নাইলুল আওতার, ৩/১৭৮)

٨٥. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ: قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ) . وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: (مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ).

৮৫. বারা ইবনে ‘আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। অতঃপর আমি দেখেছি যে, তাঁর কিয়াম বা দাঁড়ানো, রুকূ, রুকূ হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, সাজদা করা ও দুই সাজদার মাঝে বসা, আবার সাজদাহ করা এবং সালাম ফিরানোর সময় সমূহের পরিমাণ প্রায় সমান ছিল। [সহীহ বুখারী হা/৭৯২ ও মুসলিম হা/৪৭১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, কিয়াম বা দাঁড়ানো ও বসার পরিমাণে ব্যতিক্রম ছিল। [সহীহ বুখারী হা/৭৯২]

٨٦. عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: (إِنِّي لا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُصَلِّي بِنَا. قَالَ ثَابِتٌ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ. كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ: انْتَصَبَ قَائِمًا، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ: مَكَثَ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ).

৮৬. সাবিত আল বুনানী হতে বর্ণিত, তিনি আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাত পড়তেন, সেভাবে আমি তোমাদেরকে সালাত পড়িয়ে দিতে কমতি করব না। সাবিত রহিমাহুল্লাহ বলেন, আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এমন কিছু করতেন আমি তোমাদেরকে সে রকম করতে দেখি না। তিনি যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখন তিনি দাঁড়িয়েই থাকতেন। এমন কি ধারণাকারী বলতেন, তিনি মনে হয় (সাজদা করতে) ভুলেই গিয়েছেন। আর যখন তিনি সাজদাহ হতে মাথা উঠাতেন তখন তিনি বসেই থাকতেন। এমনকি ধারণাকারী মনে করতেন, তিনি মনে হয় (সালাম ফিরাতে) ভুলেই গিয়েছেন। [সহীহ বুখারী হা/৮২১, মুসলিম হা/৪৭২]

٨٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৮৭. আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে অধিকতর সংক্ষেপ ও পূর্ণাঙ্গরূপে সালাত অন্য কোনো ইমামের পিছনে আমি কখনই পড়িনি । [সহীহ বুখারী হা/৭০৮, মুসলিম হা/৪৬৯]

٨٨. عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيِّ الْبَصْرِيِّ – قَالَ: (جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، فَقَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُصَلِّي، فَقُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا، وَكَانَ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ) . أَرَادَ بِشَيْخِهِمْ: أَبَا يَزِيدَ، عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ الْجَرْمِيَّ.

৮৮. আবূ কিলাবাহ আব্দুল্লাহ ইবনে যায়িদ আল জারমী আল বাছরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের এই মাসজিদে মালিক ইবনে হুওয়াইরিছ আসলেন। অতঃপর বললেন, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করবো। কিন্তু সালাত আদায় করা আমার উদ্দ্যেশ্য নয়। বরং আমি সালাত আদায় করে দেখিয়ে দিতে চাই কীভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করতেন। অতঃপর আমি আবূ ক্বিলাবাহকে বললাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, আমাদের এই শাইখের সালাতের মত। আর তিনি যখন সাজদাহ হতে মাথা উঠাতেন তখন দাঁড়িয়ে যাওয়ার পূর্বে বসতেন। [সহীহ বুখারী হা/৬৭৭, মুসলিম হা/৪৭২] তাদের শাইখ দ্বারা তিনি আবূ ইয়াযিদ আমর ইবনে সালামাহ আল জারমীকে বুঝিয়েছেন।

জালসায়ে ইস্তিরাহা এর বিধান

প্রথম মত: জালসায়ে ইস্তিরাহা মুস্তাহাব। এই মত হচ্ছে সাহাবীদের থেকে মালেক ইবনু হুয়াইরিছ, আবু হুমাইদ, আবু কাতাদা প্রমুখ সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম। এমনিভাবে এই হচ্ছে আবু কিলাবা, শাফেয়ী, দাউদ ও ইমাম আহমাদের একটি মত। তাদের দলীল: লেখক মালেক ইবনু হুয়াইরিছ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা।

দ্বিতীয় মত: জালসায়ে ইস্তিরাহা মুস্তাহাব নয়। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। সাহাবীদের মধ্যে যারা এই মত দিয়েছেন তারা হলেন, উমার, আলী, ইবনু মাসউদ, ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম। নুমান ইবনু আবী আইয়াশ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি অনেক সাহাবীকে পেয়েছি, কিন্তু তারা কেউ এমন করতেন না। এই মতের দলীল:

১. যে সকল হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাতের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, ওই সকল হাদীসে জালসায়ে ইস্তিরাহা এর কথা নেই। এর জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক সাহাবী সালাতের আহকামের বর্ণনা দেননি, বরং সালাতের বর্ণনা হচ্ছে সকল সাহাবীর বর্ণনার সমষ্টি।

২. জালসায়ে ইস্তিরাহা এর কথা সালাতে ভুলকারীর হাদীসে উল্লেখ নেই। এর জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে, সালাতে ভুলকারীর হাদীসে সালাতের সকল আহকামের বর্ণনা নেই।

৩. এটা শরীআতসম্মত হলে অন্যান্য আহকামের মতো এটার কথাও উল্লেখ থাকতো। এর জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে, জালসায়ে ইস্তিরাহা এটা খুবই স্বল্প সময় বসা হয়, যার জন্য কোনো তাকবীর নেই। তাই এটা প্রকারন্তরে দাঁড়ানোর মতোই।

তৃতীয় মতঃ মুসল্লী দুর্বল হলে জালসায়ে ইস্তিরাহা করবে, কারণ তার বসার প্রয়োজন আছে। আর শক্তিশালী হলে বসবে না, কারণ তার বসার প্রয়োজন নেই। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জালসায়ে ইস্তিরাহা করাকে তারা বলেছেন, তিনি এটা শেষ বয়সে দুর্বলতার কারণে করেছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ পূর্বের দলীলের আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে প্রত্যেকেরই উচিত জালসায়ে ইস্তিরাহা এর ওপর অবিচল থাকা। অধিকাংশ মানুষ এটা করে না বিধায় কেউ যেন ধোঁকায় না পড়ে।

(আওসাত, ৩/১৯৪, মুগনী, ১/৫২৯, মাজমু, ৩/৪২০-৪২১, ইবনু রজব, ৭/২৮৭)

জালসায়ে ইস্তিরাহা এর জন্য বসলে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য কি বসার আগে তাকবীর দিবে নাকি পরে?

আবু হুমাইদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাতের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, ওই হাদীসে আছে, তারপর তিনি সিজদায় ঝুঁকে পড়েন। এরপর আল্লাহু আকবার বলে পা বিছিয়ে শান্তভাবে বসেন, এমনকি প্রত্যেকটা অঙ্গ স্ব স্ব স্থানে চলে আসে। তারপর উঠেন। হাদীসটি আলবানী রহিমাহুল্লাহ তিরমিযীতে (৩০৪) বিশুদ্ধ বলেছেন।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ মুগনীতে (১/৫৩১) বলেন, মুস্তাহাব হচ্ছে সিজদা থেকে মাথা তুলার সময় তাকবীর দেয়া শুরু করবে ও এটা শেষ হবে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে গেলে। যেন তাকবীর সকল রুকনকে অন্তর্ভুক্ত করে। বাকি সকল তাকবীর এমনই হবে, তবে যে জালসায়ে ইস্তিরাহা এর জন্য বসেছে তার তাকবীর বসার সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে। তারপর তাকবীর ছাড়াই দাঁড়িয়ে যাবে। আবুল খিতাব বলেন, তাকবীর দিয়ে দাঁড়াবে, তবে এটা সঠিক নয়। কেননা এর কারণে একটা রুকনে দুই তাকবীর আবশ্যক হয়ে যায়। অথচ শরীআত এর অনুমোদন দেয়নি।

৮৭. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –: (أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) .

৮৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনাহ হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত আদায় করতেন তখন তিনি দুই হাতের মাঝে এমনভাবে ফাঁকা করতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেয়ে যেত। [সহীহ বুখারী হা/৮০৭, মুসলিম হা/৪৯৫]

সিজদায় হাত পেট থেকে পৃথক রাখার বিধান

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ লেখক যে হাদীস উল্লেখ করেছেন এর ব্যাখ্যায় ফাতহুল বারীতে বলেন, সিজদায় হাত পেট থেকে আলাদা রাখা মুস্তাহাব সংক্রান্ত অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এই হাদীস ছাড়া আর কোনো হাদীস নিয়ে আসেননি। অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, সিজদায় হাত পেট থেকে আলাদা রাখা মুস্তাহাব। ইমাম তিরমিযী বলেন, তারা এর ওপরই আমল করেন। সুতরাং এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে এটা তাদের পক্ষ থেকে ইজমা।

কিন্তু নাফে ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সিজদা করলে হাত পার্শ্বের সাথে মিলিয়ে রাখতেন, পৃথক রাখতেন না। তার ছেলে ওয়াকিদ ইবনু আব্দিল্লাহ তার থেকে বর্ণনা করেন, তার বাবা হাত পৃথক রাখতেন। তার থেকে আদাম ইবনু আলী বর্ণনা করেন তিনি এরই আদেশ করেন।

হাত পেট থেকে পৃথক রাখার ফলে অন্যের কষ্ট হলে পৃথক রাখবে না

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, কাতারে ভিড় হওয়ার কারণে পাশের মুসল্লীর কষ্ট হলে হাত পৃথক রাখবে না, বরং মিলিয়ে রাখবে। একথাই বলেছেন ইমাম আওযায়ী রহিমাহুল্লাহ। ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, সিজদায় হাত পেট থেকে আলাদা রাখবে, তবে জামাআতের সাথে সালাত পড়লে পাশের মুসল্লীর কষ্ট হলে পৃথক রাখা মুস্তাহাব নয়। কারণ এতে পাশের মুসল্লীর কষ্ট হচ্ছে। কেননা হাত পৃথক রাখা হলো সুন্নাহ আর কষ্ট দেয়ার সর্বনিম্ন বিধান হলো মাকরূহ। আর সুন্নাহ পালন করার জন্য পাশের মুসল্লীকে কষ্ট দিয়ে মাকরূহ কাজ করা যাবে না। এজন্যই আলেমরা জামাআতের ক্ষেত্রে বলেছেন, হাত পৃথক রাখবে না।

(ইবনু রজব, ৭/২৪৬, শারহুল মুমতি, ৩/১২০)

নারীদের জন্য হাত পেট থেকে পৃথক রাখার বিধান

ইবনু দাকীকিল ঈদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা এই বিষয়টা শুধু পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। তারা বলেন, নারীরা হাত পেটের সাথে একদম মিলিয়ে রাখবে। কেননা নারীদের থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা জড়োসড়ো হয়ে, ঢেকে পর্দার সাথে থাকবে। আর এই অবস্থায় থাকলে তাদের থেকে যে উদ্দেশ্য তা সাধিত হবে।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, নারীরা হাত পৃথক রাখবে না, বরং মিলিয়ে রাখবে। কিছু বিদ্বান এই মত দিয়েছেন। আর এ বিষয়ে তাদের কিছু দলীল আছে, কিন্তু সবগুলোই দুর্বল। ইমাম আবু দাউদ এ বিষয়ে তার মারাসেলে একটি মুরসাল হাদীস নিয়ে এসেছেন।

ইবনু মুলাক্কিন বলেন, নারীদের হাত পেটের সাথে মিলিয়ে রাখা মুস্তাহাব। কেননা এটা তাদের জন্য পর্দা স্বরূপ। শাইখ ইয়াহইয়া হাফিযাহুল্লাহ বলেন, এটাই আমার মত। তবে যদি নারীরা ঘরে বা অন্য নারীদের সাথে সালাত পড়ে অথবা তার কাছে তার মাহরাম থাকে আর ওই সময় সে হাত পেট থেকে পৃথক রাখে তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

(ইহকাম, ১/১৩৫, ইবনু রজব, ৭/২৪৬, ইলাম, ৩/১৩৫)

٩٠. عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ).

৯০. আবূ মাসলামাহ সাঈদ ইবনু ইয়াযীদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাঁর দুই জুতা পরিধান করা অবস্থায় সালাত পড়তেন? তিনি উত্তরে বললেন: হ্যাঁ। [সহীহ বুখারী হা/৩৮৬, মুসলিম হা/৫৫৫]

জুতা পরে সালাত পড়ার বিধান

প্রথমত কথা হচ্ছে ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, জুতা পরে সালাত পড়া জায়েয আছে। এ বিষয়ে কোনো বিদ্বানের মাঝে দ্বিমত নেই। মাসআলার বিধান হচ্ছে:

প্রথম মত: জুতা পরে সালাত পড়া মুস্তাহাব। ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ লেখক যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এই হাদীস প্রমাণ করে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুতা পরে সালাত পড়ার অভ্যাস ছিল। অধিকাংশ বিদ্বানের কথা এ কথাই প্রমাণ করে জুতা পরে সালাত পড়া খালি পায়ে সালাত পড়ার চেয়ে উত্তম। সালাত শুরু করার সময় আবু মুসা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু জুতা খুলে ফেললে ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ

আনহু এটা অপছন্দ করে বলেন, তুমি কি পবিত্র উপত্যকায় আছো? আবু আমর আশ শাইবানী রহিমাহুল্লাহ মানুষরা সালাতের পূর্বে জুতা খোললে প্রহার করতেন। সালাতের সময় জুতা খুলাকে রাবী ইবনু খুছাইম অপছন্দ করতেন। এমন করাকে তিনি বিদআত মনে করতেন। নাখয়ী ও আবু জাফর ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আলী সালাতে দাঁড়ালে আগে জুতা পরে তারপর সালাত পড়তেন। অনেক সাহাবী জুতা পরে সালাত পড়ার জন্য মানুষদের বলতেন, তাদের মাঝে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ও অন্যরা আছেন। এ মতের দলীলঃ লেখক আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেই হাদীস ও শাদ্দাদ ইবনু আউস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা ইহুদিদের বিরোধিতা করো। তারা জুতা ও মোজা পরে সালাত পড়ে না"। আবু দাউদ, হা/৬৫২, হাদীসের সনদ হাসান। তাদের আরো দলীল আমর ইবনু শোয়াইব, তিনি তার বাবা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জুতা পরে ও খালি পায়ে উভয় অবস্থায় সালাত পড়তে দেখেছি। আবু দাউদ, হা/৬৫৩, হাদীসের সনদ হাসান। তাদের আরো দলীল আছে। আমাদের শাইখ মুকবিল রহিমাহুল্লাহর এ বিষয়ে একটা রিসালা রয়েছে। তিনি সেখানে ষোলটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় মতঃ জুতা খুলে সালাত পড়া উত্তম। কেননা জুতা খুলে সালাত পড়লে পায়ের পাতা সরাসরি সিজদার সময় জমিনের সাথে লাগে। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর ছাত্ররা ও তারা এই মতকে তার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং কতিপয় হাম্বলীরা তাদের সাথে একমত পোষণ করেছেন।

আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু দাকীকিল ঈদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসটি প্রমাণ করে জুতা পরে সালাত পড়া জায়েয আছে, তবে এটাকে মুস্তাহাব হিসেবে গ্রহণ করা অনুচিত। কেননা এতে সালাতের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত আর তা হলো জুতা পরে সালাত পড়া মুস্তাহাব। কারণ এ বিষয়ে দলীল বর্ণিত হয়েছে।

(ইহকাম, ১/২৩৬, ইলাম, ৩/১৪৩, ইবনু রজব, ৩/৪৪, ফাতহুল বারী, ১/৪৯৪, নাইলুল আওতার, ২/১৩৩)

জুতা খুললে মুসল্লী এই জুতা কোথায় রাখবে?

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের কেউ সালাত পড়লে তার ডানে ও বামে যেন জুতা না রাখে। এমন করলে অন্যের ডানে জুতা থাকবে। তবে যদি তার বামে কেউ না থাকে তাহলে রাখতে পারবে। সে যেন দুই পায়ের মাঝে জুতা রাখে"। আবু দাউদ, হা/৬৫৪, হাদীসের সনদ হাসান।

আব্দুল্লাহ ইবনু সায়েব রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা বিজয়ের দিন সালাত পড়তে দেখেছি। তিনি তার জুতা তার বাম দিকে রাখেন। (আবু দাউদ, হা/৬৪৮, হাদীসের সনদ সহীহ)

এই হাদীস ও পূর্বের হাদীসের ওপর ভিত্তি করে আমাদের শাইখ মুকবিল রহিমাহুল্লাহ এর একটা রিসালা আছে, যার নাম, 'শারঈয়াতুস সালাহ ফিন নিয়াল'। এই মাসআলা ও পূর্বের মাসআলার সার কথা হচ্ছে জুতা পরে সালাতে আদায় করা মুসল্লীর জন্য মুস্তাহাব। আর যদি জুতা খুলে সালাত পড়ে তাহলে তার বাম দিকে কেউ না থাকলে জুতা বাম দিকে রাখবে। তার বাম দিকে যদি কেউ থাকে তাহলে জুতা তার দুই পায়ের মাঝে রাখবে। আল্লাহ ভালো জানেন।

৯১. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلأَبِي الْعَاصِ ابْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

৯১. আবূ কাতাদাহ আল আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মেয়ে যায়নাবের কন্যা, উমামাহ বিনতে আবূল আস ইবনে রবী ইবনে আব্দিশ শামসকে বহন করা অবস্থায় সালাত আদায় করতেন। অতঃপর যখন তিনি সাজদাহ করতেন তখন তিনি মেয়েটিকে রেখে দিতেন আর যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন আবার মেয়েটিকে উঠিয়ে নিতেন। [সহীহ বুখারী হা/৫১৬, মুসলিম হা/৫৪৩]

সালাতে শিশুকে বহন করার বিধান

প্রথম মত: ফরয ও নফল সালাতে শিশুকে বহন করা জায়েয আছে। এটা শাফেয়ী, আবু ছাওর, ইবনু মুনযির রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। এ মতের দলীল: লেখক আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা।

দ্বিতীয় মত: মুসল্লী শিশুকে বহন করতে পারবে না, দরজা খুলতে পারবে না ও জন্তুর পেছনে চলতে পারবে না। যদি এগুলো করে তাহলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। এটা আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। কারণ সালাতে দরজা খোলা ও জন্তুর পেছনে চলার সম্পর্কে হাদীস আছে। এ বিষয়ে মাসআলা অচিরেই আসছে ইনশাআল্লাহ। (আওসাত, ৩/২৭৭)

ফরয সালাতে কোনো কাজ করলে বা বেশি পরিমাণ হাঁটলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে

হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, ফরয সালাতে বেশি পরিমাণ হাঁটলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের শাইখরা এই মাসআলা সম্পর্কে যা বলেছেন তার সার কথা হচ্ছে, যে সকল কাজ সালাতের সাথে সম্পৃক্ত নয় এগুলো বেশি পরিমাণ করলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। আর যদি কম পরিমাণ করে তাহলে সালাত বাতিল হবে না, এ বিষয়েও কোনো দ্বিমত নেই।

(মাজমু, ৪/২৫, ফাতহুল বারী, ৩/৮৩)

কাজ ও হাঁটার কম-বেশির পরিমাণ কতটুকু?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ মাজমুতে (৪/২৫) এর চারটা দিক আলোচনা করেছেন।

১. এক রাকআতের কম পরিমাণ সময় হলে তাকে কম বলা হয় আর এক রাকআতের চেয়ে বেশি পরিমাণ হলে তাকে বেশি বলা হয়। এটা রাফীর মত। তবে এই মত দুর্বল অথবা ভুল।

২. প্রত্যেক এমন কাজ, যা করতে দুই হাতের প্রয়োজন হয় না তাকে কম বলা হয়। যেমন: পাগড়ি উঠানো ও পায়জামার প্রান্ত ঠিক করা ইত্যাদি। প্রত্যেক এমন কাজ যা করতে দুই হাতের প্রয়োজন হয় তাকে বেশি বলা হয়। যেমন: পাগড়ি গোটানো, লুঙ্গী ও পায়জামা গিট দেয়া। এটা রাফীর মত।

৩. কম বলা হয় এমন কাজ করা, যা কেউ দেখলে মনে করে ব্যক্তি সালাতের মাঝেই আছে। আর বেশি বলা হয় এমন কাজ করা, যা করলে কেউ মনে করে ব্যক্তি সালাতের মাঝে নেই। এই মত দুর্বল। কারণ কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে দেখে শিশুকে বহন করছে বা সাপ হত্যা করছে অথবা বিচ্ছু মারছে তাহলে সে মনে করবে ওই ব্যক্তি সালাতের মাঝে নেই। অথচ এই পরিমাণ কাজ করলে সালাত বাতিল হয় না, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই।

৪. এই মতটি প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ মত। এই মতকেই লেখক ও অধিকাংশ বিদ্বান গ্রহণ করেছেন। আর তা হচ্ছে এই বিষয়টা মানুষের অভ্যাসের দিকে ন্যস্ত করা উচিত। সুতরাং মানুষ যা কম মনে করবে তা করলে কোনো সমস্যা নেই। যেমন: সালামের উত্তর দেয়ার জন্য ইশারা করা, জুতা খুলা, পাগড়ি উঠানো ও রাখা, পাতলা কাপড় পরা ও খোলা, শিশুকে বহন করা ও রাখা, সালাতের সামনে দিয়ে কেউ যেতে চাইলে তাকে প্রতিহত করা, কাপড়ে থুতু ঘষা ইত্যাদি কাজ। আর মানুষ যা বেশি মনে করে তা বেশি। যেমন: বেশি পরিমাণ হাঁটা ও পর্যায়ক্রমে বেশি বেশি কাজ করা। এগুলো করলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

٩٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ ".

৯২. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা সাজদায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত কনুই পর্যন্ত হাত বিছিয়ে না দেয়। [সহীহ বুখারী হা/৮২২, মুসলিম হা/৪৯৩]

١٥-بَابُ وُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অধ্যায়: ১৫- রুকূ'ও সাজদায় ধিরস্থিরতা অবলম্বন করা ফরয

٩٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –: (أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ – ثَلاثًا – فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا).

৯৩. আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে প্রবেশ করলেন। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করে। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে সালাম প্রদান করে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি ফিরে যাও অতঃপর সালাত আদায় কর। কারণ তুমি সালাত। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল। এরপর আবার সালাত আদায় করল যেমন সে আগের বার সালাত আদায় করেছিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে আবার সালাম দিলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। তুমি ফিরে যাও, অতঃপর সালাত আদায় করো। কারণ তুমি সালাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার লোকটি সালাত পড়ল। অতঃপর লোকটি বলল: যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম করে বলছি, আমি এর চেয়ে সুন্দর করে সালাত আদায় করতে জানি না। আমাকে সালাত শিখিয়ে দিন। তখন রসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে। অতঃপর কুরআন মাজীদের মধ্য হতে যা তোমার পক্ষে সহজ হয় তা তিলাওয়াত করবে। অতঃপর রুকূ করবে এবং রুকূতে বেশ কিছু সময় স্থির থাকবে। এরপর মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর সাজদা করবে ও সাজদায় গিয়ে বেশ কিছু সময় স্থির থাকবে। তারপর মাথা উঠাবে এবং স্থির হয়ে বসবে। অতঃপর তোমার সম্পূর্ণ সালাতে এরূপই করবে। [সহীহ বুখারী হা/৭৫৭, মুসলিম হা/৩৯৭]

এই হাদীস যে সকল ওয়াজিব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ শারহে মুসলিমে (৩৯৭) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এই হাদীসের মাঝে অনেক উপকারিতা রয়েছে। প্রথমে একটা বিষয় জেনে রাখা ভালো, এই হাদীসে ওয়াজিবসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, সুন্নাহসমূহ নয়। কেউ যদি বলে, এই হাদীসে তো সব ওয়াজিব বর্ণনা করা হয়নি। কারণ এই হাদীসে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়নি যা সকল বিদ্বানের নিকট ওয়াজিব ও এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়নি যাতে তাদের মাঝে মতভেদ আছে।

সকল বিদ্বান একমত এমন ওয়াজিব। যেমন: সালাতের শুরুতে নিয়্যাত করা, শেষ তাশাহুদে বসা, সালাতের রুকনগুলো ধারাবাহিক করা।

যে সকল বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন: শেষ তাশাহুদ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করা ও সালাম ফেরানো সম্পর্কে। তারপর তিনি এই মাসআলা সমূহের মতভেদ উল্লেখ করে বলেন, এই সব কথার জবাব হচ্ছে, যে সকল ওয়াজিব সকল বিদ্বানের নিকট ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও তা হাদীসে উল্লেখ না করার কারণ হচ্ছে প্রশ্নকারীর তা জানা ছিল। এ জন্যই তার কাছে বলা হয়নি। এমনিভাবে যে সকল বিষয়ে মতভেদ আছে এই কারণেই এগুলো বর্ণনা করা হয়নি। তারপর তিনি হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত মাসআলাসমূহ বর্ণনা করেন। কারো জানতে ইচ্ছে করলে সেখানে যাও।

রুকু হলো সালাতের রুকনসমূহের মাঝে একটি রুকন

কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা এ বিষয়টা প্রমাণিত।

কিতাব থেকে দলীল: আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! রুকু ও সিজদা করো"। (সূরা আল হাজ্জ, ৭৭)

সুন্নাহ থেকে দলীল: লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, সেখানে আছে, "তারপর ধীরস্থিরতার সাথে রুকু করো"। আরো হাদীস আছে।

ইজমা থেকে দলীল: ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, সকল বিদ্বান একমত রুকু, সিজদা ও দাঁড়ানো ফরয।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, রুকু করা ওয়াজিব এটা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। এমনিভাবে এই মাসআলায় ইমাম নববী ও ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুমা ইজমা নকল করেন।

(তামহীদ, ১০/১৮৯, মুগনী, ১/৪৯৫, মাজমু, ৩/৩৬৪, মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ২২/৫৬৬)

রুকু থেকে উঠার বিধান

প্রথম মত: রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো সালাতের রুকনসমূহের মাঝে একটি রুকন। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের মাঝে আছে ছাওরী, আওযায়ী, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক ও আবু ইউসুফ রহিমাহুমুল্লাহ। তাদের দলীল: লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, সেখানে আছে, “তারপর রুকু থেকে উঠে পরিপূর্ণভাবে দাঁড়াবে”। অনুরূপ রিফায়া ইবনু রাফে রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসেও এসেছে।

দ্বিতীয় মত: রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো সালাতের রুকনসমূহ থেকে কোনো রুকন নয়। সুতরাং যদি রুকু করে, তারপর সিজদা করে তাহলে এটা যথেষ্ট হয়ে যাবে। এটা আবু হানিফা ও মালেক রহিমাহুমার মত। এই মতের দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী: “হে ঈমানদারগণ! রুকু ও সিজদা করো”। (সূরা আল হাজ্জ, ৭৭)

আয়াতের মাঝে রুকু থেকে উঠার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর মত পূর্বের দলীল দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। এমনিভাবে পূর্বে বর্ণিত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার (৮৫) হাদীস দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। সেখানে আছে, “তিনি রুকু থেকে উঠে পরিপূর্ণভাবে না দাঁড়িয়ে সিজদায় যেতেন না”।

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ যে মত দিয়েছেন, ‘রুকু থেকে উঠে সোজা না হয়ে সিজদা করলে যথেষ্ট হয়ে যাবে’ বিদ্বানরা তার এই মতকে অপছন্দ করেন। তারা বলেন, এই মত সুন্নাহ ও ইজমা বিরোধী।

(ইস্তিযকার, ৫/৩৭২, মুগনী, ১/৫০৮, শারহে মুসলিম, ৩৯৭, ইবনু রজব, ৭/২০৭)

সিজদা হলো সালাতের রুকন সমূহের মাঝে একটি রুকন

এ বিষয়ে রুকুর মাসআলায় আয়াত গত হয়েছে। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে আছে, “তারপর ধীরস্থিরতার সাথে সিজদা করবে”।

ইজমার ব্যাপারে ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, সকল বিদ্বান একমত সালাতে রুকু, সিজদা ও দাঁড়ানো ফরয।

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, সিজদা করা ওয়াজিব, যা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সিজদা করা ফরয, যা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাআলা রুকু ও সিজদাকে ওয়াজিব করেছেন, যা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

(তামহীদ, ১০/১৮৯, মুগনী, ১/৫১৪, মাজমু, ৩/৩৯৪, মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ২২/৫৬৬)

সিজদা থেকে উঠা ও সোজা হয়ে বসার বিধান

প্রথম মত: সিজদা থেকে উঠা ও সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব। অর্থাৎ সিজদা শেষ করে তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে তারপর সোজা হয়ে বসবে। এটা ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ ও অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: পূর্বে বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস। সেখানে আছে, তারপর ধীরস্থিরতার সাথে সিজদা করবে। তারপর সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসবে”।

দ্বিতীয় মত: সিজদা থেকে উঠা ও সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব নয়। এটা মালেক ও আবু হানিফা রহিমাহুমার মত। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এর নিকট মাথা তরবারীর সমপরিমাণ উঠানোই যথেষ্ট। কেননা এই বসাটা শুধুমাত্র দু’টি সিজদার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য। আর এটি ওয়াজিব নয়।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। দেখুন, আগের মাসআলা দেখুন।

(মুগনী, ১/৫২২, শারহে মুসলিম, ৩৯৭)

রুকুতে, রুকু থেকে উঠে, সিজদাতে ও সিজদার মাঝে ধীরস্থিরতার বিধান

প্রথম মত: ধীরস্থিরতা হলো রুকন। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: লেখক আবু হুরায়র রাদ্বিয়াল্লাহর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা এবং রিফায়া ইবনু রাফে রাদ্বিয়াল্লাহ

আনহুর হাদীস, যা আবু দাউদ বর্ণনা করেন, হা/৮৫৭। এমনিভাবে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, যা (৯১) নাম্বারে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আছে, তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতেন, কোনো ব্যক্তি মনে করতো যে, তিনি ভুলে গেছেন। সিজদা থেকে মাথা তুলে অবস্থান করতেন, কোনো ব্যক্তি মনে করতো যে, তিনি ভুলে গেছেন। তাদের আরো দলীল আছে।

তৃতীয় মত: রুকুতে শুধু ঝুঁকলেই চলবে, ধীরস্থিরতা ওয়াজিব নয়। এটা আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত।

(মাজমু, ৩/৩৮১, শারহে মুসলিম, ৩৯৭, ইবনু রজব, ৭/২০৫, নাইলুল আওতার, ৩/১৯৪)

١٦–بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

অধ্যায়: ১৬-সালাতে কিরাআত পাঠ করা

٩٤. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ".

৯৪. উবাদাহ ইবনে ছামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না তার কোনো সালাত নেই। [সহীহ বুখারী হা/৭৫৬, মুসলিম হা/৩৯৪]

সূরা ফাতিহা পাঠের বিধান

প্রথম মত: সূরা ফাতিহা পড়া সালাতের রুকন, এটা ছাড়া সালাত বিশুদ্ধ হবে না। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। এই মতের দলীল: লেখক উবাদা ইবনু সামেত রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা এবং মুসলিমে (৩৯৫) বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়েনি তার সালাত অপূর্ণাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ"।

এমনিভাবে আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে সূরা ফাতিহা ও যা সহজ তা পড়তে আদেশ করেন। (মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩, আবু দাউদ, হা/৮১৮, সহীহুল মুসনাদ, ৪০৪)

দ্বিতীয় মতঃ প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, কিন্তু সালাতের জন্য শর্ত নয়। আর পরের দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়। ইচ্ছা হলে পড়বে, ইচ্ছা হলে তাসবীহ পাঠ করবে, ইচ্ছা হলে চুপ থাকবে। এটা আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর মত। হাসান বাসারী ও দাউদ যাহিরীর কতিপয় ছাত্র বলেন, সালাতে শুধু এক রাকআতে সূরা পড়া ওয়াজিব। ইসহাক ইবনু রাহওয়াই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অধিকাংশ রাকআতে কিরাত পড়লে যথেষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ থেকে একটা মত বর্ণিত হয়েছে, সালাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া নির্দিষ্ট নয়, বরং অন্য যে কোনো সূরা পড়লেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। তাদের দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী,

"কুরআন থেকে যা সহজ তা পড়ো"। (সূরা মুযাম্মেল, ২০)

সালাতে ভুলকারীর হাদীসে আছে, "তারপর কুরআন থেকে যা তোমার কাছে সহজ তা পড়ো"।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আর দ্বিতীয় মতের ব্যাপারে ইমাম শাওকানী লম্বা চওড়া জবাব দিয়েছেন। কেউ চাইলে দেখতে পারেন।

(আওসাত, ৩/৯৮, মুহাল্লা, ২/২৬৫, মুগনী, ১/৪৭৬, মাজমু, ৩/৩১৮, ফাতহুল বারী, ২/২৪২, নাইলুল আওতার, ৩/১০৪-১১১)

ইমামের পেছনে মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান

প্রথম মতঃ আস্তে কিরাত ও জোরে কিরাত সকল সালাতে মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল পূর্বে গত হয়েছে।

দ্বিতীয় মতঃ যে সকল সালাতে জোরে কিরাত পড়া হয় ওই সালাতে ফাতিহা পড়বে না। আর যে সকল সালাতে আস্তে কিরাত পড়া হয় ওই সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। এটা ইমাম যুহরী, মালেক, ইবনু মোবারক, আহমাদের একটি মত, ইসহাকের মত এবং শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ এই মত পছন্দ করেছেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে সকল সালাতে জোরে কিরাত পড়া হয় ওই সালাতে ইমামের পেছনে মুক্তাদীর কিরাত পড়া অনর্থক কাজ, যা শরীআত নিষেধ করেছে। এই মতের দলীলঃ

১. আল্লাহ তাআলার বাণী, "কুরআন পাঠ করা হলে মনোযোগ সহকারে শুনো ও চুপ থাকো"। (সূরা আরাফ, ২০৪)

২. মুসলিমে (৪০৪) বর্ণিত আবু মুসা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস তার কিছু বর্ণনায় আছে, "যখন কিরাত পাঠ করা হবে, তখন চুপ থাকবে"। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে এই বর্ণনা শায। সোলাইমান তামীমী এটা শায করেছেন।

৩. মুয়াত্তায় বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোরে কিরাত পড়া হয় এমন সালাত শেষ করে বলেন, "এখন তোমাদের মাঝে কেউ কি আমার সাথে সাথে কিরাত পড়েছে"? এরপর একলোক বললো, হ্যাঁ, আমি পড়েছি হে আল্লাহর রাসূল! তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এজন্যই তো আমি বলি, কে আমার সাথে কুরআন নিয়ে টানাটানি করছে?! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একথা শুনে লোকেরা এরপর থেকে জেহরী কিরাতে কিরাত পড়া বন্ধ করে দেয়। এই হাদীসে তাঁর কথা, 'একথা শুনে লোকেরা এরপর থেকে জেহরী কিরাতে কিরাত পড়া বন্ধ করে দেয়' এটা যুহরীর কথা। মুহাম্মদ ইবনু ইয়াহইয়া যুহালী, বুখারী ও আবু দাউদ রহিমাহুমুল্লাহ এই কথা বলেন। তাদের থেকে ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ মাজমুতে উল্লেখ করেন। ইমাম তিরমিযী, ইবনু হিব্বান ও বাইহাকী প্রমুখ বিদ্বান এদিকেই ইঙ্গিত করেন।

তৃতীয় মতঃ জোরে আস্তে কোনো সালাতেই মুক্তাদীরা কিরাত পড়তে পারবে না। এটা আবু হানিফা, ছাওরী, ইবনু উয়াইনা প্রমুখ বিদ্বানের মত। তাদের দলীলঃ 'যার ইমাম আছে, ইমামের কিরাতই তার কিরাত'। এই হাদীসটি অনেক সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাদের মাঝে আছেন আবু হুরায়রা, ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস, আবু সাঈদ, আবুদ্দারদা ও জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম। তবে হাদীসের হাফেজগণ বলেন, হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। যে সকল সালাতে কিরাত জোরে পড়া হয় ওই সালাতে মুক্তাদী শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। আর যে সকল সালাতে আস্তে কিরাত পড়া হয় ওই সালাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়তে পারবে। আল্লাহ ভালো জানেন। আমি বলছি, দলীলের আলোকে আমিও এই মত গ্রহণ করেছি। আল্লাহ ভালো জানেন।

(আওসাত, ২/১০১, মাজমু, ৩/৩২২, নাইলুল মাআরিব, ১/১৫৬)

সম্পূর্ণ সূরা ফাতিহা আয়াত, হরফ ও কালিমাসহ পাঠ করবে

শাইখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ শারহুল মুমতিতে (৩/৬০) বলেন, সম্পূর্ণ সূরা ফাতিহা আয়াত, হরফ, হরকত ও কালিমাসহ পাঠ করতে হবে। যদি ছয়টি আয়াত পড়ে তাহলে কিরাত বিশুদ্ধ হবে না। আর যদি সাতটি আয়াত পড়ে, কিন্তু 'যা-ল্লীন' বাদ দেয় তাহলে কিরাত বিশুদ্ধ হবে না। সম্পূর্ণ সূরা ফাতিহা যদি পড়ে, কিন্তু একটা হরফ যদি বাদ দেয়, যেমনঃ 'সিরাতাল লাযীনা আনআমতা আলাইহীম' এর মাঝে 'তা' হরফ বাদ দেয় তাহলে কিরাত বিশুদ্ধ হবে না। হরকত পরিবর্তনের দ্বারা যদি অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে কিরাত

বিশুদ্ধ হবে না। আর যদি অর্থ পরিবর্তন না হয় তাহলে বিশুদ্ধ হবে। অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার উদাহরণ: যেমন বলা, হামযায় যবর দিয়ে 'আহদিনা' এর অর্থ হয়, 'আমাদের উপহার দিন'। কিন্তু হামযায়ে অসল দিয়ে পড়লে অর্থ হয়, 'আমাদের বলে দিন, আমাদের তাওফীক দিন ও আমাদের এর ওপর অবিচল রাখুন'। আর যদি 'সিরাতাল লাযীনা আনআমতা আলাইহীম' এর পরিবর্তে 'তু' পড়ে তাহলে বিশুদ্ধ হবে না। কেননা এখানে অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে। অর্থ হচ্ছে যে পড়ছে নিয়ামত তার পক্ষ থেকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। অর্থ পরিবর্তন হয়নি এর উদাহরণ: যেমন 'আলহামদু' এর মাঝে 'আলহামদি' যের দিয়ে পড়েছে। 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' 'বা' তাশদীদ দিয়ে না পড়লে কিরাত বিশুদ্ধ হবে না। কেননা একটা হরফ বাদ পড়েছে। কারণ তাশদীদও একটা হরফ।

৯৫. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، يُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا. وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ. وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى فِي صَلاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

৯৫. আবূ কাতাদাহ আল আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের প্রথম দুই রাকআতে সূরাতুল ফাতিহা ও অন্য দুইটি সূরা পাঠ করতেন। প্রথম রাকআতে কিরাআত লম্বা (বেশি আয়াত পড়তেন) করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সংক্ষেপ (কম আয়াত পড়তেন) করতেন। তিনি কখনো কখনো আমাদেরকে কোনো আয়াত শোনাতেন। আর তিনি আসরের সালাতে (প্রথম দুই রাকআতে) সূরাতুল ফাতিহা এবং অন্য আরো দুইটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। প্রথম রাকআতের কিরাআত লম্বা আর দ্বিতীয় রাকাতের কিরাআত সংক্ষেপ করতেন। আর অবশিষ্ট দুই রাকআতে (যুহর ও আসরের) শুধু উম্মুল কিতাব অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। আর ফজরের সালাতে প্রথম রাকআত তিনি দীর্ঘ করতেন আর দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষেপ করতেন। [সহীহ বুখারী হা/৭৫৯, মুসলিম হা/৪৫১]

সূরা ফাতিহার পর কুরআনের কোনো আয়াত পড়ার বিধান

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়া সুন্নাহ এ বিষয়ে কারো দ্বিমত আছে কিনা আমাদের জানা নেই। সূরা ফাতিহা জোরে পড়লে এরপরের সূরাও জোরে পড়বে। আর আস্তে পড়লে সেগুলো আস্তে পড়বে। ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এই হাদীস

প্রমাণ করে যুহর ও আসরের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়া মুস্তাহাব। এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত। তবে অন্য সূরা পড়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে।

হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু হিব্বান ও কুরতুবী প্রমুখ বিদ্বান ইজমা দাবি করেন, সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়া ওয়াজিব নয়। তাদের এই ইজমা দাবিতে বিবেচনার বিষয় আছে। কারণ অনেক সাহাবী ও তৎপরবর্তী অনেক বিদ্বান ওয়াজিবের কথা বলেছেন।

আমি বলছি, উমার, তার ছেলে আব্দুল্লাহ, উসমান ইবনু আবীল আস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম বলেন, সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়া ওয়াজিব। এমনিভাবে এটা কাসেমের কথা, শাওকানী রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। এই মতটি আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের নিকটবর্তী। তিনি বলেন, আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফাতিহা ও যা সহজ তা পড়তে আদেশ করেন। (সহীহুল মুসনাদ, হা/৪০৪)

প্রথম রাকআত পরের রাকআতগুলোর চেয়ে একটু লম্বা করা কি মুস্তাহাব?

প্রথম মত: প্রথম রাকআত পরের রাকআতগুলোর চেয়ে একটু লম্বা করা মুস্তাহাব। এটা কিছু বিদ্বানের মত। তাদের মাঝে আছেন ছাওরী, আহমাদ, ইসহাক, মুহাম্মদ ইবনু হাসান ও শাফেয়ী মাযহাবের কিছু বিদ্বানের মত। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকেও এই মতটি বর্ণিত হয়েছে। এই মতের দলীল: লেখক আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। তাদের আরো দলীল আছে।

দ্বিতীয় মত: ফজরের প্রথম রাকআত ব্যতীত অন্য কোনো সালাতে প্রথম রাকআত পরের রাকআত থেকে লম্বা করবে না। কেননা ওই সময়টা হচ্ছে ঘুমের সময় ও উদাসীনতার সময়। এটা আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর মত।

তৃতীয় মত: সকল সালাতে প্রথম দুই রাকআত সমান লম্বা হবে। এটা ইমাম মালেক ও শাফেয়ী রহিমাহুমার মত। এই মতের দলীল: “আমি প্রথম দুই রাকআত একটু আস্তে পড়ি ও পরের দুই রাকআত একটু তাড়াতাড়ি পড়ি”।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীসটি বিশুদ্ধ নয় এবং হাদীসে একথাও নেই যে, তিনি প্রথম দুই রাকআত সমান লম্বা করেন। তারপর তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিরাত, সূরা আলা, গাশিয়া, জুমআ, মুনাফিকুন, আলিফ লাম মীম সিজদা, সূরা দাহার, কাফ ও কামার এই সূরাগুলো দ্বারা দলীল দেন যে, এই সূরাগুলো লম্বায় প্রায় সমান সমান।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত।

(ইবনু রজব, ৭/১৩, শারহে মুসলিম, ৪৫১)

٩٦. عن جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ في الْمَغْرِبِ بِ " وَالطُّورِ".

৯৬. জুবাইর ইবনে মুতঈম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরীবের সালাতে সূরা আত-তূর পাঠ করতে শুনেছি। [সহীহ বুখারী হা/৭৬৫, ৩০৫০, মুসলিম হা/৪৬৩]

মাগরিবের সালাত জেহরী সালাত (কিরাত জোরে পড়া হয়)

লেখক যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীসটি প্রমাণ বহন করে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের সালাতে কিরাত জোরে পড়তেন। কেননা যারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মাগরিবের কিরাত সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের অধিকাংশ বর্ণনাকারী বলেন, আমরা কিরাত শুনেছি। এটাই প্রমাণ বহন করে যে, মাগরিবের সালাত জেহরী সালাত। মাগরিবের সালাত জেহরী সালাত এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিয়ে বর্তমান অবধি বিদ্বানরা এর ওপরই অবিচল আছেন। আমি বলছি, ইবনু মুনযির, ইবনু হাযম প্রমুখ বিদ্বান ইজমা নকল করেন, মাগরিবের প্রথম দুই রাকআতে কিরাত জোরে পড়তে হয়।

(ইকনা, ১/৩৬৮, ইবনু রজব, ৭/৩৫, ফাতহুল বারী, ২/২৪৮)

জোরে পড়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ কতটুকু?

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, জোরে পড়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে নিকটবর্তী মানুষ শুনতে পাবে। এটাই আমাদের শাইখদের অভিমত, শাফেয়ীদের ও অন্যান্যদের মত। ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার দুই কানকে শ্রবণ করিয়েছে সে আস্তে পড়েনি। তার এই কথা প্রমাণ করে নিজেকে শুনানো জোরে পড়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ। ওয়াকী, সুফিয়ান থেকে, তিনি আশয়াছ ইবনু আবীশ শাছা থেকে, তিনি আসওয়াদ ইবনু হিলাল থেকে, তিনি ইবনু মাসউদ থেকে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার দুই কানকে শ্রবণ করিয়েছে সে আস্তে পড়েনি। আর জোরে পড়ার সর্বোচ্চ পরিমাণ হলো কারো কষ্ট না হলে পেছনের মানুষদের শুনানো। উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু মাসজিদের বাহিরে যারা আছে তাদের কিরাত শুনাতেন।

জেহরী সালাতে কিরাত জোরে পড়ার বিধান কী?

প্রথম মত: জেহরী সালাতে কিরাত জোরে পড়া সুন্নাহ, কেউ জোরে না পড়লে সালাত বাতিল হবে না। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

দ্বিতীয় মত: জেহরী সালাতে কিরাত জোরে না পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। এই মত ইবনু আবী লাইলা থেকে বর্ণিত হয়েছে ও হাম্বলীদের দুর্বল মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(ইবনু রজব, ৭/৩৬)

জেহরী সালাতে একাকী সালাত আদায়কারী ব্যক্তির কিরাত জোরে পড়ার বিধান কী?

প্রথম মত: জোরে কিরাত পড়া মুস্তাহাব। এটা ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ ও তার ছাত্রদের মত।

দ্বিতীয় মত: জোরে পড়া জায়েয আছে, তবে সুন্নাহ নয়। এটা আবু হানিফা ও আহমাদ রহিমাহুমার মত। আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, চাইলে জোরে কিরাত পড়বে আর না চাইলে পড়বে না। অনুরূপ তাউসও বলেন। তারা বলেন, জামাআত হলে জোরে পড়তে হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, “কুরআন পড়া হলে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো ও চুপ থাকো, অবশ্যই তোমাদের ওপর রহম করা হবে”। (সূরা আরাফ, ২০৪)

আয়াতটি সালাত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

তৃতীয় মত: একাকী সালাত আদায়কারী ব্যক্তির কিরাত জোরে পড়া মাকরূহ। এটা কতিপয় হাম্বলীদের মত।

সঠিক মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন। (ইবনু রজব, ৭/৩৬)

৯৭. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِ"وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ" فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ.

৯৭. বারা ইবনে আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সফরে ছিলেন। অতঃপর তিনি ইশার সালাত আদায় করলেন। সেই সালাতের প্রথম দু'রাকআতের কোনো এক রাকআতে সূরা আত-তীন তিলাওয়াত করলেন।

আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর কণ্ঠস্বর কিংবা কিরাআত শুনিনি। [সহীহ বুখারী হা/৭৬৭, মুসলিম হা/৪৬৪]

ইশার সালাতের প্রথম দুই রাকআতে জোরে কিরআত পাঠ করা

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ হাদীসের (فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর কণ্ঠস্বর কিংবা কিরাআত শুনিনি) এ অংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এটা প্রমাণ বহন করে যে, ইশার সালাত জেহরী সালাত। আর ইশার সালাতের প্রথম দুই রাকআত জোরে কিরআত পাঠ করার ব্যাপারে মুসলিমগণ একমত। মুসলিম উম্মাহ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে এটার ওপর আমল করে আসছে। ইশার জেহরী সালাতের বিধান মাগরিবের জেহরী সালাতের বিধানের মতই।

আমি বলছি, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনু মুনযিরসহ প্রমুখ বিদ্বান ইজমা নকল করেন যে, ইশার প্রথম দুই রাকআতে কিরাত জোরে পড়তে হয়। (ইকনা, ১/৩৬৮, ইবনু রজব, ৭/৩৯)।

٩٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بـ «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» فَلَمَّا رَجَعُوا، ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعَ ذَلِكَ؟ فَسَأَلُوهُ. فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: أَخْبِرُوهُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ) .

৯৮. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একটি লোককে সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধি করে পাঠালেন। লোকটি তাঁর সঙ্গীদের সালাতের ইমামতি করার সময় সূরা ইখলাছ (কুলহু আল্লাহু আহাদ) দ্বারা কিরাআত শেষ করতেন। যখন তাঁরা যুদ্ধ হতে ফিরে আসলো তখন বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থাপন করল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করো কেন সে এরকম করত। অতঃপর তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে সে বলে, এ সূরাটি আল্লাহর তা'আলার গুণাবলি সম্পন্ন একটি সূরা। অতএব, আমি এ সূরাটি পাঠ করতে ভালোবাসি। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন, তোমরাও তাঁকে সংবাদ দাও যে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে ভালোবাসেন। [সহীহ বুখারী হা/৭৩৭৫, মুসলিম হা/৮১৩]

৯৯. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ: فَلَوْلا صَلَّيْتَ بـ"{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}"، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، و{وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}. فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ.

৯৯. জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন: **{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}** (সূরা আল আলা), **{وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}** (সূরা আশ শামস), **{وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}** (সূরা আল লাইল) এসব সূরা দ্বারা তুমি কেন সালাত পড়াও না। কারণ তোমার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোক থাকে। [সহীহ বুখারী হা/৭০৫, মুসলিম হা/৪৬৫]

١٧- بَابُ تَرْكِ الجَهْرِ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

অধ্যায়: ১৭-বিসমিল্লাহির রহমানির উচ্চস্বরে পরিত্যাগ করা

١٠٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –: (أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلاةَ بِ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ») . وَفِي رِوَايَةٍ: (صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

وَلِمُسْلِمٍ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلاةَ بِ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلا فِي آخِرِهَا) .

১০০. আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর ও উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁরা সবাই " **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** " দ্বারা সালাত শুরু করতেন। [সহীহ বুখারী হা/৭৪৩, মুসলিম হা/৩৯৯]

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, আমি আবূ বকর, উমার এবং ওসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তাঁদের কারো নিকট হতে আমি **بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** বলতে শুনিনি। [সহীহ মুসলিম হা/৩৯৯]

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর, উমারএবং ওসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তারা সকলেই الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ দ্বারা সালাত শুরু করতেন। তারা কেউ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ কে সালাতের শুরুতে কিংবা শেষে উল্লেখ করতেন না। [সহীহ মুসলিম হা/৩৯৯]

সালাতে আউযুবিল্লাহ বলার বিধান

প্রথম মতঃ সালাতে আউযুবিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী, "কুরআন পড়লে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও"। (সূরা আন নাহল, ৯৮)

আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে সালাতের জন্য দাঁড়ালে তাকবীর দিয়ে বলতেন, 'আউযুবিল্লাহিস সামিইল আলীম মিনাশ শাইতানির রজীম মিন হামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফসিহি'। আবু দাউদ, হা/৭৭৫, তিরমিযী, হা/২৪২, শাহেদের ভিত্তিতে শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ ইরওয়াউল গালীলে (২/৫১) হাদীসটি বিশুদ্ধ বলেছেন।

দ্বিতীয় মতঃ আউযুবিল্লাহ বলা ওয়াজিব। এটা আতা, ছাওরী, ইবনু হাযম ও দাউদ যাহিরীর একমত। এই মতের দলীল হলো পূর্বে বর্ণিত আয়াত ও হাদীস।

তৃতীয় মতঃ আউযুবিল্লাহ বলবে না। এটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মত। এই মতের দলীলঃ আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শুরু করতেন 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে। এর উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে তিনি সালাতের কিরাত তাকবীর ও 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে শুরু করতেন।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। আয়াতের আলোকে সালাতে আউযুবিল্লাহ বলা ওয়াজিব।

শানকিতী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আয়াতের বাহ্যিক অবস্থা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কিরাত পড়ার সময় আউযুবিল্লাহ বলা ওয়াজিব। কেননা আয়াতে আমরের (আদেশ) সিগা ব্যবহার করা হয়েছে। আর আমরের চাহিদা হলো এটা ওয়াজিব বুঝায়। অবশ্য অনেক বিদ্বান বলেন, আয়াতে যে আমর ব্যবহার করা হয়েছে এর দ্বারা মান্দুব ও মুস্তাহাব উদ্দেশ্য। এর ওপর আবু জাফর ইবনু জারীর ও অন্যান্য ইমামরা ইজমা বর্ণনা করেন। (আওসাত, ৩/৮৯, মাজমু, ৩/২৮৩, ইবনু রজব, ৬/৪৩১, আযওয়াউল বায়ান, ৩/৩২৫)। মিসকুল খিতাম ১/৪৯৭।

আউযুবিল্লাহ কি শুধুমাত্র প্রথম রাকআতে বলতে হবে নাকি প্রত্যেক রাকআতে **বলতে হবে?**

প্রথম মত: প্রত্যেক রাকআতে আউযুবিল্লাহ বলতে হবে। এটা ইবনু সিরীন, হাসান, শাফেয়ী, ইবনু হাযম ও আহমাদের একটি মত রহিমাহুমুল্লাহ।

দ্বিতীয় মত: শুধু প্রথম রাকআতে আউযুবিল্লাহ বলতে হবে। এটা আতা, হাসান, নাখয়ী, ছাওরী, আবু হানিফা ও আহমাদের একটি মত রহিমাহুমুল্লাহ।

সঠিক মত: সঠিক মতহ হচ্ছে প্রথম রাকআতে আউযুবিল্লাহ বলা ওয়াজিব ও বাকি রাকআতে মুস্তাহাব। আল্লাহ ভালো জানেন।

(আওসাত, ৩/৮৯, মুহাল্লা, ২/২৭৮, মাজমু, ৩/২৮২, ইবনু রজব, ৬/৪৩১)। মিসকুল খিতাম ১/৪৯৮।

আউযুবিল্লাহ কি জোরে বলবে নাকি আস্তে?

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে (৬/৪৩০) বলেন, অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, জেহরী সালাতে আউযুবিল্লাহ আস্তে বলবে। এটা ইবনু উমার, ইবনু মাসউদ ও অনেক সাহাবীর মত। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, আউযুবিল্লাহ জোরে বলতে হবে। এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর দুইটি মত আছে। ইবনু আবী লাইলা থেকে জোরে ও আস্তে পড়ার দুই মতই বর্ণিত হয়েছে।

আমি বলছি, সঠিক মত হচ্ছে যা অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি যে, তিনি আউযুবিল্লাহ জোরে পড়েছেন। আল্লাহ ভালো জানেন।

বিসমিল্লাহ কি সূরা ফাতিহা ও প্রত্যেক সূরার একটি আয়াত?

প্রথম মত: বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহা ও অন্য কোনো সূরার আয়াত নয়। বরং দুই সূরার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য মূলত বিসমিল্লাহ কে নিয়ে আসা হয়েছে। এটা ইমাম মালেক, আবু হানিফা, তাদের ছাত্রদের মত, আওযায়ী, দাউদ ও ইমাম আহমাদের একটি মত। তাদের দলীল:

১. লেখক আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। এই হাদীস থেকে তারা প্রমাণ দেন যে, হাদীসে বিসমিল্লাহ এর কথা উল্লেখ নেই। এটাই প্রমাণ করে যে, বিসমিল্লাহ আয়াতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ বলেন, "আমি সালাতকে (ফাতিহাকে) আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে দুইভাগে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দার জন্য তা আছে যা সে চায়। বান্দা যখন বলে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' হাদীসের শেষ পর্যন্ত। হাদীসটি মুসলিমে (৩৯৫) বর্ণিত হয়েছে। হাদীস থেকে প্রমাণ হচ্ছে এখানে বিসমিল্লাহ উল্লেখ করা হয়নি।

৩. অহী সূচনা হওয়ার হাদীস, যা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আছে, তারপর ফেরেশতা এসে বলেন, "তুমি তোমার ওই রবের নামে পড়ো, যিনি সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা আলাক, ১) বুখারী, হা/৩, মুসলিম, হা/১৬০)। এখানেও বিসমিল্লাহ উল্লেখ করা হয়নি।

৪. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "কুরআনের একটা সূরার ত্রিশটি আয়াত রয়েছে। এটা কোনো ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, তা হচ্ছে , 'তাবারকাল্লাযি বিইয়াদিহিল মূলক'। (সূরা মূলক, ১)

হাদীসটি আহমাদ (২/২৯৯) আবু দাউদ, (হা/১৪০০) আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাদীস থেকে প্রমাণ হচ্ছে, সকল কারী একমত বিসমিল্লাহ ছাড়া সূরা সূলক এর আয়াত ত্রিশটি।

দ্বিতীয় মত: বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহা ও বাকি সূরার একটা আয়াত, তবে সূরা তাওবার আয়াত নয়। এটা ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার, ইবনু যুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম, তাউস, আতা, মাকহুল, ইবনু মোবারক ও ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহর তাদের মত। এটা শাফেয়ী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা অগণিত সালাফদের মত। তাদের দলীল: আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে ছিলেন। হঠাৎ তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হন! তারপর হাসিমুখে মাথা তুলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন বিষয় আপনাকে হাসিয়েছে? তিনি বলেন, "এইমাত্র আমার ওপর একটা সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে 'ইন্না আতাইনা কাল কাউসার' পড়েন"। (মুসলিম, হা/৪০০)

তারা আরো দলীল দেন যে, সাহাবীরা কুরআনে সূরা তাওবা ছাড়া বাকি সকল সূরাতে বিসমিল্লাহ রেখেছেন। সুতরাং এটা ইজমার মতো।

তৃতীয় মত: বিসমিল্লাহ শুধু সূরা ফাতিহার আয়াত। এই মত আলী, ইবনু আব্বাস, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাদের। এমনিভাবে এই মত গ্রহণ করেন সাঈদ ইবনু জুবায়ের, মুহাম্মদ ইবনু কাব আল কুরযী, যুহরী, সুফিয়ান ছাওরী, ইসহাক, আবু উবাইদ, কুফার বিদ্বানরা, মক্কা ও ইরাকের বিদ্বানরা, এটা আহমাদেরও একমত।

চতুর্থ মত: বিসমিল্লাহ সূরা তাওবা ও আনফাল ছাড়া বাকি প্রত্যেক সূরার শুরুতে স্বতন্ত্র একটা আয়াত। এটা ওই সূরার অন্তর্ভুক্ত নয় (বিসমিল্লাহ একটি আয়াত যেটা দু'টি সূরাকে পৃথক করার জন্যে নাযিল হয়েছে)। বরং এটা ছোট সূরার মতো। এটা আবু বকর রাযী, কিছু হানাফী ও আব্দুল্লাহ ইবনু মোবারক রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। এই মত দাউদ যাহিরী ও তার ছাত্রদের, ইমাম আহমাদের একটি মত। এই মতকে পছন্দ করেছেন ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ। এই মতের দলীল হলো যে সকল দলীল দ্বিতীয় মতে গত হয়েছে। এমনিভাবে তাদের দলীল হলো ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরার মাঝে পার্থক্য করতে পারতেন না। তারপর তার ওপর অবতীর্ণ হয় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। (আবু দাউদ, হা/৭৮৮) সনদ বিশুদ্ধ।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে চতুর্থ মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(ইস্তিযকার ৪/২০৪, মাজমু ৩/২৯০, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৪৩৩, ইখতিয়ার ৬৫, তাফসীর ইবনু কাছীর ১/১৭, নাইলুল আওতার ৩/৮২, শারহুল মুমতি ৩/৫৭)। মিসকুল খিতাম ১/৪৯৯।

বিসমিল্লাহকে কেউ আয়াত হিসেবে ধরলে বা কেউ না ধরলে তাকে কাফের বলা যাবে না

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিসমিল্লাহ এর ব্যাপারে মতভেদ থাকার কারণে কেউ এটাকে আয়াত হিসেবে ধরলে বা কেউ না ধরলে কাউকে কাফের বলা যাবে না। কিন্তু কেউ যদি বিসমিল্লাহ ছাড়া যে হরফ কুরআনের না তা কুরআনর হরফ বলে বা যে হরফ কুরআনের তাকে বলে কুরআনের না তাহলে সকল বিদ্বান একমত সে কাফের। আর সূরা নামলে যে বিসমিল্লাহ আছে, 'ইন্নাহু মিন সোলাইমানা ওয়া ইন্নাহু বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। (নাহল, ৩০)। এটা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে, কুরআনের আয়াত। কেউ এর একটা হরফকে অস্বীকার করলে সকল বিদ্বানের নিকট সে কাফের হয়ে যাবে। আমি বলছি, ইবনু তাইমিয়্যাহ ও শাওকানী রহিমাহুমাও এই ব্যাপারে ইজমা দাবি করেন।

(মাজমু, ৩/২৯০, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২২/৪৩৩, নাইলুল আওতার, ৩/৮৩)

বিসমিল্লাহ আস্তে বা জোরে যেভাবেই পড়া হোক না কেন সালাত বাতিল হবে না

ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, সকল বিদ্বান একমত বিসমিল্লাহ আস্তে পড়া হোক বা জোরে পড়া হোক সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ। ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেন বিসমিল্লাহ আস্তে পড়া ও জোরে পড়া নিয়ে যে মতভেদ এটা মূলত সুন্নাহ ও মুস্তাহাব নিয়ে। আস্তে ও জোরে যেভাবেই পড়া হোক না কেন সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এই মাসআলায় আলেমদের মতভেদ থাকার কারণে তুমি কিন্তু ধোঁকায় পতিত হবে না। কিছু মানুষ তো বাড়াবাড়ি করে এটাকে আকীদাগত মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

(ইবনু কাছীর, ১/১৮, নাইলুল আওতার, ৩/৯৩)

জেহরী সালাতে বিসমিল্লাহ আস্তে পড়ার বিধান

প্রথম মতঃ বিসমিল্লাহ জোরে পড়বে না, বরং আস্তে পড়বে। এটা অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ ও তৎপরবর্তী বিদ্বানদের মত। সাহাবীদের মাঝে আছেন আবু বকর, উমার, উসমান, আলী, ইবনু মাসউদ, আম্মার ইবনু ইয়াসার, ইবনু যুবায়ের প্রমুখ সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম। এই মতকে শাইখ আলবানী ও আমাদের শাইখ মুকবিল রহিমাহুমা পছন্দ করেছেন। এই মতের দলীলঃ লেখক আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। সেখানে আছে, "সাহাবীরা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দ্বারা সালাত শুরু করতেন"। তাদের আরো দলীল আছে।

দ্বিতীয় মতঃ সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা যেভাবে জোরে পড়া হয় বিসমিল্লাহও অনুরূপ জোরে পড়া মুস্তাহাব। এটা অনেক সাহাবী, তাবেঈ ও তৎপরবর্তী বিদ্বানদের মত। সাহাবীদের মাঝে আঠারোজন সাহাবী এই মত গ্রহণ করেছেন, তাদের মাঝে চার খলীফাও আছেন। এই মতের সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল হলো নুয়াইম আল মুজমার এর হাদীস। তিনি আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর পেছনে সালাত পড়লে তিনি বিসমিল্লাহ পড়েন। তবে হাদীসে উল্লেখিত বিসমিল্লাহ এর ব্যাপারে বিদ্বানরা ত্রুটি বর্ণনা করেন। কারো দেখতে মন চাইলে নাসবুর রায় দেখুন। (নাসবুর রায়, ১/৩৫৫)

তাদের আরো দলীল আছে, কিন্তু একটাও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। ইমাম যাইলায়ী নাসবুর রায় নামক কিতাবে বলেন, এ বিষয়ে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে এর একটাও বিশুদ্ধ নয়। কীভাবে বিশুদ্ধ হবে! একটা হাদীসও তো প্রসিদ্ধ কোনো হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। এর বর্ণনাকারীরা সবাই হয় মিথ্যুক অথবা অপরিচিত।

তৃতীয় মতঃ জেহরী ও সিররি কোনো সালাতেই বিসমিল্লাহ পড়বে না। এটা ইমাম মালেক ও আওযায়ী রহিমাহুমার মত। তাদের দলীলঃ লেখক আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। সেখানে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর, উমার, উসমান রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম তারা কিরাতের শুরুতে ও শেষে বিসমিল্লাহ এর কথা বলেননি। এর জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে যে, একথা নিশ্চিত, সাহাবীরা জোরে বিসমিল্লাহ বলতেন না। আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে দশ বছর উঠাবসা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিন খলীফার সাথে পঁচিশ বছর চলেছেন। তিনি তাদের পেছনে সালাত পড়তেন। আর তাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তারা বিসমিল্লাহ পড়তেন।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত (বিসমিল্লাহ জোরে পড়বে না, বরং আস্তে পড়বে)। বিসমিল্লাহ পড়া নিয়ে বিদ্বানরা অনেক গ্রন্থ রচনা

করেছেন। যারা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের মাঝে আছেন মুহাম্মদ ইবনু নাসর আল মারুযী, ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান, দারাকুতনী, খতীব বাগদাদী, বাইহাকী, ইবনু আব্দিল বার প্রমুখ বিদ্বান রহিমাহুমুল্লাহ। ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ এগুলো উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত কেউ জানতে চাইলে নিচের কিতাবগুলো দেখুন।

(আওসাত, ৩/১২৫, নাসবুর রায়, ১/৩৩০, মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ২২/২৭৪, ইবনু রজব, ৬/৪০৭, যাদুল মাআদ, ১/২০৬, তাফসীর ইবনু কাছীর, ১/১৮, তামামুল মিন্নাহ, ১৬৮, নাইলুল মাআরেব, ১/১৫৪)। মিসকুল খিতাম ১/৫০২।

١٨-بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

অধ্যায়: ১৮- সাহু সিজদা

١٠١. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: (صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ– صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ – قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَسَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ. وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا – قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ – وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ – فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ. وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَسِيتَ، أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ قَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ. فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ قَالَ: فَنُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ) . العَشِيُّ: مابينَ زوالِ الشمسِ وغروبِها.

১০১. প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহিমাহুল্লাহ আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রা বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে জোহর অথবা আসর এই দুই সালাতের মধ্য হতে কোনো এক সালাত আদায় করলেন। ইবনে সীরীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সে সালাতের নাম (যুহর ও আসর)

বলেছিলেন কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি। আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিনি আমাদের কে সঙ্গে নিয়ে (চার রাকআতের স্থলে) দুই রাকআত আদায় করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। তারপর মাসজিদের মধ্যে রাখা একটি কাঠের খণ্ডের সাথে হেলান দিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালেন যেন তিনি খুবই রাগান্বিত হয়ে আছেন। আর তিনি তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রাখলেন এবং উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করালেন। এদিকে দ্রুতগামী লোকেরা মাসজিদের বিভিন্ন দরজা দিয়ে বের হয়ে পড়ল। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, সালাত সংক্ষিপ্ত করা হলো নাকি? জনতার মধ্যে আবূ বকর ও উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ছিলেন। তাঁরাও এ বিষয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথা বলতে ভয় (সংকোচ) করছিলেন। লোকদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যার দুই হাত কিছুটা লম্বা ছিল। তাকে যুল ইদাঈন তথা লম্বা দু'হাত ওয়ালা বলা হতো। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি কি ভুল করছেন, নাকি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সালাত সংক্ষেপ করা হয়েছে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ভুলে যাইনি এবং এবং সালাতও সংক্ষেপ করা হয়নি। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণ কে প্রশ্ন করলেন, যুল ইদাঈন যা বলছে তা কি সঠিক? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি অগ্রসর হয়ে সামনে গেলেন এবং বাকী সালাত পড়লেন যা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর ছালাম ফিরালেন। তারপর তাকবীর তথা আল্লাহু আকবার বললেন এবং সিজদা করলেন সালাতের সাধারণ সাজদার মত। অথবা এর চেয়েও কিছুটা লম্বা। তারপর নিজ মাথা উঠালেন এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বললেন। তারপর তাকবীর তথা আল্লাহু আকবার বললেন এবং সিজদা করলেন সালাতের সাধারণ সাজদার মত। অথবা এর চেয়েও কিছুটা লম্বা। তারপর নিজ মাথা উঠালেন এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বললেন। বর্ণনাকারীকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, (আবূ হুরায়রা কি এটাও বলেছেন?) যে, অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন? তখন ইবনে সীরীন বললেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, ইমরান ইবনে হুসাঈন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন। [সহীহ বুখারী হা/৪৮২, মুসলিম হা/৫৭৩]

হাদীসে উল্লেখিত **العَشِيُّ** শব্দের অর্থ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত সময়।

١٠٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ – وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – (أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ،

حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ: كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ).

১০২. আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যতম একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তাঁদেরকে নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি প্রথম দুই রাকআত পর (প্রথম বৈঠক না করেই) দাঁড়িয়ে গেলেন, আর বসলেন না। অতঃপর লোকজন তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যায়। অবশেষে যখন তিনি সালাত আদায় করা শেষ করেন, লোকজন তাঁর সালামের অপেক্ষা করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বসে থেকেই তাকবীর প্রদান করেন। অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা দেন। তারপর সালাম ফিরান। [সহীহ বুখারী হা/৮২৯, মুসলিম হা/৫৭০]

সিজদায়ে সাহুর বিধান

প্রথম মত: সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব। এটা হাকাম, ইবনু শুবরুমা, মালেক, আবু হানিফা, ছাওরী, আহমাদ, ইসহাক রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন, সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব, কেউ ছেড়ে দিলে গুনাহগার হবে। তবে সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাতে ত্রুটি হওয়ার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাতে হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে সিজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব। এই মতের দলীল: বুখারী (৪০১) ও মুসলিমে (৫৭২) বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ মাত্র। তোমরা যেমন ভুলে যাও আমিও ভুলে যাই। আমি ভুলে গেলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। তোমাদের কারো সালাতে সন্দেহ হলে নিশ্চিতটাকে ধরে সালাত পূর্ণ করবে। তারপর সালাম ফিরিয়ে দুটি সিজদা দিবে"। মুসলিমে (৫৭১) বর্ণিত আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, "তারপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দুটি সিজদা করবে"।

দ্বিতীয় মত: সিজদায়ে সাহু মুস্তাহাব। এটা কতিপয় শাফেয়ী ও হানাফিদের মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। ইবনু কুদামা ও ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুমা এই মতকে পছন্দ করেছেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে সকল হাদীস উল্লেখ করে বলেন, যারা বলেন, সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব নয় তাদের কথা সঠিক নয়।

(মুগনী, ২/৩৬, মাজমু, ৪/৬৯, মাজমূ' ফাতাওয়া, ১৩/২৮, ইবনু রজব, ৯/৪৭৫)

সিজদায়ে সাহু না দিলে সালাত কি বাতিল হয়ে যাবে?

প্রথমত কথা হচ্ছে যারা বলেন, সিজদায়ে সাহু সুন্নাহ তাদের নিকট সিজদায়ে সাহু ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হবে না। আর যারা বলেছেন ওয়াজিব তাদের নিকট সালাত বাতিল হবে কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

প্রথম মত: সিজদায়ে সাহু যদি সালামের পূর্বে দেয় তাহলে তা ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর সালামের পর হলে তা ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হবে না। এটা ইমাম মালেক, আবু ছাওরা, আহমাদের একমত ও ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। তারা বলেন, সালাত শেষ করে একটু পরই যদি মনে হয় তাহলে সিজদা দিয়ে দিবে। আর যদি অনেক সময় চলে যাওয়ার পর মনে হয় তাহলে সালাত পুনরায় পড়বে। তারা বলেন, সালামের পূর্বের অংশ সালাতের অংশর ন্যায়। কিন্তু সালামের পরের অংশ এর বিপরীত। কেননা এটা সালাতের অংশ নয়।

দ্বিতীয় মত: সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব, এটা ছেড়ে দিলে গুনাহগার হবে। তবে সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। এটা ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর মত।

(মাজমু, ৪/৬৯, মাজমুল ফাতাওয়া, ২৩/৩২, ইবনু রজব, ৯/৪৭৭)

সালাতে বৃদ্ধি-হ্রাস ও সন্দেহের কারণে সিজদায়ে সাহু দিতে হয়

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা উল্লেখ করেছি যে, আমাদের মাযহাব হচ্ছে সালাতে বৃদ্ধি ও হ্রাস হলে সিজদায়ে সাহু দিতে হয়। এটাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল বিদ্বানের মত। শাইখ আবু হামেদ বলেন, তবে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর দুই ছাত্র আলকামা ও আসওয়াদ রহিমাহুমা মনে করেন সালাতে বৃদ্ধি হলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না। পূর্বে বর্ণিত সকল হাদীস হলো আমাদের দলীল।

ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, তিন কারণে সিজদায়ে সাহু দিতে হয়।

১. বৃদ্ধির কারণে, ২. হ্রাসের কারণে ও ৩. সন্দেহের কারণে।

(মাজমু, ৪/৫৫, শারহুল মুমতি, ৩/৩৩৮)

সিজদায়ে সাহুর জন্য কি তাকবীরে তাহরীমা দিতে হবে?

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, সিজদায় যাওয়ার সময় ও সিজদা থেকে উঠার সময় তাকবীর দিতে হবে। এটার ওপরই বিদ্বানদের আমল রয়েছে। একথাই বলেছেন আতা, শাফেয়ী,

আহমাদ প্রমুখ বিদ্বান রহিমাহুমুল্লাহ। সিজদায়ে সাহু সালামের আগে দেয়া হোক বা পরে এতে কোনো পার্থক্য নেই। শাফেয়ী মাযহাবের কিছু বিদ্বান বলেন, সালামের পর সিজদায়ে সাহু দিলে আগে তাকবীরে তাহরীমা দিতে হবে তারপর সিজদার জন্য তাকবীর দিবে।

সঠিক মতঃ সঠিক মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। আর তা হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা দিতে হবে না। কারণে এ বিষয়ে লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর স্পষ্ট হাদীস উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে তাকবীর হচ্ছে চারটি। দুই সিজদায় যাওয়ার সময় দুই তাকবীর ও সিজদা থেকে উঠার সময় দুই তাকবীর।

(মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৩/৪৫, ইবনু রজব, ৯/৪৪৬, ফাতহুল বারী, ৩/৯৯)

সিজদায়ে সাহুর জন্য কি তাশাহুদ আছে?

সালামের পূর্বে যদি সিজদায়ে সাহু দেয়া হয় তাহলে পুনরায় তাশাহুদ পড়তে হবে না। সালাতের তাশাহুদই যথেষ্ট। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

লাইছ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাশাহুদ পুনরায় পড়তে হবে। এমনিভাবে ইমাম মালেক ও ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। তবে ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার সনদ বিচ্ছিন্ন।

সালামের পরে যদি সিজদায়ে সাহু দেয়া হয় তাহলে এ বিষয়ে কথা হচ্ছে

প্রথম মতঃ সিজদা করবে, তারপর তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীলঃ ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিয়ে সালাত পড়েন। তারপর তিনি সালাতে ভুল করলে দুই সিজদা দিয়ে তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরান। হাদীসটি আবু দাউদ (১০৩৯) তিরমিযী (৩৯৫) বর্ণনা করেন। হাদীসটি বিশুদ্ধ। তবে তাশাহুদের কথাটা শায। হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্দুল মালিক হামরানী এর কারণে হাদীসটি শায। আলবানী রহিমাহুল্লাহও ইরওয়াউল গালীলে (৪০৩) হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এর মতো কথা বলেন। হাদীসটিকে বাইহাকী ও ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুমা দুর্বল বলেন।

দ্বিতীয় মতঃ তাশাহুদ পড়বে না। এটা হাসান, আতা, ইবনু সিরীন জাওযানী রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। এমনিভাবে এটা আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে কাতাদা রহিমাহুল্লাহ থেকে দুইটি মত বর্ণিত হয়েছে। ইবনু মুনযির ও ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুমা এই মতের দিকেই ইশারা করেছেন। ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাশাহুদ পড়া সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে

সমস্যা আছে। আতা রহিমাহুল্লাহ থেকে এ বিষয়ে দুই ধরনের মত বর্ণিত হয়েছে। চাইলে তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে অথবা পড়বে না। তাদের দলীল: এ বিষয়ে বুখারী ও মুসলিমে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো লেখক যে হাদীসটা বর্ণনা করেছেন তা। সেখানে তাশাহুদের কথা উল্লেখ নেই। তাশাহুদ পড়া সম্পর্কে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে সবগুলো দুর্বল।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত দ্বিতীয় মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(ইশরাফ, ২/৭৪, মুগনী, ২/৩৫, মাজমুল ফাতাওয়া, ২৩/৪৫, ইবনু রজব, ৯/৪২৬, ফাতহুর বারী, ৩/৯৮)

সিজদায়ে সাহু দিলে কি সালাম ফিরাতে হবে?

সালাম ফিরানোর পূর্বে যদি সিজদায়ে সাহু দেয়া হয় তাহলে সালাতের সালামই যথেষ্ট। আরেক সালামের প্রয়োজন নেই। এতে কারো দ্বিমত নেই।

সালাম ফিরানোর পরে যদি সিজদায়ে সাহু দেয়া হয় তাহলে এ বিষয়ে কথা হচ্ছে

অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট দুই সিজদা করে সালাম ফিরাবে। তাদের দলীল: লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। এমনিভাবে মুসলিমে (৫৭৪) বর্ণিত ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, "তারপর তিনি এক রাকআত পরে সালাম ফিরিয়ে তারপর দুই সিজদা করে তারপর সালাম ফিরান"। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, "তারপর তিনি দুই সিজদা করে সালাম ফিরান"।

আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু, হাসান, আতা রহিমাহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সিজদায়ে সাহুতে সালাম নেই। তাদের থেকে সালাম ফিরানো সম্পর্কেও মত বর্ণিত হয়েছে। যারা বলেছেন সালাম ফিরাতে হবে না তারা এটাকে সিজদায়ে তিলাওয়াতের সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন। কেননা এটা আলাদা একটা সিজদা। তাই সিজদায়ে তিলাওয়াতের ন্যায় এখানে সালাম ফিরাতে হবে না।

প্রাধান্যযোগ্য মত: পূর্বের দলীলের আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(ইশরাফ, ২/৭৪, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৩/৪৫, ইবনু রজব, ৯/৪২৮)

সিজদায়ে সাহু কখন দিবে, সালামের আগে নাকি পরে?

প্রথম মত: সালামের আগে। এটা মাকহুল, যুহরী, সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব, ইয়াহইয়া আল আনসারী, রাবীয়াহ, আওযায়ী, লাইছ ইবনু সাদ ও শাফেয়ী রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকেও এই মত বর্ণিত হয়েছে। তাদের দলীল: সালামের আগে সিজদা করতে হবে এ বিষয়ে দলীর পুর্বে গত হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: সিজদায়ে সাহু সালাম ফিরানোর পর দিবে। এটা হাসান, নাখয়ী, ছাওরী, হাসান ইবনু সালেহ ও আসহাবে রায়ের মত। এই মত বর্ণিত হয়েছে আলী, আম্মার, সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, ইবনু মাসউদ, আনাস, যুবায়ের ও ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম থেকে। এই মতের দলীল: সালামের পরে সিজদা করবে এ বিষয়ে দলীর পূর্বে গত হয়েছে।

তৃতীয় মত: সালাতে হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণে সিজদায়ে সাহুর মাঝে পার্থক্য হবে। সালাতে কিছু বৃদ্ধি হলে সালামের পর সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। আর হ্রাস হলে সালামের আগে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। এটা ইমাম মালেক, তার ছাত্রদের মত, মুযানী, আবু ছাওর, ইমাম শাফেয়ীর পুরাতন মত ও ইমাম আহমাদের একমত। তার নিকট সন্দেহ হলে সালামের আগে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে।

এই মতের দলীল: লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর ও ইবনু বুহাইনা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে সালাম, কথা ও কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই সালামের পর তিনি সিজদা করেন। আর ইবনু বুহাইনা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি সালামের আগে সিজদায়ে সাহু করেন। এর কারণ তিনি প্রথম তাশাহুদ ছেড়ে দেন। তারা বলেন, সালাতে হ্রাস হলে সিজদায়ে সাহু আগে দেয়ার কারণ হলো যা ছোটে গেছে সিজদায়ে সাহুর মাধ্যমে তা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তাই এটাকে সালামে ফিরানোর আগেই দিতে হবে। আর সালাতে বৃদ্ধি পেলে সিজদায়ে সাহু দেয়া হয় শয়তানকে অপমানিত করার জন্য। তাই সালাম ফিরানোর পর সিজদায়ে সাহু দিতে হয়।

চতুর্থ মত: সিজদায়ে সাহু সম্পর্কে যে হাদীস যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে সিজদা দিতে হবে। আর যে ব্যাপারে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি সে ক্ষেত্রে সালামের পূর্বে সিজদায়ে সাহু দিবে। এটা আবু হাইছাম, দাউদ হাশেমী, ইবনু মুনযির ও ইমাম আহমাদের একমত।

এই মাসআলায় সারকথা: এই মাসআলায় সারকথা হচ্ছে পারলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সিজদায়ে সাহু সম্পর্কে যে হাদীস যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে সিজদা দিবে। আর এটাই উত্তম। যেমনটি চতুর্থ মতে বর্ণিত হয়েছে। আর না পারলে তৃতীয় মতানুয়ায়ী আমল করবে। এই মতকে ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ প্রাধান্য দিয়েছেন।

(আওসাত, ৩/৩০৭, মুগনী, ২/২২, মাজমু, ৪/৭০, মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ২৩/২৪, ইবনু রজব, ৯/৪৯৭, নাইলুল আওতার, ৪/৩৮, শারহুল মুমতি, ৩/৩৯৫)

সালাম ফিরানোর পরের সিজদায়ে সাহু যদি সালামের আগে দেয় তাহলে কোনো সমস্যা আছে কি?

প্রথম মত: এ বিষয়ে যে সকল মতভেদ উল্লেখ করা হয়েছে তা মূলত মুস্তাহাব নিয়ে। সুতরাং কেউ যদি সব কারণে সালাম ফিরানোর আগে বা পরে সিজদায়ে সাহু দেয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। বরং এটা জায়েয আছে। এটাই সকল ইমামের অনুসারীদের মত। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাবীর লেখক বলেন, সকল বিদ্বান একমত সিজদায়ে সাহু সালাম ফিরানোর আগে ও পরে দুভাবেই দেয়া জায়েয আছে। তাদের মাঝে মতভেদ হলো সুন্নাহ ও উত্তম নিয়ে।

দ্বিতীয় মত: ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, সালামের পূর্বে দেয়ার জন্য যা বর্ণিত হয়েছে তা সালামের পূর্বে দেয়াই ওয়াজিব। আর যা সালামের পরে দেয়ার জন্য বর্ণিত হয়েছে তা সালামের পরে দেয়াই ওয়াজিব। এটাই ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ইমামদের কথা। এই কথাই বিশুদ্ধ। সন্দেহ দূর করার জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সালাম ফিরানোর আগে দুটি সিজদা দিবে"। অন্য বর্ণনায় আছে, "সালাম ফিরানোর আগে সিজদা করে তারপর সালাম ফিরাবে"। সঠিকটা অন্বেষন করার হাদীসে আছে, "সঠিকটা অন্বেষন করে এর ওপর ভিত্তি করে সালাত পড়বে। তারপর দুই সিজদা করবে"। বুখারীর বর্ণনায় আছে, "তারপর সালাত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। তারপর দুটি সিজদা করবে"। এখানে সালাম ফিরিয়ে তারপর সিজদা দিতে বলেছেন। আর ওইখানে সালামের আগে সিজদা দিতে বলেছেন। এই দুই আদেশের চাহিদা হচ্ছে এটা ওয়াজিব বুঝাবে। এই দুই মতকেই আম (ব্যাপক) করে দেয় এই হাদীস, "সালাতে হ্রাস বা বৃদ্ধি হলে দুটি সিজদা করবে"। তিনি বলেন, "তোমাদের কেউ যদি না জানে যে, সে কত রাকআত পড়েছে তাহলে বসাবস্থায় যেন সে দুটি সিজদা করে"। এই হাদীসগুলোতে হ্রাস-বৃদ্ধি ও সন্দেহের ক্ষেত্রে একই হুকুম লাগানো হয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে। সুতরাং সালাতে বৃদ্ধি হলে সালাম ফিরানোর পর সিজদায়ে সাহু দিবে। আর হ্রাস হলে সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদায়ে সাহু দিবে। আল্লাহ ভালো জানেন।

এই পার্থক্যটা করতে না পারলে তার সালাত কি বাতিল হয়ে যাবে?

সঠিক কথা হচ্ছে সালাত বাতিল হবে না। কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন, সিজদায়ে সাহুর বিষয়ে বিদ্বানদের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তারা সকলে মনে করেন, কেউ যদি সালাম ফিরানোর আগের সাহু সিজদা সালাম ফিরানোর পরে দেয় অথবা সালাম ফিরানোর পরের সাহু সিজদা সালাম ফিরানোরে আগে দেয় তাহলে এটা যথেষ্ট হয়ে যাবে। সালাত বাতিল হবে না।

(ইকমালুল মুয়াল্লিম, ২/৫০৮, মাজমু, ৪/৭০, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৩/৩৬, ইবনু রজব, ৯/৪৫৪, নাইলুর আওতার, ৪/৪১)

একই সালাতে যদি একাধিক ভুল হয়

একই সালাতে যদি একই জাতীয় জিনিস একাধিকবার ভুল হয় তাহলে সবভুলের জন্য দুটি সিজদাই যথেষ্ট। ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ এতে মতভেদ করেছেন কিনা আমরা জানি না। আমি বলছি, 'একই জাতীয় জিনিস' এর অর্থ হচ্ছে সালাতে এমন দুটি বা একাধিকবার ভুল যার কারণে সালাম ফিরানোর আগে বা পরে সিজদায়ে সাহু দেয়া হয়। এ বিষয়ে দলীল হলো লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। কারণ সেখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সালাম, কথা ও কাজ প্রকাশিত হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে ভুল যদি 'দুই জাতীয় জিনিস' এর হয়।

'দুই জাতীয় জিনিস' এর অর্থ হচ্ছে একটা ভুল এমন যার কারণে সালামের আগে সিজদায়ে সাহু দিতে হয় ও আরেক ভুল এমন যার কারণে সালামের পরে সিজদায়ে সাহু দিতে হয়।

প্রথম মতের ওপর ভিত্তি করে সকল ভুলের জন্য দুটি সিজদা দিলেই যথেষ্ট। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

তাদের দলীল: লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস পূর্বে উল্লেখ করেছেন তা। এমনিভাবে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, "তোমাদের কারোর সালাতে সন্দেহ হলে সে যেন সঠিকটার ওপর ভিত্তি করে সালাত পূর্ণ করে। তারপর দুটি সিজদা দেয়"। হাদীস থেকে প্রমাণ হচ্ছে এখানে মুতলাক (সাধারণভাবে) ভাবে ভুলের কথা বলা হয়েছে, যা দুটি অথবা একাধিক ভুলকে শামিল করে। এমনিভাবে এই ভুলের কারণে সালামের আগে বা পরে সিজদায়ে সাহু দিতে পারবে। তারা বলেন, সিজদায়ে সাহু সালাতের শেষে দেয়া হয়, যাতে সকল ভুল এই দুই সিজদা দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। অন্যথায় তো সিজদায়ে সাহু ভুল করার পরপরই দেয়া হতো।

দ্বিতীয় মত: দ্বিতীয় মত অর্থাৎ তার ওপর যদি দুটি সিজদা আবশ্যক হয়, যার একটা সালামের পূর্বের ও আরেকটা সালামের পরের। এ ক্ষেত্রে সে দুটি সিজদাকেই স্বস্ব স্থানে দিবে। এটা আওযায়ী, ইবনু আবী হাযেম, আব্দুল আযীয ইবনু আবী সালামা ও হাম্বলী হাযহাবের একটা মত।

তাদের দলীল: ছাওবান রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "প্রত্যেক ভুলের কারণে দুটি সিজদা করতে হয়"। হাদীসটি আবু দাউদ (১০৩৮) ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি যুহাইর ইবনু সালেম আনবাসীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর সে দুর্বল। যদি হাদীসটিকে বিশুদ্ধও ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হচ্ছে 'সালাতের মাঝে একাধিক ভুল হলেও দুটি সিজদা দিতে হবে'।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(আওসাত, ৩/৩১৭, মুগনী, ২/৩৯, মাজমু, ৪/৬৩)

সিজদায়ে সাহুতে যদি ভুল হয়

অনেক বিদ্বান বলেন, সিজদায়ে সাহুতে ভুল করলে পুনরায় সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না। ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটার ওপর তাবেঈদের ইজমা রয়েছে। কাতাদা রহিমাহুল্লাহ বলেন, পুনরায় সিজদায়ে সাহু দিতে হবে।

(আওসাত, ৩/৩২৬, ইশরাফ, ২/৮০, মুগনী, ২/৪৫)

ভুলবশত সালাতে মুস্তাহাব বিষয় ছেড়ে দিলে কি সিজদায়ে সাহু দিতে হবে?

ভুলবশত সালাতে মুস্তাহাব বিষয় ছেড়ে দিলে সিজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব নয়। কেননা আমি কোনো বিদ্বানকে ওয়াজিব বলতে দেখিনি। সিজদায়ে সাহু দেয়া মুস্তাহাব কিনা এ বিষয়ে বিদ্বানদের মাঝে মতভেদ আছে।

প্রথম মত: সিজদায়ে সাহু দেয়া মুস্তাহাব। এটা ইমাম মালেক, আবু হানিফা, ইমাম আহমাদের একমত। ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেন। তিনি বলেন, কোনো মানুষ ভুলবশত সুন্নাত ছেড়ে দিলে এটা আদায় করতে পারে। সুতরাং সিজদায়ে সাহু এটাও একটা সুন্নাত, তাই এটা দিতে হবে। আর যদি সুন্নাত ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় তাহলে সিজদায়ে সাহু দিতে পারবে না, কারণ এখানে কারণ অর্থাৎ ভুল পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় মত: সিজদায়ে সাহু দেয়া মুস্তাহাব নয়। এটা আওযায়ী, শাফেয়ীদের মত ও আহমাদের একটি মত। তাদের দলীল: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুস্তাহাব ছেড়ে দিলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে মর্মে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। আর সিজদায়ে সাহু হচ্ছে সালাতে অতিরিক্ত একটা বিষয়। সুতরাং দলীল ছাড়া এটা দেয়া জায়েয হবে না।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(মুগনী, ২/৩১, মাজমু, ৪/৫৩-৫৫, শারহুল মুমতি, ৩/৩৯২)

নফল সালাতে ভুল করলে কি সিজদায়ে সাহু দিতে হবে?

অনেক বিদ্বান বলেন, নফল সালাত ফরয সালাতের মতই। নফল সালাতে ভুল করলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। ইবনু সিরীন রহিমাহুল্লাহ এর বিরোধিতা করে বলেন, নফল সালাতে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। কারণ এ বিষয়ে আম (ব্যাপক) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে নফল ও ফরয সালাতের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। আর নফল সালাত ফরয সালাতের মতো রুকু সিজদা বিশিষ্ট। সুতরাং ফরয সালাতের মত এতেও ভুল হলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে।

(আওসাত, ৩/৩২৫, মুগনী, ২/৪৪, মাজমু, ৪/৭৩, ইবনু রজব, ৯/৪৮১)

সিজদায়ে তিলাওয়াত ও জানাযার সালাতে সিজদায়ে সাহু শরীআতসম্মত নয়

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ মুগনীতে (২/৪৫) বলেন, জানাযার সালাতে ও সিজদায়ে তিলাওয়াতে সিজদায়ে সাহু নেই্। কেননা জানাযার সালাতে সিজদা নেই। সুতরাং সিজদায়ে সাহু এতে আরো আগে নেই। আর তিলাওয়াতে সিজদায় সিজদায়ে সাহু দেয়া এটা অতিরিক্ত কাজ।

ইমাম সাহু সিজদা দিলে মুক্তাদীরাও সিজদা দিবে

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানদের মধ্য থেকে যাদের কাছ থেকে আমরা জ্ঞান শিখেছি তারা সকলেই বলেন, ইমাম ভুল করলে সিজদায়ে সাহু দিলে মুক্তাদীরাও সিজদা দিবে। তাদের দলীল: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী, “ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করার জন্য”। আমি বলছি, ইবনু সিরীন রহিমাহুল্লাহ থেকে কতিপয় শাফেয়ীরা তার মত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মুক্তাদীরা সিজদা করবে না।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

(আওসাত, ৩/৩২২, মুগনী, ২/৪১, মাজমু, ৪/৬৬)

ইমাম ভুল করে সিজদায়ে সাহু না করলে মুক্তাদীরা কি সাহু সিজদা করবে?

প্রথম মত: ইমাম সিজদা না করলে মুক্তাদীরা সিজদা করবে না। এটা আতা, হাসান, নাখয়ী, কাসেম, হাম্মাদ ইবনু আবী সোলাইমান, ছাওরী, আসহাবে রায় ও ইমাম আহমাদের একমত রহিমাহুমুল্লাহ। কেননা মুক্তাদীরা ইমামের অনুসরণ করে সিজদা দিয়ে থাকে। এখানে যেহেতু ইমাম সিজদা দেয়নি তাই মুক্তাদীরাও সিজদা করবে না।

দ্বিতীয় মত: ইমাম ভুল করে সিজদা না করলে মুক্তাদীরা সিজদা করবে। এটা ইবনু সিরীন, হাকাম, কাতাদা, আওযায়ী, মালেক, লাইছ, শাফেয়ী, আবু ছাওর ও ইমাম আহমাদের একমত রহিমাহুমুল্লাহ। আবু ছাওর বলেন, সিজদায়ে সাহু এটা এমন একটা বিষয়, যা ইমাম ও মুক্তাদী সকলের ওপর ওয়াজিব। ইমাম ছেড়ে দিলে এটা মুক্তাদীদের থেকে রহিত হয়

না। এর কারণ হচ্ছে ফরয বা ওয়াজিব তা আদায় না করার আগ পর্যন্ত রহিত হয় না। তাই তা করতে হবে।

সঠিক মতঃ সঠিক মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(আওসাত, ৩/৩২২, মুগনী, ২/৪২, মাজমু, ৪/৬৬)

মুক্তাদী ইমামের সাথে সালাতের কিছু অংশ পেয়েছে আর ইমামের ওপর সিজদায়ে সাহু রয়েছে। এক্ষেত্রে তার করণীয় কী?

প্রথম মতঃ ইমামের সাথে সিজদা করবে, চাই ইমাম সালাম ফিরানোর আগে সিজদা করুক বা পরে। তারপর উঠে সে তার বাকি সালাত আদায় করবে। এটা শাবী, আতা, নাখয়ী, হাসান, যাহহাক, আহমাদ, আবু ছাওর ও আসহাবে রায় তাদের মত রহিমাহুমুল্লাহ।

দ্বিতীয় মতঃ প্রথমে আগে তার ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করবে। তারপর সিজদা করবে। এটা ইবনু সিরীন ও ইসহাক রহিমাহুমার মত। ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, সে দুই সালাতকে এক সাথে মিলাবে না।

তৃতীয় মতঃ এখানে একটু বিস্তারিত কথা আছে। আর তা হচ্ছে ইমাম যদি সালাম ফিরানোর আগে সিজদায়ে সাহু করে তাহলে তার সাথে সিজদা করবে। আর যদি সালাম ফিরানোর পরে সিজদায়ে সাহু করে তাহলে দাঁড়িয়ে তার ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করে তারপর সিজদা করবে। এটা ইমাম মালেক, আওযায়ী, লাইছ ইবনু সাদ, শাফেয়ী আব্দুল আযীয ইবনু আবী সালামা রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। তারা বলেন, ইমাম সালাতের পরে সিজদা করার কারণে সে ইমামের অনুসরণ করবে না।

সঠিক মতঃ সঠিক মত হচ্ছে তৃতীয় মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(আওসাত, ৩/৩২৩, মুগনী, ২/৪১)

মুক্তাদী ইমামের পেছনে ভুল করলে সে কি সিজদায়ে সাহু করবে?

প্রথম মতঃ সে সিজদায়ে সাহু করবে না। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। বরং ইসহাক রহিমাহুল্লাহ এর ওপর ইজমা দাবি করেন। তাদের দলীলঃ মুসলিমে (৫৩৭) বর্ণিত মুয়াবীয়া ইবনু হাকাম রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে কথা বলা সত্ত্বেও তিনি তাকে সিজদায়ে সাহু করার জন্য আদেশ করেননি।

উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "ইমামের পেছনে যে আছে তার কোনো সাহু সিজদা নেই। ইমাম ভুল করলে ইমাম ও তার পেছনে যারা আছে সবার সিজদা করতে হবে"। হাদীসটি ইমাম দারাকুতনী (১/৩৭৭)

খারেজা ইবনু মুসআব এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তবে খারেজা ইবনু মুসআব মাতরূক পরিত্যাজ্য। ইরওয়াউল গালীল দেখুন, (৪০৪) ।

দ্বিতীয় মত: তার ওপর সিজদায়ে সাহু করা ওয়াজিব। এটা মাকহুল, ইবনু সিরীন, লাইছ ইবনু সাদ ও যাযহরীদের মত। সানআনী রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। তাদের দলীল: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে ভুল হলেই প্রত্যেককে সিজদায়ে সাহু দিতে আদেশ করেছেন। তিনি এখানে ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী সালাত আদায়কারী কাউকে নির্দিষ্ট করেননি। সুতরাং এখানে নির্দিষ্ট করা চলবে না।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত প্রথম মত। আলবানী ও ইবনু উসাইমীন রহিমাহুমা এই মতকে পছন্দ করেছেন। ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, এর কারণ হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং তার বিপরীত করবে না"। সিজদায়ে সাহু এটা ওয়াজিব, সালাতের রুকন নয়। ইমামের অনুসরণের কারণে অনেক স্থানে মুক্তাদীর থেকে ওয়াজিব রহিত হয়ে যায়। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য স্থান হলো।

১. ইমাম যদি প্রথম তাশাহুদ ভুল করে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে মুক্তাদীদের থেকে এটা রহিত হয়ে যায়।

২. চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতে যদি মুক্তাদী দ্বিতীয় রাকআতে ইমামের পেছনে সালাতে দাঁড়ায় তাহলে মুক্তাদীর থেকে প্রথম তাশাহুদ রহিত হয়ে যায়। কেননা ইমামের কারণে এই মুক্তাদীর প্রথম তাশাহুদটা তৃতীয় রাকআতে হচ্ছে। আর এটা জানা বিষয় যে ইমাম তৃতীয় রাকআতে বসেন না। তাই মুক্তাদী তার অনুসরণ করে তার সাথে দাঁড়িয়ে যাবার কারণে সালাতের একটা ওয়াজিব তার থেকে ছুটে গেছে। ইমামের অনুসরণের কারণে যেহেতু মুক্তাদীর থেকে ওয়াজিব রহিত হয়ে যায় আর সিজদায়ে সাহু এটা ওয়াজিব, সেহেতু এটাও রহিত হয়ে যাবে।

(আওসাত, ৩/৩২০, মুহাল্লা, ৩/৮১, নাওয়াদিরুল ফিকহ, ৪১, মুগনী, ২/৪১, ইরওয়াউল গালীল, ২/১৩২, শারহুল মুমতি, ৩/৩৮৭)

মুক্তাদী যদি মাসবুক হয় আর তার সালাতে ভুল হয় তাহলে করণীয় কী?

শাইখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ শারহুল মুমতিতে (৩/৩৯০) বলেন, মুক্তাদী যদি মাসবুক হয় আর তার সালাতে ভুল হয়, কিন্তু ইমামের কোনো ভুল হয়নি তাহলে কি তার ওপর সিজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব? অর্থাৎ মুক্তাদী যদি ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকআতে অংশগ্রহণ করে ও রুকুতে 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' বলতে ভুলে যায় আর ইমাম সালাম ফিরিয়ে ফেলে। তারপর মুক্তাদী তার ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করে তাহলে কি তার ওপর সিজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব?

উত্তর: যে ভুলের কারণে সিজদায়ে সাহু দিতে হয় এমন ভুল হলে তার ওপর সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব। কেননা সে এখন ইমাম থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আর এখন সিজদা করলে ইমামের বিপরীত হচ্ছে না।

সিজদায়ে সাহু দিতে ভুলে গেলে তারপর স্মরণ হলে করণীয় কী?

সিজদায়ে সাহু দিতে ভুলে গেলে তারপর মাসজিদে থাকাবস্থায়ই যদি দীর্ঘ সময় গত হওয়ার আগেই স্মরণ হয় তাহলে সিজদা করবে। চাই কথা বলুক বা না বলুক। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা।

হাসান ও ইবনু সিরীন রহিমাহুমা বলেন, কিবলা দিক থেকে মুখ সরিয়ে ফেললে এর ওপর ভিত্তি করবে না ও সিজদা করবে না। ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাতের পর কথা বললে সিজদায়ে সাহু রহিত হয়ে যাবে। কেননা সে অনুচিত কাজ করেছে, যা ওযূ ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাদৃশ্য রাখে।

সঠিক মত: লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সে হাদীসের কারণে সঠিক মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। কেননা ওই হাদীসে সালাম, কথা ও কাজ হয়েছে।

এই হাদীসটা হাসান, ইবনু সিরীন ও আবু হানিফা রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট।

এখন কথা হচ্ছে সময় যদি দীর্ঘক্ষণ হয়ে যায়, এ বিষয়ে যাহহাক, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ, ছাওরী, মাকহুল, আওযায়ী, হাসান ইবনু হাই, ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদের একটি মত এবং ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত হচ্ছে সিজদা করবে, যদিও সময় দীর্ঘ হয়ে থাকে।

ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন, সিজদায়ে সাহু সালাম ফিরানোর পরে দিলে সিজদা করবে আর আগে দিলে করবে না, তবে সময় যদি দীর্ঘ না হয় তাহলে সিজদা করবে। আর সময় যদি দীর্ঘ হয় তাহলে সালাত পুনরায় পড়তে হবে। কেননা সিজদা সালাতের একটা অংশ। তার থেকে আরেক বর্ণনা আছে যে, তিনি বলেন, সাধারণভাবেই সিজদা করবে।

ইমাম শাফেয়ীর বিশুদ্ধ মত ও ইমাম আহমাদের একটি মত হচ্ছে সময় যদি দীর্ঘ হয় তাহলে সিজদা করবে না। এই মতটিই বিশুদ্ধ। আল্লাহ ভালো জানেন। তারপর বিদ্বানরা দীর্ঘ সময় ও কম সময়ের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। শাফেয়ীদের বিশুদ্ধ মত ও কতিপয় হাম্বলীদের মত হচ্ছে এটা সমাজের প্রচলন অনুযায়ী হবে।

হাকাম, ইবনু শুবরুমা ও আহমাদ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মাসজিদ থেকে বের না হবে। বিশুদ্ধ মত হচ্ছে শাফেয়ীদের মত। এটা সমাজের প্রচলন অনুযায়ী হবে। এই মতটা লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তার মতো। কেননা হাদীসে আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সাহাবীর সাথে কথা বলেন। কিছু সাহাবী মাসজিদ থেকে বের হয়ে বলাবলি করছেন সালাত কমিয়ে দেয়া হয়েছে। শাইখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ এর পরিমাপ করেন তিন, চার পাঁচ মিনিটের মতো।

(আওসাত, ৩/৩১৮, মুগনী, ২/৩৪, মাজমু, ৪/৭২, মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ২৩/৪৩, ইবনু রজব, ৯/৩৯৭, শারহুল মুমতি, ৩/৩৬৩)

ভুলবশত সালাতের রুকন ছেড়ে দিলে করণীয় কী?

প্রথম কথা হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা যদি ইচ্ছা করে বা ভুল করে ছেড়ে দেয় তাহলে সালাত সংঘটিত হবে না। কারণ তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সালাত সংঘটিত হয় না।

দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে প্রথম সিজদা ও দুই সিজদার মাঝে পার্থক্যকারী বৈঠক ছেড়ে দিয়েছে। এই অবস্থায় তাহলে দুটি রুকন বাদ পড়েছে। একটা হলো দুই সিজদার মাঝে পার্থক্যকারী বৈঠক ও একটা সিজদা। এ রকম কারো হলো এই মাসআলার দুই অবস্থা।

১. পরের রাকআতের কিরাত শুরু করার পূর্বেই স্মরণ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে রুকন ছেড়ে দিয়েছে তাতে সাথে সাথে ফিরে আসা আবশ্যক অর্থাৎ ভুলে যাওয়া রুকন আদায় করবে। এটা মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ রহিমাহুমুল্লাহর মত। ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত আছে কিনা আমার জানা নেই।

২. রুকু বা সিজদা ছেড়ে দিয়েছে। তারপর পরের রাকআতের কিরাত শুরু করার পর মনে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ও ইসহাক রহিমাহুমা বলেন, যে রাকআতের রুকন ছুটে গেছে ওই রাকআত বাতিল হয়ে যাবে। আর যে রাকআত শুরু করেছে তা হবে প্রথম রাকআত।

ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে রুকন ছুটে গেছে পরের রাকআতের কোন রুকনের কাছে যাওয়ার আগে মনে হলে ফিরে আসবে আর পরে মনে হলে ফিরে আসবে না। এই মতকে ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন, কেননা এ ক্ষেত্রে যদি ওই রুকনে ফিরে যায় তাহলে কোনো ফায়দা নেই। দ্বিতীয় রাকআতটাই প্রথম রাকআত হবে।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ এর মত।

প্রথম অবস্থার উদাহরণ: কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকআতে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা শুরু করে দিয়েছে। তারপর তার মনে হয়েছে যে, সে প্রথম রাকআতে সিজদা করেনি। আমরা তাকে বলবো, তুমি দুই সিজদার মাঝে বসো ও সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করো।

দ্বিতীয় অবস্থার উদাহরণ: কোনো ব্যক্তি প্রথম রাকআতে প্রথম সিজদা করে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। তারপর দ্বিতীয় রাকআতে বসাবস্থায় তার মনে হয় যে, সে প্রথম রাকআতে শুধুমাত্র একটা সিজদা করেছে এ ক্ষেত্রে সে প্রথম রাকআতে ফিরে যাবে না। যদি সে ফিরে যায় তাহলে ওই রুকনেই থাকবে। অর্থাৎ সেখানে ফিরে গেলে কোনো ফায়দা নেই। এই মাসআলায় হাসান, নাখয়ী ও আওয়ায়ী রহিমাহুমুল্লাহর মত হচ্ছে কেউ যদি কোনো সিজদা করতে ভুলে যায় তাহলে যখন মনে হবে, তখনই সাথে সাথে সিজদা করে নিবে।

সঠিক মত হচ্ছে পূর্বে বর্ণিত ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ এর মত।

ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ এই মাসআলার তৃতীয় আরেকটা অবস্থা বর্ণনা করেছেন আর তা হচ্ছে, ছুটে যাওয়া সিজদার কথা যদি সালাম ফিরানোর পরে মনে হয় আর ওই সিজদাটা শেষ রাকআতের আগের রাকআতের হয় তাহলে পরিপূর্ণ এক রাকআত পড়তে হবে। আর যদি সিজদাটা শেষ রাকআতের হয় তাহলে শুধু সিজদা করবে ও সিজদার পরের কাজগুলো করবে, পরিপূর্ণ রাকআত পড়তে হবে না। (মুগনী, ২/২৮, শারহুল মুমতি, ৩/৩৭২)।

١٩-بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

অধ্যায়: ১৯- মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা

١٠٣. عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِن الإِثْمِ؟ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي) . قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لا أَدْرِي: قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.

১০৩. আবূ জুহাইম ইবনে হারিছ ইবনে ছামত আল আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সামনে দিয়ে চলাচলকারী জানত যে, এতে তার কত গুনাহ হয়, তবে সে সালাত

আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকেই উত্তম মনে করত। [সহীহ বুখারী হা/৫১০, মুসলিম হা/৫০৭]

বর্ণনাকারী আবূ নযর বলেন, আমি জানি না (অর্থাৎ আমার মনে নেই) আবূ জুহাইম চল্লিশ দিন না চল্লিশ মাস না চল্লিশ বছর বলেছেন।

মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাওয়ার বিধান

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাওয়া মাকরূহ এ বিষয়ে বিদ্বানদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। এমনিভাবে তারা আরো মাকরূহ মনে করেন, কেউ মুসল্লীর সামনে দিয়ে যেতে চাইলে মুসল্লী তাকে বাধা না দেয়া। মুসল্লী সাধ্যানুযায়ী তাকে বাধা দিবে। তবে এমন কাজ করবে না যাতে সালাত বিনষ্ট হয়ে যায়। জেনে যদি কেউ সামনে দিয়ে যায় ও মুসল্লী তাকে বাধা না দেয় তাহলে দুজনেরই গুনাহ হবে, তবে অতিক্রমকারীর গুনাহ একটু বেশি হবে। এ বিষয়ে বিদ্বানদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই।

ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা একমত মুসল্লীর সামনে দিয়ে বা সুতরা ও মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা মাকরূহ ও অতিক্রমকারী গুনাহগার হবে।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা হারাম। আর এটাই আমাদের ও শাফেয়ী মাযহাবের বিজ্ঞ আলেমদের বিশুদ্ধ মত। আমাদের কতিপয় শাইখের নিকট অতিক্রম করা মাকরূহ। এমনিভাবে আরো অনেক বিদ্বানের নিকট মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা মাকরূহ। ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ ইজমা নামক কিতাবে বলেন, বিদ্বানরা একমত মুসল্লীর সামনে দিয়ে বা সুতরার সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী গুনাহগার হবে।

সারকথা: এ বিষয়ে সারকথা হচ্ছে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা হারাম। আর ইবনু হাযম ও ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুমা যে বলেছেন অতিক্রম করা মাকরূহ এর উত্তর ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, তাদের মাকরূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হারাম হওয়া। কেনান তারা এ কথাও বলেছেন যে, অতিক্রমকারী গুনাহগার হবে। আমরা জানি ব্যক্তি গুনাহগার হয় হারাম কাজ করলে, মাকরূহ কাজ করলে গুনাহগার হয় না। কিছু বিদ্বান তো বলেছেন মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা কবীরা গুনাহ।

হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ সকল দলীল প্রমাণ করে যে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা কবীরা গুনাহ। ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীস প্রমাণ করে যে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা কবীরা গুনাহ। এর কারণে জাহান্নামে যেতে হবে। হাদীসের বাহ্যিক অবস্থা দেখে বুঝা যাচ্ছে নফল সালাত বা ফরয সালাত যে সালাতেরই সামনে দিয়ে অতিক্রম করা হোক অতিক্রমকারী এই পাপের অধিকারী হবে।

মুসল্লীর সামনে কোনো সুতরা না থাকলে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করার বিধান

প্রথম মত: মুসল্লীর সামনে ও তার কিবলার সামনে কোনো সুতরা না থাকলে অথবা অনেক দূরে থাকলে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা হারাম। এটাই হাম্বলীদের বিশুদ্ধ মত।

দ্বিতীয় মত: অতিক্রম করা মাকরূহ, হারাম নয়। এটা শাফেয়ীদের মত ও হাম্বলীদের দ্বিতীয় মত।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে প্রথম মত। এটাই ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন, হাদীস প্রমাণ করে যে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা হারাম। চাই সুতরাকে সামনে রেখে সালাত পড়ুক বা না পড়ুক।

(মাজমু, ৩/২২৮, ইবনু রজব, ৪/৯৭)

মুসল্লীর সামনে সুতরা না থাকলে কতটুকু পরিমাণ নিকটবর্তী দিয়ে অতিক্রম করা নিষেধ

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসল্লীর সামনে সুতরা না থাকলে কতটুকু পরিমাণ নিকটবর্তী দিয়ে অতিক্রম করা নিষেধ এ বিষয়ে আমাদের শাইখদের দুটি মত রয়েছে।

১. এর সীমা হচ্ছে তিনহাত। কেননা তিনহাত পরিমাণ দূরে সুতরা রাখা সুন্নাহ।

২. এর সীমা হচ্ছে কেউ মুসল্লীর সামনে দিয়ে যেতে চাইলে সে তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে এতটুকু পরিমাণ স্থান। হানিফীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে মুসল্লীর সিজদা দেয়ার স্থান পর্যন্ত এর সীমা। এর পেছন দিয়ে অতিক্রম করাতে কোনো সমস্যা নেই।

সঠিক মত: অধিক সঠিক মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(ইস্তিযকার, ৬/১৭২, ইবনু রজব, ৪/৯৬)

মুসল্লী যদি এমন স্থানে সালাত পড়ে যেখানে মানুষের অতিক্রম করার সম্ভবনা আছে

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বিদ্বানরা একমত মুসল্লী যদি সুতরা সামনে রেখে বা এমন স্থানে সালাত পড়ে যেখান দিয়ে মানুষের অতিক্রম করার সম্ভবনা নেই তাহলে ব্যক্তি সুতরা না দেয়ার কারণে সীমালঙ্ঘনকারী হবে না, বরং সাবধানতাস্বরূপ সুতরা দিয়ে তার পিছনে সালাত আদায় করবে।

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসল্লীর সামনে সুতরা থাকলে আর কেউ তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে গুনাহ শুধু অতিক্রমকারীর একা হবে। আর মুসল্লী যদি এমন স্থানে সালাত পড়ে যেখান দিয়ে মানুষের অতিক্রম করার সম্ভবনা রয়েছে তাহলে গুনাহ দুজনেরই হবে। এটাই আমাদের শাইখদের মত।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ যদি মানুষের চলাচলের স্থানে সালাত পড়ে আর ওই স্থান ব্যতীত যাওয়ার জন্য অন্য কোনো স্থান না থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে অতিক্রমকারীর গুনাহ হবে না। এটাই আমাদের শাইখরা ও অন্যান্যরা স্পষ্ট করে বলেছেন। কেননা এখানে মুসল্লী নিজে সীমালঙ্ঘন করেছে (সুতরাং মানুষের চলাচলের স্থান বর্জন করা উচিত)।

পূর্বে বর্ণিত আবু জাহাম রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসের বাহ্যিক অবস্থা থেকে বুঝা যাচ্ছে সাধারণভাবেই মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নিষেধ। যদিও ওই স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান না থাকে। ওই সময় মুসল্লীর সালাত শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করবে।

আমি বলছি, ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন তা হাদীসের বাহ্যিক কথা। আল্লাহ ভালো জানেন।

(মুফহিম, ২/১০৬, শারহে মুসলিম, ৬০৭, ইবনু রজব, ৪/৯৭, ফাতহুল বারী, ১/৫৮৬)

١٠٤. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، – فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ".

১০৪. আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো জিনিসকে মানুষ হতে আড়াল (সুতরাহ) হিসেবে দাঁড় করিয়ে সালাত আদায় করে, আর তখন কেউ যদি তার (সালাত আদায়কারীর) সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে চায়, তবে সে যেন তাকে বাধা দেয়। যদি সে বাধাকে অমান্য করে, তবে যেন তার সাথে লড়াই করে। কেননা সে (মানুষরূপী) শয়তান। [সহীহ বুখারী হা/৫০৯, মুসলিম হা/৫০৫]

মুসল্লীর সামনে দিয়ে কেউ যেতে চাইলে তাকে প্রতিরোধ করার বিধান

মুসল্লীর সামনে দিয়ে কেউ যেতে চাইলে তাকে প্রতিরোধ করা মুস্তাহাব। কোনো বিদ্বান ওয়াজিব বলেছেন কিনা আমার জানা নেই। আমাদের শাইখরা ও অন্যান্যরা স্পষ্ট করে বলেছেন, প্রতিরোধ করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, যাহিরীরা বলেছেন, প্রতিরোধ করা ওয়াজিব। সম্ভবত শাইখ তাদের কথা পর্যালোচনা করেননি বা তাদের বিরোধিতাকে গণ্য করেননি।

আমি বলছি, যাহিরীদের কথাকে ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহও পছন্দ করেছেন। এ বিষয়ের দলীল হলো লেখক যে হাদীস বর্ণনা করেছেন ও মুসলিমে বর্ণিত ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীস, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"তোমাদের কেউ সালাত পড়লে আর তার সামনে দিয়ে কেউ যেতে চাইলে সে যেন তাকে বাধা দেয়। সে যদি অস্বীকার করে যেতে চায় তাহলে যেন তার সাথে যুদ্ধ করে, কেননা তার সাথে শয়তান রয়েছে"।

(শারহে মুসলিম, ৫০৫, ফাতহুল বারী, ১/৫৮৪)

অস্ত্র দিয়ে ও এমন জিনিস দিয়ে লড়াই করবে না যার কারণে অতিক্রমকারী মারা যায়

কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা একমত অস্ত্র দিয়ে ও এমন জিনিস দিয়ে লড়াই করবে না যার কারণে অতিক্রমকারী মারা যেতে পারে। জায়েয হচ্ছে তাকে বাধা দেয়া, এমন জিনিস দিয়ে যদি অতিক্রমকারীকে প্রতিরোধ করা হয় আর এর ফলে সে মারা যায় তাহলে তার ওপর কিসাস জারি করা যাবে না। এই বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত।

মারা গেলে কি দিয়াত (রক্তপণ) দিতে হবে নাকি দিয়াত মাফ?

এ বিষয়ে বিদ্বানদের দুটি মত আছে। ইকমালুল মুয়াল্লিমে আমাদের শাইখরা দুটি মতই উল্লেখ করেছেন।

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা একমত অতিক্রমকারীর সাথে অস্ত্র দিয়ে লড়াই করা যাবে না। কেননা এটা সালাত আদায়কারীর বিপরীত আচরণ। কারণ সালাতে ব্যস্ততা আছে, সালাতে চুপ থাকতে হয়। এমনিভাবে মানুষের রক্তপাত ঘটানো হারাম। যারা শরীআতের গোপন বিষয় বুঝে না তাদের কথায় পড়ে এমন কাজ করা যাবে না। আমি বলছি, ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে ইজমা দাবি করেন।

(ইস্তযকার, ৬/১৬৩, ইকমালুল মুয়াল্লিম, ২/৪১৯, মুফহিম, ২/১০৫, শারহে মুসলিম, ৫০৫)

প্রতিরোধ করার জন্য হাঁটা যাবে না ও অতিরিক্ত কাজ করা যাবে না

হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ ও অন্যরা ইজমা নকল করেন, সকল বিদ্বান একমত প্রতিরোধ করার জন্য হাঁটা যাবে না ও অতিরিক্ত কাজ করা যাবে না, এমনটি করা জায়েয নেই। কেননা এগুলো করা সালাতের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে মারাত্মক।

কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন, সকল বিদ্বান একমত প্রতিরোধ করার জন্য সামনে যাওয়া জায়েয নেই ও অতিরিক্ত কাজ করাও জায়েয নেই। কেননা এগুলো করা সালাতের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে মারাত্মক। তার জন্য বৈধ হচ্ছে শুধু সাধ্যানুযায়ী হাত দিয়ে বাধা দেয়া। হাঁটা যাবে না ও অতিরিক্ত কাজ করা যাবে না। সুতরার সামনে দিয়ে কেউ গেলে এতটুকুই করবে।

(ইকমালুল মুয়াল্লিম, ২/৪১৯, শারহে মুসলিম, ৫০৫, ফাতহুল বারী, ১/৫৮৪)

অতিক্রম করে চলে গেলে তাকে আর ফিরাবে না

কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা একমত কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেলে তাকে আর ফিরাবে না। কারণ এতে দ্বিতীয়বার অতিক্রম হয়। তবে কতিপয় বিদ্বান ফিরানোর কথা বলেছেন। তাদের মধ্য থেকে কিছু বিদ্বান আশহাব রহিমাহুল্লাহ এর ইশারা দ্বারা ফিরানোর কথা ব্যাখ্যা করে এই মত দেন। কিন্তু আশহাব রহিমাহুল্লাহ এর কথার বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা বুঝা যায় তিনি ইশারার কথা বলেন অতিক্রম করার শুরুতে।

ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, কেউ অতিক্রম করে চলে গেলে তাকে বাধা দেয়া না হলে তাকে পুনরায় বাধা দেয়া উচিত নয়। কেননা এতে পুনরায় অতিক্রম করা হবে। ইবনু আবী শাইবা ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ও অন্যান্যদেরে থেকে বর্ণনা করেন, তাকে ফিরাতে পারবে। এই মতটাকে এভাবে নেয়া যেতে পারে যে, কাউকে যেতে বাধা দেয়া হলে সে চেলে গেলে বাধা দেয়া হবে। এর অর্থ এ নয় যে, মুসল্লী তাকে বাধা দেয়ার ক্ষেত্রে ত্রুটি করবে।

(ইকমালুল মুয়াল্লিম, ২/৪১৯, শারহে মুসলিম, ৫০৫, ফাতহুল বারী, ১/৫৮৪)

١٠٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنىً إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

১০৫. ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি একটি গাধীর পিঠে চড়ে (মিনায়) হাজির হলাম, তখন আমি সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছিলাম। ঐ সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতে কোনো দেয়ালের আড়াল ছাড়াই সাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন। আর আমি সালাতের সারির একাংশের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে গেলাম। অতঃপর অবতরণ করলাম এবং গাধীটিকে মাঠে চরতে ছেড়ে দিয়ে

আমি সালাতের সারিতে শামিল হলাম। কিন্তু আমার এ কাজে কেউই অপছন্দ করলেন না। [সহীহ বুখারী হা/৪৯৩, মুসলিম হা/৫০৪]

সুতরা দেয়ার বিধান কী?

প্রথম মত: সুতরা দেয়া ওয়াজিব। এটা কতিপয় হাম্বলীদের মত। ইমাম শাওকানী, আলবানী ও আমাদের শাইখ মুকবিল রহিমাহুমুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। এই মতের দলীল: ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসল্লায় বের হলে সাথে বর্শা নিয়ে বের হওয়ার আদেশ করতেন। তারপর তা তার সামনে রাখা হতো। (বুখারী, হা/৪৯৪, মুসলিম, হা/৫০১)

দ্বিতীয় মত: সুতরা দেয়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। এই মতের দলীল: লেখক ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা, সেখানে আছে, তারপর তিনি দেয়াল ছাড়া অন্য দিকে সালাত আদায় করেন।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ ছাড়া কেউ ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে 'দেয়াল ছাড়া অন্য দিকে' এই কথাটা বর্ণনা করেননি। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ এই হাদীসটা তার মুয়াত্তাতে দুইস্থানে বর্ণনা করেন। একস্থানে এই শব্দ বর্ণনা করেন ও আরেকস্থানে বর্ণনা করেননি।

ইবনু রজব রহিমহুল্লাহর এই ইশারা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এই বর্ণনাটি শায। এই বর্ণনাটি যদি বিশুদ্ধও ধরা হয় তাহলে এর উত্তর হচ্ছে দেয়াল ছাড়া অন্য কিছু সুতরা হিসেবে দিয়েছিলেন। এমনিভাবে তারা লেখক আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা দিয়েও দলীল উপস্থাপন করেছেন, "তোমাদের কেউ যখন এমন জিনিসের দিকে ফিরে সালাত পড়বে যা তাকে মানুষ থেকে আড়ালে রাখে। এই হাদীসে তো সুতরার আদেশ দেয়া হয়নি।

সঠিক মত: পূর্বে বর্ণিত ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের আলোকে সঠিক মত হচ্ছে **সুতরা দেয়া ওয়াজিব।** এমনিভাবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় সুতরা দিয়েছেন। এমন স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি যে, তিনি সুতরা ছাড়া সালাত পড়েছেন। তিনি বলেন, 'আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছ, তোমরা সেভাবে সালাত পড়বে"।

(মুহাল্লা, ৩/১০১, ইবনু রজব, ৪/৫, নাইলুল আওতার, ৩/৪০৭, তামামুল মিন্নাহ, ৩০০)

ইমামের সুতরা কি তার পেছনে যারা আছে তাদের সুতরা?

প্রথম মত: ইমামের সুতরা তার পেছনে যারা আছে তাদের সুতরা। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। এর অর্থ হচ্ছে মুক্তাদীরা ইমামের সুতরা ছাড়া তাদের সামনে কোনো সুতরা স্থাপন করবে না। ইমামের সামনে সুতরা থাকলে কেউ তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে কোনো সমস্যা নেই। তারা ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীস দিয়ে দলীল দিয়েছেন এবং আমর ইবনু শুয়াইব, তিনি তার বাবা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছানিয়ায়ে আযাহির থেকে প্রস্থান করছিলাম। তারপর সালাতের সময় হয়। অর্থাৎ দেয়ালের দিকে মুখ করে সালাত পড়েন। তিনি এটাকে কিবলা বানান আর আমরা তার পেছনে ছিলাম। এরপর একটা পশু তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করে আর তিনি এটাকে তাড়াতে লাগলেন, এমনকি তার পেট দেয়ালের সাথে লেগে যায় এবং এটা দেয়ালের পেছন দিয়ে অতিক্রম করে। হাদীসটি আবু দাউদ, (৭০৮) ও আহমাদ, (২/১৯৬) বর্ণনা করেন। হাদীসের সনদ হাসান।

দ্বিতীয় মত: ইমাম হলো পেছনে যারা আছে তাদের সুতরা। এটা আতা ও ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর কতিপয় ছাত্রের মত। সাহাবী হাকাম ইবনু আমর আল গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তার সাথীদের নিয়ে কোনো এক সফরে সালাত পড়েন। তার সামনে সুতরা ছিল। তারপর তার সাথীদের সামনে দিয়ে একটা গাধা অতিক্রম করলে তিনি তাদের নিয়ে সালাত পুনরায় পড়েন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তাদের বলেন, গাধা আমার সালাত বিনষ্ট করেনি, বরং তোমাদের সালাত বিনষ্ট করেছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: পূর্বের দলীলের আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(আওসাত, ৫/১০৭, শারহে মুসলিম, ৫০৪, মুফহিম, ২/১০৩, মুগনী, ২/২৩৭, ইবনু রজব, ৪/১২, ফাতহুল বারী, ১/৫৭২)

মুসল্লীর মাঝে ও তার সুতরার মাঝে দূরত্ব কতটুকু হবে?

প্রথম মত: সর্বনিম্ন তিনহাত। এটা আতা ও শাফেয়ী রহিমাহুমার মত। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনহাত ও তার অধিক। তাদের দলীল: বুখারীতে (৫০৬) বর্ণিত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নিশ্চয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাঘরে প্রবেশ করে সালাত পড়েন। তার মাঝে ও তার সামনে দেয়ালের মাঝে তিনহাত পরিমাণ দূরত্ব ছিল।

দ্বিতীয় মত: মুসল্লীর মাঝে ও তার সুতরার মাঝে একটা বকরি অতিক্রম করতে পারে এই পরিমাণ দূরত্ব থাকবে। এটা ইবনু বাত্তালের কথা। তার দলীল: বুখারী (৪৯৬) ও মুসলিমে (৫০৮) বর্ণিত সাহল ইবনু সাদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুসল্লা ও দেয়ালের মাঝে একটা বকরি অতিক্রম করতে পারে এই পরিমাণ দূরত্ব ছিল।

তৃতীয় মত: মুসল্লীর মাঝে ও তার সুতরার মাঝে ছয়হাত পরিমাণ দূরত্ব থাকবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রাদ্বিয়াল্লাহ এমন করতেন।

চতুর্থ মত: কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। এটা হাসান ও ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মত।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। এই মত ও দ্বিতীয় মতের মাঝে কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই। প্রথম মতে তিনহাতের যে কথা বলা হয়েছে এটা মুসল্লীর দাঁড়ানোর অবস্থার ক্ষেত্রে হবে আর দ্বিতীয় মতে বকরি অতিক্রম করতে পারে এই পরিমাণ দূরত্বের যে কথা বলা হয়েছে তা রুকু ও সিজদার অবস্থার সময়। এই কথাই কতিপয় বিদ্বান বলেছেন।

(আওসাত, ৫/৯০, মুগনী, ২/২৩৯, মাজমু, ৩/২২৬, ইবনু রজব, ৪/২৮, ফাতহুল বারী, ১/৫৭৫, নাইলুল আওতার, ৩/৪১০)

সুতরার উচ্চতা কতটুকু পরিমাণ হবে

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাবুক যুদ্ধের সময় মুসল্লীর সুতরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "উটের হাওদার পেছনের কাঠের মতো"। (মুসলিম, হা/৫০০)

উটের হাওদার পেছনের কাঠের পরিমাণ নিয়ে বিদ্বানদের মাঝে মতভেদ আছে

প্রথম মত: উটের হাওদার পেছনের কাঠের পরিমাণ হচ্ছে একহাত। এটা আতা, ছাওরী, আবু হানিফা ও আহমাদের একমত রহিমাহুমুল্লাহ। কাতাদা রহিমাহুল্লাহ বলেন, একহাত ও এক বিঘত।

দ্বিতীয় মত: এর উচ্চতা হচ্ছে যিরার হাড্ডি পরিমাণ। আর তা হচ্ছে হাতের দুই তৃতীয়াংশ। এটা মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদের একমত রহিমাহুমুল্লাহ।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে যা ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন। তিনি বলেন, সঠিক মত হচ্ছে এর পরিমাণ নির্ধারিত নয়। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিমাণের কথা বলেছেন উটের হাওদার পেছনের কাঠের সমপরিমাণ। আর এর দৈর্ঘ্যতা নিয়ে মতভেদ আছে। কখনো এটা একহাত হয় কখনো একহাতের কম। সুতরাং একহাতের নিকটবর্তী হলেই যথেষ্ট হবে। আল্লাহ ভালো জানেন।

(আওসাত, ৫/৮৯, ইস্তিযকার, ৬/১৭৩, মুগনী, ২/২৩৮, মাজমু, ৩/২২৬, শারহে মুসলিম, ৪৯৯, ফাতহুল বারী, ১/৫৮১)

সুতরার পুরুত্ব সর্বনিম্ন কতটুকু হবে

প্রথম মতঃ সুতরার পুরুত্ব সর্বনিম্ন বর্শা, চাবুক ও লাঠির মত হবে। এটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মত।

দ্বিতীয় মতঃ সামনে একটা জিনিস রাখলেই চলবে। সুতরার পুরুত্বের কোনো সীমা নেই। এটা শাফেয়ীদের মত।

সারকথাঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বর্শা, লাঠি, চাবুক, কাঠ, খাট ইত্যাদিকে সুতরা বানিয়ে সালাত পড়েছেন। এমনকি তিনি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহাকে সামনে রেখে সালাত পড়েছেন। এই সকল বর্ণনা থেকে কি সুতরার সীমা বুঝা যায়?

বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এ সকল বিষয় থেকে সুতরার সীমা বুঝা যায় না। এর ওপর ভিত্তি করে সঠিক মত হচ্ছে শাফেয়ীদের মত। এর দলীল হচ্ছে লেখক (১০৯) নাম্বারে যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। সেখানে আছে, "তোমাদের কেউ সালাত পড়লে কোনো জিনিসকে সামনে রেখে যেন সালাত পড়ে"। এখানে 'শাই' (জিনিস) শব্দটা হচ্ছে নাকেরা। আর নাকেরার চাহিদা হচ্ছে তা আম (ব্যাপক) বুঝাবে। তবে এমন জিনিস সামনে রাখা যাবে না, যা রাখতে বিদ্বানরা অপছন্দ করেন। যেমনঃ কুরআন, ইলমের বই, আগুন, বাতি প্রভৃতি জিনিসকে সুতরা হিসেবে সামনে রাখা যাবে না। আল্লাহ ভালো জানেন। আগুনের দিকে ফিরে সালাত পড়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অচিরেই আসছে ইনশাআল্লাহ।

(আওসাত, ৫/৮৮, ইস্তিযকার, ৬/১৭৩, মুগনী, ২/২৩৮, মাজমু, ৩/২২৭, শারহে মুসলিম, ৪৯৯)

١٠٦. عَنْ عَائِشَةَ رضىَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ. وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

১০৬. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে ঘুমিয়ে থাকতাম। আর আমার পাদ্বয় তাঁর কিবলার দিকে থাকত। তিনি যখন সাজদায় যেতেন তখন তিনি আমাকে চিমটি কাটতেন, অতঃপর আমি আমার পাদ্বয়কে গুটিয়ে নিতাম। আর যখন তিনি দাঁড়াইতেন তখন আমি আবার আমার পা দুটিকে

বিছিয়ে দিতাম। আর সে সময় ঘর সমূহে কোনো বাতি ছিল না। [সহীহ বুখারী হা/৩৮২, মুসলিম হা/৫১২]

ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত পড়ার বিধান

প্রথম মত: ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত পড়া মাকরূহ নয়। এটা শাফেয়ীদের ও ইমাম বুখারীর মত। ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেন। তাদের দলীল: লেখক আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা।

দ্বিতীয় মত: ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত পড়া মাকরূহ। এটা মুজাহিদ, তাউস, মালেক, আহমাদ ও ইসহাক রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। তাদের দলীল: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমাকে পরস্পর কথা বলছে এমন ব্যক্তির পেছনে ও ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে"। হাদীসটি তাবারানী আওসাতে (৫২৪৬) বর্ণনা করেন। হাদীসটি হাসান। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ ইরওয়াউল গালীলে (২/৯৫) হাসান বলেছেন। আর ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর সূত্রে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা দুর্বল। এটাও ইরওয়াউল গালীলে (৩৭৫) বর্ণিত হয়েছে। তারা কারণ হিসেবে আরো বর্ণনা করেন, ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত পড়লে মুসল্লীর সমস্যা হতে পারে। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার হাদীসের উত্তর তারা এভাবে দিয়েছেন যে, প্রয়োজনে ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত পড়া জায়েয। কেননা তার ঘরটা সংকীর্ণ ছিল।

ইমাম আহমাদ থেকে একটা মত বর্ণিত হয়েছে, ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে ফরয সালাত পড়া মাকরূহ, নফল সালাত মাকরূহ নয়। আবু হুরায়রা ও আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীসকে একত্রিত করে তিনি এই মত দিয়েছেন। ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই মতটা সঠিকের নিকটবর্তী।

(মুগনী, ২/২৪১, মাজমু, ৩/২৩১, ইবনু রজব, ৪/১০৬, নাইলুল আওতার, ৩/৪২১)

জন্তু দ্বারা সুতরা দেয়ার বিধান

প্রথম মত: জন্তু দ্বারা সুতরা দেয়া জায়েয আছে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, সাওয়ারী দ্বারা সুতরা দেয়ার ব্যাপারে কারো মতভেদ আছে কিনা আমার জানা নেই। তাদের দলীল: ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাওয়ারীকে সামনে দাঁড় করিয়ে তার দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। (বুখারী, হা/৫০৭, মুসলিম, হা/৫০২)

দ্বিতীয় মত: জন্তু দ্বারা সুতরা দেয়া যাবে না। এটা ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর মত।

সঠিক মত: পূর্বের দলীলের আলোকে সঠিক মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(ইস্তিযকার, ৬/১৮২, মুগনী, ২/২৪০, মাজমু, ৩/২২৭, ফাতহুল বারী, ১/৫৮১)

মুসল্লী তার চেহারাকে অন্য দিকে ফিরানোর বিধান

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসল্লী তার চেহারাকে অন্য দিকে ফিরানো মাকরূহ। এটা আমাদের ও অধিকাংশ বিদ্বানের মাযহাব। কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ এই মতটি অধিকাংশ বিদ্বান থেকে নকল করেন।

(মুগনী, ২/২৪২, শারহে মুসলিম, ৫১৩, ইবনু রজব, ৪/১০২)

পরস্পর কথা বলছে এমন ব্যক্তির দিকে ফিরে সালাত পড়ার বিধান কী?

প্রথম মত: পরস্পর কথা বলছে এমন ব্যক্তির দিকে ফিরে সালাত পড়া মাকরূহ। এটা সাঈদ ইবনু যুবায়ের, শাফেয়ী, আহমাদ ও আবু ছাওর রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। ইবনু মাসউদ ও ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা থেকেও এমন মত বর্ণিত হয়েছে। তাদের দলীল: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমাকে পরস্পর কথা বলছে এমন ব্যক্তির পেছনে ও ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে"। হাদীসটি তাবারানী আওসাতে (৫২৪৬) বর্ণনা করেন। হাদীসটি হাসান। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ ইরওয়াউল গালীলে হাসান বলেছেন। এই হাদীসের শাহেদ আছে। ইরওয়াউল গালীল দেখুন, (৩৭৫)। তারা আরো বলেন, তাদের পেছনে সালাত পড়লে মুসল্লীর মন তাদের কথার দিকে চলে যাবে।

দ্বিতীয় মত: সালাত পড়া জায়েয আছে। এটা যুহরী রহিমাহুল্লাহর মত। ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, বসে কথা বলছে এমন ব্যক্তি পিঠের দিকে মুখ করে সালাত পড়াতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। কথা বলছে এমন ব্যক্তির পেছনে সালাত পড়লে তাদের নিকট সালাত পুনরায় পড়তে হবে না।

(আওসাত, ৫/৯৮, মুগনী, ২/২৪১, ইবনু রজব, ৪/১০৮)

আগুনের দিকে ফিরে সালাত পড়ার বিধান কী?

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, অধিকাংশ বিদ্বান আগুনের দিকে ফিরে সালাত পড়াকে মাকরূহ মনে করেন। তাদের মাঝে আছেন ইবনু সিরীন রহিমাহুল্লাহ। তিনি চুলার দিকে ফিরে সালাত পড়াকে অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, এটা হলো আগুনের ঘর। সুফিয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মাসজিদের কিবলা দিকে বাতি লাগানো মাকরূহ। ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, বাতি লাগানোতে কোনো সমস্যা নেই। অগ্নিকুন্ড জ্বালানোকে আমি অপছন্দ করি। হারব রহিমাহুল্লাহ এই মত তার থেকে নকল করেন।

তিনি বলেন, মাকরূহ হওয়ার কারণ হচ্ছে আগুন জ্বালালে অগ্নিপূজকদের সাথে বাহ্যিকভাবে সাদৃশ্য হয়ে যায়। এ কারণেই তিনি অপছন্দ করেন। যদিও মুসল্লী আল্লাহর জন্যই সালাত পড়ে থাকে। যেমনিভাবে সূর্য উঠা ও অস্ত যাওয়ার সময় সালাত পড়া নিষেধ। কারণ ওই সময় সূর্যপূজারীরা সূর্যের জন্য সিজদা করে। আর ওই সময় মুসল্লী আল্লাহর জন্য সিজদা করা সত্ত্বেও সালাত পড়া তার জন্য মাকরূহ।

(মুগনী, ২/২৪২, ইবনু রজব, ৩/২২৯)

٢٠- بَابٌ جَامِعٌ

অধ্যায়: ২০-বিবিধ বিষয়

١٠٧. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَرِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ).

১০৭. আবূ কাতাদাহ ইবনে রবঈ আল আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে সে যেন দুই রাকআত সালাত আদায় না করা পর্যন্ত মাসজিদে না বসে। [সহীহ বুখারী হা/১১৬৩, মুসলিম হা/৭১৪]

তাহিয়্যাতুল মাসজিদের বিধান

প্রথম মত: তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সুন্নাহ। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে সকল বিদ্বানের ফতোয়া গ্রহণযোগ্য তারা সকলে একমত তাহিয়্যাতুল মাসজিদের ব্যাপারে যে আদেশ বর্ণিত হয়েছে তা মুস্তাহাবের জন্য। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, তাহিয়্যাতুল

মাসজিদ মুস্তাহাব এব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত। তাহিয়্যাতুল মাসজিদ না পড়ে বসাকে তারা মাকরূহ মনে করেন। এই মতের দলীল:

১. যে ব্যক্তি জুমআর দিন মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে আসছিল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, "বসে যাও, তুমি তো মানুষকে কষ্ট দিচ্ছো"!

এই দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সে সালাত পড়েনি এখানে এ কথা নেই।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীরা মাসজিদে প্রবেশ করে বের হয়ে চলে আসতেন, কিন্তু সালাত পড়তেন না।

দ্বিতীয় মত: তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ওয়াজিব। ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ ব্যতীত এটা দাউদ যাহিরী ও তার ছাত্রদের মত। ইমাম শাওকানী ও আমাদের শাইখ মুকবিল রহিমাহুমা এই মতকে পছন্দ করেন। এই মতের দলীল: লেখক আবু কাতাদা রহিমাহুল্লাহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা এবং জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমআর দিন খুতবা দেয়া অবস্থায় একলোক মাসজিদে প্রবেশ করে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, "হে অমুক! তুমি কি সালাত পড়েছো"? সে বললো, না। তিনি বলেন, "দাঁড়িয়ে দু'রাকআত সালাত পড়ো"।

সঠিকের নিকটবর্তী মত: সঠিকের নিকটবর্তী মত হচ্ছে ওয়াজিব। আল্লাহ ভালো জানেন।

(মুগনী, ২/১৩৫, মাজমু, ৪/৫৪৪, মুফহিম, ২/৩২৫, ইবনু রজব, ৩/২৭০, ফাতহুল বারী, ১/৫৩৭, নাইলুল আওতার, ৩/৬৮)। মিসকুল খিতাম ১/৫৪০।

মাসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ না পড়ে বসে পড়লে তারপর কি দাঁড়িয়ে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়তে পারবে?

প্রথমত কথা হচ্ছে, ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ যদি মাসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ না পড়ে বসে পড়ে আর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে থাকে তাহলে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ছুটে যাবে, এটা কাযা পড়া বৈধ নয়, এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত।

আর যদি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত না হয়ে থাকে তাহলে এ বিষয়ে ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, শাইখরা বলেন, বসে যাওয়ার কারণে এটা ছুটে গেছে, তাই পরে পড়া যাবে না। ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাত পড়ার আগে বসে পড়লে তার জন্য সুন্নাত হচ্ছে দাঁড়িয়ে সালাত পড়া। হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানদের একটি দল স্পষ্টভাবে বলেন, কেউ যদি সালাত পড়ার আগে বসে পড়ে তাহলে সে আর এই সালাত ধরতে পারবে না। এই মতের ব্যাপারে বিবেচনার বিষয়ে আছে।

আমি বলছি, সঠিক মত হচ্ছে, দাঁড়িয়ে সালাত পড়বে। জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন, জুমআর দিন সালিক আল গাতফানী এসে সালাত না পড়ে বসে পড়েন। আর ওই সময়

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারের ওপর বসা ছিলেন। তিনি তাকে বলেন, "তুমি কি দু'রাকআত সালাত পড়েছো"? সে বললো, না। তিনি বলেন, "তুমি দাঁড়িয়ে দু'রাকআত সালাত পড়ো"। হাদীসটি বুখারী, (৯৩০) ও মুসলিম, (৮৭৫) বর্ণনা করেন।

(মুগনী, ২/১৩৫, মাজমু, ৩/৫৪৫, ইবনু রজব, ৩/২৭৪, ফাতহুল বারী, ১/৫৩৮)

ওযূবিহীন মাসজিদে প্রবেশ করলে ওযূ করে এসে সালাত পড়া কি আবশ্যক?

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ (৩/২৭২) বলেন, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, কখনো কখনো কোনো ব্যক্তি ওযূবিহীন মাসজিদে প্রবেশ করে এবং কখনো এমন সময় মাসজিদে প্রবেশ করে, যখন সালাত পড়া নিষেধ। এই কথা দ্বারা তিনি এই দিকে ইশারা করেন, মাসজিদে প্রবেশ করার পরে যদি সালাত পড়া ওয়াজিব হয় তাহলে প্রবেশকারীর জন্য ওয়াজিব প্রবেশ করার আগে ওযূ করা অথচ কোনো মুসলিম মাসজিদে প্রবেশের জন্য ওযূ করাকে ওয়াজিব বলেননি।

আমি বলছি, ওয়াজিবের ব্যাপারটা হচ্ছে ইতোপূর্বে আমরা বলেছি, অনেক বিদ্বান তাহিয়্যাতুল মাসজিদকে মুস্তাহাব বলেছেন, তাদের মাঝে রয়েছেন ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ। দাউদ যাহিরী ব্যতীত পূর্বের যুগের কোনো বিদ্বান এ বিষয়ে মতভেদ করেননি। দাউদ যাহিরী ওয়াজিব বলেন। আমার কাছে সঠিক মনে হচ্ছে ওযূ করতে গেলে যদি কষ্ট হয় তাহলে বসলে কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহ ভালো জানেন।

মাসজিদে বারবার প্রবেশ করলে কি প্রত্যেকবার তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়তে হবে?

প্রথম মত: একবার তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়লেই যথেষ্ট হবে। এটা মালেকী, হানাফী ও শাফেয়ীদের একমত।

দ্বিতীয় মত: তাহিয়্যাতুল মাসজিদ প্রত্যেকবার পড়া মুস্তাহাব। এটা শাফেয়ীদের বিশুদ্ধ মত।

(মাজমু, ৩/৫৪৪, মাউসুয়া ফিকহিয়া, ১০/৩০৪)

ফরয ও নফল সালাতের সাথে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় হয়ে যায় এবং তা সর্বনিম্ন দুই রাকআত

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের শাইখরা বলেন, হাদীসের ভিত্তিতে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ দুই রাকআত। এক সালামে যদি দুই রাকআতের অধিক সালাত একসাথে পড়া হয় তাহলে এটা জায়েয আছে। ওই সময় এই সবগুলোই তাহিয়্যাতুল মাসজিদ হয়ে যাবে। জানাযার সালাত বা শুকরানা সিজদা বা তিলাওয়াতে সিজদা দিলে অথবা এক রাকআত

সালাত পড়লে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ হবে না। কারণ এ বিষয়ে স্পষ্ট হাদীস আছে দুই রাকআতের কম তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নেই। আমাদের শাইখরা বলেন, সালাত পড়ার সময় তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নিয়্যাত করা শর্ত নয়। বরং সাধারণভাবে যদি দুই রাকআত সালাত পড়ে বা দুই রাকআত সুন্নাতে রাতেবা বা সাধারণ সুন্নাতের নিয়্যাত করে বা ফরয সালাত বা কাযা সালাত অথবা মানতের সালাত পড়ে তাহলে এই সালাতও হয়ে যাবে এবং তাহিয়্যাতুল মাসজিদও হয়ে যাবে। এতে কোনো মতভেদ নেই। এমনিভাবে যদি ফরয ও তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নিয়্যাত একসাথে করে বা সুন্নাতে রাতেবা ও তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নিয়্যাত একসাথে করে তাহলে দুই সালাতই হয়ে যাবে। এতে করো কোনো দ্বিমত নেই।

(আল বায়ান ২/২৮৬, মাজমু ৩/৫৪৪, ফাতহুল বারী ১/৫৩৭)। মিসকুল খিতাম ১/৫৪০।

(দুই রাকআত সালাতকে) তাহিয়্যাতুল মাসজিদ হিসেবে নামকরণের কি কোনো ভিত্তি আছে?

ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তার সহীহ ইবনু হিব্বানে (৩৬১) আবু যার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে একটা হাদীস নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, আমি মাসজিদে প্রবেশ করি। আর ওই সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা বসেছিলেন। তিনি বলেন, "হে আবু যার! মাসজিদের জন্য তাহিয়্যাতু রয়েছে। তার তাহিয়্যাতু হচ্ছে দুই রাকআত সালাত। সুতরাং দাঁড়িয়ে দুই রাকআত সালাত পড়ো"। তারপর আমি দাঁড়িয়ে দুই রাকআত সালাত পড়ে পুনরায় তার কাছে গিয়ে বসি।

এই হাদীসের সনদে ইবরাহীম ইবনু হিশাম ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া আল গাসসানী রয়েছে। তার সম্পর্কে আবু হাতেম ও আবু যুরআ রহিমাহুমা বলেন, সে মিথ্যাবাদী। তার জীবনী 'লিসানে' রয়েছে।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদীসটি আবু যার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোনো সনদই সমালোচনা থেকে মুক্ত নয়।

আমি বলছি, ফকীহদের নিকট এই দুই রাকআত সালাত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সম্ভবত তারা আবু যার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর এই জাল হাদীসের ওপর নির্ভর করে এই নাম দিয়েছেন। আল্লাহ ভালো জানেন। (ইবনু রজব, ৩/২৭৩, লিসান, ১/১৭৯)

١٠٨. عَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ، وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ {وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ونُهِينَا عَنِ الْكَلام".

১০৮. যায়েদ ইবনে আরকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সালাত পড়া অবস্থায় কথপোকথন করতাম। আমাদের মধ্যকার লোকজন তার পাশে থাকা ভাইয়ের সাথে কথা বলত। অবশেষে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো

{وقُومُوا لله قَانِتِينَ} আর তোমরা মহান আল্লাহর জন্য অনুগত হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। (সূরা আল বাকারা:২৩৮)

সুতরাং আমাদেরকে চুপ থাকতে নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং কথা বলতে বারণ করা হয়। [সহীহ বুখারী হা/১২০০, মুসলিম হা/৫৩৯]

কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতে কথা বললে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা একমত, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতে কথা বললে আর সে কথা বলার দ্বারা সালাতের কোনো কিছু ঠিক করতে চায়নি তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

শাইখুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা একমত, কোনো কল্যাণ ও উপকার ছাড়া কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতে কথা বললে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। ইবনু কুদামা ও ইবনু মুনযির রহিমাহুমাও অনুরূপ ইজমা নকল করেন।

(আওসাত, ৩/২৩৪, মুগনী, ৩/৪৫, মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ৭/১৩২)

কেউ সালাতে ভুলবশত কথা বললে তার সালাতের বিধান

প্রথম মত: সালাত চালিয়ে যাবে, পুনরায় পড়তে হবে না। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। এই মতের দলীল: যুল ইয়াদাইনের ঘটনায় আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আমি ভুলে যাইনি ও সালাতও কমানো হয়নি”। সেখানে আরো আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যুল ইয়াদাইন যেমন বলছে বিষয়টা কি তেমন”? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন বলা হলো তখন তিনি সালাত পরিপূর্ণ করেন, কিন্তু পুনরায় সালাত পড়েননি এবং এরপর সিজদায়ে সাহু দেন।

দ্বিতীয় মত: যে ব্যক্তি সালাতে ভুলবশত কথা বলবে, সে পুনরায় সালাত পড়বে। এটা নাখয়ী, কাতাদা, হাম্মাদ ইবনু আবী সোলাইমান, আবু হানিফা ও তার ছাত্রদের মত ও ইমাম আহমাদের একমত রহিমাহুমুল্লাহ। তাদের দলীল: লেখক যায়েদ ইবনু আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা এবং আরো অন্যান্য হাদীস, তার মাঝে মুসলিমে (৫৩৭) বর্ণিত মুয়াবীয়া ইবনু হাকাম রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, নাবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “এই সালাতে মানুষের কথা বলা সমীচীন নয়। সালাতে তো শুধু তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াত পাঠ করতে হয়”।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। কিন্তু ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে সকল কথা বললে সালাত বাতিল হবে না তা অল্প হতে হবে। যদি কথা বেশি হয় ও সময় দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। এটা শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর মত। কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ ‘মুজাররাদে’ বলেন, সময় দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হলে সালাত পুনরায় পড়তে হবে। এটা তার একটি মত। তার থেকে আরেক মত বর্ণিত হয়েছে, যা তিনি ‘জামে’ নামক কিতাবে উল্লেখ করেন, ইমাম আহমাদের বাহ্যিক কথা অনুযায়ী কম ও বেশির কোনো পার্থক্য নেই। কেননা ভুলের কারণে যা ক্ষমাযোগ্য তা কম ও বেশি সমান, কোনো পার্থক্য নেই। যেমন কেউ ভুল করে সিয়াম রেখে অল্প আহার করুক বা বেশি আহার করুক কোনো সমস্যা নেই। এটা কতিপয় শাফেয়ীদের মত।

(আওসাত, ৩/২৩৬, মুগনী, ২/৪৬, মাজমু, ৪/১৭)

সালাতে কথা বলা হারাম এ কথা না জেনে কেউ কথা বললে তার বিধান কী?

শাফেয়ীরা ও কতিপয় হাম্বলীরা বলেন, কথা যদি অল্প হয় তাহলে সালাত বাতিল হবে না। আর কথা যদি বেশি হয় তাহলে শাফেয়ীদের দুই মত। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সালাত বাতিল হয়ে যাবে। অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট অল্প ও বেশি এটা গণ্য হবে সমাজের প্রচলন অনুযায়ী। তাদের দলীল: মুসলিমে বর্ণিত মুয়াবীয়া ইবনু হাকাম রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সালাত পড়ছিলেন। তারপর সালাতে একলোক হাঁচি দেয়। তিনি ‘ইয়ার হামুকাল্লাহ’ বলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাত পুনরায় পড়তে বলেননি। বরং সালাতে কথা বলা হারাম এটা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি জানে সালাতে কথা বলা হারাম, কিন্তু এ কথা জানে না যে, কথা বললে সালাত বাতিল হয়ে যায় তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে, এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। কারণ সালাতে তার ত্রুটি ও অবাধ্যতা আছে। যেমন কেউ জানে কাউকে হত্যা করা হারাম, যিনা করা হারাম, চুরি করা হারাম, মিথ্যা অপবাদ দেয়া হারাম প্রভৃতি, কিন্তু সে জানে না এগুলোর শাস্তি কী তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। এখানে তার কোনো ওজর আপত্তি চলবে না। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

(মুগনী, ২/৪৬, মাজমু, ৪/১১, শারহে মুসলিম, ৫৩৭)

সালাতের মাঝে যদি সালাতের কোনো কল্যাণে কথা বলে তাহলে কি সালাত বাতিল হয়ে যাবে?

প্রথম মত: সালাত বাতিল হয়ে যাবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। এর উদাহরণ হচ্ছে ইমাম পাঁচ রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেছে আর মুসল্লী তাকে পেছন থেকে বলছে, চার রাকআত পড়েছেন। তাদের দলীল: লেখক যায়েদ ইবনু আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা এবং মুয়াবীয়া ইবনু হাকাম রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "এই সালাতে মানুষের কথা বলা সমীচীন নয়। সালাতে তো শুধু তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াত পাঠ করতে হয়"। তাদের আরো দলীল আছে।

দ্বিতীয় মত: সালাত বাতিল হবে না। এটা আওযায়ী, ইমাম মালেকের একটি মত ও ইমাম আহমাদ রহিমাহুমুল্লাহর একটি মত। তাদের দলীল: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক সালাত দুই রাকআত পড়েন। সেখানে আছে, তারপর তাকে যুল ইয়াদাইন বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন নাকি সালাত কমিয়ে দেয়া হয়েছে?

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তারা যে যুল ইয়াদাইন এর হাদীস দিয়ে দলীল দিয়েছেন এই ব্যাপারে ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম যখন মনে করেন তিনি সালাত পরিপূর্ণ করেছেন তারপর তিনি নিজেকে সালাতের বাহিরে আছেন ভেবে কথা বলেন তাহলে সালাত পরিপূর্ণ করে থাকলে তার সালাত হয়ে যাবে। আর তার পেছনের মুসল্লীরা যদি মনে করে তাদের ইমাম সালাত পরিপূর্ণ করেননি তারপর তারা জেনেশুনে কথা বলে তাহলে তাদের পুনরায় সালাত পড়তে হবে। কেননা দুই দিকে থেকে তাদের অবস্থা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যারা ছিলেন তাদের অবস্থার বিপরীত।

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় ফরয সালাত বৃদ্ধি পাওয়ার ও কমার সম্ভবনা রয়েছে, যার কারণেই যুল ইয়াদাইন বলেন, সালাত কি কমানো হয়েছে নাকি আপনি ভুলে গেছেন? এমনিভাবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে আছেন এ কথা ভেবে কথা বলেননি। কিন্তু বর্তমান থেকে নিয়ে কিয়ামত অবধি সালাত বৃদ্ধি হওয়ার ও কমার কোনো সম্ভবনা নেই।

২. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যারা ছিলেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ডাকলে তার ডাকের সাড়া দেয়া তাদের জন্য ওয়াজিব, কারণ ওই সময় তিনি তাদের মাঝে জীবিত ছিলেন। আর বর্তমানে তিনি জীবিত নেই।

(আওসাত, ২৩৪, মুগনী, ২/৫০, মাজমু, ৪/১৭)

অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কথা বলে অথবা যদি হাসি চলে আসে?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কথা বলে অথবা যদি হাসি চলে আসে বা হাঁচি দেয় বা কাশি দেয়, যার কারণে দুইটি হরফ বের হয়ে যায় অথবা ভুলবশত কথা বলে ফেলে অথবা সালাতে কথা বলা হারাম এটা জানে না, এগুলো যদি অল্প পরিমাণ হয় তাহলে সালাত বাতিল হবে না। এ বিষয়ে আমাদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। আর যদি বেশি হয় তাহলে এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর আরেক মতানুযায়ী বাতিল হবে না। এটা আবু ইসহাক আল মারুযী রহিমাহুল্লাহর মত। কথা কম ও বেশির হিসেব ধরা হবে সমাজের প্রচলন অনুযায়ী। এটাই ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর উম নামক কিতাবে আছে। অধিকাংশ বিদ্বান এটার কথাই বলেছেন।

ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসল্লীর যদি হাঁচি, কান্না ও হাই প্রাধান্য পায় তাহলে অধিকাংশ বিদ্বানের বিশুদ্ধ মত হচ্ছে সালাত বাতিল হবে না। এটা ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ ও অন্যদের মত। তার কিছু ছাত্র বলেন, সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

(মুগনী, ২/৪৭, মাজমু, ৪/১১, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২২/৬২১, শারহুল মুমতি, ৩/৩৬৬)

মুসল্লী যদি জরুরী কথা বলে

মুসল্লী যদি কোনো ব্যক্তিকে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম দেখে, যেমন অন্ধ ব্যক্তি কূপে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে অথবা অবুঝ শিশু আগুনের নিকটবর্তী হয়েছে বা ঘুমন্ত অথবা উদাসীন ব্যক্তিকে হিংস্র জন্তু বা সাপ আক্রমণ করবে অথবা জালেম ব্যক্তি কাউকে হত্যা করতে চাইছে আর কথা বলা ছাড়া ওই ব্যক্তিকে শতর্ক করা যাচ্ছে না তাহলে এই মুহূর্তে কথা বলা ওয়াজিব। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে তার সালাত কি বাতিল হয়ে যাবে?

প্রথম মত: তার সালাত বাতিল হবে না। এটা শাফেয়ীদের বিশুদ্ধ মত ও হাম্বলীদের একমত। ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর বাহ্যিক মত। তাদের দলীল: লেখক পূর্বে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে যুল ইয়াদাইন এর যে হাদীস বর্ণনা করেন তা। সেই হাদীস থেকে প্রমাণ হচ্ছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সাথে কথা বলেন, আর সাহাবীদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার জবাব দেয়া। এখানে কথা বলা ওয়াজিব হওয়ার কারণে সাহাবীদের সালাত বাতিল হয়নি, বরং বিশুদ্ধ হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: তার সালাত বিশুদ্ধ হবে না। এটা শাফেয়ী ও হাম্বলীদের দ্বিতীয় মত। তারা বলেন, ব্যক্তি কখনো কখনো কূপে নাও পড়তে পারে।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন। (মুগনী, ৩/৪৯, মাজমু, ৪/১২)

সালাতে অট্টহাসি দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, সকল বিদ্বান একমত সালাতে হাসলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন, সকল বিদ্বান একমত সালাতে খেলে, হাসলে বা ইচ্ছা করে অধিক কাজ করলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তিনি বলেন, সালাতে অট্টহাসি দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। শাবী রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সালাতে হাসি দিবে তার সালাত হবে না।

শাইখুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, উঁচু আওয়াজ করে সালাতে হাসি দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। কারণ তা সালাতের ওয়াজিব খুশুখুজু বিনষ্ট করে দেয়, যার কারণে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

আমি বলছি, শাফেয়ীরা ও হাম্বলীরা তা দুটি হরফে সীমাবদ্ধ করেন। অর্থাৎ হাসি দেয়ার সময় যদি দুটি হরফ প্রকাশ পায় তাহলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। অন্যথায় বাতিল হবে না। এই সীমাবদ্ধকরণের কোনো দলীল নেই।

(ইজমা, ৪৩, মুহাল্লা, ২/৩১৯, মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ২২/৬২২, ফাতাওয়া কুবরা, ৫/৩৩৮)

সালাতে মুচকি হাসি দিলে সালাত বাতিল হবে না

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে সকল বিদ্বান থেকে আমরা জ্ঞান শিখেছি তারা একমত, সালাতে মুচকি হাসি দিলে সালাত বাতিল হবে না। আমি বলছি, ইবনু সিরীন ও ইবনু হাযম রহিমাহুমা এর বিরোধিতা করে বলেন, ইচ্ছা করে মুচকি হাসি দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

(ইজমা, ৪৩, মাজমু, ৪/২১, মুহাল্লা, ২/৩১৯)

সালাতে কাঁদার বিধান কী?

আল্লাহর ভয়ে সালাতে কাঁদলে অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট সালাত বাতিল হবে না। বরং কাঁদা হলো আল্লাহর যিকির ও দুআর শামিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, “তাদের কাছে

রহমানের আয়াত পাঠ করে শুনালে তারা সিজদায় ক্রন্দনরত অবস্থায় লুটে পড়ে”। (সূরা মারইয়াম, ৫৮)

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহার হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আবু বকরকে বলো সে যেন মানুষদের নিয়ে সালাত পড়ে নেয়”। এরপর আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা বলেন, আবু বকর তো কোমল অন্তরের মানুষ, তিনি কিরাত শুরু করলে কাঁদা শুরু করবেন। তারপর তিনি বলেন, “তাকে সালাত পড়াতে বলো”।

আল্লাহর ভয়ে যদি সালাতে না কাঁদে, বরং কোনো চিন্তার কারণে কাঁদে। যেমন কোনো চিন্তা উদ্রেক সংবাদ সালাতে শুনেছে বা তার নিকট আত্মীয় কেউ মারা গেছে, যার ফলে সে সালাতেই কেঁদে দিয়েছে এমন হলে যদি সে তা আটকিয়ে না রাখতে পারে, বরং মনের অজান্তে বের হয়ে যায় তাহলে কোনো সমস্যা নেই, অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট সালাত বাতিল হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, “তবে যা তোমাদের অন্তর ইচ্ছা করে সম্পাদন করে”। (সূরা আহযাব, ৫)

এই অবস্থায় ব্যক্তি ইচ্ছা করে কাঁদেনি। আল্লাহর তাআলার বাণী, “সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ কে ভয় করো”। (সূরা তাগাবুন, ১৬) আরো অন্যান্য দলীল।

কতিপয় হাম্বলীরা বলেন, ওজর থাকলেও সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

সঠিক মতঃ সঠিক মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। শাফেয়ীরা ও হাম্বলীরা বলেন, কান্না আটকানোর সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি না আটকায় আর তার থেকে কান্নার দুটি হরফ বা তার বেশি হরফ প্রকাশ পায় তাহলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। দুটি প্রকাশ না পেলে বাতিল হবে না।

(বায়ান, ২/৩০৯, মুগনী, ২/৫৩, মাজমু, ৪/৮, মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ২২/৬২১, শারহুল মুমতি, ৩/৩৬৮)

সালাতে উহ্ আহ্ করার বিধান কী?

প্রথম মতঃ সালাতে উহ্ আহ্ করলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। এটা শাবী, নাখয়ী, মুগীরা, ছাওরী, আবু ছাওর, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মত। তবে শাফেয়ীরা ও হাম্বলীরা বলেন, উহ্ আহ্ করার ফলে যদি দুটি হরফ প্রকাশ পায় তাহলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। দুটি প্রকাশ না পেলে বাতিল হবে না।

দ্বিতীয় মতঃ সাধারণভাবে সালাত বাতিল হবে না। এটা আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহর মত। ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ

বলেন, অসুস্থ ব্যক্তি সালাতে উহ্ আহ্ করলে সালাত বাতিল হবে না। আর সুস্থ ব্যক্তি এমন করলে আমি তা মাকরূহ মনে করি। কিন্তু সালাত বাতিল হবে না।

ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, কোনো সন্দেহ নেই প্রয়োজন ছাড়া উহ্ আহ্ করা মাকরূহ।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে দ্বিতীয় মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(মুগনী, ২/৫৩, মাজমু, ৪/২১, মাজমুল ফাতাওয়া, ২২/৬২১)

সালাতরত অবস্থায় যদি কোনো সংবাদ শুনে সুবহানাল্লাহ বা আলহামদুলিল্লাহ বলে?

সালাতের বাহিরের কোনো যিকির যদি কারণবশত সালাতে বলে, যেমন কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললো বা বিচ্ছু তাকে কামড় দিয়েছে যার ফলে সে 'বিসমিল্লাহ' বলেছে বা শুনেছে অথবা চিন্তা সৃষ্টি করে এমন জিনিস দেখে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজীউন' বলেছে বা বিস্ময়মূলক কিছু দেখে 'সুবহানাল্লাহ' বলেছে এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, সালাত বাতিল হবে না। তাদের মাঝে আছেন আওযায়ী, ছাওরী, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক ও আবু ছাওর রহিমাহুমুল্লাহ।

তাদের দলীল: মুয়াবীয়া ইবনু হাকাম রাদিআল্লহু আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, সালাত হলো তাসবীহ, তাহলীল ও কুরআন পাঠের নাম"। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত সাহল ইবনু সাদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি তোমাদের দেখলাম তোমরা বেশি বেশি হাতে তালি দিচ্ছ?! সালাতে কোনো সমস্যা হলে 'সুবহানাল্লাহ' বলবে"।

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন, শুরুতে যদি এগুলো বলে তাহলে এগুলো কথা না আর যদি জবাবে বলে তাহলে কথা। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ থেকেও এমন মত বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, আল ইশরাফ ২/৪৯, আল মুগনী ২/৫৬, আল মাজমূ ৪/২১।

١٠٩. عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

১০৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ও আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যখন সূর্যের উত্তাপ অধিক হবে, তখন তোমরা সালাতকে ঠাণ্ডা করে

পড়বে তথা দেরিতে আদায় করবে। কারণ গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের কারণে হয়ে থাকে। [সহীহ বুখারী হা/৫৩৩,৫৩৪,৫৩৬, মুসলিম হা/৬১৫]

ঠাণ্ডা করে সালাত পড়ার হিকমাহ

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে কারণে সালাত ঠাণ্ডা করে পড়তে আদেশ করেছেন তার অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে বিদ্বানদের মাঝে মতভেদ আছে। তাদের মাঝে কেউ কেউ বলেন, সালাতে খুশুখুজু ঠিক রাখার জন্য ঠাণ্ডা করে সালাত পড়তে আদেশ করেছেন। কেননা গরমের সময় সালাত পড়া হচ্ছে খাবার উপস্থিত হলে সালাত পড়ার মতো, কেননা তার অন্তর ঝুঁকে থাকবে খাবারের দিকে ও পেশাব পায়খানার চাপের সময় সালাত পড়ার মতো, কেননা ঐ সময় তার অন্তর ঝুঁকে থাকবে চাপ মুক্ত হওয়ার দিকে। কারণ ওই সময় সালাতে খুশুখুজু থাকে না। এই কারণে ঠাণ্ডা করে সালাত পড়তে আদেশ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি একা সালাত পড়ুক বা জামাআতে পড়ুক কোনো পার্থক্য নেই।

কিছু বিদ্বান বলেন, যারা মাসজিদ থেকে দূরে আছে তাদের গরমের মাঝে হেঁটে আসতে কষ্ট হবে। তাই ঠাণ্ডা করে সালাত পড়তে আদেশ করা হয়েছে। এই মতের ওপর ভিত্তি করে ঠাণ্ডা করে সালাত পড়বে তারা, যারা দূর থেকে মাসজিদে আসে।

কিছু বিদ্বান বলেন, ওই সময় জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তাই ঠাণ্ডা করে সালাত পড়তে আদেশ করা হয়েছে। মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আমর ইবনু আবাসা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "তারপর ছায়া তীরের চেয়ে কমা পর্যন্ত সালাত পড়তে থাক, কেননা ওই সময় সালাত উপস্থিত করা হয়। তারপর পড়বে না, কেননা ওই সময় জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হয়। তারপর সূর্য ঢলে গেলে সালাত আসরের আগ পর্যন্ত সালাত পড়তে থাক, কেননা ওই সময় সালাত উপস্থিত করা হয়।

(ইবনু রজব, ৪/২৪০, ফাতহুল বারী, ২/১৭)

যুহরের সালাত ঠাণ্ডা করে পড়ার বিধান

প্রথম মত: যুহরের সালাত ঠাণ্ডা করে পড়া মুস্তাহাব। এটা সাহাবী, তাবেঈ ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ বিদ্বানের মত। এই মতের দলীল: লেখক আবু হুরায়রা ও ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমা যে হাদীস উল্লেক করেছেন তা।

দ্বিতীয় মত: সালাত ঠাণ্ডা করে পড়ার অনুমতি আছে, কিন্তু সুন্নাহ নয়। প্রথম ওয়াক্তে সালাত পড়া সর্বদা উত্তম। এটা লাইছ ও কতিপয় শাফেয়ীদের মত। এই মতের দরীল: খাব্বাব ইবনু আরত রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হাদীস, তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এর কাছে সূর্যের প্রখর তাপের কারণে যুহরের সালাতকে একটু দেরিতে পড়ার জন্য আবেদন করলাম। কিন্তু তিনি আমাদের আবেদন গ্রহণ করেননি। (মুসলিম, হা/৬১৯)

এই হাদীসের দুটি উত্তর দেয়া হয়েছে।

১. তারা সালাতকে একেবারে শেষ ওয়াক্তে পড়ার জন্য আবেদন করেন, তাই তাদের আবেদন তিনি গ্রহণ করেননি।

২. ঠাণ্ডা করে সালাত পড়ার আদেশ এই হাদীসকে রহিত করে দিয়েছে।

তৃতীয় মতঃ ঠাণ্ডা করে সালাত পড়া ওয়াজিব। এটা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইশারা করেন ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার এই কথার দ্বারা, 'ঠাণ্ডা করে সালাত পড়ার ব্যাপারে যে আদেশ বর্ণিত হয়েছে তা মুস্তাহাবের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কেউ বলেন, নির্দেশ প্রদানের জন্য আবার কেউ বলেন, ওয়াজিবের জন্য'। কাযী ইয়ায ও অন্যরা এটা বর্ণনা করেন।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত আর তা হচ্ছে মুস্তাহাব। যে সালাতকে ঠাণ্ডা করে পড়তে হবে তা হচ্ছে যুহরের সালাত। এই বিষয়টা বুখারীতে (৫৩৮) আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে স্পষ্টভাবে এসেছে, "যুহরের সালাত ঠাণ্ডা করে পড়ো"। ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, কিছু বিদ্বান বলেন, এটা সকল সালাতের জন্য। কেননা এখানে মুফরাদ মারেফা এসেছে আর তা আম (ব্যাপক) বুঝায়। আশহাব রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা আসরের সালাতের সাথে সম্পৃক্ত। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে সালাত ঠাণ্ডা করে পড়বে শুধু গরমকালে, শীলকালে নয়।

মাগরিবের সময় ও ফজরের সময় সালাত ঠাণ্ডা করে পড়া যাবে না। কারণ এই দুই সালাতের সময় খুবই সংকীর্ণ।

(শারহে মুসলিম, ৬১৬, ইলাম, ৩/৩৫৬, ইবনু রজব, ৪/২৪২, ফাতহুল বারী, ২/১৬)

জুমআর সালাত ঠাণ্ডা করে পড়ার বিধান কী?

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, জুমআর সালাত ঠাণ্ডা করা ছাড়া সূর্য ঢলে যাওয়ার সাথে সাথে পড়তে হবে। কেননা সালামা ইবনু আকওয়া রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জুমআর সালাত পড়তাম। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন। আমাদের কাছে কোনো হাদীস পৌঁছেনি যে, তিনি বিলম্ব করে জুমআ পড়েছেন। এমনকি সাহল ইবনু সাদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন, আমরা জুমআর পরে দুপুরের আহার ও বিশ্রাম করতাম। হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন। জুমআর সালাতে তাড়াতাড়ি যাওয়া সুন্নাহ। যদি এই সালাত দেরি করে পড়া হয় তাহলে মানুষরা কষ্ট পাবে।

ঠাণ্ডা করে সালাত পড়া কি শুধু বাড়িতে থাকার সাথে (মুকীমের) নির্দিষ্ট?

আবু যার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কোনো এক সফরে ছিলাম। তারপর মুয়াজ্জিন আযান দিতে ইচ্ছা করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "গরম কমলে আযান দাও"। তারপর কিছুক্ষণ পরে আবার আযান দিতে চাইলে তিনি বলেন, "গরম কমলে আযান দাও"। এমনকি আমরা টিলার ছায়া দেখতে পেলাম। হাদীসটি ইমাম বুখারী (৫৩৯) ও মুসলিম (৬১৬) বর্ণনা করেন। এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ অধ্যায় বেঁধেছেন, "সফরে যুহরের সালাত একটু গরম কমলে পড়া"।

হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই বাব দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন ঠাণ্ডা করে সালাত পড়া শুধু বাড়িতে থাকার সাথে খাস নয়। এর স্থানটা হচ্ছে মুসাফির যদি কোনো জায়গায় অবস্থান করে থাকে। আর যদি চলতে থাকে তাহলে জমায়ে তাকদীম বা তাখীর করবে।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসের বাহ্যিক অবস্থা থেকে যা বুঝা যাচ্ছে, সালাত গরম কমলে পড়লে আযানও গরম কমলে দিবে। সুতরাং আযান হবে ওই সময় যখন সালাত পড়বে। সালাত তাড়াতাড়ি পড়লে আযান তাড়াতাড়ি দিবে আর সালাত দেরিতে পড়লে আযান দেরিতে দিবে।

আমি বলছি, ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন তাতে প্রসিদ্ধ মতভেদ আছে আর তা হচ্ছে আযান কি সময় হওয়ার জন্য দেয়া হয় নাকি সালাতের জন্য দেয়া হয়?

ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে বিষয়টি শক্তিশালী তা হচ্ছে আযান সালাতের জন্য দেয়া হয়। আমি বলছি, এটাই সঠিক মত।

(ইবনু রজব, ৪/২৪৯, ফাতহুল বারী, ২/২০)

ঠাণ্ডা করে সালাত পড়া কি শুধু জামাআতের সাথে যে সালাত পড়ে তার সাথে খাস নাকি এটা আম (ব্যাপক)?

প্রথম মত: গরমের সময় ঠাণ্ডা করে সালাত পড়া এটা আম (ব্যাপক)। চাই দেশটা শীত মৌসুমের হোক বা গরম, চাই জামাআতের সাথে সালাত পড়ুক বা একাকী। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। এই মতের দলীল: লেখক আবু হুরায়রা ও ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। সেখানে শব্দগুলো আম (ব্যাপক)।

দ্বিতীয় মত: যে দেশে গরম বেশি ও যারা জামাআতের সাথে সালাত পড়ে ওই দেশে ঠাণ্ডা করে সালাত পড়তে হবে। এটা শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ ও তার অধিকাংশ ছাত্রের মত। কাযী

আবু ইয়ালা হাম্বলী রহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনটি শর্ত সাপেক্ষে ঠাণ্ডা করে সালাত পড়া জায়েয আছে।

১. খুব গরম থাকতে হবে,

২. যে দেশে গরম বেশি ওই দেশ হতে হবে ও

৩. যে মাসজিদে জামাআত হয় ওই মাসজিদ হতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি বাড়িতে সালাত পড়ে বা তার বাড়ির আঙিনার মাসজিদে সালাত পড়ে তার জন্য উত্তম হলো তাড়াতাড়ি সালাত পড়া।

প্রাধান্যযোগ্য মত: আম দলীলের আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(আওসাত, ২/৩৫৯, মুগনী, ১/৩৯০, শারহুল মুমতি, ৬১৫, ইবনু রজব, ৪/২৩৯, ফাতহুল বারী, ২/১৬)

ঠাণ্ডা করে সালাত পড়ার সীমা

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, ঠাণ্ডা করে সালাত পড়ার সীমা হচ্ছে আমাদের শাইখ কাযী আবু ইয়ালা রহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাত শেষ করার পরে পরবর্তী সালাতের সময় হওয়ার আগে অনেক সময় থাকবে।

শাফেয়ীরা বলেন, ঠাণ্ডা করে সালাত পড়ার সীমা হচ্ছে সালাতকে প্রথম সময় থেকে এতটুকু বিলম্ব করে পড়া যে, দেয়ালের ছায়া দিয়ে মানুষ চলতে পারে এবং অর্ধেক সময় হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করবে না। এটা সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন।

ইসহাক ইবনু রাহওয়াই কিছু আলেম থেকে বর্ণনা করেন, অর্ধেক সময় হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করলে সীমালজ্ঘন হবে না। অন্য সালাতের সময় চলে আসলে সীমালজ্ঘন হবে। সম্ভবত এর দ্বারা তিনি মাকরূহ উদ্দেশ্য নিয়েছেন, হারাম নয়।

(মুগনী, ১/৩৯০, ইবনু রজব, ৪/২৪২, ফাতহুল বারী, ২/২০)

١١٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ: بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

১১০. আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তীব্র গরমের সময় সালাত আদায় করছিলাম। অতঃপর আমাদের কেউ যখন তার কপালকে মাটিতে রাখতে সক্ষম হতেন না, তখন সে তার

কাপড়কে মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর সিজদা করতেন। [সহীহ বুখারী হা/১২০৮, সহীহ মুসলিম হা/৬২০]

শীত ও গরমের সময় কাপড়ের ওপর সিজদা করার বিধান কী?

অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, শীত ও গরমের সময় কাপড়ের ওপর সিজদা করা জায়েয আছে। তাদের দলীল: লেখক আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ মনে করেন, কাপড়ের ওপর সিজদা করলে যথেষ্ট হবে না, তবে যদি ক্ষত থাকে তাহলে ওজরের কারণে জায়েয হবে।

সঠিক মত: সঠিক মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত। সরাসরি সিজদা দেয়ার বিধান আস্তিন, আঁচল, হাত ও পাগড়ির ওপর সিজদা দেয়ার মতোই। এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে (৮৭) নাম্বারে হাদীস গত হয়েছে। সেখানে আছে, "সাত অঙ্গের ওপর সিজদা করার জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে"।

(আওসাত ৩/১৭৭, ইশরাফ ২/৩২)।

١١١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ. وَتَلا قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} وَلِمُسْلِمٍ" "مَن نَسِيَ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا: أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا".

১১১. আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি কোনো সালাত আদায় করতে ভুলে যাবে সে যেন তখনই আদায় করে যখন তার স্মরণ হবে। এটা ছাড়া তার অন্য কোনো কাফ্ফারা নেই। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

আমার স্মরণার্থে তুমি সালাত আদায় কর (সূরা ত্ব-হা: ১৪)। [সহীহ বুখারী হা/৫৯৭, মুসলিম হা/৬৮৪]

আর সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে যাবে অথবা সালাত না পড়েই ঘুমিয়ে যাবে, তার কাফ্ফারাহ হলো যখন তার স্মরণ হবে তখনই যেন সে তা আদায় করে নেয়। [সহীহ মুসলিম হা/৬৮৪]

ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার বিধান

প্রথম মত: ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়। সুতরাং কেউ সালাতের মাঝে প্রবেশ করলে তারপর তার ছুটে যাওয়া সালাতের কথা মনে হলেও সালাত পড়তে থাকবে। তারপর কাযা সালাত আদায় করবে। এটা তাউস, হাসান বাসারী, মুহাম্মদ ইবনু হাসান, আবু ছাওর, শাফেয়ী ও দাউদ রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত।

দ্বিতীয় মত: একদিন ও একরাতের সকল সালাত কাযা না হয়ে থাকলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। সুতরাং কেউ যদি উপস্থিত সালাত পড়াকালে ছুটে যাওয়া সালাতের কথা মনে হয় তাহলে এই সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তাকে আগে ছুটে যাওয়া সালাত পড়তে হবে তারপর বর্তমানের সালাত পড়তে হবে। এটা ইমাম মালেক ও আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর মত।

তৃতীয় মত: ছুটে যাওয়া সালাত কম হোক বা বেশি হোক ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। বর্তমান সালাত পড়াকালে কাযা সালাতের কথা মনে হলে এরপর বর্তমান সালাত আদায় করে কাযা সালাত আদায় করলে পুনরায় আবার বর্তমান সালাত আদায় করতে হবে। এটা আহমাদ, ইসহাক ও যুফার রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। তারা দলীর দিয়েছেন ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর আসার দিয়ে, "যে ব্যক্তি কাযা সালাতের কথা ভুলে যাবে। তারপর ইমামের সাথে সালাত পড়াবস্থায় মনে হবে তাহলে ইমামের সাথে সালাত শেষ করে পুনরায় ভুলে যাওয়া কাযা সালাত আদায় করতে হবে"। হাদীসটি ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ মুয়াত্তায় (১/১৬৮) উল্লেখ করেছেন। হাদীসের সনদ সহীহ। হাদীসটি মারফূও বর্ণিত হয়েছে। আমাদের শাইখ সহীহুল মুসনাদে (৭৭৬) উল্লেখ করেন, কিন্তু আবু যুরআ, বাইহাকী, দারাকুতনী ও ইবনু আদী রহিমাহুমুল্লাহ তারা বলেন, হাদীসটি মাওকুফ হিসেবে সহীহ, মারফূ হিসেবে নয়। মারফূ হিসেবে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন ইবনু মাঈন ও ইবনু আবী হাতেম তার ইলালে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। এই মতকে ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, কারো সালাত পড়াবস্থায় ছুটে যাওয়া সালাতের কথা মনে হলে বর্তমান সালাত নষ্ট হবে না। আমি বলছি, এই বিধানটা বর্তাবে বর্তমান সালাত ও ছুটে যাওয়া সালাত একসাথে হলে। আর সব সালাত যদি ছুটে যাওয়া হয় আর এগুলো একসাথে আদায় করে তাহলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। তবে শাফেয়ীরা এর ব্যতিক্রম মত দেন। তারা মনে করেন, এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই মাসআলায় নির্ভরযোগ্য কথা হচ্ছে কাযা সালাতটা ব্যক্তির ওপর ঋণের মতো। সুতরাং ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব একথা স্পষ্ট দলীল ছাড়া বলা যাবে না। আর এ বিষয়ে স্পষ্ট দলীল নেই। তাই কেউ তারতীব রক্ষা করা ছাড়া

সালাত পড়লে সে তার ওপর অর্পিত আদেশ পালন করেছে। দলীল ছাড়া তার ওপর অতিরিক্ত কোনো কাজ নির্ধারণ করা আবশ্যক হবে না। আল্লাহ ভালো জানেন।

(আওসাত ২/৪১৬, ইলাল ১/১০৮, দারাকুতনী ১/৪২০, বাইহাকী কুবরা ২/২২১, ইবনু আদীর কামেল ৩/৪০০, মুগনী ১/৬০৮, মাজমু ৩/৭৬, ইবনু রজব ৫/১২৯)।

কেউ সালাতের কথা ভুলে গেলে আরেক সালাতের সময় মনে হলে কোন সালাত আগে পড়বে?

প্রথম মত: ভুলে যাওয়া সালাত আগে পড়বে। তবে যদি বর্তমান সালাতের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে আগে বর্তমান সালাত পড়ে তারপর ভুলে যাওয়া সালাত পড়বে। এটা সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব, হাসান, আওযায়ী, রাবীয়া, সুফিয়ান ছাওরী, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক, আবু ছাওর ও আসহাবুর রায় রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত।

দ্বিতীয় মত: যে সালাতের কথা স্মরণ হয়েছে তা পড়বে, যদিও বর্তমান সালাত ছুটে যায়। এটা আতা, নাখয়ী, যুহরী, মালেক ও লাইছ রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ যা আগে শুরু করেছেন তা আগে পড়তে হবে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি দলীল দিয়েছেন আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে যাওয়ার হাদীস দ্বারা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের ফজর সালাত পড়ার আগে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়েছেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ (৬৮১) বর্ণনা করেন।

(আওসাত ২/৪১৪, ৪১৯, মুগনী ১/৬১০, ইবনু রজব ৫/১২৫)।

ছুটে যাওয়া সালাত কি সাথে সাথেই আদায় করতে হবে নাকি একটু বিলম্ব করা যাবে?

প্রথম মত: ছুটে যাওয়া সালাত সাথে সাথে আদায় করা ওয়াজিব। এটা আবু হানিফা, মালেক ও আহমাদ রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। তাদের দলীল: লেখক আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন সেখানে আছে, "স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে ওই সালাত আদায় করবে"।

দ্বিতীয় মত: রমজানের কাযা সিয়ামের মতো বিলম্ব করে আদায় করা যাবে। তবে সাথে সাথে আদায় করা মুস্তাহাব। এটা শাফেয়ীদের মত। তাদের দলীল: বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ইমরান ইবনু হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহ আহুর হাদীস, তারা ফজরের সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে ছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "একটু সামনে চলো"। তিনি বলেন, তারপর

তিনি আমাদের নিয়ে সামনে চলেন। সূর্য শুভ্র হলে আমাদের নিয়ে অবতরণ করে ফজরের সালাত পড়েন।

এই হাদীসের জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সালাত একটু বিলম্ব করে পড়েছেন সালাতের কল্যাণে আর তা হচ্ছে যে স্থানে সালাত পড়া মাকরূহ সেখান থেকে একটু দূরে গিয়ে সালাত পড়া।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(মাজমু ৩/৭৪, ইবনু রজব ৫/১৩১)।

যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করতে ভুলে গেছে তারপর নফল সালাত শুরু করার পর তা মনে হয়েছে এ ক্ষেত্রে তার করণীয় কী?

প্রথম মত: যতটুকু নফল সালাত পড়েছে তা বাতিল হয়ে যাবে। ইমামের সাথে যতটুকু ছুটে গেছে ততটুকু পুরা করে সিজদায়ে সাহু করবে। আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি ফরয সালাতের এক রাকআত পড়তে ভুলে যান। তারপর নফল সালাত শুরু করেন। নফল সালাত পড়াকালে তার ছুটে যাওয়া ফরয সালাতের কথা মনে হয়। তিনি ফরয সালাতের বাকিটুকু শেষ করে বসাবস্থায়ই সিজদায়ে সাহু করেন। ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ বিষয়ে কোনো সাহাবী আনাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর বিরোধিতা করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। আমি বলছি, এটা হাকাম, আওযায়ী রহিমাহুমার মত। আওযায়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, দুই রাকআত নফল পড়ার পর যদি ছুটে যাওয়া ফরয সালাতের কথা মনে পড়ে তাহলে ফরয সালাত পূর্ণ করবে, নফল দুই রাকআতকে গণ্য করা হবে না।

দ্বিতীয় মত: নফল শুরু করলে ফরয সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তাকে আবার নতুন করে ফরয সালাত পড়তে হবে। এটা হাসান, হাম্মাদ ইবনু আবী সালামা রহিমাহুমার মত। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন, দুই রাকআত নফল পড়ার পরে ফরয সালাতের কথা মনে হলে আমার নিকট পছন্দনীয় হচ্ছে ফরয সালাত নতুন করে পড়া।

তৃতীয় মত: নফল সালাত শুরু করার অল্প সময় পড়েই যদি ফরয সালাতের কথা মনে হয়ে যায় তাহলে ফরয সালাতে ফিরে এসে তা পূর্ণ করে শেষে সিজদায়ে সাহু দিবে। আর সময় যদি একটু বেশি অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে ফরয সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তাকে পুনরায় ফরয সালাত পড়তে হবে। এটা ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লার মত। ইবরাহীম নাখয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, নফল সালাতের রুকু করার আগে ফরয সালাতের কথা মনে হলে ফরয সালাত পূর্ণ করবে। আর যদি রুকু ও সিজদা করার পরে মনে হয় তাহলে নতুন করে ফরয সালাত পড়বে।

নিকটবর্তী মত: এই মতগুলোর মাঝে নিকটবর্তী মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন। (আওসাত ৩/৩২৪, মুহাল্লা ৩/৭৭)।

একদল মানুষের সালাত ছুটে গেলে তারা কি এই সালাত জামাআতের সাথে পড়বে?

শাফেয়ীরা ও হাম্বলীরা বলেন, ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করলে জামাআতের সাথে পড়া মুস্তাহাব। শাফেয়ীরা একটু খাস করে বলেন, একদল লোকের সালাত ছুটে গেলে তাদের জন্য জামাআতের সাথে ওই সালাত পড়া মুস্তাহাব। তাদের দলীল: আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন মুশরিকরা আমাদের যুহরের সালাত আদায় করতে দেয়নি, এমনকি সূর্য ডুবে যায়। ওই হাদীসে আছে, তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুকে ইকামত দেয়ার আদেশ করলে তিনি যুহরের সালাতের ইকামত দেন। তারপর তিনি যুহরের সালাত যুহরের সময় যেভাবে আদায় করেন, ঠিক সেভাবে তা আদায় করেন। তারপর আসরের সালাতের জন্য ইকামত দেন। তিনি আসরের সালাত আসরের সময় যেভাবে আদায় করেন, ঠিক সেভাবে তা আদায় করেন। তারপর মাগরিবের জন্য আযান দেন। তিনি মাগরিবের সালাত মাগরিবের সময় যেভাবে আদায় করেন, ঠিক সেভাবে তা আদায় করেন। হাদীসটি নাসাঈ ও অন্যরা বর্ণনা করেন। এর সনদ বিশুদ্ধ। দেখুন, ইরওয়াউল গালীল ১/২৫৭, ও সহীহুল মুসনাদ (৩৮২)।

(মুগনী ১/৬১৪, মাজমু ৪/১০৭)।

ছুটে যাওয়া ফরয সালাতের সুন্নাতে রাতেবাও কি পড়তে হবে?

অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট ফজরের সুন্নাত ফজরের ছুটে যাওয়া ফরয শুরু করার আগে পড়তে হবে। তাদের দলীল: মুসলিমে বর্ণিত আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তারা সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে থাকেন, সেখানে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে ফজরের সুন্নাত পড়েন তারপর ফরয পড়েন।

ফজর ব্যতীত অন্যান্য সালাতের ব্যাপারে ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, সুন্নাতে রাতেবা ফরয সালাতের পূর্বে পড়া মাকরূহ নয়। যেমনটি আমরা ফজরের সুন্নাতের ব্যাপারে বলেছি।

(মুগনী ১/৬১৪, ইনসাফ ১/৩১৩)।

١١٢. عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الآَخِرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ، فيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ.

১১২. জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআয (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রথমে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ইশার সালাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি তাঁর কওমের নিকট ফিরে এসে তাদের কে উক্ত সালাত পড়াতেন। [সহীহ বুখারী হা/৭০০,৭০১, মুসলিম হা/৪৬৫]

নফল সালাত আদায়কারী কি ফরয সালাত আদায়কারীর ইকতিদা (অনুসরণ) করতে পারবে?

প্রথম মতঃ ইকতিদা করা জায়েয আছে। এটা সাহাবী, তাবেঈ ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ বিদ্বানের মত। বরং অনেক বিদ্বান এর ওপর ইজমা দাবি করেন। তাদের মাঝে আছেন ইমাম শাফেয়ী, তাহাবী, ইবনু আব্দিল বার, মাওয়ারদী, ইবনু হুবাইর প্রমুখ বিদ্বান রহিমাহুমুল্লাহ।

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, নফল সালাত আদায়কারী চাইলে ফরয সালাত আদায়কারীর পেছনে সালাত আদায় করতে পারবে।

ইবনু হুবাইর রহিমাহুল্লাহ বলেন, সকল বিদ্বান একমত নফল সালাত আদায়কারী ফরয সালাত আদায়কারীর ইকতিদা (অনুসরণ) করতে পারবে।

তাদের দলীলঃ ইয়াযিদ ইবনু আসওয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত আদায় করেন। সালাত শেষ করে তিনি দুজন লোককে দেখতে পেলেন মাসজিদের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাদের দুজনকে ডাকলে তারা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তার কাছে আসে। তিনি তাদের বললেন, "তোমরা আমাদের সাথে সালাত পড়লে না কেন"? তারা বললো, আমরা বাড়ি থেকে সালাত পড়ে এসেছি। এরপর তিনি বলেন, "তোমরা এমন করবে না। বাড়িতে সালাত পড়ে এসে ইমামকে পেলে তার সাথে সালাত পড়বে। এটা নফল হয়ে যাবে"। হাদীসটি আবু দাউদ (৫৭৫), তিরমিযী (২১৯), ও নাসাঈ (৮৫৮), বর্ণনা করেন। হাদীসটি সহীহুল মুসনাদেও আছে (১২০০)। এর সনদ বিশুদ্ধ।

এমনিভাবে আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একলোককে দেখতে পান সে একাকী সালাত পড়ছে। এরপর তিনি বলেন, "কে আছো, তার সাথে সালাত পড়ে তাকে সাদাকা করবে"!? হাদীসটি আবু দাউদ (৫৭৪), ও আহমাদ (৩/৬৪), বর্ণনা করেন। এর সনদ বিশুদ্ধ। হাদীসটি সহীহুল মুসনাদেও আছে (৪০০)। তাদের আরো দলীল আছে।

দ্বিতীয় মতঃ ইকতিদা করা জায়েয নেই। এটা হাসান, যুহরী, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল আনসারী, রাবীয়া, আবু কিলাবা ও ইমাম মালেকের একমত রহিমাহুমুল্লাহ।

ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, একদল বিদ্বান বলেন, মুক্তাদীর নিয়্যাত ইমামের নিয়্যাতের ভিন্ন হলে তার সালাত হবে না। তাকে নতুন করে সালাত পড়তে হবে।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, একদল বিদ্বান বলেন, ফরয সালাত আদায়কারীর পেছনে নফল সালাত আদায়কারী, নফল সালাত আদায়কারীর পেছনে ফরয সালাত আদায়কারী ও অন্য ফরয সালাত আদায়কারীর পেছনে সালাত হবে না। তাদের দলীল: হাদীস, "ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করার জন্য। অতএব, তার বিপরীত করবে না"। লেখক (৭৮) নাম্বার যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সেটা তাদের দলীল। এই হাদীসের জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে, হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাহ্যিক কাজ ইমামের বিপরীত করা যাবে না। এই কথাটাকে শক্তিশালী করে এই হাদীসের পরের অংশ, "ইমাম তাকবীর দিলে তোমরাও তাকবীর দাও। রুকু করলে তোমরাও রুকুতে যাও"।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(ইশরাফ ২/১৪৭, শারহুল মায়ানী ১/৪১০, তামহীদ ২৪/৩৬৮, মুগনী ২/২২৬, মাজমু ৪/১৬৯, ইহকাম ১/২০৩, ইজমা ১/৬১৩)।

নফল সালাত আদায়কারীর পেছনে ফরয সালাত আদায়কারীর সালাত কি বিশুদ্ধ হবে?

প্রথম মত: বিশুদ্ধ হবে। এটা তাউস, আতা, আওযায়ী, শাফেয়ী, ইসহাক, আবু খাইছামা, আবু বকর ইবনু আবী শাইবা, সোলাইমান ইবনু হারব, আবু ছাওর, দাউদ, ইবনু মুনযির ও ইমাম আহমাদের একটি মত। তাদের দলীল: লেখক জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। এমনিভাবে সালাতুল খাওফে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইদলকে নিয়ে সালাত পড়েন। প্রত্যেক দলের দুই রাকআত করে সালাত হয়।

দ্বিতীয় মত: বিশুদ্ধ হবে না। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের মাঝে আছে, মালেক, আবু হানিফা ও আহমাদের একমত রহিমাহুমুল্লাহ। তাদের দলীল: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী, "ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করার জন্য। অতএব, তার বিপরীত করবে না"। তারা বলেন, নিয়্যাতের ভিন্নতা এটা বিপরীত আচরণ। এই হাদীসের উত্তর পূর্বে দেয়া হয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে **প্রথম মত**। এই মতকে ইবনু কুদামা ও ইবনু রজব রহিমাহুমা পছন্দ করেছেন।

(ইশরাফ ২/১৪৮, মুগনী ২/২২৫, মাজমু ৪/১৬৯, ইবনু রজব ৬/২৪০)।

কেউ যদি ফরয সালাত ভিন্ন ফরয সালাত আদায়কারীর পেছনে পড়ে!

এর উদাহরণ: যুহরের সালাত আদায়কারী আসরের সালাত আদায়কারী ইমামের পেছনে সালাত পড়ছে। পূর্বের মাসআলার ন্যায় এই মাসআলায়ও মতভেদ আছে।

সঠিক মত হচ্ছে নফল সালাত আদায়কারীর পেছনে যেমন ফরয সালাত আদায়কারীর সালাত বিশুদ্ধ আছে, অনুরূপ ভিন্ন ফরয সালাত আদায়কারীর পেছনেও সালাত জায়েয আছে। আল্লাহ ভালো জানেন।

(মুগনী ২/২২৭, মাজমু ৪/১৬৯)।

এক সালাত যদি আরেক সালাতের বাহ্যিক কাজগুলো বিপরীত হয়!

এর উদাহরণ: সালাতে কুসুফ বা জানাযার সালাত আদায়কারী যুহরের সালাত আদায়কারীর পেছনে ইকতিদা করছে, এই ক্ষেত্রে হাম্বলীরা ও শাফেয়ীদের একমত হচ্ছে সালাত বিশুদ্ধ হবে না। শাফেয়ীদের দ্বিতীয় মত হচ্ছে সালাত বিশুদ্ধ হবে।

সঠিক মত: সালাত বিশুদ্ধ হবে না। এর দলীল: বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, "ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করার জন্য। অতএব, তার বিপরীত করবে না"। এই সালাতের কাজগুলো ইমামের সালাতের বিপরীত কাজ।

(মুগনী ২/২২৭, মাজমু ৪/১৬৮)।

١١٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ".

১১৩. আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি যেন এরূপ এক পোশাক পরিধান করে সালাত আদায় না করে, যার কোনো এক অংশ তাঁর কাঁধের ওপর থাকে না। [সহীহ বুখারী হা/৩৫৯, মুসলিম হা/৫১৬]

কাঁধের ওপর কোনো জিনিস রাখার হিকমাহ কী?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ শারহে মুসলিমে (৫১৬) বলেন, কাঁধের ওপর কোনো জিনিস রাখার হিকমাহ হচ্ছে, যদি লুঙ্গি পরা হয় আর কাঁধের ওপর কোনো জিনিস না থাকে তাহলে লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু কাঁধের ওপর যদি কোনো জিনিস থাকে এর

সম্ভাবনা নেই। কখনো কখনো একহাত বা দুইহাত দ্বারা লুঙ্গি ধরে রাখতে হয়, যার দরুন ডান হাত যে বাম হাতের ওপর বুকের নিচে রাখতে হয় ও রফউল ইয়াদাইন করতে হয় এই সুন্নাহ ছুটে যায়। এমনিভাবে কাঁধের ওপর কোনো জিনিস না রাখলে শরীরের উপরিভাগ প্রকাশিত হয়ে যায় ও সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা সৌন্দর্য প্রকাশ করো"। (সূরা আল আরাফ: ৩১)

সালাতে দুই কাঁধের ওপর কোনো জিনিস রাখার বিধান কী?

প্রথমত কথা হচ্ছে: সালাতে দুই কাঁধের ওপর কোনো জিনিস রাখা মুস্তাহাব ও কাঁধ খোলা রেখে সালাত পড়া মাকরূহ। এই বিষয়ে কোনো বিদ্বানের মতভেদ নেই। তাদের মাঝে মতভেদ হচ্ছে ওয়াজিব কিনা এ নিয়ে?

প্রথম মত: সক্ষম হলে সালাতে দুই কাঁধের ওপর কোনো জিনিস রাখা ওয়াজিব। এটা ইমাম আহমাদ, ইবনু মুনযির, ইবনু হাযম রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। তাদের দলীল: লেখক আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা।

দ্বিতীয় মত: মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। কাঁধ খোলা রেখে যদি সালাত পড়লে সালাত মাকরূহ হবে, তবে সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা অধিকাংশ বিদ্বানে মত। তাদের দলীল: জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কাপড় যদি প্রশস্ত হয় তাহলে সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করো আর যদি সংকীর্ণ হয় তাহলে এর দ্বারা লুঙ্গি পরো"। হাদীসটি বুখারী (৩৬১) ও মুসলিম (৩০১০) বর্ণনা করেন। তারা আরো বলেন, কাঁধ সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এটা অন্যান্য অঙ্গের ন্যায়। উপরে বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের ব্যাপারে তারা বলেন, এখানের নিষেধাজ্ঞাটা 'নাহিয়ে তানযীহ' এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: হাদীসের বাহ্যিক অবস্থার আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের ব্যাপারে প্রথম মতের প্রবক্তারা বলেন, কাপড় সংকীর্ণ হলে এমন করবে, যা হাদীসের এই অংশ থেকে বুঝা যাচ্ছে, "আর যদি সংকীর্ণ হয় তাহলে এর দ্বারা লুঙ্গি পরো"। যারা বলেছেন কাঁধের ওপর কোনো জিনিস রাখা ওয়াজিব, কাঁধ খোলা রেখে সালাত পড়লে এই সালাত কি তাদের নিকট বিশুদ্ধ হবে?

ইমাম আহমাদের একটি মত ও ইবনু হাযমের মত হচ্ছে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আহমাদের দ্বিতীয় মত হচ্ছে সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তবে গুনাহগার হবে। এই মতটিই বিশুদ্ধ। আল্লাহ ভালো জানেন।

(মুহাল্লা ২/৩৯০, মুগনী ১/৫৮০, মাজমু ৩/১৮০, ফাতহুল বারী ১/৪৭২, নাইলুল আওতার ২/৩৮৫)।

কাপড় দ্বারা দুই কাঁধের সম্পূর্ণ ঢাকা কি ওয়াজিব?

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, কাপড় দ্বারা দুই কাঁধের সম্পূর্ণ ঢাকা ওয়াজিব নয়। বরং সামান্য ঢাকলেই যথেষ্ট হবে। গায়ের রং বুঝা যায় এমন পাতলা কাপড় দিয়ে ঢাকলেও যথেষ্ট হবে। কেননা হাদীসে কাঁধ ঢাকার জন্য শব্দ এভাবে এসেছে, "কোনো ব্যক্তি কাঁধের ওপর কোনো কিছু না দিয়ে এক কাপড়ে সালাত পড়বে না"। এই হাদীস সম্পূর্ণ দুই কাঁধকে বুঝায় আবার বুঝায়ও না। আমরা ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর উক্তি উল্লেখ করেছি, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি এক কাঁধ খোলা রেখে যদি সালাত পড়ে তাহলে তাকে কি পুনরায় সালাত পড়তে হবে? উত্তরে তিনি বলেন, তাকে পুনরায় সালাত পড়তে হবে না। (মুগনী ১/৫৮১, ইবনু রজব ২/৩৬৩)।

যদি দুই কাঁধের এক কাঁধ ঢাকে?

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর মত আছে, কোনো ব্যক্তি যদি এক কাঁধ ঢেকে রাখে ও আরেক কাঁধ খোলা রেখে সালাত পড়ে তাহলে তার সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা সে নিষেধ লঙ্ঘন করেনি। হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে দুই কাঁধ খোলা রাখতে আর সে দুই কাঁধ খোলা রাখেনি।

কাযী আবু ইয়ালা রহিমাহুল্লাহ বলেন, লজ্জাস্থানের ন্যায় সম্পূর্ণ কাঁধ ঢেকে রাখা ওয়াজিব। আরেক স্থানে তিনি বলেন, সামান্য ঢেকে রাখলেও যথেষ্ট হবে। লজ্জাস্থান ঢাকার ন্যায় মোটা কাপড় দিয়েও ঢাকা ওয়াজিব নয়, বরং গায়ের রং বুঝা যায় এমন পাতলা কাপড় দিয়ে ঢাকলেই যথেষ্ট। (মুগনী ১/৫৮১, ইবনু রজব ২/৩৬৩)।

কাঁধে যদি রশি বা সুতা রাখে তাহলে এটা কি যথেষ্ট হবে?

ইবনু কুদামা ও ইবনু রজব রহিমাহুমা এ বিষয়ে হাম্বলীদের দুটি মত উল্লেখ করেছেন।

১. যথেষ্ট হবে। কারণ আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে এসে কাঁধে যেন কোনো কিছু রাখে। আর এই সুতা বা রশি কোনো কিছু।

২. যথেষ্ট হবে না। তাদের দলীলও আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস। তারা বলেন, হাদীসে 'মিনহু' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা কাপড়ের দিকে ফিরেছে। এই মতটিই বিশুদ্ধ মত। এই মতকেই ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন।

কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের কেউ এক কাপড়ে সালাত পড়লে কাপড়ের দুই প্রান্ত যেন বিপরীতভাবে কাঁধে রাখে"। হাদীসটি বিশুদ্ধ, আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন। কাঁধের ওপর কাপড় রাখতে আদেশ করা হয়েছে কাঁধ ঢাকার জন্য। সুতা বা রশি রাখলে কাঁধ ঢাকবে না এবং এটাকে পোশাকও বলা হয় না। জাবের

রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা বিশুদ্ধ নয়। আর যদি সাহাবীদের থেকে এ বিষয়ে বিশুদ্ধ কোনো হাদীস বর্ণিতও হয় তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এগুলো বাদ দিয়ে অন্য কিছু। আল্লাহ ভালো জানেন। (মুগনী ১/৫৮২, ইবনু রজব ২/৩৬৩)।

কাঁধের ওপর কোনো কিছু রাখার ব্যাপারে এখানে কি ফরয ও নফলের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে?

ইবনু কুদামা রহিমাহুল্লাহ মুগনীতে (১/৫৮২) বলেন, ইমাম খিরাকী এই বিষয়ে ফরয ও নফলের মাঝে কোনো পার্থক্য করেননি। কেননা এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীস আম (ব্যাপক) যা ফরয ও নফল উভয় সালাতকে বুঝায়। এমনিভাবে ফরযের জন্য যা শর্ত নফলের জন্য তা শর্ত। যেমন পবিত্রতা। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, নফল সালাতে যথেষ্ট হবে। কেননা নফল সালাতের বিষয় আরো সহজ।

আমি বলছি, সঠিক মত হচ্ছে ফরয ও নফলের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীস আম (ব্যাপক)। আল্লাহ ভালো জানেন।

١١٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا. فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ: لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ. وَأُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ. فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِن الْبُقُولِ. فَقَالَ: (قَرِّبُوهَا) إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ. فَلَمَّا رَآهُ، كَرِهَ أَكْلَهَا. قَالَ: (كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي) .

১১৪. জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (কাঁচা) রসুন কিংবা পিঁয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে অথবা আমাদের মাসজিদ হতে আলাদা থাকে। সে যেন তার বাড়িতেই অবস্থান করে। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে একদা একটি পাতিলে সবজি জাতীয় কিছু আনা হলে তার থেকে দুর্গন্ধ অনুভব করেন। অতঃপর তিনি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এরপর তার মধ্যে থাকা সবজি সম্পর্কে বলা হলে তিনি সে গুলোকে তাঁর সঙ্গে থাকা অন্য এক সাহাবীর নিকট নিয়ে যেতে বলেন। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন যে, ঐ সাহাবী সেই খাবারটি খেতে অপছন্দ করছে তখন তিনি বললেন, তুমি খাও। কারণ আমি এমন ব্যক্তির সাথে গোপনে কথা বলি যার সাথে তুমি বল না। [সহীহ বুখারী হা/৮৫৫, মুসলিম হা/৫৬৪]

١١٥. **عَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ أَوِ الثُّومَ أَوِ الْكُرَّاثَ، فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو الإِنْسَانِ.**

وَفِي رِوَايَةٍ (بَنُو آدَمَ) .

১১৫. জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুন, পিঁয়াজ কিংবা পেঁয়াজ জাতীয় সবজিবিশেষ খাবে, সে যেন আমাদের মাসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কারণ যা দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়, তা দ্বারা ফিরিশতাগণও কষ্ট পায়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আদম সন্তান। [সহীহ মুসলিম হা/৫৬৪]

পিঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি খাওয়ার বিধান

প্রথম মত: পিঁয়াজ ও রসুন খাওয়া হালাল। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: লেখক জাবের রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। তাদের আরো দলীল হচ্ছে মুসলিমে (৫৬৫) বর্ণিত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "হে মানুষ সকল! আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করার আমার জন্য অনুচিত। কিন্তু আমি এই গাছের (পিঁয়াজ ও রসুন) গন্ধ অপছন্দ করি"।

দ্বিতীয় মত: এই শাকসবজি খাওয়া হারাম। এটা পূর্বের কিছু বিদ্বানের মত। ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ ও কিছু যাহিরীদেন মত, তবে ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ তাদের মাঝে নেই। কেননা তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন এগুলো খাওয়া হালাল, যদিও তার নিকট জামাআতের সাথে সালাত পড়া ফরজে আইন।

যারা এগুলো খাওয়া হারাম বলেছেন তাদের হারাম বলার নেপথ্যে কারণ হচ্ছে, তাদের নিকট জামাআতের সাথে সালাত পড়া ফরজে আইন। আর এগুলো খেলে যেহেতু সালাতে যাওয়া যায় না, সেহেতু এগুলো খাওয়া হারাম। মূলনীতি হচ্ছে, "যে জিনিস ছাড়া ওয়াজিব পরিপূর্ণ হয় না ওই জিনিসটাও ওয়াজিব"। সুতরাং জামাআতের জন্য এগুলো খাওয়া যাবে না, তাই এগুলো হারাম।

বিন বায রহিমাহুল্লাহ বুখারীর টীকায় এর জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, তাদের এই ব্যাখ্যা সুন্দর নয়।

সঠিক কথা হচ্ছে এই দুর্গন্ধযুক্ত সবজি খাওয়া হালাল হলেই জামাআতের সাথে সালাত ফরজে আইনকে বাধা দেয় না। যেমন খাবার উপস্থিত হলে জামাআত বর্জন করা জায়েয আছে অথচ এই খাবার বৈধ!

(শারহে মুসলিম (৫৬৪), ইবনু রজব ৮/১৪, ফাতহুল বারী ২/৩৪৩)।

হাদীসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যেক মাসজিদের জন্য প্রযোজ্য

কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ ‘ইকমালুল মুয়াল্লিমে’ (২/৪৯৭) বলেন, অধিকাংশ বিদ্বানের মত হচ্ছে হাদীসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যেক মাসজিদের জন্য প্রযোজ্য। কিছু বিদ্বান বলেন, এই নিষেধাজ্ঞা শুধু মাসজিদে নববীর সাথে খাস। কেননা অহির ফেরেশতা ওই মাসজিদে আশার দরুন তারা কষ্ট পায়। তাদের দলীল, “সে যেন আমাদের মাসজিদের নিকটবর্তীও না হয়”। অধিকাংশ বিদ্বানের দলীল হচ্ছে, “সে যেন কোনো মাসজিদের নিকটবর্তীও না হয়”। এই দুটি বর্ণনাই ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন।

মাসজিদ যদি খালি থাকে তাহলেও কি তাদের মাসজিদে যাওয়া নিষেধ?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ শারহে মুসলিমে (৫৯১) বলেন, বিদ্বানরা বলেন, এই হাদীস প্রমাণ করে মাসজিদ খালি থাকলেও যারা পিঁয়াজ ও রসুন খাবে তারা মাসজিদে যেতে পারবে না। কারণ মাসজিদ হচ্ছে ফেরেশতাদের যাতায়াতের স্থান এবং হাদীসে আমভাবে (ব্যাপকভাবে) নিষেধ করা হয়েছে।

মাসজিদের সাথে সাথে এই নিষেধাজ্ঞা কি জনসমাগমের স্থানেও প্রযোজ্য?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ শারহে মুসলিমে (৫৬২) বলেন, কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা মাসজিদের সাথে কিয়াস করে বলেন, পিঁয়াজ ও রসুন খেয়ে জমসমাগমেও যাওয়া যাবে না। যেমন: ঈদের মাঠে, জানাযার সালাতে, ইলমের ও যিকিরের মজলিসে, ওলিমার অনুষ্ঠানে প্রভৃতি স্থানে। তবে বাজারে যেতে পারবে।

কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহর এই আলোচনার পরে ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসে পিঁয়াজ ও রসুন খাওয়া সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে এর কারণ হচ্ছে মানুষ যেন কষ্ট না পায়। সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞাকে শুধু ফেরেশতাদের যাতায়াতের স্থানের সাথে ও ইবাদতের স্থানের সাথে খাস করা অনুচিত। তাই বাজারে যাওয়ার সময়ও এগুলো খেয়ে যাওয়া নিষেধ। মুসলিমে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, “রসুনের দুর্গন্ধ দ্বারা সে যেন আমাদের কষ্ট না দেয়”। এই হাদীস প্রমাণ করে নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে মানুষ যেন কষ্ট না পায়।

ইবনু দাকীকিল ঈদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা উপরে বর্ণিত দুই কারণের সাথেই প্রযোজ্য। সুতরাং অন্যান্য ইবাদতের স্থানের ন্যায় বাজারও এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

(ইহকাম ২/৬৭, মুফহিম ২/১৬৬, ইবনু রজব ৮/১৩, ফাতহুল বারী ২/৩৪৩, নাইলুল আওতার ২/৫৬৭)।

যে সকল জিনিসের দুর্গন্ধ রয়েছে ওই সকল জিনিস কি পিঁয়াজ ও রসুনের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত?

হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে (২/৩৪৪) বলেন, ইবনু তীন রহিমাহুল্লাহ ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, মুলা খেলে যদি মুখ দুর্গন্ধ হয়ে যায় তাহলে মুলাও রসুনের মতো। তবে কাযী ইয়ায একটু খাস করে বলেন, ঢেকুর আসতে হবে। কিছু বিদ্বান বলেন, যাদের মুখে গন্ধ অথবা ক্ষত থাকার কারণে সেখান থেকে দুর্গন্ধ বের হয় তারাও হাদীসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

কিছু বিদ্বান বলেন, যারা দুর্গন্ধের স্থানে কাজ করে, যেমন মাছের বাজারে বা আবর্জনার স্থানে, যার দরুন তাদের থেকে দুর্গন্ধ আসে তারাও এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত। এমনিভাবে যারা বিকলাঙ্গ বা শেত রোগে আক্রান্ত অথবা মুখ দ্বারা মানুষকে কষ্ট দেয় তারাও এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত। ইবনু দাকীকিল ঈদ রহিমাহুল্লাহ এই সকল বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেন।

মাসজিদের বারান্দা কি মাসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত?

হাফেজ ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে (২/৩৪৪) বলেন, মাসজিদের বারান্দা ও মাসজিদের নিকটবর্তী স্থান মাসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো থেকে দুর্গন্ধ পেলে তাকে বাকী কবরস্থানের দিকে চলে যাওয়ার জন্য বলতেন। যেমনঃ মুসলিমে উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে।

পিঁয়াজ ও রসুন রান্না করে দুর্গন্ধ দূর করে খেলে

উমার ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল কে দেখেছি তিনি কারো থেকে পিঁয়াজ ও রসুনের গন্ধ পেলে তাকে বাকী কবরস্থানের দিকে চলে যাওয়ার জন্য আদেশ করতেন। তিনি বলেন,

“কেউ এই দুটি জিনিস খেলে সে যেন রান্না করে দুর্গন্ধ দূর করে খায়”। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (৫৬৭) বর্ণনা করেন। কুরতুবী মুফহিমে বলেন, “সে যেন রান্না করে খায়”। অর্থাৎ রান্না করার কারণে গন্ধ যেন চলে যায়।

(মুফহিম ২/১৭৩, ইবনু রজব ৮/১৫)।

পিঁয়াজ ও রসুন খাওয়ার পরে যদি এমন জিনিস খায়, যা এই দুইটার গন্ধ দূর করে দেয়

ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ শারহে রিয়াযুস সালেহীনে (৪/৩৫০) বলেন, কোনো মানুষ যদি এমন জিনিস খায়, যা খাওয়ার দ্বারা ওই দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায় তাহলে কি খাওয়া জায়েয আছে?

আমরা বলি, হ্যাঁ, খাওয়া জায়েয আছে। কোনো মানুষ যদি এমন জিনিস খায়, যার দরুন পিঁয়াজ ও রসুনের গন্ধ চলে যায় তাহলে এগুলো খাওয়া জায়েয আছে। কারণ ইল্লাত (কারণ) থাকা ও না থাকার কারণে হুকুমের পরিবর্তন হয়।

জামাআত থেকে পেছনে থাকার উদ্দেশ্যে কেউ যদি পিঁয়াজ ও রসুন খায়

বিন বায রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীর টীকায় বলেন, সারকথা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য সহজ করতেন চান। শারঈ কল্যাণের কারণে তিনি এই বৈধ জিনিসকে জামাআত বর্জনের ওজর নির্ধারণ করেছেন। কোনো ব্যক্তি যদি জামাআত থেকে পেছনে থাকার উদ্দেশ্যে এগুলো খায় তাহলে এটা হারাম হবে। আল্লাহ ভালো জানেন।

শাইখ ইবনু উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, জামাআতে উপস্থিত না হওয়ার জন্য এগুলো খাওয়া কি জায়েয আছে?

আমরা বলি, ফরয বিধানকে রহিত করার জন্য কোনো ব্যক্তির জন্য মাধ্যম গ্রহণ করা হারাম। কিন্তু কেউ যদি আগ্রহী হয়ে এগুলো খায় তাহলে আমরা বলি এগুলো খাওয়া জায়েয আছে, কিন্তু গন্ধ দূর হওয়ার আগ পর্যন্ত মাসজিদের নিকটবর্তী হবে না। আল্লাহ তাওফীকদাতা।

(ফাতহুল বারী ২/৩৪৩, শারহে রিয়াযুস সালেহীন ৪/৩৫০)

٢١-بَابُ التَّشَهُّدِ

অধ্যায়: ২১-তাশাহুদ

١١٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: (عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – التَّشَهُّدَ – كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ – كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِن الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

وَفِي لَفْظٍ: إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ .....– وَذَكَرَهُ أَلَى آخره. وَفِيهِ: فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. وَفِيهِ – فَلْيَتَخَيَّرْ مِن الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.

১১৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেমনিভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পবিত্র কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন তেমনি তিনি আমাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমার হাত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুই হাতের মাঝে ছিল।

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আত্তাহিয়্যাতু (সমস্ত রাজত্ব, মহত্ব, স্থায়িত্ব ও যাবতীয় মন্দগুণ হতে পবিত্রতা), ওয়াছছ্বলাওয়াতু (পাঁচ ওয়াক্ত সালাতসহ অন্যান্য সালাতসমূহ), ওয়া ত্বয়্যিবাতু (যাবতীয় উত্তম কথা, কাজ ও গুণসমূহ) একমাত্র আল্লাহর জন্যে। হে নাবী আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, কল্যাণ এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আর আমাদের প্রতি ও আল্লাহর নেককার বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল। [সহীহ বুখারী হা/৬২৬৫, মুসলিম হা/৪০২]

অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে, যখন তোমাদের কেউ সালাতের জন্য বসবে, তখন সে যেন বলে, আত্যাহিয়্যাতু লিল্লাহ.... শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন। সে বর্ণনায় আরো রয়েছে: তোমরা যখন এমনটি করবে, তখন তোমরা আসমান ও যমীন সমূহের সকল নেককার ও সৎ ব্যক্তিদের প্রতি সালাম বা শান্তি বর্ষনের দু'আ করলে।

সে বর্ণনায় আরো বর্ণিত রয়েছে যে, অতঃপর ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো আবেদন বা দু'আ পছন্দ করবে। [সহীহ বুখারী হা/৮৩৫ ,৬২৩০, মুসলিম হা/৪০২]

প্রথম তাশাহুদের বিধান

প্রথম মত: প্রথম তাশাহুদ ওয়াজিব। এটা লাইছ, আহমাদ, আবু ছাওর, ইসহাক ও দাউদ রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। তারা বলেন, ইচ্ছা করে তাশাহুদ ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর ভুলক্রমে ছেড়ে দিলে সিজদায়ে সাহু দিলে যথেষ্ট হয়ে যাবে। তাদের দলীল: রিফায়া রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে,

তুমি সালাতের প্রথম বৈঠকে প্রশান্তির সাথে বসবে এবং এ সময় তোমরা বাম পা বিছিয়ে দিবে, অতঃপর তাশাহুদ পড়বে। অতঃপর আবার দাঁড়ালে উপরোক্ত নিয়মেই সালাত শেষ করবে। হাদীসটি আবু দাউদ (৮৬০) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটি হাসান বলেছেন। এমনিভাবে ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস যা লেখক উল্লেখ করেছেন, সেখানে আছে, "তোমাদের কেউ সালাতে বসলে সে যেন বলে, আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি---। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা এভাবেই সালাত পড়েন। তিনি বলেন, 'আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছো সেভাবে সালাত আদায় করো'।

দ্বিতীয় মত: সুন্নাহ। আর এটা মালেক, ছাওরী, আওযায়ী, আবু হানিফা ও শাফেয়ী রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। বরং বলা হয়ে থাকে এটা অধিকাংশ বিদ্বানদের মত। তাদের দলীল: পূর্বে বর্ণিত (১০৭) আব্দুল্লাহ ইবনু বুহাইনা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে, নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিয়ে যুহরের সালাত পড়েন। তারপর তিনি দ্বিতীয় রাকআতে না বসে দাঁড়িয়ে যান। এরপর সালাত পূর্ণ করে দুটি সিজদায়ে সাহু দেন।

হাদীস থেকে প্রমাণ হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না বসে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ত্রুটি দূর করেছেন সিজদায়ে সাহু দ্বারা। যদি এটা ওয়াজিব হতো তাহলে সিজদায়ে সাহু দ্বারা এই ত্রুটি নিরসন হতো না। কিন্তু তাদের এই কথা 'সুন্নাহ ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু দ্বারা এর ত্রুটি দূর করা হয়, ওয়াজিব ছুটে গেলে ত্রুটি দূর করা যান না' গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ এ কথাই বলেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত আর তা হচ্ছে প্রথম তাশাহুদ ওয়াজিব। এটা যদি ভুলক্রমে ছেড়ে দেয় তাহলে সিজদায়ে সাহু দিলে ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। আর ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। ইবনু রজব ও শাওকানী রহিমাহুমা এই মত গ্রহণ করেছেন। শাওকানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা পূর্বে বহুবার বলেছি ওয়াজিব ছুটে গেলে সালাত বাতিল হয় না। সালাত বাতিল হয় সালাতের শর্ত ও রুকন ছেড়ে দিলে। আমি বলছি, এই মতটি সঠিক। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

(মুগনী ১/৫৩২, মাজমু ৩/৪২৯, ইবনু রজব ৭/৩১৭, সাইলুল জাররার ১/৪৯১, নাইলুল আওতার ৩/২৩৪, ২৫৮)।

শেষ তাশাহুদের বিধান

প্রথম মত: শেষ তাশাহুদ ও তাতে বসা সালাতের রুকন। এটা ছাড়া সালাত বিশুদ্ধ হবে না। এটা হাসান বাসরী, আহমাদ, ইসহাক, দাউদ রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। ইবনু মুনযির রহিমাহুল্লাহ উমার ইবনু খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু ও ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু গোলাম নাফে থেকে এই মত বর্ণনা করেন। এই মতের দলীল: লেখক ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ

আনহুর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তা। সেখানে আছে, 'তোমাদের কেউ সালাতে বসলে সে যেন বলে আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি'---।

হাদীসটি নাসাঈ (১২৭৭) এই শব্দে বর্ণনা করেন, 'তাশাহুদ ফরয হওয়ার পূর্বে আমরা সালাতে বলতাম'। এই শব্দটা সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রহিমাহুল্লাহ এককভাবে বর্ণনা করেন। ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তাশাহুদ ফরয হওয়ার পূর্বে' এই শব্দটা ইনবু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর সূত্রে কেউ বর্ণনা করেননি।

দ্বিতীয় মত: তাশাহুদ পরিমাণ সময় বসা ওয়াজিব, তবে তাশাহুদ ওয়াজিব নয়। এটা আবু হানিফা, ছাওরী ও ইমাম মালেকের একমত রহিমাহুমুল্লাহ।

তৃতীয় মত: তাশাহুদ সুন্নাহ, কেউ ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হবে না। এটা নাখয়ী, কাতাদা, হাম্মাদ, আওযায়ী ও ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মত। তাদের দলীল: এর আলোচনা প্রথম তাশাহুদে অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা আরো বলেন, সালাতে ভুলকারীর হাদীসে তাশাহুদের কথা উল্লেখ নেই।

চতুর্থ মত: তাশাহুদ ওয়াজিব। এটা যুহরী, ছাওরী, আবু খাইছামা, ইবনু আবী শাইবা, সোলাইমান ইবনু দাউদ আল হাশেমী রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। ইমাম আওযায়ী রহিমাহুল্লাহ থেকেও এই মত বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় হাম্বলী বলেন, এটাই ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর মত আর তা হচ্ছে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর নিকট প্রথম তাশাহুদ ও শেষ তাশাহুদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এই মতের দলীল: এর আলোচনা প্রথম তাশাহুদে অতিক্রান্ত হয়েছে।

প্রাধান্যযোগ্য মত: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে চতুর্থ মত। ইমাম শাওকানী রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন আর তা হচ্ছে প্রথম তাশাহুদ ও শেষ তাশাহুদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, যেমনটি ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন।

(আওসাত ৩/২১৭, ইস্তিযকার ৪/২৮৭, মুগনী ১/৫৪১, মাজমু ৩/৪৪৩, শারহে মুসলিম (৪০২), নাইলুল আওতার ৩/২৩৫, সাইলুল জাররার ১/৪৬৮)।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত যে কোনো তাশাহুদ মুসল্লীর জন্য পড়া জায়েয আছে

ইমাম নববী ও ইবনু রজব রহিমাহুমা বলেন, সকল বিদ্বান একমত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত যে কোনো তাশাহুদ পড়া জায়েয আছে। তবে কোনটা পড়া মুস্তাহাব এ নিয়ে তাদের মাঝে মতভেদ আছে। অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে যে তাশাহুদ বর্ণিত হয়েছে তা পড়া উত্তম। কিন্তু কখনো কখনো

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে যে সকল তাশাহুদ বর্ণিত হয়েছে তা পড়াও উত্তম, যেমন মুসলিমে (৪০৩) বর্ণিত ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর তাশাহুদ।

(মাজমু ৩/৪৩৭, শারহে মুসলিম (৪০২), ইবনু রজব ৭/৩৩২)।

দুটি তাশাহুদই আস্তে পড়বে, জোরে নয়

ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, তাশাহুদ আস্তে পড়া সকল বিদ্বানের নিকট সুন্নাহ আর জোরে পড়া হলো মূর্খতা ও বিদআত। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সকল বিদ্বান একমত দুই তাশাহুদই আস্তে পড়তে হবে, জোরে পড়া মাকরূহ।

(ইস্তিযকার ৪/২৮৭, মাজমু ৩/৪৪৪)।

প্রথম ও দ্বিতীয় তাশাহুদে বসার পদ্ধতি

প্রথম মত: যে সালাতে দুটি তাশাহুদ আছে ওই সালাতের প্রথম বৈঠকে ইফতিরাশ- বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া রেখে বসবে ও দ্বিতীয় তাশাহুদে তাওয়াররুক (বাম নিতম্বের ওপর বসে ডান পা খাড়া রাখা) করে বসবে।

এটা আহমাদ ও ইসহাক রহিহুমার মত। এই মতের দলীল: বুখারীতে (৮২৮) বর্ণিত আবু হুমাইদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, সেখানে আছে দ্বিতীয় রাকআতে তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বসলে বাম পায়ের ওপর বসতেন ও ডান পা খাড়া করে রাখতেন। শেষ রাকআতে বসলে বাম পা আগে বাড়িয়ে দিয়ে নিতম্বের ওপর বসতেন ও ডান পা খাড়া করে রাখতেন।

দ্বিতীয় মত: যে বৈঠকে সালাম আছে ওই বৈঠকে (শেষ বৈঠকে) বসার সময় তাওয়াররুক করবে। চাই ওই সালাতে তাশাহুদ একটা থাক বা দুটি। এটা ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর মত। তার দলীল: আবু হুমাইদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর আম (ব্যাপক) হাদীস (শেষ রাকআতে বসলে)। যে তাশাহুদে সালাম ফিরানো হয় ওই তাশাহুদে দীর্ঘ সময় ধরে দুআ করা হয়, তাই এখানে তাওয়াররুক করা উচিত। কেননা তাওয়াররুক ইফতিরাশ (বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া করে রাখা) থেকে সহজ।

তৃতীয় মত: সব তাশাহুদেই ইফতিরাশ (বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া করে রাখা) করে বসবে। এটা আবু হানিফা, ছাওরী, হাসান ইবনু সালেহ, ইবনু মোবারক রহিমাহুমুল্লাহ তাদের মত। ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই মত কে অধিকাংশ বিদ্বানের দিকে সম্পৃক্ত করেন।

চতুর্থ মত: সব তাশাহুদেই তাওয়াররুক করবে। এটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মত।

সঠিকের নিকটবর্তী মত: এই মতগুলোর মাঝে সঠিকের নিকটবর্তী মত হচ্ছে প্রথম মত। ইবনু কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ এই মতকে পছন্দ করেছেন। তবে দ্বিতীয় মতও সঠিক মতের কাছাকাছি। (শারহে মুসলিম (৪৯৮), যাদুল মাআদ ১/২৫৪, ইবনু রজব ৭/৩১১, ফাতহুল বারী ২/৩০৯)।

তাশাহুদে ইফতিরাশ ও তাওয়াররুকের বিধান

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ শারহে মুসলিমে (৪৯৮) বলেন, এই পদ্ধতিতে বসা সুন্নাহ। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি উভয় তাশাহুদে ইফতিরাশ করে বসে বা তাওয়াররুক করে বসে বা আসন পিড়ি করে বসে বা ইকয়া (দুই পা খাঁড়া করে গোড়ালিতে বসা) করে বসে অথবা দুই পা কে সম্প্রসারিত করে বসে তাহলে সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নাতের খিলাফ কাজ হবে।

বি.দ্র. প্রথম তাশাহুদে ইফতিরাশ ও শেষ তাশাহুদে তাওয়াররুক করে বসা সুন্নাহ।

নারীরা তাশাহুদে কীভাবে বসবে?

প্রথম মত: পুরুষরা যেভাবে বসে সেভাবে বসবে। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ উম্মুদ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহা থেকে তালীক সূত্রে এই মত বর্ণনা করেন। এমনিভাবে এটা ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আওযায়ী ও নাখয়ীর একমত রহিমাহুমুল্লাহ। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ এই মত কে অধিকাংশ বিদ্বানের দিকে সম্পৃক্ত করেন।

দ্বিতীয় মত: নারীরা তাশাহুদে আসন পিঁড়ি হয়ে বসবে। এই মত ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তার স্ত্রী সাফিয়া বলেন, তিনি তার স্ত্রীদের এভাবে বসার জন্য আদেশ করতেন। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর বলেন, আসন পিড়ি হয়ে বসবে অথবা দুই পা ডান দিকে বের করে বসবে। তবে ডান দিকে বের করে বসা তার নিকট উত্তম। এটা নাখয়ী, ছাওরী ও ইসহাক রহিহুমুল্লাহ তাদের মত। কেননা এইভাবে বসাটা পুরুষের বসার মতো ও এইভাবে বসলে সবকিছু একত্রিত হয়ে থাকে।

তৃতীয় মত: যেভাবে সহজ হয় সেভাবে বসবে। এটা শাবী রহিমাহুল্লাহর মত। কাতাদা রহিমাহুল্লাহ বলেন, যেভাবে বসলে ভালো করে সতর ঢেকে বসতে পারে সেভাবে বসবে। হাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বসবে। আতা রহিমাহুল্লাহ বলেন, যেভাবেই বসুক কোনো সমস্যা নেই। তবে ডান পাশে বসার চেয়ে বাম পাশে বসা আমার নিকট বেশি প্রিয়।

সঠিকের নিকটবর্তী মত: এই মতগুলোর মাঝে সঠিকের নিকটবর্তী মত হচ্ছে প্রথম মত আর তা হচ্ছে নারীরা পুরুষদের মতো বসবে। তবে যদি সতর প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার শঙ্কা করে তাহলে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বসবে। আল্লাহ ভালো জানেন।

(শারহে মুসলিম (৪৯৮), ইবনু রজব ৭/২৯৯, ফাতহুল বারী ২/৩০৫)।

١١٧. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: (لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ أَلا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

১১৭. আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার সাথে কা'ব ইবনে ওযরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সাক্ষাত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আব্দুর রহমান আমি কি তোমাকে একটি বাণী উপহার দিব না? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের কাছে আসলেন অতঃপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে আপনার ওপর সালাম জানাব তা আমরা (আপনার কাছ থেকে) জানতে পেরেছি। অতএব, কি পদ্ধতিতে আমরা আপনার ওপর সালাত (দরুদ) পাঠ করব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা বলবে,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমত বর্ষণ কর যেভাবে আপনি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর পরিবারবর্গের ওপর রহমত বর্ষণ করে ছিলেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করুন যেমনি ভাবে আপনি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর প্রতি ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করেছিলেন। অবশ্যই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। [সহীহ বুখারী হা/৩৩৭০, মুসলিম হা/৪০৬]

সালাতে ও অন্যান্য সময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পড়ার বিধান

ইবনু মুলকান 'ইলামে' (৩/৪৫৬) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে যে 'কুলু' আমরের সিগা ব্যবহৃত হয়েছে তার বাহ্যিক চাহিদা হচ্ছে তা ওয়াজিব বুঝাবে। সকল বিদ্বান একমত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব। তবে তাদের মাঝে মতভেদ হচ্ছে পরিমাণ নিয়ে। অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, শাহাদাতাইন (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله) এর মতো জীবনে একবার দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব। তাহাবী ও হালীমী রহিমাহুমা বলেন, যখনই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারিত হবে তখনই তার ওপর দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব।

শাফেয়ী ও আহমাদ রহিমাহুমা বলেন, শেষ বৈঠকে সালামের পূর্বে দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব। উমার ইবনু খাত্তাব ও তার ছেলে আব্দুল্লাহ থেকে এই মত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাবী রহিমাহুল্লাহর এই মত গ্রহণ করেন। কিছু বিদ্বান বলেন, ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ যে বলেছেন শেষ বৈঠকে দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব এটা ইজমার বিপরীত মত। তাদের মাঝে আছেন ইমাম খাত্তাবী ও ইমাম বাগাবী রহিমাহুমা।

শেষ তাশাহুদে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করার বিধান

শেষ তাশাহুদে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ শরীআতসম্মত এ বিষয়ে কোনো বিদ্বানের দ্বিমত নেই। তবে তাদের মধ্যে মতভেদ হচ্ছে এর বিধান নিয়ে।

প্রথম মত: এটা সালাতের একটা রুকন, এটা ছাড়া সালাত বিশুদ্ধ হবে না। এটা শাবী, শাফেয়ী ও আহমাদের একটি মত রহিমাহুমুল্লাহ। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে এই মত বর্ণিত হয়েছে। ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন, আমি মনে করি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ না করা হলে সালাত বিশুদ্ধ হবে না। তাদের দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী, "হে ঈমানদারগণ! তাঁর ওপর দরুদ পাঠ করো ও সালাম দাও"। (সূরা আহযাব: ৫৬)

এই আয়াতের জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে, বিদ্বানরা একমত উল্লেখিত আয়াতটি মুস্তাহাবের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, ওয়াজিবের জন্য নয়। যদি ওয়াজিবের জন্য মেনেও নেয়া হয় তাহলে ওয়াজিব একবার সম্পাদন করলেই যথেষ্ট। তারা লেখক যে কাব ইবনু উজরা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস উল্লেখ করেছেন তা দিয়ে দলীল দিয়েছেন। সেখানে আছে, "তোমরা বলো, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ"। এই হাদীসের জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে, এখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তার ওপর দরুদ পাঠ করার জন্য প্রথমেই আদেশ করেননি। যদি তার ওপর দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব হতো তাহলে প্রথমেই আদেশ করতেন।

দ্বিতীয় মত: এটা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। নাখয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিদ্বানরা তাশাহুদ পড়াকেই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করার ব্যাপারে যথেষ্ট মনে করেন।

ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, সম্ভবত নাখয়ী রহিমাহুল্লাহ এই কথার দ্বারা ইচ্ছা করেছেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাম পাঠানো ও তার রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া এটাই যথেষ্ট তার ওপর দরুদ পাঠ করার চেয়ে। তার থেকে বর্ণিত হয়েছে এটাই তার উদ্দেশ্য। মানসুর, ছাওরী প্রমুখ বিদ্বান রহিমাহুমুল্লাহ থেকেও এমন কথা বর্ণিত হয়েছে। তাদের দলীল: সালাতে ভুলকারীর হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করার কথা বর্ণিত হয়নি। তারা আরো দলীল দেন বিদ্বানরা একমত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব নয়। ইমাম তাবারী ও তাহাবী রহিমাহুমা বলেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল বিদ্বান একমত নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব নয়। কিছু বিদ্বান বলেন, ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ ছাড়া কেউ বলেননি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব। তাদের এই কথা সঠিক নয়। কারণ পূর্ববর্তী অনেকেই ওয়াজিব বলেছেন। যেমন: উমার, ইবনু মাসউদ, জাবের ইবনু যায়েদ, কাসেম প্রমুখ বিদ্বান রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুম।

তৃতীয় মত: ভুলবশত দরুদ ছেড়ে দিলে সালাত বিশুদ্ধ হবে আর ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে বিশুদ্ধ হবে না। এটা আহমাদের একটি মত ও ইমাম ইসহাক রহিহুমাল্লার মত। ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকেও এমন মত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম মতে যে সকল দলীল বর্ণিত হয়েছে তারা ওই দলীল দ্বারাই দলীল দিয়েছেন।

সঠিকের নিকটবর্তী মত: এই মতগুলোর মাঝে সঠিকের নিকটবর্তী মত হচ্ছে তৃতীয় মত। আল্লাহ ভালো জানেন। (ইশরাফ ২/৪৪, মাজমু ৩/৩৫০, ইবনু রজব ৭/৩৫৪, নাইলুল আওতার ৩/২৬২)।

প্রথম তাশাহুদে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করা কি শরীআতসম্মত?

প্রথম মত: শরীআতসম্মত নয়। এটা আবু হানিফা, আহমাদ, ইসহাক ও শাফেয়ীর একমত রহিমাহুমুল্লাহ। আতা, শাবী, নাখয়ী ও ছাওরী রহিমাহুমুল্লাহ থেকেও এই মত বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মত: মুস্তাহাব। এটা শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহর নতুন মত। শাবী রহিমাহুল্লাহ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করাতে কোনো সমস্যা মনে করতেন না। ইমাম শাওকানী ও আলবানী রহিমাহুমা এই মত পছন্দ করেছেন।

সঠিকের নিকটবর্তী মত: সঠিকের নিকটবর্তী মত হচ্ছে প্রথম মত। ইবনু কাইয়্যিম ও আমাদের শাইখ মুকবিল রহিমাহুমা এই মতকে পছন্দ করেছেন। ইবনু কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ

বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তাশাহুদকে খুবই সংক্ষিপ্ত করতেন। এমন সংক্ষিপ্ত করতেন মনে হতো তিনি উত্তপ্ত পাথড়ের ওপর আছেন। কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি যে, তিনি তার ওপর ও তার পরিবারের ওপর এই তাশাহুদে দরুদ পাঠ করেছেন এবং কবরের, জাহান্নামের শাস্তি থেকে, জীবন- মৃত্যুর ও দাজ্জালের ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। যে ব্যক্তি এই তাশাহুদে দরুদ পাঠ করা মুস্তাহাব মনে করেন তিনি মূলত আম (ব্যাপক) হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন, যা মূলত শেষ তাশাহুদের ক্ষেত্রে পড়ার জন্য বর্ণিত হয়েছে।

আমি বলছি, 'যেন তিনি উত্তপ্ত পাথড়ের ওপর আছেন' মর্মে যে হাদীসটি আবু দাউদ (৯৯৫) ও তিরমিযী (৩৬৬) বর্ণনা করেন, এই হাদীসটা আবু উবায়দা তার বাবার সূত্রে ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণনা করেন। কিন্তু তার বাবা ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে এই হাদীস শুনেননি। (মুগনী ১/৫৩৭, মাজমু ৩/৪৪১, যাদুল মাআদ ১/২৪৫, নাইলুল আওতার ৩/২৭০)

বি.দ্র. প্রথম তাশাহুদে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করা মুস্তাহাব। ইমাম শাওকানী ও আলবানী রহিমাহুমাল্লাহর পছন্দনীয় মত। দেখুন, আল লুবাব পৃ. ১৪৭, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৩৯, আল ওয়াজীব ফি ফিকহুস সুন্নাহ ওয়াল কিতাব পৃ. ৯৭, আল মওসূআতুল ফিকহীয়াহ আল মুইয়াসসারাতুহ ২/৮০, তামামুল মিন্নাহ পৃ. ২২৪ ।

١١٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَدْعُو: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

১১৮. আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই কবরের 'আযাব হতে, জাহান্নামের আযাব হতে, জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিৎনা হতে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিৎনা হতে। [সহীহ বুখারী হা/১৩৭৭, মুসলিম হা/৫৮৮]

মুসলিমের অন্য শব্দে রয়েছে: যখন তোমাদের কেউ তাশাহুদ পাঠ করবে। সে যেন চারটি বিষয় হতে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নামের ‘আযাব হতে, কবরের ‘আযাব হতে, জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিৎনা হতে এবং মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট ফিৎনা হতে। [সহীহ মুসলিম হা/৫৮৮]

১১৯. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –:عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

১১৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন। আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি আমাকে এমন একটি দু‘আ শিক্ষা দিন যা দিয়ে আমি আমার সালাতে আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করতে পারব। তিনি বললেন, তুমি বল,

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আমার আত্মার প্রতি অত্যাধিক যুলুম করেছি। আর এসব পাপ তুমি ব্যতীত আর কেউ ক্ষমা করবে না। অতএব, তোমার পক্ষ হতে আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি দয়া করো। নিশ্চয় তুমি পরম ক্ষমাশীল ও অতি করুণাময়। [সহীহ বুখারী হা/৮৩৪, মুসলিম হা/২৭০৫]

শেষ তাশাহুদে দুআ করার বিধান কী?

শেষ তাশাহুদে সালাম ফিরানোর পূর্বে দুআ করা শরীআতসম্মত এ বিষয়ে কোনো বিদ্বানের মাঝে দ্বিমত নেই। তাদের মাঝে মতভেদ চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ওয়াজিব কিনা এ নিয়ে?

প্রথম মত: চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ওয়াজিব। কারণ এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা লেখক উল্লেখ করেছেন। এটা তাউস, ইবনু হাযম, হাম্বলীদের একটি মত। ইমাম শাওকানী ও সানআনী রহিমাহুমাল্লাহ এই মত কে পছন্দ করেছেন।

ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, প্রথম তাশাহুদেও আশ্রয় প্রার্থনা করা ওয়াজিব। তবে মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস তার এই মতকে প্রত্যাখ্যান করে। সেখানে আছে, 'তোমাদের কেউ শেষ তাশাহুদ থেকে অবসর হলে সে যেন চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে'।

দ্বিতীয় মত: ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। কিছু বিদ্বান তো ওয়াজিব নয় এর ওপর ইজমা দাবি করেন। তারা বলেন, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে যে আমর (আদেশ) ব্যবহৃত হয়েছে তা ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু এর একই হাদীস, যা এই অধ্যায়েই পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে আছে, 'তারপর সে যা ইচ্ছা তাই চাইবে'। বুখারীর বর্ণনায় এভাবে এসেছে, 'তারপর তার মনে যা চায় সে তাই দুআ করবে'। এমনিভাবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক সাহাবীকে বলেন, 'তুমি সালাতে কী বলো'? সে বললো, আমি তাশাহুদ পড়ি ও জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি আপনার ও মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর অস্পষ্ট শব্দগুলো বুঝি না। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমরাও অস্পষ্ট শব্দগুলোর আশপাশে ঘুরে থাকি'। হাদীসটি আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ (৭৯৩) বর্ণনা করেন। হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। আলবানী রহিমাহুল্লাহ আবু দাউদে ও মুকবিল রহিমাহুল্লাহ সহীহুল মুসনাদে (১৪৬১) হাদীসটি কে বিশুদ্ধ বলেছেন।

প্রাধান্যযোগ্য মত: আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের আলোকে প্রাধান্যযোগ্য মত **হচ্ছে প্রথম মত অর্থাৎ চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ওয়াজিব।** আল্লাহ ভালো জানেন।

(আওসাত ৩/৩১৪, ইহকাম ২/৭৭, শারহে মুসলিম (৫৮৮) ইবনু রজব ৭/৩৪৩, ফাতহুল বারী ২/৩২১, সুবুলুস সালাম ১/৪৩৭, নাইলুল আওতার ৩/২৮১)।

সালাতে দুআ মাছুরা (হাদীসে বর্ণিত দুআ) ও গাইরে দুআ মাছুরা (যা হাদীসে বর্ণিত হয়নি) পড়ার বিধান কী?

কুরআন ও হাদীসে যে সকল দুআ বর্ণিত হয়েছে শেষ তাশাহুদে তা পড়া জায়েয ও মুস্তাহাব। এ বিষয়ে বিদ্বানের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। তাদের মাঝে মতভেদ হচ্ছে ওই সকল দুআ নিয়ে, যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন উদ্দেশ্য হয়, দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য থাকে না, কিন্তু যেগুলো কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, **এ সকল দুআ করা জায়েয আছে।** কারণ ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসে বলা হয়েছে, 'তারপর

সে যা ইচ্ছা তাই চাইবে'। অনুরূপভাবে আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। ওই হাদীসে আছে, আমি জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আবু হানিফা, ছাওরী, তাউস ও নাখয়ী রহিমাহুমুল্লাহ তারা বলেন, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দুআ ব্যতীত অন্য কোনো দুআ পড়া জায়েয নেই।

সঠিক মত: পূর্বের দলীলের আলোকে সঠিক মত হচ্ছে অধিকাংশ বিদ্বানের মত।

এরপর কথা হচ্ছে দুআতে যদি বিশেষভাবে দুনিয়াবী কোনো কল্যাণ মূলক কিছু চায়, যেমন এভাবে দুআ করা, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র রিযিক দাও, সুন্দরী স্ত্রী দাও ও সুন্দর কাপড় দাও। এ ক্ষেত্রে উরওয়া, মালেক, শাফেয়ী, ইসহাক, আবু ছাওর ও আহমাদের একমত রহিমাহুমুল্লাহ তারা বলেন, এভাবে দুআ করা জায়েয আছে। তারা মুসলিমে (৪৭৯) বর্ণিত ইবনু মাসউদ ও ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুমার হাদীস দিয়ে দলীল দিয়েছেন। সেখানে আছে, 'সিজদায় বেশি বেশি দুআ করো। কারণ সিজদায় দুআ কবুল হওয়ার স্থান'। এখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণভাবে দুআ করার জন্য আদেশ করেছেন, কোনো নির্দিষ্ট দুআ নির্ধারণ করেননি। অন্য দিকে ইমাম আহমাদের প্রসিদ্ধ মত, শাফেয়ী মাযহাবের আবু মুহাম্মদ জুওয়াইনী এবং ইমাম আবু হানিফা ও তার সাথে যারা আছেন তাদের মত হচ্ছে এই ধরনের দুআ করা জায়েয নেই। তারা বলেন, কেননা এ ধরনের দুআ মানুষের কথার মতো। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় এই সালাতে মানুষের কথা বৈধ নয়। এখানে শুধু তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ হবে'।

সঠিকের নিকটবর্তী মত: সঠিকের নিকটবর্তী মত হচ্ছে প্রথম মত আর তা হচ্ছে এ ধরনের দুআ করা জায়েয আছে। আল্লাহ ভালো জানেন।

(ইশরাফ ২/৫০, মুগনী ১/৫৪৬, মাজমু ৩/৪৫৪, ইবন রজব ৭/৩৪৪, ফাতহুল বারী ২/৩২১)।

সালাত শেষ করতে সালাম ফিরানোর বিধান

প্রথম মত: সালাত শেষ করতে সালাম ফিরানো হচ্ছে সালাতের রুকন। সালাম ছাড়া সালাত থেকে বের হওয়া যাবে না এবং এটা ছাড়া সালাতও বিশুদ্ধ হবে না। এটা সাহাবী, তাবেঈ ও তৎপরর্তী অধিকাংশ বিদ্বানের মত। তাদের দলীল: আলী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস, 'সালাত থেকে বের হতে হবে সালাম দ্বারা'। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছো সেভাবে সালাত আদায় করো'।

দ্বিতীয় মত: সালাম ফিরানো ওয়াজিব নয় এবং এটা সালাতের অন্তর্ভূক্তও নয়। সালাত পরিপন্থি কাজ যেমন পানাহার করা, কথা বলা অথবা ওযূ নষ্ট করার দ্বারা সালাত থেকে বের হওয়া যাবে। চাই এটা মুসল্লী ইচ্ছা করে করুক বা অনিচ্ছা করে করুক। এটা হাকাম, হাম্মাদ,

ছাওরী, আওযায়ী আবু হানিফা ও তার ছাত্রদের মত রহিমাহুমুল্লাহ। তবে আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইচ্ছা করে ওযূ নষ্ট করলে সালাত বিশুদ্ধ হবে আর যদি অনিচ্ছায় করে তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

একদল বিদ্বান বলেন, যে ব্যক্তি তাশাহুদের পর ইচ্ছা করে ওযূ নষ্ট করে ফেলবে তার সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। তাদের মাঝে আছেন, হাসান, ইবনু সিরীন, নাখয়ী রহিমাহুমুল্লাহ। তবে আতা রহিমাহুল্লাহ এর বিরোধিতা করেন। আলী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকেও নাকি এমন মত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম আহমাদ, আবু হাতেম প্রমুখ বিদ্বান রহিমাহুমুল্লাহ বলেন, এর সনদ বিশুদ্ধ নয়।

প্রাধান্যযোগ্য মতঃ প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে প্রথম মত। আল্লাহ ভালো জানেন।

(মুগনী ১/৫৫১, মাজমু ৩/৪৬২, ইবনু রজব ৭/৩৭৬)।

١٢٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: "إِذَا جَاءَ نَصرُ اللهِ وَالْفَتحُ"، إِلَّا يَقُولُ فِيهَا: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي".

وَفِي لَفْظٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ.: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي".

১২০. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি "**إِذَا جَاءَ نَصرُ اللهِ وَالْفَتحُ**" সূরা আন নাসর নাযিল হওয়ার পর তিনি প্রত্যেক সালাতেই বলতেন,

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي".

হে আল্লাহ, আমরা প্রশংসাসহ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হে আমাদের প্রতিপালক। হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো। [সহীহ বুখারী হা/৮১৭, মুসলিম হা/৪৮৪]

অন্য শব্দে রয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকূ ও সিজদার মধ্যে বেশি বেশি বলতেন,

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي".

হে আল্লাহ, আমরা প্রশংসাসহ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আমাদের প্রতিপালক। হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো। [সহীহ বুখারী হা/৪৯৬৮, মুসলিম হা/৪৮৪]

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত কিতাবসমূহ

১. কিতাবুল ঈমান- ড. আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২. শারহুস সুন্নাহ-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৩. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব ইবনু সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৪. কিতাবুত তাওহীদ
- ড. সালিহ ইবনু ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৫. আকীদাতুত তাওহীদ
-ড. সালিহ ইবনু ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৬. আল ইরশাদ- সহীহ আকীদার দিশারী (ঈমানের মূলনীতির ব্যাখ্যা)
- ড. সালিহ ইবনু ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা]

৭. আল ওয়াসীয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৮. আল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৮০ টাকা]

৯. শারহুল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া
-ড. সালিহ ইবনু ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১০.শারহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ
- ড. সালিহ ইবনু ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১১.শারহুল আকীদা আত-তহাবীয়া প্রথম খণ্ড
-ইমাম ইবনু আবীল ইয আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

১২.শারহুল আকীদা আত-তহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড
-ইমাম ইবনু আবীল ইয আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

১৩.নবী-রসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি
- মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৪. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৫. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৬. কিয়ামতের সহীহ আলামত- শাইখ ইসাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৭. ফিকহুল খিলাফাত

- মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১৮. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়আত

-আব্দুল আলীম ইবনু কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১৯. ইসলামী রাজনীতি বিষয়ক ফতোয়া

-শাইখ মুকবিল ইবনু হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২০. ফিকহের মূলনীতি (আল উসূল মিন ইলমিল উসূল)

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২১. হাদীস আকীদা ও ফিকহের স্বতন্ত্র দলীল

- মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ [নির্ধারিত মূল্য: ১৮০ টাকা]

২২. মুখতাসার কিতাবুত তাওহীদ

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমাহ [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২৩.মানহাজ-কর্মপদ্ধতি

- ড. সালিহ ইবনু ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২৪. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদার নিরসন

- ড. আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

২৫. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৬. ইজতিহাদ ও তাকলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২৭. ফায়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান

- মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হামাদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

২৮. কিতাবুল ফারায়েয-উত্তরাধিকার আইন

- মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৯. উমদাতুল আহকাম

- ইমাম হাফেয আব্দুল গনী আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৩০. তাওযীহু উসূলিল ফিকহ আলা মানাহাজি আহলিল হাদীস

-যাকারীয়া ইবনু গুলাম কাদীর [নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ টাকা]

৩১. আন নাবযাতুল কাফীয়া ফী আহকামি উসূলিদ দীন-দীনের মূলনীতি

- ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩২. আদ-দুরারুল বাহীয়াহ ফিল মাসাঈলিল ফিকহিয়াহ

- মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৩৩. নতুন চাঁদের মাসআলা

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩৪. ইমাম নব্বীর চল্লিশ হাদীসের ব্যাখ্যা

-ইমাম ইবনু দাকীক ঈদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩৫. কিতাবুল আরশ

-ইমাম আয-যাহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৩৬. সালাসাতুল উসূল এর ব্যাখ্যা (তিনটি মূলনীতি বুঝার সহজ উপায়)

- ড. মানসূর বিন মুহাম্মাদ আল সাকউব [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৩৭. আল-ফাতওয়া আল-হামাবীয়া আল-কুবরা

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫০ টাকা]

৩৮. ইসলামে যুদ্ধ ও তার মূলনীতি

- ড. আব্দুস সালাম ইবনু সালেম আস-সুহাইমী [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৩৯. মুখতাসার ফিক্বহুস সুন্নাহ-আল লুবাব ফি ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব

- মুহাম্মাদ সুবহী ইবনু হাসান হাল্লাক্ব [নির্ধারিত মূল্য : ১২০০ টাকা]

৪০. তাফসীর আস সা‘দী ১০ম খণ্ড (৫৮-১১৪)

-শায়খ আব্দুর রহমান নাসির আস-সা‘দী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

৪১. বেরেলভী মতবাদ

-শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৪২. মিসকুল খিতাম (উমদাতুল আহকামের ব্যাখ্যা) প্রথম খণ্ড

- যায়েদ ইবনু হাসান ইবনু সালেহ আল-ওয়াসাবী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত দাওয়াতী রিসালাসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু বায [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাসের ইবনু আব্দুল করীম আল-আকল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩. ইসলামী আকীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৪. আকীদা আত-তাওহীদ বিষয়ে ১০০ প্রশ্নোত্তর

-আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ আশ-শাআলান [নির্ধারিত মূল্য: ৪০ টাকা]

৫. আহলুল হাদীসদের আকীদা-আবূ বকর আহমাদ ইবনু ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

৬. উসূলুস সুন্নাহ-ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৭. লুমআতুল ইতিকদ-আকীদার ঝলক
-ইবনু কুদামা আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৮. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা
- আব্দুল আলীম ইবনু কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৯. আল আকীদা আত-তহাবীয়া
- ইমাম আবূ জাফর আহমাদ আত-তহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১০. আল ওয়ালা ওয়াল বারা [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]
- ড. সালিহ ইবনু ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১১. আমাদের দাওয়াত, আমাদের আকীদা ও ফিতনা হতে মুক্তির উপায়
-শাইখ মুকবিল ইবনু হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

১২. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানকীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৩. ইসলামে মানবাধিকার
- শাইখ সালিহ ইবনু আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৪. কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা
-সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৫. হাদীসের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আসারী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৬. এক নজরে সালাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৭. একশত কবীরা গুনাহ
- ড. সালেহ ইবনু আব্দুল্লাহ আস-সাইয়্যাহ [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

১৮. যাকাতুল ফিতর
- মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

১৯. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়া-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ
-আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২০. নতুন চাঁদের বিধান- শায়েখ আদনান ইবনু মুহাম্মাদ আল আরউর
[নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২১. সিয়াম পালনকারীর হিজামার বিধান
শাইখ উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ। [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২২. বিদআতের মূলনীতি ও উম্মাহর প্রতি তার কুপ্রভাব
আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু নাসির আল-ফাকীহী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]